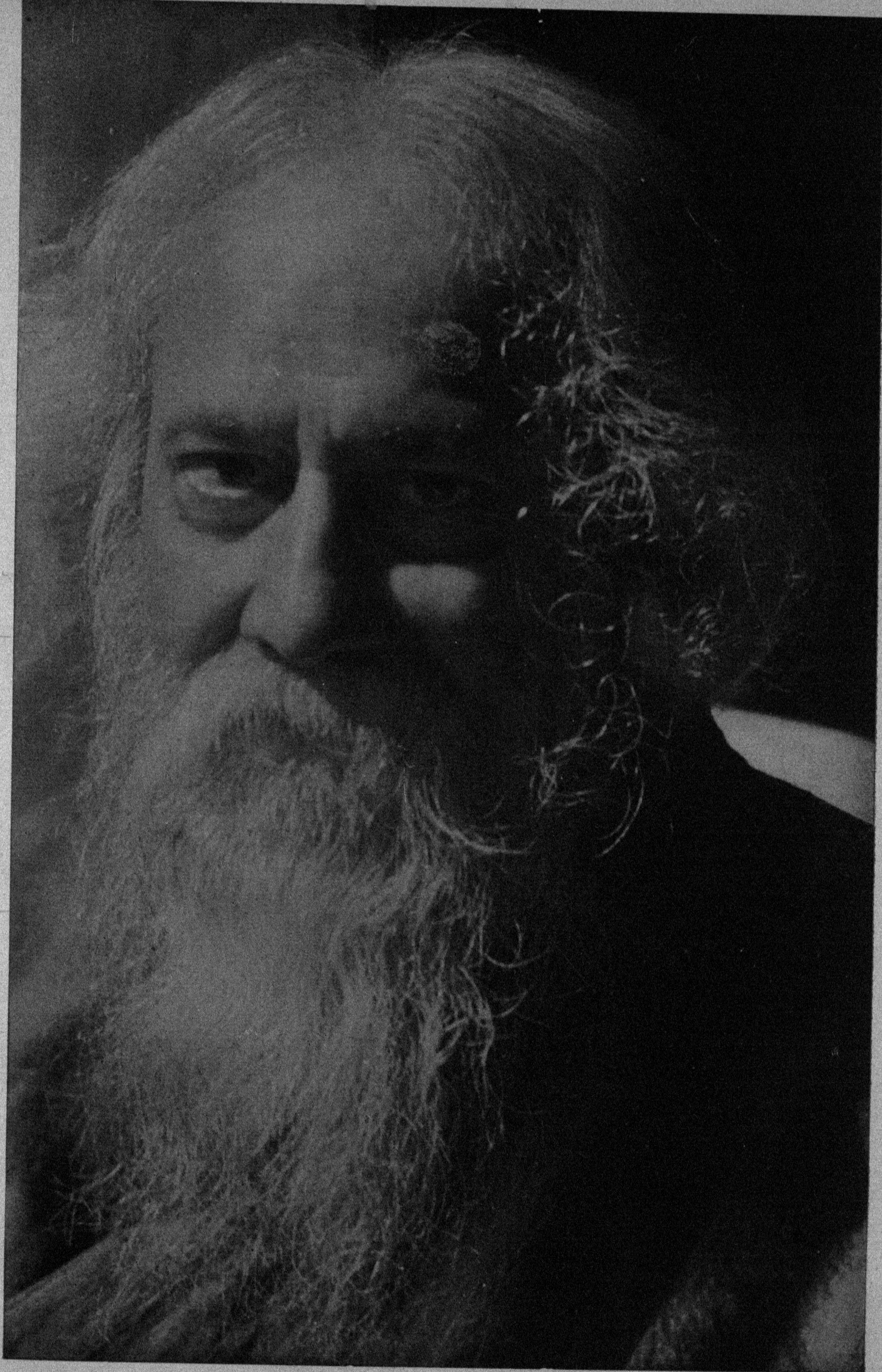
প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৩

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

২'১



Raymond Burnier-গৃহীত চিত্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির এক পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছিলেন, "আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে। সে অনুরোধ পালন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি।" তবে তাঁহার প্রশ্ন : "যাঁহারা সাধু এবং যাঁহারা কর্মবীর তাঁহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয়— কেননা, তাঁহাদের জীবনটাই তাঁহাদের সর্ব-প্রধান রচনা। কবির সর্বপ্রধান রচনা কাব্য, তাহা তো সাধারণের অবজ্ঞা বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে— আবার জীবনের কথা কেন।" কিন্তু নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে গিয়া কবির "চোখে পড়িয়াছে যে, কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-দুটা একই বৃহৎ-রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে, আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত।" টেনিসনের জীবনী পড়িয়া 'কবিজীবনী' (আষাঢ় ১৩০৮) নামে তিনি যে প্রবন্ধটি লেখেন সেইটিও এখানে স্মরণীয়। এই প্রবন্ধে কবি এক স্থানে বলেন, "কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন ; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।" এই উক্তি কি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না? রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র কবি হইতেন তবে হয়তো তাঁহার জীবনচরিত রচনারই প্রয়োজন হইত না, কারণ কাব্যই কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য এবং সে-দান তো তিনি প্রচুর পরিমাণেই রাখিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকি, ভাস, কালিদাসের নাম সংস্কৃত সাহিত্যে কিম্বদন্তী মাত্র, শেক্স্পীয়রের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এখনো সকল পণ্ডিত একমত হন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনসত্তায় কবি ও কর্মীর যে যুগ্মরূপ ফুটিয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে কোনো কবি বা কর্মীর জীবনে এমন সুষমভাবে পরিস্ফুরণের অবকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতে কবি বা কর্মী -রূপের কোনো একটিকে বাদ দিয়া অপরটির আলোচনা অসংগত হইবে। কারণ, এই দুইই এক 'বৃহৎ-রচনার অঙ্গ'। সেইজন্য চারি খণ্ডে সার্ধসহস্র পৃষ্ঠায় কবির বাণী-বিকাশের ইতিহাস লিখিয়াও মনে হইতেছে, তাঁহার কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা বিশ্বভারতীর ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে বলা হয় নাই। যেখানে তিনি কবি ও মনীষী সেখানে তাঁহার সৃষ্টিকার্যে তিনি নিঃসঙ্গ। কিন্তু যেখানে প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন, সেখানে শত শত লোকের সহায়তা তাঁহাকে নিত্য যাচ্ঞা করিতে হইয়াছে ; জীবনের শেষ পর্যন্ত উদাসীন, শ্রদ্ধাহীন, এমন-কি বিদ্রূপকারীদের প্রতিকূলতাকে স্বানুকূলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই সেই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালের ইতিহাস কবিজীবনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত। সেই ইতিহাস রচিত হইলে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনের কাহিনী সম্পূর্ণ হইবে, কারণ বিশ্বভারতী তাঁহার ব্যক্তিসত্তার 'বৃহৎ রচনারই অঙ্গ'।

কাব্য যাঁহারা উপভোগ করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে কাব্যপাঠই যথেষ্ট ; অন্তরের আলোকে তাঁহারা কবির ভাবের মধ্যে প্রবেশাধিকার সহজেই পান, রসিকের রস-উপভোগের জন্য রাসায়নিককে ডাকা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তাই তাঁহার জীবনের একমাত্র পরিচয় নহে, যদিও আত্মপরিচয়দান-কালে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কবিজীবনেরই ব্যাখ্যান ; জীবনস্মৃতিকেও তিনি সাহিত্যময় করিয়া লিখিয়াছিলেন। সেইজন্য 'সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা' করিয়াছিলেন, 'বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ' ফুটাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। জীবনস্মৃতিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনের শেষ কথা বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ একটি পরিপূর্ণ মানুষের ধর্মের প্রতীক বলিয়া তাঁহার জীবন এমন বিচিত্র এবং তাঁহার জীবনচরিত লেখাও সেইজন্য এমন কঠিন। তাঁহার রসাত্মক কাব্যজীবন রহস্যময়। যে মানুষের চেতন-অবচেতন মনের কাছে

'বিশ্বচরাচর গোচর অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন' মালায় গাঁথা, সে-মানুষ সম্পূর্ণ (perfect) না হইতেও পারেন, তবে তিনি আপনার মাঝে আপনি পূর্ণ বলিয়াই সার্থক। সেই বিচিত্রধর্মী মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবনের রচনা ও ঘটনা পাশাপাশি বা যুগপৎ দেখিবার প্রয়োজন হয়; সেইখানেই জীবনীকারের প্রয়োজন।

এই বিচিত্রধর্মী মানুষকে নানা লোকের নানা ভাবে দেখা খুবই স্বাভাবিক; তাই দেখা যায় নানা শ্রেণীর লোক ও মতবিশ্বাসীরা কবিকে আপন আপন দলের বা মতের গণ্ডির মধ্যে টানিবার জন্য চেষ্টান্বিত। তাঁহার বিরাট সাহিত্য হইতে বচন ও কবিতা চয়ন করিয়া যে যাহার মতো তাঁহাকে গড়িতেছেন। কেহ তাঁহাকে ভক্ত, কেহ ঋষি, কেহ নাৎসি, কেহ কম্যুনিস্ট, কেহ ফাসিস্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ য়ুটোপিয়ান রূপে অভিহিত করিতেছেন, কেহ তাঁহার সাহিত্যকে অশ্লীল, কেহ-বা বস্তুতন্ত্রহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সূর্যের আলো শুভ্র— বর্ণালীতে সে সপ্তবর্ণ।

রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কাছে এই কথাটি খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, কবিকে যাঁহারা কোনো গণ্ডি দল বা ism-এর মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে পাইবেন না; অন্ধের হস্তীদর্শন হইবে। কবির জীবনদেবতা শতদলবিহারিণী। কবি শতদলের লোক, তাঁহাকে একটি দলের মধ্যে পাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। রবীন্দ্রনাথ দলের ছিলেন না, দল গঠন করেন নাই। শারদোৎসবের একজন বালক ঠাকুরদাকে বলে, "তুমি আমাদের দলে", দ্বিতীয় জন বলে, "তুমি আমাদের দলে"। ঠাকুরদা বলেন, "ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই। . . আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি, তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক, তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। . . ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘরগড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশি, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করি নে।" (আত্মপরিচয়) মানুষ অপূর্ণ বলিয়াই সে সার্থক ও সুন্দর হইবার সুযোগ পায়।—

কত জয় কত পরাভব
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই-সব
ভালোমন্দ সাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।

এই সাদায় কালোয় গড়া মানুষকেই কবিরা ভালোবাসিয়াছেন, সাহিত্যে তাহাদের গড়িয়াছেন— দেবতাকে দূর হইতে প্রণাম করা যায়, মানুষকে বুকে টানা যায়। রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা সেইখানেই যেখানে 'অপূর্ণ' মানুষের ধরণীকে 'আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙিন' করিবার জন্য প্রার্থনা জাগিয়াছে। অন্তরের দিকে তাকাইয়া আজ আমরা যদি সে-কথায় সায় দিতে না পারি— যদি 'নবীন আভায়' নিজ নিজ জীবনের কোনো-একটি অংশও রঙিন করিয়া না থাকি— তবে বুঝিব রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু তাহা যে হয় নাই, তাহা আজ বাঙালীর জীবন প্রতিদিন সাক্ষ্য দিতেছে। সে নয়নের মাঝখানে নিয়েছে যে ঠাঁই!

আমাদের এই আলোচ্য খণ্ড রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ সাত বৎসরের ইতিহাস। এই পর্বটির ইতিহাস যেমন জটিল, উপাদানও তেমনি অতি-প্রচুর। এই সময়টি ভারতের স্বাধীনতা-লাভের জন্য পূর্ণ-উদ্যমের পর্ব; পশ্চিম-য়ুরোপেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব। দেশের ও বিদেশের বিচিত্র রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরা, মানুষের সকলপ্রকার অপমান দুঃখ ও বেদনা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শচেতন চিত্তকে তীব্রভাবে আঘাত করে— সাড়া না দিয়া তিনি পারেন না। তাই দেখিতে পাই, প্রতিবাদ, মতান্তর, এমন-কি বন্ধুবিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও, অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা

করিতে কবি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। বিশেষ দলের বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন অথবা ব্রিটিশ-ভারতের কর্তৃপক্ষের অপ্রিয় হইবার ভয়ে, তাঁহার কাছে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে এরূপ বিষয় সম্বন্ধে অকুণ্ঠ ভাষায় মত প্রকাশ করিতে নিরস্ত হন নাই আত্মদৃষ্টি হইতে কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে ভারত ছাড়িতেই হইবে এবং তাহাকে কোন্ অবস্থায় ভারতকে রাখিয়া যাইতে হইবে তাহারও আভাস্ দিয়া গিয়াছিলেন— আজ তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে।

আমাদের আলোচ্য পর্বে (১৯৩৫-৪১) রবীন্দ্রনাথের প্রায় চল্লিশখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; ইহার মধ্যে সবগুলি নূতন গ্রন্থ নহে, কয়েকখানি পূর্ব-রচনার নূতন সংস্করণও আছে। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে কবিতা, গান, নৃত্যনাট্য, গল্প, প্রবন্ধ, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা-বিষয়ক বই। তবে কবিতা ও গানের বইই বেশি— সতেরোখানি কাব্য এই পর্বের রচনা। এই সময়ের কবিতাপুস্তকগুলি সম্বন্ধে নানা লেখকের নানা মত, যেমন চিরদিনই হইয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, একই কাব্যকে বিভিন্নভাবে দেখা সমালোচকদের স্বভাবধর্ম। এই-সব রচনা ছাড়া আছে সাংবাদিকদের সঙ্গে মোলাকাৎ, সংবাদপত্রে বিবৃতি ও খোলাচিঠি, জন্মদিনের ও বিবাহদিনের জন্য আশীর্বাণী, মৃত্যুর জন্য সান্ত্বনাবাণী, নূতন লেখকদের গ্রন্থপাঠ করিয়া উৎসাহবাণী, শিল্পপতিদের কর্মশালা পরিদর্শন করিয়া প্রশংসাবাণী, ইত্যাদি। এই-সমস্তের ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘকাল ছিল ছবি আঁকার কাজ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত-রচনার উপাদান প্রচুর। প্রথমত তাঁহার রচনাই তাঁহার জীবনের প্রধান ভাষ্য ও সমালোচনা। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে আপনাকে দেখিবার অসামান্য ক্ষমতা-বলে তিনি স্বয়ং বহু ক্ষেত্রে বিচারকের আসনে বসিয়া আপনাকেই বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এ ছাড়া কবিজীবনীর শ্রেষ্ঠ উপাদান তাঁহার চিঠিপত্র; তাঁহার জীবিতকালে যে-সব চিঠিপত্র সম্পাদিত ও সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, আমাদের মতে সেই-সবই জীবনেতিহাসের প্রধানতম উপাদান। অত্যন্ত ব্যক্তিগত, এমন-কি পারিবারিক চিঠিপত্র তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এমনভাবে মুদ্রিত হইয়া বাহির হইবে, তাহা কবি স্বপ্নেও বোধ হয় ভাবেন নাই। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পত্র ব্যতীত তাঁহার বহুশত পত্র প্রকাশিত হইবার জন্যই লিখিত হয়, এবং সদ্য রচনার অব্যবহিত পরেই সমসাময়িক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; সেগুলির মধ্যে তত্ত্ব অনেক, তথ্য কম, তবে মনের ও মতের আবহাওয়াটা ভালো করিয়াই জানা যায়। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রধারা কাটিয়া ছাঁটিয়া কবি 'ছিন্নপত্র' নামে বাহির করেন। ভাবিয়াছিলেন পত্রমধ্যে লিখিত জীবনের ব্যক্তিগত ঘটনাগুলি দিবালোক দেখিবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে সাময়িক পত্রিকার অনুসন্ধিৎসু সম্পাদকগণ কৌতূহলী পাঠকদের সম্মুখে সে-সবও পূর্ণভাবে পেশ করিয়াছেন। এই বিরাট পত্রধারা যৌবনকালের রবীন্দ্রনাথের জীবনীর শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইবে, কারণ সেগুলি লিখিবার সময় ছাপিবার কথা মনে হয় নাই।

কবির তিরোধানের পরে তাঁহার লিখিত কতশত পত্র যে সাময়িক পত্রিকাদিতে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সঠিক বলা কঠিন। এতদ্‌ব্যতীত বহু স্মৃতিগ্রন্থ ও আত্মজীবনীর মধ্যে কবি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যাইতেছে। এই-সব স্মৃতিগ্রন্থের কতকগুলি হইতে মূল্যবান উপাদান পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সকলগুলিই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যায় কি না তাহা গভীরভাবে বিচার্য। সমসাময়িক উপাদান হইতে সে-সব তথ্যের সমর্থন পাইলেই অবিসম্বাদী বলিয়া সেগুলিকে গ্রহণ করিতে পারা যায়; নতুবা অগ্রাহ্য হওয়া উচিত। সংক্ষেপে এইটুকুমাত্র বলিতে চাই যে, আমরা স্বভাবত ইতিহাসবিমুখ— হয় সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা বিসর্জন দিয়া অন্ধ গুরুবাদী, নয় সমস্ত প্রমাণ-প্রয়োগ তুচ্ছ করিয়া অহেতুনিন্দাবাদী; তথ্যনিরূপণ-বিষয়ে আমরা স্বভাবতই শিথিল; আমাদের বিশ্বাস অল্পতেই; শোনা কথা বা 'গালগল্প' প্রমাণাভাবে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করি না; আবার তথ্যানুসন্ধানের জন্য মেহন্নত করিতেও পরাঙ্মুখ।

কোনো কোনো লেখক কবির জবানীতে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাহা যে রবীন্দ্রনাথের ভাষা নহে, তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক সহজেই ধরিতে পারিবেন। সেই-সব রচনার মধ্যে কতখানি রবিচ্ছায়া ও কতখানি লেখকের উপচ্ছায়া পড়িয়াছে নির্ণয় করা কঠিন। এইখানে থুকিডিডেস তাঁহার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও রচনারীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয়; তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই যুদ্ধে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল কেবল লোকের মুখে গল্প শুনে কি অনুমানে নির্ভর করে তাদের বর্ণনা করি নি। যে ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি নিজের জ্ঞান থেকে তা লিখেছি। যেখানে তা সম্ভব হয় নি সেখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ বহু পরীক্ষার পর গ্রহণ করেছি। এ কাজ কঠিন, কারণ একই ঘটনা যারা দেখে তাদের বিবরণের মধ্যে অনেক অসংগতি। মনের পক্ষপাতিত্ব ও স্মৃতিশক্তির তারতম্য এই অসংগতির কারণ। আমার বিবরণে গল্প ও কল্পনার মিশাল নেই, সেজন্য হয়তো তেমন সুখপাঠ্য নয়। তবে তাদের তৃপ্তি দেবে যারা অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ ভালোবাসেন। আমার ইতিহাস সাধারণের স্থায়ী সম্পত্তি, সাময়িক হাততালি লাভের কৌশল নয়।"[১]

রবীন্দ্রনাথের সার্ধ-সহস্রাধিক-পৃষ্ঠাব্যাপী জীবনী লিখিতে আমার জীবনের দীর্ঘকাল গিয়াছে। তরুণ বন্ধুরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন কবে এই গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয়। সঠিক তারিখ দেওয়া কঠিন। গ্রন্থরচনার পূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্য-অধ্যয়ন ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তথ্যাদি-সংগ্রহকে এই গ্রন্থ-প্রণয়নেরই অঙ্গ বলিয়া ধরা উচিত। আমি ১৯০৯ সালের শেষ ভাগে শান্তিনিকেতনে আসি— রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিলাম এই প্রথম— তার পর বত্রিশ বৎসর তাঁহাকে দেখিবার, জানিবার, তাঁহার কথা শুনিবার, তাঁহার অপার স্নেহ পাইবার, তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক— এমন-কি সভাসমিতিতে তাঁহার বিরোধিতা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সেই-সব ধৃষ্টতার কথা মনে হইলে অবাক হইয়া ভাবি কী ধৈর্যশীল মহাপুরুষের সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিব এই দুরাকাঙ্ক্ষা কবে হইল তাহার ইতিহাস আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান সুধীরচন্দ্র কর পুরাতন কাগজপত্র হইতে সম্প্রতি উদ্ধার করিয়া আমার কাছে পেশ করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে ১৯২৯ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী ও শ্রীসুধীরচন্দ্র করের সম্পাদকত্বে 'রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা' স্থাপিত হয়। সভার পক্ষ হইতে এক আবেদনপত্র প্রচার করা হয়, তাহাতে ঐ সভার জন্য কে কী কাজ করিবেন সে সম্বন্ধে নিজ নিজ মত লিপিবদ্ধ করিবার অনুরোধ লইয়া সুধীরচন্দ্র হাজির হন। এই পত্রে আশ্রমের তৎকালীন প্রায় সকলেরই নাম-স্বাক্ষর দেখিলাম। সেইখানে আমি লিখিয়াছিলাম যে, "১৯১০ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনী' সংকলন করিবার ভার গ্রহণ করিলাম— ২৯.৭.২৯।" সেইদিন ছিল ১৩ শ্রাবণ ১৩৩৬। তার পর রবীন্দ্রজীবনীর চতুর্থ খণ্ডের রচনা-সমাপ্তি ও বিশ্বভারতীর সহিত আমার কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের অবসান ঘটিল প্রায় সেই সময়েই— ১১ শ্রাবণ ১৩৬১ (২৭ জুলাই ১৯৫৪)।

এই দিনের সহিত আমার জীবনের আর-একটি সামান্য ঘটনা যুক্ত আছে। ১৩১৭ সালের আষাঢ় মাসে আমি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হই; সেই বৎসর ১১ শ্রাবণ আমার জন্মদিনে আমার মতো অভাজনের কথা দিয়া বুধবারের সন্ধ্যাকালীন মন্দিরের উপাসনা কবি আরম্ভ করেন (পূর্ণ, শান্তিনিকেতন, ১২শ খণ্ড)। তিনি বলেন, "আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন, আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।' তাঁর সেই যৌবনকালের আরম্ভ, আর আমার এই প্রৌঢ়বয়সের প্রান্ত— এই দুই সীমার মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই উনিশ বছরকে দেখছি, গণনা ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দূরে! তাঁর এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবাদ, কত ফসল ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নষ্ট হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা

১ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, "ইতিহাসের মুক্তি", বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২।

নেই। . . তাই আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিন্তবিন্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারি নে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে, তারাই সবচেয়ে বড়ো হয়ে আমার চোখে পড়ছে না, এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে সেইটেই আমার কাছে আজ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে।"

আজ জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া আমিও পিছন ফিরিয়া অতীত জীবনকে দেখিতেছি। আমার একমাত্র বলিবার কথা এই যে, জীবনে যে মূলধন লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা নষ্ট করি নাই। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ, রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, রথীন্দ্রনাথের সহায়তা, আশ্রমবন্ধুদের উপদেশ, হিতাকাঙ্ক্ষীদের ভর্ৎসনা, সহকর্মীদের সহযোগিতা, সমস্তই আমার অনুকূলে কার্য করিয়া আসিয়াছে। পঁয়তাল্লিশ বৎসর শান্তিনিকেতন হইতে এত আনন্দ, এত আনুকূল্য, এত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম যে, তাহার হিসাব দেওয়া কঠিন। মানুষ অনেক-কিছুই হয় না, অনেক-কিছুই পায় না— সেই অভাব-অপূর্ণতার তো শেষ নাই। কিন্তু যাহা সে পাইয়াছে তাহারই কি শেষ আছে? কবি ১১ শ্রাবণ ১৩১৭ প্রাতে গীতাঞ্জলির একটি যে কবিতা লেখেন, তাহাকেই আমার জন্মদিনের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি:

যখন আমায় বাঁধ' আগে পিছে
মনে করি আর পাব না ছাড়া।
যখন আমায় ফেল' তুমি নীচে
মনে করি, আর হব না খাড়া।
আবার তুমি দাও যে বাঁধন খুলে,
আবার তুমি নাও আমারে তুলে,
চিরজীবন বাহুদোলায় তব
এমনি করে কেবলই দাও নাড়া।

ভয় লাগায়ে তন্দ্রা কর' ক্ষয়,
ঘুম ভাঙায়ে তখন ভাঙ' ভয়।
দেখা দিয়ে ডাক দিয়ে যাও প্রাণে,
তাহার পরে লুকাও যে কোন্‌খানে,
মনে করি এই হারালেম বুঝি—
কোথা হতে আবার যে দাও সাড়া।

কবির নিকট হইতে আর-একদিন আমার জন্মদিনের জন্য লিখিত তাঁহার আশীর্বাণী পাইয়াছিলাম, সেইটি লিখিয়া দেন ১১ শ্রাবণ ১৩২১ তারিখে; তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত করিয়া আমার নিবেদন শেষ করিলাম—

প্রভাতের 'পরে দক্ষিণ করে
রবির আশীর্বাদ—
নূতন জনমে নব নব দিন
তোমার জীবন করুক নবীন,
অমল আলোকে দূরে হোক লীন
রজনীর অবসাদ।

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে যাঁহাদের সহায়তা এতাবৎ কাল নানা ভাবে লাভ করিয়াছি তাঁহাদের কথা ইতিপূর্বে তিন খণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছি; যদি অনবধানবশত কাহারও নাম করিতে ভুলিয়া গিয়া থাকি তবে তাঁহারা যেন বিশ্বাস করেন যে উহা স্বেচ্ছাকৃত নহে, বার্ধক্যজনিত ভ্রম। আশা করি তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। এই খণ্ড-প্রণয়নে শ্রীমতী সাধনা কর ও রবীন্দ্রসদনের শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীমোহিতকুমার মজুমদার মহাশয়দের সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতিদিনই নানা ভাবে যাঁহার সহযোগিতা পাইয়াছি তাঁহার নাম অনুল্লিখিত থাকিলেও পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন আশা করিয়া নীরব থাকিলাম। এই খণ্ডের শেষাংশে বিস্তারিত সংযোজন ও সংশোধন প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহাদের কাছ হইতে সহায়তা লাভ করিয়াছি তাঁহাদের নাম সংযোজনাদির সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হইতেছে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এযাবৎকাল যে-সব গ্রন্থ বাংলায় রচিত হইয়াছে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। এ কাজ তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনন্দকর্ম, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতার অপেক্ষা রাখেন না।

এই বৃহৎ গ্রন্থ শেষ করিবার সময় আজ বিশেষভাবে স্মরণ হইতেছে রথীন্দ্রনাথকে। আজ বিশ্বভারতীর সহিত আপাতদৃষ্টিতে তিনি সম্বন্ধশূন্য; কিন্তু শান্তিনিকেতনের সহিত আবাল্যের তাঁহার যে নাড়ির যোগ তাহা ছেদন করিবার শক্তি তাঁহারও নাই, অপরেরও নাই। আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সাতচল্লিশ বৎসরের। জীবনে ও কর্মে তাঁহার যে অনুকূলতা পাইয়াছিলাম তাহার প্রধানতম সাক্ষ্য আমার এই গ্রন্থ; পদে পদে তাঁহার সহায়তা না পাইলে এই গ্রন্থ লিখিতে পারিতাম না। অথচ গ্রন্থমধ্যে আমি এমন বহু মতামত ব্যক্ত করিয়াছি যাহা হয়তো সকলে গ্রহণ করিবেন না; কিন্তু কোনোদিন, কি বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে কি ব্যক্তিগত ভাবে, তিনি আমাকে নিবৃত্ত করিবার বা প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াছিলাম।

বিশ্বভারতীর প্রকাশন-বিভাগের অধিকর্তা শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সাহসপূর্বক এই গ্রন্থ-প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইত কি না জানি না। গ্রন্থমুদ্রণকালে আমি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছি তাহা কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সহ্য করিত না; আমি তজ্জন্য বিশ্বভারতীর প্রকাশন-বিভাগের নিকট কৃতজ্ঞ।

বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ শান্তিনিকেতন প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তাঁহার সহকারী শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র, সুদক্ষ হেড কম্পোজিটর শ্রীবলরাম সাহা ও মেশিনম্যান শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই অশেষ ধৈর্যের সহিত এই কর্ম সমাপ্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এই দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠান হইতে এত আনুকূল্য, এত করুণা, এত স্নেহ ও শ্রদ্ধা পাইয়াছি যে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হইলে ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে—

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভুবননগর। বোলপুর
১১ শ্রাবণ ১৩৬৩। ২৭ জুলাই ১৯৫৬

বিষয়সূচী

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রজীবনী

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত। . .
কবি আমি ওদের দলে,
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না। . .
আজ আপন মনে ভাবি,—
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।' . .
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই। . .
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী . .
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্য শুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী।
মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি,
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাতজোড় ক'রে—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

"ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোলবিভাগের মায়াগণ্ডি সম্পূর্ণ মুছে যাক— সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক— সেই জায়গা হোক শান্তিনিকেতন। . . শান্তিনিকেতনের আকাশ আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী আঁধির আক্রমণে যেন নিরালোক হয়ে না ওঠে।"

"এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব— কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে।"

উত্তর-ভারতে। ১৯৩৫

কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন[১] ও নিখিলবঙ্গ সংগীত সম্মেলন[২] উদ্‌বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩৪১ সালের মাঘ মাসে (জানুয়ারি ১৯৩৫) শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে কবি 'বাংলা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' সম্বন্ধে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার একটি কথা আজ আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশকে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তানে দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়া যান নাই। তবে ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশ একবার বিভক্ত হইয়াছিল; সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "একদা আমাদের রাষ্ট্রপতিরা বাংলাদেশের মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে প্রস্তাব করেছিলেন সেটা যদি আরও পঞ্চাশ বছর পূর্বে ঘটত, তবে তার আশঙ্কা আমাদের এত তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার প্রধানতম কারণ বাংলাসাহিত্য। বাংলাদেশকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে, এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙালি উদাসীন থাকতে পারে নি। বাঙালিচিত্তের এই ঐক্যবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙালির চৈতন্যকে ব্যাপকভাবে গভীরভাবে অধিকার করেছে। সেই কারণেই আজ বাঙালি যতদূরে যেখানেই যাক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে, "ভাষার যোগই অন্তরের নাড়ীর যোগ — সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হলেই মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়।" কবি স্পষ্টভাবেই বলেন, "বাঙালিচিত্তের যে বিশেষত্ব মানব-সংসারে নিঃসন্দেহ তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালি জাতির পক্ষে বড়ো ক্ষতির কারণ ঘটা সম্ভব।"[৪]

কবির কথা যে কত সত্য তাহা আজ বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হইয়াও বুঝিতেছে। পাকিস্তানের মুসলমান বাঙালি মুক্তকণ্ঠে দাবি জানাইতেছে যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্য হিন্দুমুসলমানের যুগ্ম সাধনার ধন। ইংরেজ জাতি পৃথিবীর নানা স্থানে উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করিয়াছে; তাহাদের অনেকের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্বার্থ বিরুদ্ধ, কিন্তু কোথাও ইংরেজি ভাষা অনাদৃত হয় নাই, নূতন নূতন দেশে ইংরেজি সাহিত্যের নূতন ফসল ফলিতেছে। বাংলা খণ্ডিত হইলেও বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য খণ্ডিত হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিবার অব্যবহিত পরে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের (Indian Science Congress) সদস্যগণ কলিকাতা অধিবেশনের পরে শান্তিনিকেতন দেখিতে আসিলেন (৬ জানুয়ারি)। গুণীদের যথোচিত সমাদর যাহাতে হয় তজ্জন্য কবি কলিকাতা হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছিলেন। অতিথিপরিচর্যা বিষয়ে তাঁহার কী উৎকণ্ঠা হইত তাহা বাড়ির লোকে ও তাঁহার পার্শ্বে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা ভালো করিয়া জানিতেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা ইহা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন।

কয়েকদিন পরেই আসিলেন নৃত্যশিল্পী গোপীনাথ ও রাগিণী দেবী; গোপীনাথের নাচ দেখিয়া কবি মুগ্ধ,[৫] ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "দুই-একজন বাঙালি মেয়েকে যদি এঁদের কাছে তৈরি করতে দিস তাদের খুবই

১ বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ, বিচিত্রা, মাঘ ১৩৪১, পৃ ৩-৯। দ্র. সাহিত্যের পথে। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫২০।

২ সুর ও সঙ্গতি, কবির পত্র, ৭ জানুয়ারি ১৯৩৫, পৃ ৫-৭।

৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫২৬।

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫২৫।

৫ মাদ্রাজে কলাক্ষেত্র নামে সংগীত-বিদ্যালয় তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়।

উপকার হবে।"[১] ইহাদের সহিত নৃত্যগীত সম্বন্ধে কবির আলোচনা হয়তো হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই।

খুচরা কাজের অন্ত নাই; কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণ লিখিতে হইতেছে। কবিতাও দুই-একটি লেখা চলিতেছে। বীথিকা কাব্যের 'সাঁওতাল মেয়ে'[২] কবিতাটি (১৮ জানুয়ারি ১৯৩৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতাটির মধ্যে কবির নিগূঢ় সমাজতান্ত্রিক ভাব মূর্ত হইয়াছে, অকুলীন ধনিক সমাজের বণিগ্‌বৃত্তি তাঁহাকে ক্লিষ্ট করে। কিন্তু আপনাকে মুক্ত করিবার পথ পান না বলিয়া অনুশোচনা যথেষ্ট আছে।

আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি— এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধ সুধা-ভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।

কবির মন যে ক্রমেই সংস্কারাবদ্ধ সমাজ ও অর্থনৈতিক মতবাদ হইতে সরিয়া চলিয়াছে এইটি তাহার অন্যতম নিদর্শন। অপর কবিতাটি শোকাঘাতে উদ্রিক্ত। ১৯ জানুয়ারি ১৯৩৫ কলিকাতায় রমার (নুটু) অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। ইঁহার কথা পূর্বে বলিয়াছি— চারি বৎসর পূর্বে (৬ মে ১৯৩১) সুরেন্দ্রনাথ করের সহিত রমার বিবাহ হয়; রবীন্দ্রসংগীতে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল।[৩]

সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুরের কয়েকটি কবিতা পাই ইহারই সঙ্গে। 'নুটু' কবিতা লিখিবার কয়েকদিন পর লিখিলেন 'পলাতকা' (২২ জানুয়ারি ১৯৩৫)— দৌহিত্রী নন্দিতার উদ্দেশে রচিত।

কোথা তুমি গেলে যে মোটরে
শহরের গলির কোটরে—
একজামিনেশনের তাড়া।
কেতাবের 'পরে ঝুঁকে থাক,
বেণীর ডগাও দেখি নাকো,
দিনে রাতে পাই নে যে সাড়া।[৪]

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৮। *Visva-Bharati News*, April 1935, p. 63।

২ ১৮ জানুয়ারি ১৯৩৫ ॥ ৪ মাঘ ১৩৪১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৭২।

৩ নুটু (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ ॥ ১৮ মাঘ ১৩৪১)। *Visva-Bharati News*, February 1935, p. 51; কবিতাটি এই পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্র. বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১০০।

৪ প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ২৮।

মীরা দেবীকে লিখিত পত্রে লেখেন, "একজামিনেশন তো হয়ে গেল এখন বুড়ির [নন্দিতা] শরীর-মনের অবস্থা কিরকম ?"[১]

এই শ্রেণীর কবিতা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকটি লেখেন, ইহাকে আমরা বলিব মনের reliefএর জন্য লিখিত। হালকা কথায়, হালকা সুরে, চলতি ছন্দে ইহাদের প্রকাশ।

স্থির হইয়া এক স্থানে দীর্ঘকাল বাস করা বা বসিয়া থাকা না ছিল তাঁহার অদৃষ্টে, না ছিল স্বভাবে। চুয়াত্তর বৎসর বয়সেও বাহিরের আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন না। এবার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে কাশী, এলাহাবাদ, লাহোর হইতে। কবি যেদিন অপরাহ্ণে আশ্রম ত্যাগ করিলেন (৬ ফেব্রুয়ারি) সেদিন প্রাতে আশ্রম দেখিতে আসেন তৎকালীন বঙ্গদেশের গভর্নর স্যর জন আন্‌ডারসন (Anderson)।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশের প্রত্যেক গভর্নর শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আন্‌ডারসনের আশ্রম-পরিদর্শনের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। গভর্নর হিসাবে তিনি এ দেশে চিরখ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন! বাংলা দেশের টেররিস্ট (সন্ত্রাসবাদ) আন্দোলন ইঁহার সময়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়। এ দেশে আসিবার পূর্বে আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা-আন্দোলন নষ্ট করিবার চেষ্টায় তাঁহার নিষ্ঠুরতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর (!) স্থান পাইয়াছে। এ-হেন লাট-সাহেবের আগমন উপলক্ষে স্থানীয় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও বঙ্গীয় পুলিস বিভাগ যেরূপ কড়াকড়ি ও জবরদস্তি করিতে লাগিলেন, তাহা যেমন বিরক্তিকর, তেমনি হাস্যোদ্দীপক। পুলিস বিভাগ হইতে জানানো হয় যে, গভর্নরের নিরাপত্তার জন্য শান্তিনিকেতন-কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে তাঁহারা সাময়িকভাবে আটক রাখিবেন। কবি এই কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হন; জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কে. এল. মুখার্জিকে জানাইয়া দিলেন যে, এইরূপ ব্যবহার করিলে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, গভর্নরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য থাকিবেন না। যাহাই হউক, কবির নির্দেশে আশ্রমবাসী ছাত্র অধ্যাপক সকলেই শ্রীনিকেতন-উৎসবে (৬ ফেব্রুয়ারি) চলিয়া গেলেন; আশ্রমে থাকিলেন কয়েকজন বিভাগীয় কর্তা মাত্র। তাঁহারাও পুলিসের কর্তা ও কর্মসচিবের সহি-যুক্ত ছাড়পত্র বা পাস্ লইয়া পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগের লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শূন্য পুরীতে রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন! আন্‌ডারসন ছাত্রশূন্য বিদ্যায়তন দেখিয়া গেলেন। 'সামান্য ক্ষতি'র গোড়ার দিকটার কথা সেদিন অনেকেরই মনে হইয়াছিল। আর আমাদের মনে পড়ে, পনেরো বৎসর পূর্বে তৎকালীন গভর্নর আর্ল্ অব্ রোনাল্ড্‌শে[২] যখন আশ্রম-দর্শনে আসেন, বাঁধের নিকট আশ্রম চোখে পড়া মাত্রই মোটরকার হইতে নামিয়া পদব্রজে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ভারতীয় আশ্রমে যাইতেছি, দেশের রীতি অনুসারে হাঁটিয়াই যাইব।" তখন আশ্রমের ভিতরে গভর্নরের নিরাপত্তার জন্য পুলিসের সহায়তা লওয়া হয় নাই। কিন্তু সময়ের এমনই পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে কবির পক্ষে গভর্নরের নিরাপত্তার দায় গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এইভাবে লাট-সাহেবকে আশ্রমে অভ্যর্থনা করিতে রাজি হওয়ায় অনেকেই কবির সমালোচনা করিয়াছিলেন।

গভর্নর প্রাতে আশ্রম পরিদর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন, কবি অপরাহ্ণে কাশী রওনা হইলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থগিত সমাবর্তন উৎসব দুই দিন পরে; ঐ দিন কনভোকেশনে কবিকে 'ডক্টর' উপাধি দান করা হয়। তৎপূর্বে তিনি সমাবর্তনের ভাষণ দান করেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ইহাই কবির প্রথম ভাষণ। (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫)

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চানসেলার মদনমোহন মালব্যজির ইচ্ছা ছিল যে দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে যে সভা আহূত হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহার সভাপতিত্ব করেন; ইতিপূর্বে তিনি কবিকে সে বিষয়ে টেলিগ্রামও

১ চিঠিপত্র ৪, পত্র ৬৮; ১৮ মার্চ।

২ আলোচ্য পর্বে ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যান্ড্ নামে পরিচিত।

করিয়াছিলেন। কবি মালব্যজিকে বলিলেন যে, এ শ্রেণীর রাজনৈতিক বিসংবাদের মধ্যে তিনি থাকিতে পারিবেন না।

কাশী হইতে মোটরযোগে কবি এলাহাবাদ আসিলেন (৯ ফেব্রুয়ারি)। সেই দিন সন্ধ্যায় পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১] উদ্যোগে আহূত মহিলা-সভায় তাঁহার সংবর্ধনা হইল। কিন্তু শরীর খারাপ হওয়ায় কয়েকটি সভা-সমিতি বাদ দিতে হইল, এমন-কি ম্যুনিসিপালিটির স্বাগত সভাও। পরদিন (১০ ফেব্রুয়ারি) অপরাহ্ণে স্যর প্যারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থায় বাঙালিদের উদ্যান-সম্মিলনীতে কবি উপস্থিত হন। কবি আছেন থিওজোফিক্যাল সোসাইটির কৃষ্ণাশ্রমে। কবির সহিত দেখা করিতে আসেন প্রায়ই সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা জয়া ও জামাতা কুলপ্রসাদ সেন।[২] গত ৪ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের বিবাহে আচার্যের কার্য করেন। সে সময়ে কবি তাঁহাদের জন্য কবিতা-যৌতুক লিখিয়া দেন নাই; এবার তাঁহারা আসিয়া কিছু লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে, কবি লিখিয়া দিলেন 'পরিণয়-মঙ্গল' (১০ ফেব্রুয়ারি। ২৭ মাঘ ১৩৪১)—

তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা
অক্ষয় হয়ে থাক্ সিঁদুরের কৌটা।
সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে,
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে।
শাশুড়ি না বলে যেন 'কী বেহায়া বৌটা'।

নাতিদীর্ঘ কবিতা, কৌতুকহাস্যপূর্ণ।

পরদিন (১১ ফেব্রুয়ারি) বেসাণ্ট স্কুলের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করিয়া কবি বক্তৃতা করিলেন। ১২ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র য়ুনিয়নের উদ্যোগে সিনেট-গৃহে কবির আর-একটি বক্তৃতা হইয়াছিল। ছাত্ররা কবির হস্তে একটি টাকার তোড়া উপহার দেয়।

এলাহাবাদে কবির শরীর ভালো যাইতেছে না; অনেকেই লাহোর যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু দেহ না চলিলেও মন চলে, এবং মন চলিলে দেহকে যাইতেই হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি কবি লাহোর পৌঁছিলেন; শ্রীধনীরাম ভল্লার আতিথ্য তিনি গ্রহণ করিলেন। শুনিয়াছি কবি ইক্‌বল এই সময়ে লাহোরে ছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন শুনিয়া নগর ত্যাগ করিয়া যান। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, একই শহরে দুই কবি একই সময়ে থাকিতে পারে না। কবি লাহোরে যান পঞ্জাব ছাত্র-সমাজের আহ্বানে; তাহাদের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হইয়াছিলেন।

কবি লাহোরে আসিয়া সংবাদপত্র মারফত জানাইয়া দিলেন যে তিনি কাহারও সহিত মোলাকাত করিবেন না। তৎসত্ত্বেও একদিন পঞ্চাশটি বালিকা কবি-সন্দর্শনে আসিয়া হাজির হয়। কবি তাহাদের বিমুখ করিলেন না।

কবি যেদিন লাহোর পৌঁছিলেন তাহার পরদিন ছাত্র-সম্মেলনের উদ্‌বোধন-সভা; সেদিন (১৫ ফেব্রুয়ারি)

১ পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদের প্যারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ ও নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির অন্যতমা কন্যা, অরুণা আসফ আলির সহোদরা। প্যারিলাল ছিলেন কবির ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের জামাতা। পূর্ণিমার মৃত্যু হয় জুন ১৯৫১।

২ জয়া, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। কুলপ্রসাদ সেন— স্নেহলতা সেনের পুত্র ও প্রদ্যোৎকুমার সেনের কনিষ্ঠ সহোদর। কুলপ্রসাদের ডাক-নাম মটরু— সেই নামেই তিনি আত্মীয়-বন্ধুমহলে পরিচিত। অসহযোগ আন্দোলন-কালে কিছুদিনের জন্য শ্রীনিকেতনে ছিলেন। তার পর পোস্টাল বিভাগে কর্মে প্রবেশ করিয়া বাংলাদেশের প্রধানরূপে অবসর গ্রহণ করেন। এখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের সহিত যুক্ত।

৩ প্রহাসিনী। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ১২।

কবির প্রথম ভাষণ। দুই দিন পরে (১৭ই) সভার শেষে কবির শেষ বক্তৃতা হয়। ১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে নূতন ভারত-শাসন আইন প্রবর্তিত হইবার মুখে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈরীভাব দেখিয়াছেন; পঞ্জাবে আসিয়া ইহার চরম তীব্র রূপ দেখিলেন, রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার নূতন অভিজ্ঞতা হইল।

সম্মেলনের দুইটি বক্তৃতার মাঝের দিন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন পঞ্জাবের জাত-পাত-তোড়ক মণ্ডলের প্রতিনিধিগণ। এই মণ্ডলীর সদস্যগণ উগ্র সমাজ-সংস্কারক, ভেদহীন জাতিহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। কবি তাঁহাদের কাছে বলেন, ভেদহীন সমাজ গড়িতে হইলে আন্তঃ-প্রাদেশিক বিবাহাদি প্রয়োজন। কবি বলিতেন যে রক্তের মিশ্রণ না হইলে 'নেশন' গড়া যায় না।

এবার লাহোরে শিখদের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা হয়। 'গুরু গোবিন্দ' কবিতা লইয়া তাহাদের যে ক্ষোভ ছিল তাহা নিরাকৃত হইল, 'আকালী' পত্রিকায় কবির বক্তব্য প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথের ঋষিকল্প মূর্তি, তাঁহার শিষ্টাচারে শিখরা মুগ্ধ; একদিন গুরুদ্বারে কবিকে তাহারা বিশেষভাবে সম্মানিত করিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহাদের এমনই উৎসাহ দেখা দিল যে, তাহারা শান্তিনিকেতনে গুরুদ্বার স্থাপনার জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কবি এই প্রস্তাবে রাজি হইতে পারিলেন না; কারণ তিনি জানিতেন এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মন্দির বা ধর্মস্থানের পত্তন প্রবর্তিত হইলে, ইহার শেষ কোথায় বলা যায় না।

আর-একদিন কবি দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ পরিদর্শনে যান। বহু বৎসর পূর্বে তিনি দয়ানন্দ সরস্বতীকে বাংলাদেশে দেখিয়াছিলেন, সে কথা সভায় ব্যক্ত করেন। পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে বাল্যকালে তিনি তাঁহার পিতার সহিত পঞ্জাব আসেন, সেই স্মৃতিকথাও সেদিন বলিলেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি লাহোরের বাঙালি-সমাজ কবি-সংবর্ধনা করিল। সেইদিন অতিথি-বৎসল শ্রীভল্লার গৃহপ্রাঙ্গণে কবি একটি আম্রতরু রোপণ করেন। ইহার তিন দিন পরে শ্রীভল্লার গৃহে লাহোরের বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ কবির সহিত দেখা করিতে আসেন। সেদিন কবি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষণ দিয়াছিলেন। কবি চারি দিকের মনোভাব দেখিয়া অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন। হিন্দু, শিখ ও মুসলমান কাহারও সহিত কাহারও সদ্‌ভাব নাই। দেশের এ কী পরিস্থিতি! কবি সাংবাদিকগণের নিকট উদ্‌বিগ্ন চিত্তে মৈত্রী প্রচারের জন্য আবেদন করিলেন।

কবি লাহোরে ছিলেন প্রায় দুই সপ্তাহ (১৪-২৭ ফেব্রুয়ারি)। এই সময়ে সভাসমিতিতে ভাষণাদি দান ছাড়া তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিত ছবি আঁকিয়া। কবিতাও লেখেন, সব কয়টির তারিখ দেন কিনা জানি না; তারিখ-দেওয়া কবিতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কিছুকাল হইতে কবি রাধারানী দেবী 'অপরাজিতা দেবী' নাম গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত কবিতায় পত্র-বিনিময় করিতেছিলেন।[১] 'বিচিত্রা'য় (মাঘ ১৩৪১) কবি-রচিত 'নারীপ্রগতি' কবিতা পড়িয়া ছদ্মনামা রাধারানী কবিকে পত্র দেন; লাহোরে আসিয়া তাহার উত্তরে কবি লিখিলেন 'আধুনিকা'[২] (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫)। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, 'নারীপ্রগতি' কবিতাটি শ্রীমতী রানী মহলানবিশের একটি ঘটনার কথা শুনিয়া লেখা; তাঁহাকে লিখিত পত্র-মধ্যে উল্লেখ আছে।[৩]

১ এই লাহোরে বসিয়া অপরাজিতা দেবীকে কবিতায় হালকা ছন্দে এক পত্র লেখেন (বীথিকা)।

২ 'আধুনিকা'। লাহোর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫। প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪১। প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫-৭।

৩ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত কবিতা-পত্র (৭ বৈশাখ ১৩৪১ ॥ ২০ এপ্রিল ১৯৩৪)। শান্তিনিকেতন হইতে লিখিত। দেশ পত্রিকা, ১২ আশ্বিন ১৩৬৮। পত্র-সংখ্যা ২৬৬। কবিতাটি আছে প্রহাসিনীতে; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ১০।

লাহোর হইতে ২৭ ফেব্রুয়ারি কবি লখনৌ যাত্রা করেন; লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে[১] দুইদিন বক্তৃতা করিয়া ৪ মার্চ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এইবার কবির সঙ্গে ছিলেন অনিলকুমার চন্দ ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।[২]

কবির লখনৌ বাস সম্বন্ধে একটু আলোচনার ক্ষেত্র আছে। কবি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের অতিথি। সে সময়ে রবীন্দ্রসংগীত গাহিবার জন্য নির্মলকুমারের স্ত্রী চিত্রলেখা দেবীর খ্যাতি ছিল। তাঁহার গান কবির খুব ভালো লাগিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রভক্তও বটে সমালোচকও বটে। তাঁহার চেষ্টায় একটি সান্ধ্য জলসায় শ্রীকৃষ্ণ রতনঝনকরের গানের ব্যবস্থা হয়। জ্বর সত্ত্বেও কবি গভীর রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া গান শুনিলেন। গান তাঁহার ভালো লাগিলেও তাহা একেবারে সমালোচনা-শূন্য হয় নাই। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি এই সংগীতরীতি সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদকে দীর্ঘ এক পত্রে[৩] নিজ মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন। খেয়াল শ্রেণীর গানের বিরামহীন দীর্ঘ তান ও রূপান্তর সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, এই প্রকার আলাপের মধ্যে exhibition-এর ভাবটাই উগ্র। "Art is never an exhibition but a revelation, এ কথা ওস্তাদরা ভুলিয়া থাকেন। Exhibitionএর গর্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, revelationএর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে। সেই ঐক্যে থামা বলে একটা পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার মূল্য কম নয়। সে থামা অত্যন্ত জরুরি।" কবি বলেন যে এ শ্রেণীর সংগীতে আর্টের সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় না, বাহুল্য বা অতিরঞ্জনের দ্বারা আর্টের মান থাকে না।

সংগীতের প্রশ্ন লইয়া ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে কবির পত্রালাপ চলে। ধূর্জটিপ্রসাদ কবিকে সংগীত সম্বন্ধে নানা ভাবে প্রশ্ন করিতেন ও তাহারই ফলে কবি দীর্ঘ উত্তর দানে উদ্‌বোধিত হইতেন। ধূর্জটিপ্রসাদের সহিত আলোচনা 'সুর ও সঙ্গতি' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।[৪]

'সুর ও সঙ্গতি' প্রকাশিত হইলে (শ্রাবণ ১৩৪২) ছদ্মনামী 'শার্ঙ্গধর' যে নাতিদীর্ঘ সমালোচনা[৫] করেন তাহা প্রত্যেক সংগীতরসিকের অবশ্যপাঠ্য। সমালোচক প্রগতির দৃষ্টিতে ভারতীয় সংগীতকে দেখিয়া বলিয়াছেন, "সুরের সঙ্গে সঙ্গতি হয় জীবন্ত সুরের, অসুরের নয়, . . । বাঙালি ভগীরথের . . সুরের সুরধুনী ছুটে চলল আপন অনিবার্যতার বেগে। জাগল অজানা ঝংকার, অচেনা ছন্দ; কতক মিলল অতীতের সঙ্গে, কিন্তু বোঝা গেল তার চরম আলাপ ভবিষ্যৎকে নিয়ে। এ স্রোত যখন বাংলার বুকের উপর দিয়ে চলেছে তখন বাংলার মাটির রঙের ছাপ তার উপর

১ লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের স্মরণে বিরাট গ্রন্থাগারের নাম দেন Tagore Library।

২ সুধাকান্ত শান্তিনিকেতনের পুরাতন ছাত্র, পরে কর্মীরূপে আসেন; বিচিত্র কর্মের মধ্য দিয়া তিনি দীর্ঘকাল আশ্রমকে সেবা করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৯এ কবির ব্যক্তিগত তদারকের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়ে তিনি বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহে বিশেষভাবে নিযুক্ত হন।

৩ ২১ মার্চ ১৯৩৫। সুর ও সঙ্গতি, পৃ ৯-১২।

৪ সুর ও সঙ্গতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভারতীভবন [অগস্ট ১৯৩৫]। যে পত্রগুলি 'সুর ও সঙ্গতি'তে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা এখানে তাহার তালিকা দিলাম—

কবির পত্র: ৭ জানুয়ারি ১৯৩৫, পৃ ৫। [জানুয়ারি ১৯৩৫], পৃ ১। ২১ মার্চ ১৯৩৫, পৃ ৯। ৩০ মার্চ ১৯৩৫, পৃ ১৩। ধূর্জটিপ্রসাদের পত্র: ২৫ মার্চ ১৯৩৫, পৃ ১৭-৪৯, ৬০। রবীন্দ্রনাথের পত্র: ৩০ মার্চ ১৯৩৫, পৃ ১৩। ৯ এপ্রিল ১৯৩৫, পৃ ৫০। ১৫ মে ১৯৩৫, পৃ ৫৬। ১৬ মে ১৯৩৫, পৃ ৬৩। ধূর্জটিপ্রসাদের পত্র: ৪ জুলাই ১৯৩৫, পৃ ৬৭। রবীন্দ্রনাথের পত্র: ৬ জুলাই ১৯৩৫, পৃ ৭৭। ১১ জুলাই ১৯৩৫, পৃ ৯০। শেষ সপ্তক-এর ১৭-সংখ্যক কবিতা-পত্র ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত।

৫ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৩, পুস্তক-পরিচয়, পৃ ৮৫। দ্র রবীন্দ্রলাল রায়, সুর ও সঙ্গতি (সমালোচনা), পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪২, পৃ ৩২১-৩২৭।

পড়তে বাধ্য ; বাংলা কীর্তন, বাউল, জারি, ভাটিয়ালের ছন্দ তাকে নিজস্ব ছন্দে নাচিয়ে তুলবেই। এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদই টিকবে না— না পণ্ডিতের, না কালোয়াতের। এই মৌলিক তথ্যটি কবি তাঁর নিজস্ব ভাষায় অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন এই বইয়ের কয়েকটি চিঠিতে।"

সমালোচক কবির নিম্নোদ্‌ধৃত বাণী উদ্‌ধৃত করিয়া বক্তব্য শেষ করিয়াছেন— "একদিন বাংলার সংগীতে যখন বড়ো প্রতিভার আবির্ভাব হবে তখন সে বসে বসে পঞ্চদশ শতাব্দীর তানসেনী সংগীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রতিধ্বনিত করবে না . . তার দৃষ্টি অপূর্ব হবে, গম্ভীর হবে, বর্তমান কালের চিত্তশঙ্খকে সে বাজিয়ে তুলবে নিত্যকালের মহাপ্রাঙ্গণে।"

কবি ভালোরূপেই জানিতেন যে, অতীতে ভারতীয় সংগীত বৈদিক স্থানিক ও ইসলামিক বিচিত্র সুরের মিলনে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও বিচিত্রের সমাবেশে আত্মপ্রকাশ করিবে ; হিন্দুস্থানী সংগীত Indo-Sarasenic art-এর ন্যায় অতীতের জিনিস। কাব্যে শিল্পে যেমন মানুষ অতীতকে আঁকড়াইয়া নাই, কবির মতে সংগীতও অতীতের আঁচলে বাঁধা পড়িয়া থাকিবে না ; সেখানে নূতন ভাব, নূতন ছন্দ, নূতন সুর আসিবেই।

শ্যামলী— মাটির ঘরে

উত্তর-ভারত ঘুরিয়া (৬ ফেব্রুয়ারি - ৩ মার্চ) কলিকাতায় বরানগরে প্রশান্তচন্দ্রের বাসায় একদিন থাকিয়া কবি শান্তিনিকেতন ফিরিলেন (৪ মার্চ ১৯৩৫)। এইবার কবি শান্তিনিকেতনে একাদিক্রমে ৪ মার্চ হইতে ১২ মে পর্যন্ত বাস করেন। শান্তিনিকেতনে তাঁহার মাটির বাড়ি 'শ্যামলী' নির্মিত হইতেছে। পনেরো বৎসর পূর্বে যে পর্ণকুটির মাঠের মধ্যে নির্মিত হয় তাহাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরায়ণের বিরাট প্রাসাদোপম গৃহাদি উঠিয়াছে ; তাহার মধ্যে নূতন মাটির বাড়ি কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া সুরেন্দ্রনাথ, নন্দলালের সহিত কবির কত রকম পরামর্শ চলিতেছে। মাটির বাড়ি— তার ছাদ মাটির সঙ্গে আলকাতরা মিশাইয়া শক্ত করা হইবে— ঘরের মেঝেও হইবে সেই উপাদানে। এই গৃহ-পরিকল্পনার উদয় হয়, পূর্ব বৎসর নন্দলাল-নির্মিত অনুরূপ উপাদানে গঠিত মঞ্চ হইতে। মঞ্চটি আছে ভোজনশালার সম্মুখে রাস্তার মোড়ে। এই উপাদানেই 'শ্যামলী' গৃহ নির্মিত হইতে থাকিল।

শান্তিনিকেতনে কবি তখন একা। মার্চ মাসে (১৯৩৫) রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ইংলন্ড গিয়াছেন ; শিক্ষাভবন ও পাঠভবনের অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রমোহনও সঙ্গে গিয়াছেন। ইঁহাদের বিলাতযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য মিঃ এল্‌ম্‌হার্স্টের সহিত শ্রীনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা। পাঠকের স্মরণ আছে, গত ১৯২২ সাল হইতে শ্রীনিকেতন এল্‌ম্‌হার্স্টের প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। রথীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি-কালে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্মসচিবের ও সুরেন্দ্রনাথ কর শান্তিনিকেতন-সচিবের কাজ করেন। গৌরগোপাল ঘোষ শ্রীনিকেতন-সচিব ছিলেন। প্রসঙ্গত বলিতে পারি এল্‌ম্‌হার্স্টের দান পূর্বের ন্যায় চলিতে লাগিল ; এ ছাড়াও Dartington Trust[১] হইতে গ্রামের অর্থনৈতিক গবেষণার জন্য অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া গেল ; ইহাও এল্‌ম্‌হার্স্টের দান।

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী বিলাত চলিয়া গেলে উত্তরায়ণে কবির অভিভাবিকা থাকিলেন বালিকা পুপে বা নন্দিনী। যে কয় মাস রথীন্দ্রনাথরা বিদেশে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া কোথায়ও যান নাই (৪ মার্চ - ১২ মে)। এই পর্বে তিনি আপন মনে বসিয়া শেষ সপ্তকের গদ্যছন্দের রচনা লিখিতেছেন ও ছবি আঁকিতেছেন।

১ ***Dartington Hall, The History of an Experiment*** **by Victor Bonham-Carter, with an account of the School by William Burnbe Curry. Foreword by Leonard K. Elmhirst. Phoenix House Ltd., London, 1958.**

শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পক্ষকাল-মধ্যে আশ্রমের বসন্ত-উৎসব উদ্‌যাপিত হইল। (২০ মার্চ ১৯৩৫ ॥ ৫ চৈত্র ১৩৪১)। প্রাতে আম্রকুঞ্জে উৎসব ; কবি স্বয়ং 'ফাল্গুনী' নাটক হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন, তৎপূর্বে বসন্ত-উৎসবের মর্মকথা ব্যাখ্যান করেন। সন্ধ্যার পরে আম্রকুঞ্জে নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা হয়। সেদিন কবি 'বসন্ত' কবিতা আবৃত্তি ও সন্ত-রচিত দুইটি গান স্বয়ং গাহিয়া শোনাইলেন। গান দুইটি—

আমার বনে বনে ধরল মুকুল[১]

ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী[২]

মার্চ মাসের শেষের দিকে কবির আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক কাজি আবদুল ওদুদ[৩] আসিলেন হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য। জনাব ওদুদ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপর একখানি সমালোচনা-গ্রন্থ লিখিয়া ইতিমধ্যে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। ওদুদ সাহেবের মনের ব্যাপ্তি ও দরদী ভাব কবিকে আকৃষ্ট করে। শান্তিনিকেতনে আসিয়া জনাব ওদুদ যে বক্তৃতাগুলি দেন, তাহাতে কবি উপস্থিত হইতেন (২৬, ২৭, ২৮ মার্চ ১৯৩৫)। এ যুগের জটিলতম সমস্যা হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ। শিক্ষিত মুসলমান কিভাবে এইটিকে দেখেন, তাহা জানিবার কৌতূহল কবির। ওদুদ সম্বন্ধে কবি তাঁর মত ব্যক্ত করেন অধ্যাপকের গ্রন্থ 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' -এর ভূমিকায় ; কবি লেখেন, "এদেশে হিন্দুমুসলমান-বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন ক'রে আছে এমন এক-একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলাভাষায় তাঁর প্রকাশশক্তির বিশিষ্টতা।" —ভূমিকা, ২১ মাঘ ১৩৪২ [ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬]। অধ্যাপকের ভাষণ শুনিয়া কবির মনে এই সমস্যা সম্বন্ধে যে ভাবনার উদয় হয় তাহা তিনি একখানি পত্রে (২৭ মার্চ) অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন। উত্তর-ভারত-ভ্রমণ-কালে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আহরণ করেন তাহারই ভিত্তিতে পত্রখানি লিখিত। কবি লিখিতেছেন—

"শান্তিনিকেতনে যখন আপনাদের ভাবে ও কাজে বেষ্টিত হয়ে থাকি, তখন সমগ্র ভারতের বর্তমান ঐতিহাসিক রূপটা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই নে। এবারে মূর্তিটা দেখা গেল।.. সর্বত্রই দেখা গেল হোয়াইট পেপার নিয়ে আলোচনা চলছে।.. দেখতে দেখতে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠল, এর মধ্যে ভাবী কালের যে সূচনা দেখা যাচ্ছে তা রক্তপঙ্কিল। লখনৌয়ে একজন মুসলমান ভদ্রলোক আক্ষেপ ক'রে বলছিলেন, কী করা যায়। আমি বললুম

১ গীতবিতান ২, পৃ ৫০৬।

২ গীতবিতান ২, পৃ ৫০৫। 'ওগো বধূ সুন্দরী'—এইটি পূর্বে কবিতা ছিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত 'সাত ভাই চম্পা' ছবিকে অবলম্বন করিয়া ১৩৩১ সালে কোনো বিবাহ উপলক্ষে রচিত। সেই কবিতার ভাষা কিছু পরিবর্তন করিয়া এবার সুর সংযোগ করিয়া গানে রূপান্তরিত করিলেন। দ্র. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত (দ্বিতীয় সং), পৃ ২৩১। এখানে তারিখ চৈত্র ১৩৪০ আছে। আবার সুধীরচন্দ্র করের 'কবিকথা' (পৃ ১৬৯) গ্রন্থে তারিখ আছে ১৩৪২। আসলে ১৩৪১-এর চৈত্র মাস হইবে। এই উৎসবে বহু জনাগম হয় ; বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, তাঁহার স্বামী শ্রীপণ্ডিত ও শ্রীমতী কুমারস্বামী (মার্কিন মহিলা) উপস্থিত ছিলেন।

৩ কাজী আবদুল ওদুদ, জন্মস্থান শিলাইদহের ১৪ মাইল দূরে গ্রামে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পাস করিয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঢাকায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম সাহিত্য সমাজ স্থাপনের অন্যতম উৎসাহী। 'বুদ্ধির মুক্তি' ছিল মূলমন্ত্র। কলিকাতাবাসী। বহু বাংলা গ্রন্থের লেখক। ১৩৩৪-এ [১৯২৭] রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপর গ্রন্থ লেখেন। ১৯৫৬-এ বিশ্বভারতীতে 'বাংলার জাগরণ' বক্তৃতা দেন। ১৯৫১ জুলাই পর্যন্ত ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগে কাজ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে মিলতে হবে।.. তিনি বললেন, আগা খাঁ এই কাজে মুসলমানদের স্বতন্ত্র হয়ে চেষ্টা করতে মন্ত্রণা দিচ্ছে। পাছে গান্ধীজির অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আপনি মিলন ঘটে সেই সম্ভাবনাটাকে দূর করবার অভিপ্রায়ে এই দৌত্য। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হওয়াই মুসলমানের স্বার্থরক্ষার প্রধান উপায়। এতকাল ধর্মে যে দুই সম্প্রদায়কে পৃথক করেছিল আজ অর্থেও তাদের পৃথক করে দিল— মিলব কোন্ শুভবুদ্ধিতে আপীল ক'রে? না মিললে ভারতে স্বায়ত্তশাসন হবে ফুটো কলসীতে জল ভরা।..

"পঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক এবং লজ্জাকররূপে অসভ্য। বাংলার অবস্থা তো জানোই— এখানে উভয় পক্ষের বিকৃত সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে প্রায়ই যে-সব বীভৎস অত্যাচার ঘটছে তাতে কেবল অসহ্য দুঃখ পাচ্ছি তা নয়, আমাদের মাথা হেঁট ক'রে দিলে।"[১]

এই পত্র কবি লেখেন ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসের শেষ ভাগে। ১৯৩৫-এর নূতন শাসনতন্ত্র চালু করিবার আয়োজন চলিতেছে, তৎপরবর্তী যুগের ইতিহাস সুপরিচিত। কবির দূরদৃষ্টিতে যাহা প্রতিভাত হইতেছিল, রাষ্ট্রনীতিকদের ক্ষীণদৃষ্টিতে তাহার কোনো আভাস নাই— সেখানে তাঁহাদের আত্মতৃপ্ত ভাব, আশু সিদ্ধিলাভের উত্তেজনায় সকলেই মুগ্ধ। এই পত্রের আরো কয়েকটি পংক্তি প্রণিধানযোগ্য। "কোনো-এক সময়ে য়ুরোপে যখন প্রলয় কাণ্ড ঘটবে তখন ইংরেজের শিথিল মুষ্টি থেকে ভারতবর্ষ খসে পড়বেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো এত বড়ো দেশে দুই প্রতিবেশী জাতির মজ্জায় মজ্জায় এই-যে বিষবৃক্ষ আজ বর্ধিত ও শাখায়িত হল, কবে তা আমরা উৎপাটিত করতে পারব?"

সমস্যা নানা প্রকারের। এই তো গেল দেশব্যাপী সমস্যা। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী যে আর্থিক দুর্গতি ও বেকার-সমস্যা সকলকে পিষিয়া মারিতেছে তাহার তরঙ্গও কবিকে অনুভব করিতে হয়, কারণ তাঁহার যোগ বহু ও বিচিত্রের সঙ্গে। বিশ্বভারতীর দায়ের কথা এবং সেখানকার অর্থকৃচ্ছ্রতা সুবিদিত। প্রমথ চৌধুরীকে কবি লিখিতেছেন, "সমস্ত পৃথিবী এখন অর্থাভাবে গ্রহণ লাগা— তার ছায়া এখানেও [শান্তিনিকেতনে] আছে— কিন্তু একটা সুবিধে এই যে, যেহেতু এ জায়গাটা উদ্ধত সহর নয় সেইজন্যে দারিদ্র্যটা অত্যন্ত বেমানান হয়ে মানুষকে প্রতিদিন অবমানিত করে না। অভাবটাকে এখানে স্বভাবের মতোই করে নেওয়া চলে।"[২] এইটি লিখিত হয় ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে— এখন থেকে বহু বৎসর পূর্বে— অতঃপর কালান্তর ঘটিয়াছে।

তবে কবির কাছে সরল জীবন যাপন ও সৌন্দর্যহীনতা একার্থক নহে। দেশের মধ্যে মহাত্মাজির সরল জীবনাদর্শের অনুকরণে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে কৃত্রিম 'গরিবানা'র ঢং দেখা দিয়েছে; সৌন্দর্যকে অবজ্ঞা করা যেন তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতার একটা অঙ্গ। চারি দিকের pseudo-asceticism-এর কথা কবি আলোচনা করিয়া নববর্ষের ভাষণে (১৩৪২) বলিলেন, "সুন্দরকে অবজ্ঞা করার শিক্ষা আজ এ দেশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। যে অসুন্দরে প্রকাশের পূর্ণতা ভ্রষ্ট হয়, তাকে স্পর্ধাপূর্বক বরণ করবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে; দারিদ্র্যের অনুকরণ করাকে কর্তব্য বলে মনে করছি; ভুলে যাচ্ছি দারিদ্র্যের বাহ্য ছদ্মবেশে আত্মার অবমাননা করা হয়। ঐশ্বর্যই বীরের। ঐশ্বর্য মহৎ, ঐশ্বর্য দাস নয়; .. ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করতে চায় বীর্যশালী ..।"[৩]

১ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪২, পৃ ৭০-৭১।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১১৭, ৩ বৈশাখ।

৩ নববর্ষ। শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২, পৃ ১৫৭।

এইসঙ্গে কবির মনে আর-একটি ভাবনা আসে। দেশে কিছুকাল হইতে 'সাধারণ লোকের জন্য' কিছু করিবার উৎসাহ বাড়িয়াছে— যেন যাঁহারা তাহা করিবেন তাঁহারা অ-সাধারণ, তাঁহারা 'দরিদ্রনারায়ণ'এর জন্য যেমন অন্নদান করিবেন, তেমনিই তাহাদের মানসিক উন্নতির জন্য তাহাদের উপযোগী ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীগত সাহিত্য, কলা, আনন্দ -সৃষ্টির চিরবিরোধী। তিনি এই ভাষণে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—

"সংখ্যা গণনা করলে পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই বাক্যদীন, শিক্ষার অভাবে শক্তির অভাবে বাক্যের দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করতে জানে না ; সেই বাক্যদৈন্যের সাধনাকেই যদি তাদের প্রতি মমতা প্রকাশের উপায় বলে গণ্য করি তবে সেই দীনদেরই সকলের চেয়ে বঞ্চিত করা হবে। যে-ভাষার ঐশ্বর্য কাব্যে মহাকাব্যে মহানাটকে, বাণীর সেই ঐশ্বর্যক্ষেত্রেই বাক্যদীনদের আনন্দসত্র . . দেবতা যেমন সর্ববর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষেরই, শিল্পৈশ্বর্যের প্রকাশও তেমনি সকল মানুষেরই। তাকে বোঝবার, স্বীকার করবার শিক্ষা অবস্থানির্বিশেষে সকলেরই হোক এই কথাটাই বলবার যোগ্য। শোনা যায় এসকিলস, সফোক্লিস, য়ুরিপিডীস প্রমুখ মহৎ প্রতিভাবান নাট্যকারদের নাটক এথেন্সের সর্বসাধারণের জন্যেই অভিনীত হয়েছে— সর্বসাধারণের প্রতি এই হচ্ছে যথার্থ সম্মান প্রকাশ। তাদের প্রতি দয়া করে নাটকের রচনাকে যদি দরিদ্র করা হত তবে সেই গর্বোদ্ধত দারিদ্র্যসাধনার প্রতি সর্বকালের অভিশাপ বর্ষিত হত।"

কবি চিরদিন সর্বসাধারণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী দিবার পক্ষপাতী। আধুনিক জগতে প্রগতিশীল জাতির ভাবনা এই দিকেই গিয়াছে। দরিদ্রনারায়ণ বা হরিজনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার তিনি বিরোধী। এই ভাষণের শেষাংশে বেদের একটি অংশ উদ্‌ধৃত ও অনুবাদ করিয়া কবি বলিলেন, "আমি সমস্ত দ্যুলোক ভুলোক ভ্রমণ ক'রে এসে দাঁড়ালুম প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে। সেই প্রথমজাত অমৃত তো আজও জরাজীর্ণ হয় নি, জলে স্থলে আকাশে তার ঐশ্বর্য তো বিচিত্ররূপে প্রকাশমান। আদিকালের সেই প্রথমজাত অমৃতই তো মানুষের আত্মায় 'অপূর্বেণেষিতা বাচস্', অপূর্বের দ্বারা প্রেরিত বাণী, তার প্রকাশ তো আজও নব নব আনন্দরূপে উদ্ভাবিত হয়ে মানুষকে সর্বোচ্চ গৌরবে মহীয়ান করেছে। এই আবিঃকে এই সুন্দরকে এই আনন্দকে ঈর্ষা ক'রে আমরা যদি তার প্রতি বিমুখ হই তবে আমাদের জীবন মূঢ় অদৃষ্টের পায়ের তলায় শিকলে বাঁধা হয়ে কাটবে শুধুমাত্র খেয়ে প'রে। আমরা যে সৃষ্টিকর্তার শরিক, আমাদের আত্মা যে প্রকাশস্বরূপ, এই কথাই আজ নববর্ষে আমরা যেন স্বীকার করতে পারি।"[১] কবির মতে যাহাকে আমরা 'সর্বসাধারণ' বলি সেই মানুষমাত্রই সৃষ্টিকর্তার শরিক। তাঁর কাজকে প্রত্যেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছি— এই ভাবনার ধ্যানই হইতেছে যথার্থ সাধনা।

এই নববর্ষের দিন যে কবিতাটি লেখেন অথর্ববেদ থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়া, তার ভূমিকা 'পরিত্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্ উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য'। এই প্রথমজাত অমৃতের বন্দনা এই কবিতায়—'কে এই প্রথমজাত অমৃত, কী নাম দেব তাকে? তাকেই বলি নবীন, সে নিত্যকালের'।

এইবার কবির ৭৪তম জন্মোৎসব যথারীতি সমাপ্ত হইল। এই দিন স্মরণে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে গদ্য-কবিতায় লিখিত একখানি পত্র পাই 'শেষ সপ্তক'এর মধ্যে (৪৩-সংখ্যক)—"পঁচিশে বৈশাখ চলেছে/জন্মদিনের ধারাকে বহন করে/মৃত্যুদিনের দিকে"।[২] এই দীর্ঘ কবিতায় জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা. বেদনা. আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ পাইয়াছে। এই কবিতার শেষ কয় পংক্তি উদ্‌ধৃতিযোগ্য—

১ দ্র. নববর্ষ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২, পৃ ১৫৬-৫৮।

২ শেষ সপ্তক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৮৯-৯৬।

যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল বলে
করব না অহংকার।
তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে-গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

এই দিনে উৎসবান্তে 'শ্যামলী'র গৃহপ্রবেশ-অনুষ্ঠান হইল। মাটির ঘর করার ফরমাশ কবির, স্থাপত্য-পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথের, ভাস্কর্য নন্দলালের। কবি, স্থপতি ও ভাস্করের মিলিত প্রয়াস আছে এই গৃহরচনায়। তবে আসলে এই কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার কৃতিত্ব সুরেন্দ্রনাথ করের। এই গৃহপ্রবেশ-অনুষ্ঠানের মধ্যে কবি সে কথা স্বীকার করিয়া সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটি কবিতা পাঠ করেন।[১] সেই সন্ধ্যাকালে শান্তিনিকেতনের কর্মীরা পরশুরামের 'বিরিঞ্চি বাবা' অভিনয় করেন। কবি প্রহসনটির স্থানে স্থানে অদলবদল করিয়া দেন; অভিনয়কালে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। উৎসবান্তে কবি কলিকাতায় গেলেন। সেখান হইতে রথীন্দ্রনাথকে বিলাতে লিখিতেছেন, "মাটির বাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। নন্দলালের দল দেয়ালে মূর্তি করবার জন্যে কিছুকাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম করেছে . .। গ্রামের লোকদের ঔৎসুক্য সব চেয়ে বেশি। মাটির ছাদ হতে পারে এইটেতেই ওদের উৎসাহ। পাড়াগাঁয়ে খড়ের চাল উঠে গেলে সব দিক দিয়ে ওদের সুবিধে।"[২] কবির ভাবনা শুধু আর্টিস্টের বিলাসিতা নহে, ব্যাবহারিকতার সাফল্যের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি। এই নূতন মৃৎকুটীর যখন নির্মিত হইতেছে তখন

১ ধরণী বিদায়বেলা আজ মোরে ডাক দিল পিছু—
কহিল, 'একটু থাম্, তোরে আমি দিতে চাই কিছু,
আমার বক্ষের স্নেহ, রাখিব একান্ত কাছে ধরে
যে কদিন রয়েছিস হেথা, ঘিরিয়া রাখিব তোরে
স্পর্শ মোর করি মূর্তিমান।'
হে সুরেন্দ্র, গুণী তুমি,
তোমারে আদেশ দিল ধ্যানে তব মোর মাতৃভূমি—
অপরূপ রূপ দিতে শ্যাম স্নিগ্ধ তাঁর মমতারে
অপূর্ব নৈপুণ্যবলে। আজ্ঞা তাঁর মোর জন্মবারে
সম্পূর্ণ করেছ তুমি আজি।
তাঁর বাহুর আহ্বান
নিঃশব্দ সৌন্দর্যে রচি আমারে করিলে তুমি দান
ধরণীর দূত হয়ে। মাটির আসনখানি ভরি
রূপের যে প্রতিমারে সম্মুখে তুলিলে তুমি ধরি
আমি তার উপলক্ষ্য; ধরার সন্তান যারা আছে
ধরার মহিমাগান করিবে সে সকলের কাছে।
পঁচিশে বৈশাখে আমি একদিন না রহিব যবে
মোর আমন্ত্রণখানি তোমার কীর্তিতে বাঁধা র'বে,
তোমার বাণীতে পাবে বাণী। সে বাণীতে র'বে গাঁথা—
ধরারে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মোর মাতা।

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২, পৃ ২৮২-৮৫। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব। ৯ খানি ফোটোর মুদ্রণ আছে)। কবিতাটি 'শ্যামলী', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, গ্রন্থপরিচয় অংশে সংযোজিত, পৃ ৪৪৯।

২ চিঠিপত্র ২, পত্র ৪৩, পৃ ১০৮। জোড়াসাঁকো, ২৯ বৈশাখ ১৩৪২।

কবি ইহারই উদ্দেশে লেখেন[১]—

আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি ;
ভাঙা থামে নালিশ উঁচু ক'রে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে ;
ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক'রে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
মৃত দিনের প্রেতের বাসা।

উৎসবান্তে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন।...ধুমধাম হয়ে গেল একচোট। জনসাধারণের মাঝে মাঝে খেলা করবার শখ মেটাবার জন্যে জ্যান্ত পুতুলের দরকার করে, এই শখের জোগান দিয়েছি আমি— কিন্তু বড়ো ক্লান্তিকর।"[২] পরদিন কবি কলিকাতায় গেলেন।

এইবার (মে ১৯৩৫) *Visva-Bharati Quarterly* পুনরায় প্রকাশের ব্যবস্থা হইল ; ১৯২৩ হইতে ১৯৩১ এই আট বৎসর চলিয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্বব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতার অভিঘাতেই ইহাকে বন্ধ করিতে হয়। কৃষ্ণ কৃপালনির[৩] উদ্যোগে ও সম্পাদনে উহা ২৫ বৈশাখ (১৩৪২) প্রকাশিত হইল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কবির নিজ-কৃত Art and Tradition নামে প্রবন্ধ এবং 'কোপাই' ও 'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতা দুটির তর্জমা বাহির হইল। ইহা ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অনূদিত The Function of Literature ('সাহিত্যের তাৎপর্য', সাহিত্য) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকা চালু করিবার জন্য কবি বিশ্বভারতীর 'প্রেসিডেন্ট ফাণ্ড'[৪] হইতে একটা মোটা টাকার ব্যবস্থা করেন।

শেষ সপ্তক

কবির ৭৪তম জন্মদিনে 'শেষ সপ্তক' প্রকাশিত হইল (২৫ বৈশাখ ১৩৪২)। কবি মনে করিতেছেন এই যেন তাঁহার শেষ রচনা-খণ্ড। উত্তর-ভারত হইতে ফিরিবার পর দুই মাসের মধ্যে এইগুলি রচিত। পুরাতন কবিতা

১ শেষ সপ্তক, ৪৪-সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৯৭। শেষ সপ্তক কবির জন্মদিনে (২৫ বৈশাখ ১৩৪২) প্রকাশিত হয়।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৮, পৃ ১০৩। ২৭ বৈশাখ ১৩৪২।

৩ কৃষ্ণ কৃপালনি সিন্ধুদেশীয় যুবক ; বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হইয়া বিলাত যান ও ব্যারিস্টারি পাস করিয়া আসেন। কিন্তু বোম্বাই বা করাচির বৈষয়িক জীবন তাঁহার ভালো না লাগায় তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। পরে কৃষ্ণ কৃপালনি শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল-কালাম আজাদের খাস সেক্রেটারি হন। বর্তমানে সাহিত্য অকাদেমীর সেক্রেটারি।

৪ কিছুকাল পূর্বে বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে রবীন্দ্রনাথের নিজ ইচ্ছা ও বিবেচনা মতো ব্যয় করিবার অধিকারে একটি তহবিল সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়, ইহা প্রেসিডেন্ট ফাণ্ড নামে পরিচিত ছিল।

ভাঙিয়া গদ্যছন্দে নূতন রূপদানের পরীক্ষা হইয়াছে কয়েকটির মধ্যে। ইতিপূর্বে গদ্যছন্দে-রচিত 'পুনশ্চ' হইতে 'শেষ সপ্তক' সম্পূর্ণ অন্য পরিপ্রেক্ষণীতে আলোচনীয়।[১]

বার্ধক্যজনিত ক্লান্তদেহ, অনবসর জীবন— তাহার মাঝে মনের মতো অনুকূল পারিপার্শ্বিকে মন যখন নিজের দিকে চাহিবার অবসর পায়, শেষ সপ্তকের কবিতাগুলি সেই সময়ের লেখা। আমাদের মনে হয় সমসাময়িক একখানি পত্রে কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনের কথাটি ব্যক্ত হইয়াছে।

"জীবন-আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেচে— এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফেরবার মুখে— বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়। এ জন্মের যাত্রাপথের যারা সঙ্গী ছিল তারা অনেকেই নেই— নতুন যারা কাছে এসেছে জীবনের শেষপ্রান্তের সঙ্গে তাদের যোগ— এই প্রান্তটি সংকীর্ণ এবং ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসচে। চেষ্টা করচি অন্তরের দিকে নতুন পালা আরম্ভ করতে— সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তরতর অয়ন।"[২]

এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষণীতে শেষ সপ্তকের লিরিকগুলিকে দেখিতে হইবে; এবং এইজন্যই ইহাদের মূল সুরটি "সৌম্য বিষাদের সুর। অতীত যৌবনের করুণ স্মৃতি, মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় রহস্য, প্রাণরসে ভরা চঞ্চল মুহূর্তগুলির গভীরতা, আর অনাগত সার্থকতার জন্য সুবিপুল ঔৎসুক্য . . এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য।"[৩]

শেষ সপ্তকের রচনাগুলি পদ্যে লিখিত না হইলেও ইহাতে ছন্দ আছে, খাঁটি গদ্য-কবিতার উদাহরণস্বরূপ ইহাদের

১ শেষ সপ্তক, সংখ্যা ২, পূর্বরূপ স্মৃতিপাথেয় (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪০), রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, সংযোজন, পৃ ১০৭। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ৩, পূর্বরূপ বাতাবির চারা (বিচিত্রা, ফাল্গুন ১৩৪০) রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, সংযোজন, পৃ ১০৮। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ৪, পূর্বরূপ শেষপর্ব (জোড়াসাঁকো, ২২ চৈত্র ১৩৪০। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪১) রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, সংযোজন, পৃ ১০৯। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ১০, পূর্বরূপ 'দুঃখ যেন জাল পেতেছে' (২৮ আষাঢ় ১৩৪১) রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, সংযোজন, পৃ ১২৩। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ২৩, পূর্বরূপ শরৎ, 'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু।' (২৭ ভাদ্র ১৩৪১। বিচিত্রা ১৩৪১। দ্র প্রান্তিক ১৫-সংখ্যক)। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ২৬, পূর্বরূপ মর্মবাণী (পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪১) রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, সংযোজন, পৃ ১১২। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ২৭, পূর্বরূপ ঘটভরা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ১১৫, গ্রন্থপরিচয় অংশ পৃ ৫৭১-৭২। শেষ সপ্তকে, ২৭-সংখ্যক যে 'কবিতাটি ছন্দোহীন গদ্যে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথমে সেটা মিলহীন পদ্যছন্দে লেখা হয়েছিল। তারই পাণ্ডুলিপি প্রবাসীতে পাঠানো হল।' শান্তিনিকেতন, ২৪ আশ্বিন ১৩৪৩। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ (১৭৯ পৃষ্ঠায় চিত্রিত পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত)। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ৩৪, পূর্বরূপ 'পথিক দেখেছি আমি পুরাণে' (৭ বৈশাখ ১৩৪১, প্রান্তিক ১৬-সংখ্যক)। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ৩৫, পূর্বরূপ প্রশ্ন (১৫ নভেম্বর ১৯৩৪। প্রবাসী, মাঘ ১৩৪১), রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, সংযোজন, পৃ ১১৬। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ৩৬, পূর্বরূপ আমি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, সংযোজন, পৃ ১১৭। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ৩৭, পূর্বরূপ আষাঢ় (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪০) রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, সংযোজন, পৃ ১২০। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ৩৮, পূর্বরূপ যক্ষ, (দার্জিলিং, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪০) রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, সংযোজন, পৃ ১২১।

কতকগুলি পত্রকে গদ্যছন্দে রূপান্তরিত করা হয়—

শেষ সপ্তক, সংখ্যা ১৫, পূর্বরূপ, পথে ও পথের প্রান্তে, দ্র রানী মহলানবিশকে লিখিত পত্র, ৮ ও ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫। দেশ পত্রিকা, ১১ চৈত্র ১৩৬৭, পত্র নং ১০০ ও ১০১। শেষের পত্র ভাঙিয়া দুটি কবিতা হয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ২৮-৩১। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ১৬, পূর্বরূপ সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পত্র (৭ এপ্রিল ১৯৩৪) ভাঙিয়া ২টি কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩২-৩৪। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ১৭, পূর্বরূপ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পত্র। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ১৮, পূর্বরূপ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে পত্র। শেষ সপ্তক, সংখ্যা ৪২, পূর্বরূপ চারুচন্দ্র দত্তকে পত্র। শেষ সপ্তক সংখ্যা ৪৩, পূর্বরূপ অমিয় চক্রবর্তীকে পত্র (২৫ বৈশাখ ১৩৪২)। শেষ সপ্তক সংখ্যা ৪৫, পূর্বরূপ প্রমথনাথ চৌধুরীকে পত্র। পুরাতন কবিতা ১২টি ; পত্র ভাঙিয়া গদ্যছন্দে রূপান্তরিত ৭টি। শেষ সপ্তকে মোট ৪৬টি কবিতা, তন্মধ্যে ১৯টি বাদ গেলে ২৭টি নূতন কবিতা থাকে। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৭। ৭ এপ্রিল ১৯৩৫। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত।

৩ শেষ সপ্তক, অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় -লিখিত, ১ চৈত্র ১৩৪২। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন, Vol XXII, 1935-36।

পেশ করা যায়। "এদের মজ্জায় সংযমের বাঁধন আছে, পদ্যের শৃঙ্খলে এরা বাঁধা পড়ে নি বলে যে তারা উচ্ছৃঙ্খল তা নয়।"[১] কাব্যের গদ্যভঙ্গি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কয়েকদিন পরে যাহা বলিলেন তাহা এই কাব্যখণ্ড রচনার কৈফিয়ত [বা defence] বলিতে পারি। কলিকাতা বিশ্বভারতী সম্মিলনীর অধিবেশনে তাঁহার 'কাব্যের গতি' প্রসঙ্গে এই গদ্যরীতির আলোচনা ওঠে। কবি বলেন, "গদ্য কথাবার্তার ভাষা, কবিতার বক্তব্য তাতে বলবার জো নেই; ভাষার যে একটুখানি আড়াল কাব্যে মাধুর্য জোগায়, গদ্যে তার অভাব; গদ্য হচ্ছে কথার ভাষা, খবর দেবার ভাষা। যে ভাষা সর্বদা প্রচলিত নয় তার মধ্যে যে একটা দূরত্ব আছে তারই প্রয়োগে কাব্যের রস জমে ওঠে। অধুনা 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা ছন্দ প্রয়োগ করেছি তাকে 'গদ্য' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে ব'লে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্যকাব্য, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি, যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে . . যাকে আমার মন কাব্যের ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এই ভঙ্গিতে আমি যা লিখেছি আমি জানি। তা অন্য কোনো ছন্দে বলতে পারতুম না। . . অনেকে মনে করেন, কবিতা লেখা এতে সহজ হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বাঁধা ছন্দেই তো রচনা হু হু ক'রে চলে, ছন্দই প্রবাহিত ক'রে নিয়ে যায়; কিন্তু যেখানে বন্ধন নেই অথচ ছন্দ আছে, সেখানে মনকে সর্বদা সতর্ক করে রাখতে হয়।"[২]

পাঠকদের মনে স্বতই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে রবীন্দ্রনাথ মিলবদ্ধ কবিতা ভাঙিয়া ও সরল গদ্যরচনা পরিবর্তন করিয়া কেন এই নবতম গদ্যছন্দের প্রবর্তন করিলেন। গীত ও সমিল পদ্যই মানবের আদিতম সাহিত্যিক প্রকাশ; এ কথা সর্বজনবিদিত যে সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্যের প্রবেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভাবের জটিলতার সঙ্গে ভাষার সম্পদ যেমন এক দিকে বাড়িতে থাকে, তেমনই প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন হয়। গদ্য আসিল এই ভাবে। কাব্যের মধ্যে মিলের বাধা দূর হইয়াছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবির্ভাবে। রবীন্দ্রনাথ আর-এক ধাপ আগাইয়া গেলেন— এই পদ্ধতিতে গদ্যের নূতন রূপ আসিল সাহিত্যে। গত কয়েক বৎসর হইতেই কবি এই পরীক্ষা করিতেছেন; শেষ সপ্তকে আসিয়া ইহা যেন যথার্থ রূপ পাইল। এই ভঙ্গি অবলম্বনের জন্য কবিকে সমালোচনার ভাগী হইতে হয়।[৩]

ভঙ্গির দিক হইতেও এই কাব্যখানি যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষভাবে বিচারণীয়, ভাবের দিক হইতেও এই কাব্যখানি তেমনই আলোচনীয়। কয়েকদিন পরে চন্দননগরের নৌকাবাস হইতে এক পত্রে ধূর্জটিপ্রসাদকে কবি লিখিতেছেন (৩ জুন), "লেখাগুলোর ভিতরে ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গি নেই . . চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনো-খানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না, এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি।"[৪]

এই কাব্যখানি কেবলমাত্র কাব্যরস সম্ভোগের জন্য অধীতব্য নহে; একটি রচনা এক সকালে পড়িলে তার

১ শেষ সপ্তক, অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় -লিখিত, ১ চৈত্র ১৩৪২। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন, vol II, 1935-36।

২ আমার কাব্যের গতি, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৩, পৃ ৪৫৩। কলিকাতা বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে বক্তার আধুনিক কাব্যপাঠের ভূমিকা। শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত।

৩ শেষ সপ্তক প্রকাশিত হইলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য কবিকে যে পত্র দেন রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর দিয়াছিলেন (২২ মে ১৯৩৫)। 'ছন্দ' গ্রন্থের 'মোটকথা'র গদ্যছন্দ অংশটি দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, পৃ ৪৩১-৩২, ৪৪২। চারি বৎসর পর ২৯ অগস্ট ১৯৩৯ কবি শান্তিনিকেতনে ছাত্রী অধ্যাপকদের সম্মুখে 'গদ্যকাব্য' সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। ভাষণটি শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক লিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত হয়। প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬, পৃ ৪৪৮-৫০।

৪ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ৩ জুন ১৯৩৫ [চন্দননগর] দ্র ছন্দ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, পৃ ৪২২।

ভাবনার রণন চলে সারাদিনমান। আত্মকাহিনী ও আত্মচিন্তা বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত; কাব্যখানি যেন 'আত্মজৈবনিক' প্রকাশ— প্রতিদিনের ভাবনার নিবেদন— দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সমন্বিত হইয়া একটি জীবন-দর্শন সৃষ্ট হইয়াছে। এই কাব্যের রচনাগুলি গল্পধর্মী নহে, চিত্রধর্মীও নহে, বলা যাইতে পারে আত্মধর্মী। তবে কতকগুলি গল্পও আছে।

যাকে বলতে পারি আমার সবটা,
তার নাম দেওয়া হয় নি,
তার নকশা শেষ হবে কবে?
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার?
নামটা রয়েছে যে-পরিচয়টুকু নিয়ে,
টুকরো-জোড়া দেওয়া তার রূপ,
অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ-করা।[১]

এই কাব্যখণ্ড হইতে বহু অংশ উদ্ধার করিয়াও ইহার সমগ্র রূপটি দেখানো সম্ভব নহে।[২] শেষ সপ্তকের একটি কবিতায় (৪-সংখ্যক) রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের স্বরূপটি ভাষা পাইয়াছে; সেইটি পুরাতন কবিতা ভাঙিয়া পুনর্লিখিত।[৩] কবির এই জীবন-দর্শনের নাম দেওয়া যাইতে পারে 'সহজ সাধনা'। সেই দৃষ্টিতে এই কয়েকটি পংক্তি বিচারণীয়—

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূর বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব
ঐ নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে
যেখানে নিমেষের অন্তরালে
সহস্রবৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত।...
আলোছায়ার উপর দিয়ে

১ শেষ সপ্তক, সংখ্যা ৯, ২৭ মার্চ ১৯৩৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ১৮।

২ বিস্ময় (২১ বৈশাখ ১৩৪২)। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪২। পত্রপুট, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০। এই কবিতাটি 'শেষ সপ্তক' গুচ্ছের অন্তর্গত হওয়ার মতো। বোধ হয় যখন লেখা হয় তখন আর ঐ কাব্যখণ্ডে সংকলিত হওয়ার সময় ছিল না, কারণ ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ শেষ সপ্তক প্রকাশিত হয়।

৩ শেষ পর্ব, ৫ এপ্রিল ১৯৩৪। ২২ চৈত্র ১৩৪০, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ১০৯।

ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু-মহাসাগর-সংগমে।

নদীবক্ষে

শান্তিনিকেতন গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইল। জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরে (২৮ বৈশাখ ১৩৪২) কবি কলিকাতায় আসিলেন। পরদিন রথীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, গ্রীষ্মকালটা কোথায় যে কাটাইবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী বিলাতে। মংপু, পুরী, শিলং, দার্জিলিং, এমন-কি সুদূর সিমলা-শৈলের ধরমপুরেও যাইবার কথা বা কল্পনা হইতেছে। কখনো ভাবিতেছেন শান্তিনিকেতনই ভালো। কিন্তু নূতন বাড়ি 'শ্যামলী'র খুঁটিনাটি কাজ অনেক বাকি। তা ছাড়া বীরভূমে এবার দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অসহ্য গরম। কবি প্রতিমা দেবীকে বিলাতে লিখিতেছেন, "আমি চিরদিন গরমকে উপেক্ষা করে এসেছি, এবার আমার অহঙ্কার টিকল না— কোথায় যাই কোথায় যাই করে উঠল প্রাণপুরুষ, অনেক চিন্তা করে করে শেষকালে আশ্রয় নিয়েছি বোটে।"[১]

নৌকায় আশ্রয় লইবার পূর্বে যে-কয়দিন কলিকাতায় ছিলেন, তারই মধ্যে কয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে হইল। কলিকাতায় যেদিন পৌঁছিলেন তার পরদিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবির চুয়াত্তর-বৎসর-পূর্তি উপলক্ষে সংবর্ধনা (২৯ বৈশাখ ১৩৪২)। এই সভায় কবি মৌখিক কিছু বলিয়া 'শেষ সপ্তক' হইতে একটি কবিতা পাঠ করেন।[২]

ইহার কয়েকদিন পরে (৪ জ্যৈষ্ঠ) ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে কলিকাতাস্থ ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারের সভায় কবিকে সভাপতিত্ব করিতে হয়। এই দিন স্মরণে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়া ও ইংরেজিতে তাহার অনুবাদ করিয়া কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। সভায় কবি যে ভাষণ দান করেন সেটিরও ইংরেজি করা হয়। কবিতা ও ভাষণ মুদ্রিত করিয়া মহাবোধি সোসাইটি প্রচার করিয়াছিলেন।[৩] এই ভাষণে বুদ্ধদেবের প্রতি কবির অগাধ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, "আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি।" এই নাতিদীর্ঘ ভাষণের শেষ দিকে তিনি বলেন, "ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ [প্রথম] হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হ'ল, সে জয় বাহুবলের। কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয়, এইজন্যে মানুষের ইতিহাসে সে-জয় নিষ্ফল হল, সে-জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরে নি। ..পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্রোধেন জিনেৎ কোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের এই জগদ্‌ব্যাপী অপমানের যুগে বলবার দিন এল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।..

১ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৪৭।

২ সংখ্যা ৪৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৮৯। জন্মদিন স্মরণে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত।

৩ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪২। দ্র বুদ্ধদেব। বুদ্ধপূর্ণিমা, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ [১৯৫৬]। বিশ্বভারতী।

আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

কবি গঙ্গাবক্ষে আপনাদের নৌকা-গৃহ (হৌস্ বোট) 'পদ্মা'য় আছেন, সঙ্গে শ্রীঅনিলকুমার চন্দ ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীরানী দেবী। উত্তরপাড়া শ্রীরামপুর প্রভৃতি ঘাটে ঘুরিয়া অবশেষে চন্দননগরে আসিলেন। কৈশোর ও যৌবনের পরিচিত এই নদীঘাটের সঙ্গে কবিজীবনের যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, তাহা নানা রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। নৌকা যেখানে বাঁধা হইল তার 'সামনেই সেই দোতলা বাড়ি, যেখানে একদা জ্যোতিদাদার সঙ্গে অনেক দিন' কাটাইয়াছিলেন। 'সে বাড়ি অত্যন্ত বেমেরামতী অবস্থায়', তাই তার 'পাশেই একটা একতলা বাড়ি'[১] ভাড়া লইবেন ভাবিতেছেন।

আজ বৃদ্ধবয়সে সেই নদীঘাটে আসিয়া তাঁহার কবিহৃদয়ে অতীত যুগের নানা স্মৃতি যে জাগিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। কবির দেহমাত্র জরাক্রান্ত, কিন্তু সে জরা তাঁহার মনকে এখনো নীরস করিতে পারে নাই; তাই আজ বিস্মৃতপ্রায় অতীত নূতন করিয়া আলোড়িয়া উঠিল। চারি দিকের নূতনের মাঝে মাঝে কখনো স্মৃতির সুখকর দুঃখকে আহ্বান করেন, কখনো তাহাকে লইয়া করেন পরিহাস। 'বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখির জল।' যখন স্মৃতিবেদনা অন্তর-নিগূঢ় তখন বেদনা ও বিদ্রূপ চলে সমান্তরালে—'বীথিকা' ও 'প্রহাসিনী'র অনুরণন চলে পাশাপাশি।[২]

এবার গঙ্গাবক্ষে নৌকাবাস-কালে কাব্যশ্রী দেখা দিল বীথিকার সমিল-ছন্দে। ইহাদের রূপ ও সুর শেষ সপ্তকের গদ্যছন্দের রচনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিদ্রোহী (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২), গীতচ্ছবি (৫ জ্যৈষ্ঠ), মিষ্টান্বিতা (১৮ জ্যৈষ্ঠ। প্রহাসিনী), অবর্জিত (২২ জ্যৈষ্ঠ। নবজাতক), ছুটির লেখা (২৩ জ্যৈষ্ঠ), নিমন্ত্রণ (৩১ জ্যৈষ্ঠ), ছায়াছবি (৪ আষাঢ়), নাট্যশেষ (আষাঢ় ১৩৪২) এই সময়ের লেখা। যে-সব পুরাতন স্মৃতি এই কবিতাগুলির মধ্যে রূপ লইয়াছে তাহাদের ইতিহাস অস্পষ্ট নহে। চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির স্মৃতি কাদম্বরী দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত জড়িত। মনঃসংযোগ করিয়া কবিতা কয়টি পাঠ করিলে কবির মনোভাব স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। 'নিমন্ত্রণ' (বীথিকা) কবিতায় আছে—

> মনে ছবি আসে— ঝিকিমিকি বেলা হল,
> বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি ;
> কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো ;
> তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।
> কুঙ্কুমফোঁটা ভুরুসংগমে কিবা,
> শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে ;
> পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
> লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে।
> তাম্রথালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে
> সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি ;

১ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৪৭।

২ বীথিকা, ভাদ্র ১৩৪২ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯। প্রহাসিনী, পৌষ ১৩৪৫ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩।

ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে,
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি।

তুলনীয় 'ছেলেবেলা'র এই অংশটুকু— "দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে একগ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান। বউঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা . . ।"[১]

'ছায়াছবি' কবিতা হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত হইল—

প্রবল বরিষনে
পাংশু হল দিকের মুখ,
আকাশ যেন নিরুৎসুক,
নদীপারের নীলিমা ছায়
পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারাল সীমা,
হারাল পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিদ্যাপতি-রচিত সেই
ভরা-বাদর গান।

কবি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হার্মোনিয়াম-যন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত-মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম" (গঙ্গাতীর)। এই-সব পুরাতন দিনের কথা ও বিশেষ করিয়া কাদম্বরী দেবীর কথা স্মরণ হইতেছে এই গঙ্গাতীরে আসিয়া। "গিয়েছে তার ছায়ামুরতি কালের খেয়া-পারে" ('ছায়াছবি')। 'নাট্যশেষ' কবিতায়—

সহসা রাত্রে সে গেল চলি
যে রাত্রি হয় না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে অঞ্জলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হল গত . .
সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্যলতায়
ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প-সাথে।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের কবিতা 'অবর্জিত'[২] (৫ জুন ১৯৩৫) ও 'ছুটির লেখা'[৩] (৬ জুন)— প্রথমটি 'নবজাতকে'র

১ ছেলেবেলা, ভাদ্র ১৩৪৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৬১২।

২ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২। নবজাতক, বৈশাখ ১৩৪৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৯-৫১।

৩ বীথিকা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ২৯-৩১।

ও দ্বিতীয়টি 'বীথিকা'র অন্তর্গত। 'অবর্জিত' লিখিত হয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্দেশে ; তার কারণ আছে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশের কথা উঠে এবং কবির যাবতীয় লেখা সংগ্রহ ও মুদ্রিত করিবার প্রস্তাবও হয়। প্রশান্তচন্দ্র বহু বৎসর হইতে কবির রচনার বিস্তৃত সূচী প্রস্তুত করিতেছিলেন ; তাঁহার সংগ্রহও ছিল ভালো ; তাঁহার ইচ্ছা কবিকর্তৃক বর্জিত রচনাও মুদ্রিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষণীতে 'অবর্জিত' কবিতাটি পঠনীয়।

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে,
সময় রাখি নি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্যে যে জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।
বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা,
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা—
আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারি দিক হতে গর্জন করি উঠে—
'ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে ?
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।' . .
ভাবীকালে মোর কী দান শ্রদ্ধা পাবে,
খ্যাতিধারা মোর কত দূর চলে যাবে,
সে লাগি চিন্তা করার অর্থ নাহি।
বর্তমানের ভরি অর্ঘ্যের ডালি
অদেয় যা দিনু মাখায়ে ছাপার কালি
তাহারি লাগিয়া মার্জনা আমি চাহি।

এই কবিতাটির মধ্যেই এক স্থলে রহিয়াছে—

যাহা-কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবি,
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনো কবি—
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক ;
কিন্তু, হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ ?

এই ভাবনা হইতে পরদিন লেখেন 'ছুটির লেখা'—

এ লেখা মোর শূন্যদ্বীপের সৈকততীর,
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি-অতীত পারের পানে।
উদ্দেশহীন জোয়ার-ভাঁটায় অস্থির নীর
শামুক ঝিনুক যা খুশি তাই ভাসিয়ে আনে। . .

পাঠশালা সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এড়ায়,
শেখার মতো কোনো কিছুই হয় নি শেখা ;
আলোছায়ায় ছন্দ তাহার খেলিয়ে বেড়ায়
আলুথালু অবকাশের অবুঝ লেখা।

অন্যান্য হাসিবিদ্রূপপূর্ণ কবিতার ইতিহাস প্রছন্ন আছে হয়তো তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে ; 'মিষ্টান্বিতা' কবিতাটি বরাহনগরের পারুল দেবীকে পত্রাকারে লিখিত হয়। কবিতার শেষ স্তবকটুকু রহস্যচ্ছলে প্রথমবারে প্রেরিত হয় নাই (১ জুন)। কয়েকদিন পরে (৫ই) পারুল দেবীকে লিখিতেছেন, "আমি আশা করেই ছিলুম যে তুমি আমার উপর খুব রাগ করবে, কেননা রাগটা সকল ক্ষেত্রে মন্দ জিনিস নয়— না রাগ করা ঔদাসীন্যের লক্ষণ। তোমাকে রাগাব বলেই কবিতাটির শেষ দুটো শ্লোক তোমাকে পাঠাই নি— উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, অতএব এখন পাঠাই। কবিতার প্রথম অংশের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পাঠ করো।"[১]

কবি যেখানেই থাকুন, ডাকযোগে পত্র এবং স্থলপথে জলপথে সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁহার কাছে অনায়াসে পৌঁছাইতে পারিত। অনুরোধ আসিয়াছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের (মৃত্যু ১৬ জুন ১৯২৫) স্মৃতিসৌধ উন্মোচনের জন্য তাঁহার বাণী চাই। কলিকাতার কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে যে চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল তাহার পরিকল্পনা করেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর। রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত পংক্তি-চতুষ্টয় লিখিয়া দিলেন (১৬ জুন ১৯৩৫)—

স্বদেশের যে ধূলিরে শেষ স্পর্শ দিয়ে গেলে তুমি
বক্ষের অঞ্চল পাতে সেথায় তোমার জন্মভূমি।
দেশের বন্দনা বাজে শব্দহীন পাষাণের গীতে—
এসো দেহহীন স্মৃতি মৃত্যুহীন প্রেমের বেদিতে।

আর-একটি কবিতা লিখিয়া দেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেরণায়। চন্দননগর নদীঘাটে বাসকালে কবির কাছে তেলিনী-পাড়ার জমিদার-পরিবারের কেহ কেহ দেখা করিতে আসিতেন। ইঁহাদের আত্মীয় উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী শোভনা দেবীর বিবাহোপলক্ষে কবি এই কবিতাটি[২] লিখিয়া দেন (১৩ আষাঢ় ১৩৪২)—

নূতন সংসারখানি সৃষ্টি করো আপন শক্তিতে
হৃদয়সম্পদ দিয়ে, হে শোভনা, স্নেহে ও ভক্তিতে
পুণ্যে ও সেবায় ; থাকো লক্ষ্মীর আসনে শুভব্রতা।
তোমাদের সম্মিলিত প্রাণের যুগল তরুলতা
সুলগ্নে রোপিত হল ; দেবতার প্রসাদবর্ষণ
নববর্ষাধারা-সাথে আজি তারা করুক গ্রহণ,

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, পৌষ ১৩৪৯, পৃ ৩৭৫। প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫৩৭।

২ উত্তরপাড়ার অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী শোভনার বিবাহে কবির আশীর্বাদ। কবিতাটি কোথাও মুদ্রিত হয় নাই। অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ২৫ জুলাই ১৯৫০ এক পত্রে লেখককে জানাইতেছেন—"আমার পৌত্রীর বিবাহ উপলক্ষে আমার কন্যা উত্তরপাড়ায় আসায় সময়ে কবির নিকট ৫।৭ দিনের জন্য বিদায় লইতে যাইলে কবি স্বপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ আশীর্বাদটি লিখে দেন।" এই কন্যা তেলিনীপাড়ার জমিদার-বাড়ির বধূ। কবি চন্দননগর ঘাটে থাকিবার সময় ইঁহাদের বাটীতে আসিতেন। দ্র. হরিহর শেঠ -সংকলিত রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর (জন্মশতবার্ষিক স্মারক-গ্রন্থ)। চন্দননগর, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

পূর্ণ হোক প্রেমরসে, মাধুর্যের ধরুক মঞ্জরী
চিরসুন্দরের দান, উঠুক সকল শাখা ভরি
বিশ্বের সেবার তরে সরস কল্যাণময় ফল,
বিস্তার করুক শান্তি স্নিগ্ধ তার শ্যামছায়াতল ॥

শিক্ষা-সমস্যা

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে কবি তাঁহার নদীবাস হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন (১৯ আষাঢ় ১৩৪২)। এবার উঠিলেন তাঁহার নূতন মাটির বাড়ি শ্যামলীতে। শান্তিনিকেতনে আসিলেই তথাকার বিচিত্র সমস্যার সমাধানে তাঁহার সময় যায়। অথচ তাঁহার যে-বয়স হইয়াছে তাহাতে বিদ্যায়তনের সকল বিভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখাও কঠিন; এখন অনেকখানিই নির্ভর করিতে হয় কর্মীদের উপর। ফলে তাঁহার শিক্ষাদর্শ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া চলিতেছে, অসহায়ভাবে এ-সমস্ত মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরবিপ্লবী; ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাকে আমরা শিক্ষার বিপ্লবই বলিব। কিন্তু কবি দেখিতেছেন ক্রমেই শিক্ষা তাঁহার আদর্শচ্যুত হইয়া সহজ ও গতানুগতিকের পথাশ্রয়ী হইতেছে। আমেরিকার সমসাময়িক একখানি পত্রিকাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক একটি প্রবন্ধে তাঁহার শিক্ষাদর্শের সায় পাইয়া মনটা প্রফুল্ল হইল। তিনি বিলাত-প্রবাসী ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে এক দীর্ঘ পত্রে তাঁহার মনোভাব সবিস্তারে জানাইলেন (১৫ জুলাই ১৯৩৫)।[১] তিনি এই পত্রে culture বলিতে কী বুঝায় সে-সম্বন্ধে তাঁহার মত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন যে, culture আয়ত্ত করিবার উপায় কেবলমাত্র পরীক্ষা-পাস নহে। কবি বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষার নানা স্তরে, "রক্তপিপাসু পরীক্ষাদানবের কাছে শিশুদের বলি" দিবার আয়োজন হইয়াছে। তিনি অনুভব করিতেছেন যে, যে আদর্শ হইতে বিদ্যালয়ের উদ্‌ভব তাহা হইতে এখন উহা অনেক সরিয়া আসিয়াছে। তিনি জানেন বর্তমানে পরীক্ষার উৎপাতে শিক্ষকদের "শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।" সতেরো বৎসর পূর্বে যখন বিশ্বভারতী স্থাপন করেন তখন মনে করিয়াছিলেন যে শিক্ষকদের মধ্যে প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করিবেন। সেই অর্থে 'উপরের তলায় ওঠবার' কথা বোধ হয় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯৩০ সালে জারমেনি হইতে কবি অধ্যক্ষ নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলিকেও এই পরীক্ষা-সর্বস্ব মনোভাবের জন্য তীব্র মন্তব্য করিয়া এক পত্র দেন।

পাঁচ বৎসর পরেও তাঁহার এ বিষয়ে যে মতের পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা নহে। এই সময়ের মধ্যে পরীক্ষার পাস (ফাঁস) অষ্টেপৃষ্ঠে ছাত্র ও শিক্ষকের মনকে আরো বাঁধিয়াছে। সন্দিগ্ধ চক্ষুর অন্তরালে বসিয়া, মুক্ত প্রাঙ্গণে, নিরালায়, আপন মনে পরীক্ষা-পত্রের উত্তর লিখিবার স্বাধীনতা ছাত্ররা হারাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেইটি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন। যাঁহারা সহকর্মী তাঁহাদের সকলের মধ্যে ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবার ক্ষমতা সমান নহে; কবির শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও তাঁহারা হয় অজ্ঞ, নয় উদাসীন— শ্রদ্ধাহীনেরও অভাব হয় নাই। ফলে তাঁহার শিক্ষাদর্শ পদে পদে প্রতিহত হইয়াছে। উপরি-উদ্‌ধৃত পত্রমধ্যে কবির সেই আপসোস প্রকাশ পাইয়াছে।[২]

১ শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৪২। দ্র. শিক্ষা । সংস্করণ (১৩৫১)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা গ্রন্থে এই প্রবন্ধ নাই।

২ প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি, বিশ্বভারতীর প্রথম পর্বে (১৯১৯) যে প্রস্‌পেক্টাস প্রকাশিত হয় তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বলা ছিল যে পরীক্ষাগ্রহণ প্রথা থাকিবে না; জ্ঞানের সাধনা দ্বারা আপনার স্থান গ্রহণ করিতে হইবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। প্রস্‌পেক্টাস হইতে প্রথম কয়েকটি নিয়ম উদ্‌ধৃত হইল— 1. The Visvabharati is for higher studies. 2. The system of examinations will have no place

কবির ক্রমেই আশঙ্কা হইতেছে যে ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের-আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকিবে না; তিনি এক স্থানে বলিতেছেন[১], "ক্রমে যেটা সহজ পন্থা বিদ্যালয় সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হয়— শিক্ষার যে-সব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, সেইগুলিই বলবান হয়ে ওঠে, তার নিজের ধারা বদ্‌লে গিয়ে হাই-ইস্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ; সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। . . বিদ্যালয় যদি একটা হাই-ইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠক্‌লুম। . . এতে হয়তো খুব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি স্পষ্টভাবে ও সংহতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দেন 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে।[২] ইহা শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শের ব্যাখ্যা হইলেও উহাকে শিক্ষাদর্শের কেন্দ্রিক বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে বাধা নাই। শিক্ষার মূলতত্ত্ব এখানে আলোচিত হইয়াছে; প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর পক্ষে এই প্রবন্ধটি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া আমাদের মনে হয়।[৩]

অন্যত্র শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহাও এখানে উদ্‌ধৃত করিলাম। "ছাত্রদের পরস্পরের প্রতি, গুরুজনের প্রতি ব্যবহারে নিয়ম রক্ষা; যাহাতে সামাজিকতা-বৃত্তির বিকাশ হয় সেইরূপ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন; আপৎকর্মে অভিজ্ঞতা ও প্রতিবেশীর সর্বপ্রকার আনুকূল্যে তৎপরতা; স্বদেশের সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও তৎপ্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে বোধের উদ্রেক; পরজাতির প্রতি প্রীতিবৃত্তি ও তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে ন্যায়পরতার বিকাশ সাধন; সভ্যসমাজে লোকহিতের জন্য যে-সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে ও যে-সকল নূতন প্রচেষ্টার প্রবর্তন ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ— এইগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ। সংক্ষেপতঃ, মনে হৃদয়ে ও ব্যবহারে যাহাতে ছাত্রেরা মনুষ্যত্বের সকল বিভাগেই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। নিজেদের প্রতিবেশকে সর্বতোভাবে সমর্থ ও আত্মশাসনক্ষম করিয়া তোলাই যে সমস্ত দেশের স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন, ছাত্রদিগকে হাতে-কলমে তাহাই বুঝাইতে হইবে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সভায় ছাত্রদের যাহা বলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য বলিয়া এখানে উদ্‌ধৃত হইল— "জীবনের সার্থকতার জন্যে আমি রসের প্রয়োজনকে মানি কিন্তু রসের প্লাবনকে মানি নে। তার সঙ্গে কঠিন সত্যকে মানতে হবে চিন্তাশক্তির সহযোগে। তোমাদের রচনায় এবং কাজে আমি এই দেখতে চাই যে, নির্মল আনন্দের ক্ষেত্রে যেমন তোমরা বিশ্বের অন্তরঙ্গ মন নিয়ে সৌন্দর্য সম্ভোগ করো তেমনি মানব-সমাজের বিচিত্র ব্যাপারের প্রতি ঔৎসুক্য নিয়ে তোমরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করো, অন্বেষণ করো, বিচার করো এবং

whatever in the Visvabharati, nor is there any conferring of degrees. 3. Students will be encouraged to follow a definite course of study, but there will be no compulsion to adopt it rigidly.

বিশ্বভারতী বলিতে তখন বুঝাইত উচ্চতর বিদ্যালোচনার ক্ষেত্র। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্বভারতীর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে: স্কুল বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম অংশ ক্রমেই দূর যবনিকার মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। আমেরিকা হইতে তিনি এক পত্রে (১৯২১) যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণীয়।

১ ১৩৪২ এর ৮ই পৌষ বিশ্বভারতী বার্ষিক সভায় কবির ভাষণ। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত, ৭ পৌষ ১৩৫৮।

২ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৩। শিক্ষার ধারা, ভাদ্র ১৩৪৩। শিক্ষা, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫১)।

৩ বিশ্বভারতী, পৃ ১৪১-৪৬। Homer Lane ও W. B. Curry-র বইগুলি এ ক্ষেত্রে তুলনীয়। Meyers তাঁহার *Development of Education in the 20th Century* গ্রন্থে আধুনিক প্রায় সকল প্রকার progressive education-এর আলোচনা করিয়াছেন; এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে কতদূর আধুনিক ছিলেন।

৪ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসংগঠনের আদর্শ। প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৪, পৃ ৬৬৫।

আপন জীবনের লক্ষ্য অবধারণ করো।”[১]

শিক্ষা সম্বন্ধে সমসাময়িক পত্রাদি ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর খুচরা লেখাও চোখে পড়ে। ভাষার মধ্যে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ সম্বন্ধে কবিরা চিরদিনই শৌখিন। শব্দের অপপ্রয়োগ তাঁহাদের তীব্রভাবেই আঘাত করে। বিশেষ কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে কবির খুবই আপত্তি সাহিত্যে ‘কৃষ্টি’ ‘স্তম্ভ’ ‘অবদান’ প্রভৃতি শব্দের অপপ্রয়োগ লইয়া রবীন্দ্রনাথ ‘তাসের দেশে’ যে ব্যঙ্গ করেন তাহার কথা ইতিমধ্যেই আলোচিত হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ (১৩৪২) মাসের প্রবাসীতে ইংরেজি কালচার শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ‘কৃষ্টি’ শব্দের ব্যবহার দেখিয়া কবি বিস্মিত হইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, “বাংলা খবরের কাগজে একদিন হঠাৎ ব্রণের মতো ঐ শব্দটা চোখে পড়ল, তার পর দেখলুম ওটা বেড়েই চলেছে। সংক্রামকতা খবরের কাগজের বস্তি ছাড়িয়ে উপর মহলেও ছড়িয়ে পড়েছে দেখে ভয় হয়। প্রবাসী পত্রে ইংরেজি অভিধানের এই ‘অবদান’টি সংস্কৃত ভাষার মুখোশ পরে প্রবেশ করেছে, এটা নিঃসন্দেহ অনবধানতাবশত। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি বর্তমান বাংলাসাহিত্যে ‘অবদান’[২] শব্দটির যে প্রয়োগ দেখতে দেখতে ব্যাপ্ত হল সংস্কৃত শব্দকোষে তা খুঁজে পাই নি।” ভাষায় কোন্‌টি চলিতে পারে এবং কোন্‌টি ব্যাকরণসংগত হইলেও চলিতে পারে না, অথবা analogyর সাহায্যে নূতনভাবে শব্দ সৃষ্টি করিলেও অচল— সে সম্বন্ধে আলোচনা আছে এই প্রবন্ধে।

রচনার সঙ্গে ঘটনার স্রোত বহিয়া চলে, সে-সবের উপর তাঁহার কোনো হাত নাই; তাহার ঘাত-প্রতিঘাত তাঁহাকে আঘাত করে, আহত করিতে পারে না। একটি সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ এখানে করিতেছি।

আমাদের আলোচ্যপর্বে (১৯৩৫) জারমেনিতে হিটলারের প্রতাপ বাড়িতেছে। হিটলার আদর্শবাদী ভাবুকদের পুস্তকাদি দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনাও নাৎসিদের নিকট অপাঠ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। এই-সকল ঘটনা কেন্দ্র করিয়া রামানন্দবাবুর এক পত্রের উত্তরে কবি লিখিতেছেন, “আমার পক্ষে হিটলারের প্রয়োজনই হয় না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে একদা এমন দিন ছিল যখন কালিদাস প্রভৃতি কবি রসজ্ঞ মহলে তাঁদের কাব্যের প্রচার হলেই খুশি হতেন। আমার দুঃখ এই যে বিক্রমাদিত্যের ঠিকানা পাওয়া যায় না। তখন একজন কোনো অসাধারণের উপর ভার ছিল সর্বসাধারণের হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করা। পাই কোথায় তেমন রাজা। এমন যদি হত সাধারণের মধ্যেই শক্তি ও ভক্তি অনুসারে যাঁর যখন খুশি পরিতোষ প্রকাশের জন্য কবিকে পারিতোষিক পাঠাতেন তা হলে কপিরাইট আগলানোর মতো বণিগ্‌বৃত্তি সরস্বতীর মন্দিরে অশুচিতা বিস্তার করত না। রুচিও আছে রৌপ্যও আছে জনসমাজে এমন সমাবেশ দুর্লভ নয় অথচ তাঁরা দুটাকা পাঁচশিকার পরিমাণেই তাঁদের দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেন— তার ফলে যাঁদের রুচি আছে অথচ সামর্থ্য নেই দণ্ডটা তাঁদেরই নিষ্ঠুরভাবে ভোগ করতে হয়। বাণীকে সোনার দরে বিক্রির বৈশ্যরীতি বর্বরতা এ কথা মানতেই হবে।”[৩]

১ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃ ১৭০।

২ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪২, পৃ ১০৪। দ্র. বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ ১৭৮-৮১। “ওটা বঙ্গভাষা, যাকে হাল আমলের পণ্ডিতেরা বলেছে ‘অবদান’।”—সে। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ২০৮। “হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি”, বাংলাভাষা-পরিচয়, আষাঢ় ১৩৪৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৪৫৬।

৩ মান্দ্রাজের Guardian কাগজে (২৭ জুন ১৯৩৫) জারমেনিতে কবির বই বিক্রয় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হইলে, রামানন্দবাবু কবির নিকট বিষয়টি জানিতে চান; কবি তাহার উত্তরে যাহা লেখেন, তাহা ‘বিবিধ প্রসঙ্গে’র অন্তর্ভুক্ত হয়।— প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২, পৃ ৫৯০। পত্রখানি আষাঢ় ১৩৪২-এর কোনো সময়ে লিখিত।

আমরা জানি কবির বহু গ্রন্থ বহু ভাষায় তাঁহার বা প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে ও অগোচরে অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। একবার হিন্দীতেই ২৪খানি বইয়ের ‘চোরাই’ তর্জমার সন্ধান পাওয়া যায়।— প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৫, পৃ ৭৪৮। উর্দুতেও বহু বই এইভাবে ভাষান্তরিত হয়

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে 'প্রাইজ' বা পুরস্কার প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন না; ব্রহ্মচর্যাশ্রমে 'ভালো' ছেলেদের প্রাইজ দেওয়ার প্রথা ছিল না। ১৯০৭ সেপ্টেম্বর ১৪ তারিখে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ভাল ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়াটা কি শ্রেয়? সংসারে পুরস্কার হতে বঞ্চিত হওয়াতেই যথার্থ ভালর পরীক্ষা ও পরিচয়। 'আমি ভাল' এ কথা কেউ যেন প্রাইজ দেখিয়ে প্রচার করবার অবকাশ না পায়।"[১]

১৯১০ সালে রথীন্দ্রনাথের বিবাহের পর ছাত্রদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়; সেই সময়ে নূতন বধূ প্রতিমা দেবী বিজয়ীদের প্রাইজ দেন।

কিন্তু কালান্তর হইয়াছে। এখন বিশ্বভারতীতে নানাবিধ পুরস্কার প্রদত্ত হইতেছে।

শিক্ষা-বিশেষজ্ঞরা বলিতে পারেন কোন্‌টি ঠিক।

বীথিকা

শিক্ষা ভাষা সংস্কৃতি সম্বন্ধে গদ্য-প্রবন্ধে বা পত্রে যাহাই লিখুন, রবীন্দ্রনাথের অন্তরের রূপটি প্রকাশ পায় কাব্যে ও গানে। চন্দননগর নদীবক্ষে উৎসারিত ক্ষীণ কাব্যধারা শান্তিনিকেতনে ফিরিবার পর কিছুটা বেগবতী হইয়াছে। আষাঢ়ের শেষ দিক হইতে (২৮ আষাঢ় - ২৯ ভাদ্র ১৩৪২) 'বীথিকা' কাব্যখণ্ডের এক ঝাঁক কবিতা লিখিত হয়। 'শেষ সপ্তক' হইতে ইহাদের ভাব ও ছন্দ পৃথক। কবিতাগুলির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে আঙ্গিকের যোগ নাই, বিচ্ছিন্ন দিনের কবিমনের ভাবনা মাত্র। তবে আমাদের কথা— রবীন্দ্র-কাব্যধারা যাহা আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সৃষ্টির মালা, যথার্থত তাহা সেরূপ নহে। ফল্গুনদীর মতোই তাহা অন্তঃসলিলা। এই অন্তর্ধারার সন্ধান মিলিলে কবি দুর্বোধ বা অবোধ্য থাকেন না। 'বীথিকা'র এই পর্বের কবিতাগুলি সেইভাবে পঠনীয়।

এই দুই মাসের মধ্যে 'বীথিকা' কাব্যখণ্ডের ২২টি কবিতা, গান ও 'ভরসা-মঙ্গলে'র জন্য ৪টি গান লিখিত হয়। 'বীথিকা'তে আছে মোট ৭৮টি কবিতা; অর্থাৎ ৫৬টি লিখিত হয় গত দুই বৎসরের মধ্যে—কতকগুলি হয় 'শেষ সপ্তক' শেষ হইবার পর প্রধানত চন্দননগর নদীবক্ষে বাসকালে। গত দুই বৎসরের মধ্যে 'পরিশেষ' (ভাদ্র ১৩৩৯) ও 'বিচিত্রিতা' (শ্রাবণ ১৩৪০) কাব্যদ্বয় প্রকাশিত হয়। 'পরিশেষে' ও 'বিচিত্রিতা'য় ধরা হয় নাই অথচ ঐ পর্বেরই অন্তর্গত, সেরূপ কবিতা 'বীথিকা'র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আমাদের মতে 'বীথিকা' কাব্যের খাস-দরবারের মধ্যে পড়ে এমন কবিতার সংখ্যা ২২টির বেশি নয়, যেগুলি চন্দননগর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর দুই মাসের মধ্যে রচিত।

কবির সব কবিতাই যে আত্মকেন্দ্রিক বা তাহাদের প্রেরণাস্থল অবচেতন মন, তাহা ভাবিবার কারণ নাই। বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পূর্বে বৌদ্ধ অবদানগ্রন্থ, রাজস্থানের কাহিনী, মারাঠাগাথা, শিখ ইতিহাস প্রভৃতির সন্ধান করিতে হইয়াছিল। শেষ জীবনে বিষয়ের সন্ধান করিয়াছেন— শিল্পীদের এমন-কি নিজের অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে; 'মহুয়া'র কয়েকটি, 'বিচিত্রিতা'র সকলগুলি এবং 'পরিশেষ', 'বীথিকা'র গুটিকয়েক এই শ্রেণীর চিত্রের প্রেরণায় রচিত।

'পরিশেষে'র সঙ্গে সঙ্গে কবির কাব্যসৃষ্টির মধ্যে মিল-ছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল 'পুনশ্চে'র গদ্যকাব্য। অক্ষরবৃত্ত মিল-ছন্দের অভ্যস্ত কবিতা লিখিতে লিখিতে গদ্যছন্দে কবি এক নূতন technique পাইলেন; সেই প্রেরণার আবেগে

যাহার খবর কলিকাতায় বা শান্তিনিকেতনে কেহই পাইতেন না। একবার বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডক্টর আসিরি পঞ্জাব হইতে এরূপ বহু তর্জমা আনিয়াছিলেন।

১ স্মৃতি, পৃ ৬৪-৬৫।

অনবদ্য রচনা উৎসারিত হইল 'পুনশ্চে'। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে 'বলাকা'র নূতন ছন্দের কথা বলিতে পারি; 'ছবি' কবিতা দিয়া তাহার আরম্ভ; সেখানেও প্রেরণা (inspiration) ছিল সম্পূর্ণ অতর্কিত আঘাত— নূতন পরিবেশে অত্যন্ত প্রিয়জনের প্রতিকৃতি অভাবনীয়ভাবে দেখা দিয়াছিল।

যাহাই হউক, আমাদের আলোচ্য পর্ব হইতেছে 'শেষ সপ্তকে'র গদ্যছন্দের পরের পর্ব। 'শেষ সপ্তক' শেষ হইয়াছে বৈশাখে। 'বীথিকা'র পর্ব শুরু হইয়াছে আষাঢ়ে চন্দননগর হইতে; সেখানেও পুরাতনের বিস্মৃত স্মৃতির আকস্মিক আঘাত এবং তাহার পর হইতেই এই কাব্যধারার উদ্‌ভব। শান্তিনিকেতনে সেই ধারায় কবিতা চলিতেছে।

আপনার বিচিত্র সৃষ্টি সাধনা ও বিশ্বভারতীর বিবিধ কর্মরচনায় কবি নিমগ্ন। এমন সময়ে একদিন টেলিগ্রাম আসিল কলিকাতায় দিনেন্দ্রনাথের অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে (৫ শ্রাবণ ১৩৪২)। এই সংবাদের জন্য কি কবি কি আশ্রমবাসী কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। গত বৎসর শ্রাবণ মাসেই দিনেন্দ্রনাথ আশ্রমের সঙ্গে সকলপ্রকার বৈষয়িক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া চলিয়া যান। এই শান্তিনিকেতনেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার সংগীতের অসামান্য প্রতিভা ছিল; কবি বহু দুঃখের মধ্যেও দিনেন্দ্রনাথকে কোনো দিন ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার স্বভাবের মধ্যে যে আর-একটা দিক ছিল, তাহা রাহুর ন্যায় মাঝে-মাঝে তাঁহাকে অভিভূত করিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা চিরদিন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-সংগীতের তিনি ছিলেন সাধক। 'ফাল্গুনী'র ভূমিকায় কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জন নহে। আজও দিনেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মন্দিরে সকলে সমবেত হইলে কবি যে ভাষণ দান করিলেন, তাহাও সেই ভাবনার স্বীকৃতি। কবি বলিয়াছিলেন—

"আমার কবি-প্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্দ্র। অনেকে এখান থেকে গেছেন, সেবাও করেছেন, কিন্তু তার রূপ নেই ব'লে ক্রমশ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের রূপ এ তো যাবার নয়— যত দিন ছাত্রদের সংগীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন চলবে, ততদিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হতে পারবে না, ততদিন তিনি আশ্রমকে অভিগত করে থাকবেন— আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভুলবার নয়।"[১]

কবির এখন যে বয়স ও মনের অবস্থা তাহাতে মৃত্যু-আদি ঘটনা তাঁহার কাছে সংবাদ মাত্র; মনকে যদিই বা ইহারা স্পর্শ করে উপরের স্তরকে ভেদ করিতে পারে না। তাই তাঁহার সৃষ্টিসাধনায় ছেদ পড়ে না; তবে বাহিরের এই-সব বিচিত্র আঘাত তাঁহার রচনার মধ্যে রেখাপাত করে কি না, তাহা সূক্ষ্মদৃষ্টি মনস্তাত্ত্বিকরা বিচার করিবেন।

শান্তিনিকেতনে শ্রাবণের শেষ দিকে যথারীতি 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হইল (৩০ শ্রাবণ ১৩৪২)। এই সময়ে চারিটি গান[২] রচিত হয়— ১। আজি বরিষনমুখরিত শ্রাবণ-রাতি ২। মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম ৩। জানি জানি, তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে ৪। কী বেদনা মোর জান সে কি তুমি জান।

কিছুকাল হইতে কবির শরীর খারাপ হইতেছে; এই গানগুলির মধ্যে দুঃখের সুর জাগিতেছে; আপনার 'স্মৃতি-বেদনার মালা একেলা' গাঁথিতেছেন। কিছুকাল হইতে নিঃসঙ্গতা তাঁহাকে মাঝে মাঝে বেদনা দিতেছে, তাহারই আভাস পাই গানগুলির মধ্যে।

১ মন্দিরে ভাষণ। ৫ শ্রাবণ ১৩৪২। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪২, পৃ ৬৫৭। দিনেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যা অমিতা সেন এই শিল্পী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন তাহা সমসাময়িক ছাত্রছাত্রীদের মনের চিত্র; প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪২, পৃ ৭২৩-২৭। দ্র. শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: দিনেন্দ্র-স্মৃতি (কবিতা), প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃ ১৮৫-৮৬; দ্র. শ্রীসুধীরচন্দ্র কর: গুণী দিনেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ১৩৩৬।

২ ১. ২১ শ্রাবণ। প্রতীক্ষা, বীথিকা। গীতবিতান, পৃ ৪৭২; ২. ২২ শ্রাবণ। অভ্যাগত, বীথিকা। গীতবিতান, পৃ ৪৭১; ৩. ২৩ শ্রাবণ। বাদল-সন্ধ্যা, বীথিকা। গীতবিতান, পৃ ২৮৯; ৪. ২৮ শ্রাবণ ১৩৪২। বাদল-রাতি, বীথিকা। গীতবিতান, পৃ ৯০৩।

কবির শরীর অসুস্থ বলিয়া স্থির হয় যে বর্ষামঙ্গলের উৎসবক্ষেত্রে তিনি আসিবেন না; কিন্তু জলসার মধ্যে হঠাৎ তিনি উপস্থিত হইলেন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল— শান্তিনিকেতনে থাকিয়া উৎসবে উপস্থিত না থাকা বা মন্দিরে উপাসনা না করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। সেদিনের আকর্ষণ ছিল আলাউদ্দীন খাঁর যন্ত্রসংগীত। আমাদের আলোচ্যপর্বে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ মাইহার রাজদরবারের সংগীতাচার্য ছিলেন। কবির আহ্বানে তিনি পুত্র আলি আকবর খাঁর সহিত পক্ষকাল আশ্রমে থাকিয়া যান। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা আয়াত আলি খাঁ সংগীতভবনের সহিত যুক্ত হন। তখন সংগীতের ক্লাস বসিত প্রাক্তন-ছাত্রদের পুরাতন গৃহে। হেমেন্দ্রলাল রায় ছিলেন সংগীত-বিভাগের অধ্যক্ষ।

'বর্ষামঙ্গল' জলসার কয়েকদিন পরে আশ্রমের যুবক অধ্যাপক ও কর্মীরা 'ভরসা-মঙ্গল' নাম দিয়া এক আনন্দ-কোলাহলের আয়োজন করেন। বর্ধমানের দামোদর-বন্যাক্লিষ্টদের সাহায্যদানের জন্য ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তরুণ অধ্যাপক ও কবির সেক্রেটারি শ্রীঅনিলকুমার চন্দ। 'হৈ হৈ সংঘ' কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'ভরসা-মঙ্গলে'র খবর পাইয়া উদ্যোক্তাদের অনুরোধে কবি তাহাদেরই উপযুক্ত গান রচনা করিয়া দিলেন।[১] গানগুলি হইতেছে এই— ১। কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানা দেবী (৪ ভাদ্র) ২। আমরা না-গান গাওয়ার দল রে, আমরা (৪ ভাদ্র) ৩। পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে (৬ ভাদ্র) ৪। ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ (৭ ভাদ্র)।

যুবকের দল গোরুর গাড়িতে চড়িয়া গানগুলি গাহিতে গাহিতে আশ্রম প্রদক্ষিণ করিল; সন্ধ্যার পর (৭ ভাদ্র ১৩৪২। ২৪ অগস্ট ১৯৩৫) 'ভরসা-মঙ্গলে'র জলসায় রথীন্দ্রনাথ হইতে কবি-সেবক সচ্চিদানন্দ (আলু রায়) সকলেই ভেদাভেদ ভুলিয়া অংশ গ্রহণ করেন। কবি দর্শকদের মধ্যে বসিয়া যুবকদের চপলতা আনন্দস্মিত মুখে উপভোগ করিতে লাগিলেন। শান্তিনিকেতনের এই একটি দিক ছিল যেখানে মেলামেশা ছিল ভেদহীন।

'বীথিকা'র[২] শেষ কবিতা লিখিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ (২৯ ভাদ্র ১৩৪২)। উন-শেষ কবিতা 'নিঃস্ব'

১ ভরসা-মঙ্গল, বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৪২, পৃ ২৮১-৮৪। দ্র. গীতবিতান, পৃ ৫৯৫-৯৭। গানগুলির রচনার মাঝে একদিন, ৫ ভাদ্র, মিলনযাত্রা (বীথিকা) কবিতাটি লেখেন। এই কবিতাটি পলাতকা কাব্যের কবিতা স্মরণ করায়।

২ চন্দননগরে রচিত— ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২, বিদ্রোহী; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৪৪। ৫ জ্যৈষ্ঠ, গীতচ্ছবি; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৪৬। ১৮ জ্যৈষ্ঠ, মিষ্টান্বিতা; প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৪৯। ২২ জ্যৈষ্ঠ, অবর্জিত; নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৯। ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ছুটির লেখা; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ২৯। ৩১ জ্যৈষ্ঠ, নিমন্ত্রণ; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ২৫। ১ আষাঢ়, [চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে কবিতা]। ৪ আষাঢ়, ছায়াছবি; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ২৩। ১০ আষাঢ়, নাট্যশেষ; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৩১। ১৩ আষাঢ় [শোভনার বিবাহ উপলক্ষে কবিতা]। [১৯ আষাঢ়, শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন।] ২৮ আষাঢ়, অতীতের ছবি; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৫। ২ শ্রাবণ, বিরোধ; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৬৪। ৯ শ্রাবণ, দুজন; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৯। ১৭ শ্রাবণ, মাটি; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৭। ১৮ শ্রাবণ, নমস্কার; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১১৬। ২০ শ্রাবণ, মেঘমালা; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৫৮। ২১ শ্রাবণ, প্রতীক্ষা (গান); বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৯৯। (গীতবিতান, পৃ ৪৭২। পাঠান্তর)। ২২ শ্রাবণ, অভ্যাগত (গান); বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১০৭ (গীতবিতান, পৃ ৯৪০। পাঠান্তর)। ২৩ শ্রাবণ, বাদল-সন্ধ্যা (গান); বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১০২ (গীতবিতান, পৃ ৯৪০। পাঠান্তর)। ২৬ শ্রাবণ, দেবতা; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১২০। ২৮ শ্রাবণ, বাদলরাতি (গান); বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১০৪ (গীতবিতান, পৃ ৮৯৭)। ২৯ শ্রাবণ, জয়ী; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১০৩। [৩০ শ্রাবণ, বর্ষামঙ্গল অভিনয়]। ৪ ভাদ্র, কাঁটাবনবিহারিণী [ভরসা-মঙ্গল]; গীতবিতান, পৃ ৫৯৬। ৫ ভাদ্র, আমরা না-গান-গাওয়ার দল রে [ভরসা-মঙ্গল]; গীতবিতান ৫৯৭। ৫ ভাদ্র, মিলনযাত্রা; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৭৪-৭৮। ৬ ভাদ্র, পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে [ভরসা-মঙ্গল]; গীতবিতান, পৃ ৫৯৫। ৭ ভাদ্র, ও ভাই কানাই, কারে জানাই [ভরসা-মঙ্গল]; গীতবিতান,

(২৭ ভাদ্র) লিখিত হয় স্থানিক চাহিদায়।[১] শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ও কর্মী শ্রীসুধীরচন্দ্র করের দ্বারা পরিচালিত 'রবীন্দ্র-পরিচয় সভা'র মুখপত্র হস্তলিখিত পত্রিকার জন্য এইটি লিখিত হয়।[২]

'বীথিকা'র পর্ব শেষ হইবার কয়েক দিন পর (১ আশ্বিন। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫) মৈমনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র তরুণ সুরশিল্পী শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর আশ্রমে আসেন। সন্ধ্যায় তিনি সংগীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ও সেতার শোনান। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন; জলসার শেষে তিনি বলেন যে, পারস্যে ও মিশরে তিনি যে-সব গান শুনিয়াছিলেন তাহাতে ভারতীয় সুরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। ভারতীয় সংগীতের বিদেশী পটভূমি সম্বন্ধে বীরেন্দ্রকিশোরের মতের কথা উল্লেখ করিয়া কবি বলিলেন যে, ভারত এককালে বাহির হইতে রস সংগ্রহ করিতে লজ্জাবোধ করে নাই; কিন্তু য়ুরোপীয় সংগীত সেভাবে এ দেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কবি বলেন যে, বাংলা দেশ য়ুরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান কলা শিল্প প্রভৃতিকে যেভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, পাশ্চাত্য সংগীতকে সেভাবে আত্মসাৎ করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহার কারণ, দুই সংগীত-ধারার প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক্‌। কবি বলেন, য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে বহু ভালো জিনিস আছে, ভারতীয় সংগীতকারগণ যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তাহা দুঃখের বিষয়।[৩] রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে প্রাচীন রীতির মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিবার বিরোধী; রবীন্দ্রসংগীত-বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি কত পাশ্চাত্য সুর তাঁহার গানের মধ্যে আনিয়াছেন। ধূর্জটিপ্রসাদকে সংগীত-বিষয়ক যে-সব পত্র লেখেন[৪] এখানে সেগুলি স্মরণীয়।

বীথিকার কবিতা লেখার মাঝে মাঝে 'বর্ষামঙ্গলে'র গান রচনা চলিতেছিল, তাহারই সঙ্গে ছিল উৎসবের জন্য মহড়া। ইহার মধ্যে অনুরোধ আসিয়াছিল 'সিংগী জৈন গ্রন্থমালা'[৫] সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের জন্য। কবি ১৬ শ্রাবণ (১ অগস্ট ১৯৩৫) এ বিষয়ে তাঁহার মত ব্যক্ত করিলেন। কবি কেন পত্র লিখিলেন, তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

১৯৩১ সালে আজিমগঞ্জের (মুর্শিদাবাদ) জৈন ধনিক বাহাদুর সিংগজি সিংগী তাঁহার পিতা দলচাঁদজি সিংগীর (মৃত্যু ১৯২৭) নামে 'সিংগী জৈন গ্রন্থমালা' প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৬] অতঃপর ১৯৩১-এ শান্তিনিকেতনে

পৃ ৫৯৭। ৮ ভাদ্র, মাটিতে-আলোতে; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১০৭। ১৪ ভাদ্র, কলুষিত; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৯৬-৯৮। ১৯ ভাদ্র, ঋতু-অবসান; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১১৪। ২০ ভাদ্র, মুক্তি; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১০৯। ২১ ভাদ্র, মূল্য; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১১৩। ২১ ভাদ্র, আশ্বিনে; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১১৮। ২২ ভাদ্র, শেষ; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১২১। ২৭ ভাদ্র, নিঃস্ব; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১১৯। ২৯ ভাদ্র, জাগরণ; বীথিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ১২২ [বীথিকার শেষ কবিতা]।

১ নিঃস্ব, ২৭ ভাদ্র ১৩৪২। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। দ্র. বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৪২, পৃ ৪২৩।

২ রবীন্দ্র-পরিচয় সভা বহুদিনের প্রতিষ্ঠান। ১৯৩১ সালে জয়ন্তীর সময় ক্ষিতিমোহন সেন 'জয়ন্তী উৎসর্গ' নামে গ্রন্থখানি উৎসবক্ষেত্রে রবীন্দ্র-পরিচয় সভার পক্ষ হইতে সমর্পণ করেন। এই সভা হইতে 'রবীন্দ্র-পরিচয় পত্রিকা' (হস্তলিখিত) প্রকাশিত হয়। দ্র. শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, রবিচ্ছবি (১৯৬১), পৃ ১৬৮-৬৯।

৩ *Visva-Bharati News*, October 1935, p 30।

৪ সুর ও সঙ্গতি।

৫ Singhi Jaina Series..Founded and patronised by Sriman Bahadur Singhji Singhi of Calcutta..in memory of his late father Sri Dalchandji Singhi..Founded 1931 A. D. General Editor—Jinavijaya Muni।

৬ "Babu Bahadur Singhji Singhi incidentally met the Poet Rabindranath Tagore and learnt of his desire to get a Chair of Jaina studies established in the Visvabharati, Santiniketan. Out of his respect for the Poet, Sjt. Bahadur Singhji readily agreed to found the desired Chair for three years and invited me [Jinavijaya

জিনবিজয় মুনি ও সুখলালজি অধ্যাপকরূপে আসেন। ইঁহাদের সঙ্গে বহু ছাত্র আসে, জৈন ছাত্রাবাস খোলা হয়। তিন বৎসর (১৯৩৩) এই প্রতিষ্ঠানটি চালু ছিল। ইহার পূর্বে ১৯২৭ সালে অমৃতসরের উমেদসিংহ মুচ্ছদিলালের দ্বারা বিশ্বভারতীতে জৈন গ্রন্থাগারের সূচনা হয়। সেই গ্রন্থসংগ্রহের নাম 'কেশরকুমারী জৈন পুস্তক সংগ্রহ' (১৯২৮ জুন)। মুচ্ছদিলালের অর্থ-সাহায্যে ১৯২৮ সালে কয়েক মাসের জন্য পণ্ডিত মথুরানাথজি শান্তিনিকেতনে আসিয়া থাকিয়া যান। ইহার পর ১৯৩১ সালে জিনবিজয় মুনি আসেন, ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত এখানে বাস করেন। এই সময়ে যে-সব গ্রন্থ তিনি সম্পাদন করেন, তাহা বিশ্বভারতীর কার্য বলিয়া প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই কথা স্মরণ করিয়া জিনবিজয় মুনির সাহিত্যিক কার্যের প্রশংসা করিয়া পত্র দেন। কবি লিখিতেছেন, "Most of the sacred books of the Jainas are securely locked up in monasteries scattered all over the country and access to them is extremely difficult, if not absolutely impossible. By his work, Prof. Jinavijaya Muni has rendered a considerable service to the cause of scientific research in the field."

স্লয়ড্ শিক্ষিকা

শারদাবকাশ (১ অক্টোবর - ১ নভেম্বর ১৯৩৫) আরম্ভ হইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একদিন শান্তিনিকেতনের কারু (স্লয়ড্) শিক্ষিকা সুইডিশ মহিলা মিস্ জিয়ানসন (Jeanson)-এর বিদায় উপলক্ষে এক পার্টি দেন; তাহাতে জিয়ানসনের ছাত্ররা ও আশ্রমের বিশিষ্ট কর্মীরা যোগদান করেন। জিয়ানসন শান্তিনিকেতনে একবৎসর সুইডিশ পদ্ধতিতে বয়ন-শিল্প শিক্ষা দিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তাঁহার স্থলে সুইডেন হইতে মিস্ সেডারব্লম (Cederblom) স্লয়ড্ শিক্ষিকারূপে অনতিকালের মধ্যে আসিতেছেন।

সুইডেন হইতে এই দুই মহিলার শান্তিনিকেতনে আসিবার ইতিহাস আছে। সেটি এখানে বিবৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইঁহাদের আগমনের সর্ববিধ ব্যবস্থা করেন তৎকালে সুইডেনপ্রবাসী লক্ষ্মীশ্বর সিংহ[১]।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গে যে-সব বালক সরকারী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া নূতন আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হয় লক্ষ্মীশ্বর সিংহ তাহাদের অন্যতম। শ্রীনিকেতনে এল্‌ম্‌হার্স্ট-প্রবর্তিত গ্রামসংগঠন-কার্য তরুণ লক্ষ্মীশ্বরকে আকর্ষণ করিয়া আনে। গ্রামের কাজের সঙ্গে সঙ্গে অবসর সময়ে কাসাহারা নামে জাপানী কারুদক্ষের নিকট তিনি কাঠের কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন; ইতিপূর্বে নিজ গৃহে ও 'জাতীয় বিদ্যালয়ে' তাঁহার কাঠের কাজের হাতে-খড়ি হইয়াছিল। শ্রীনিকেতনে তখনো কাঠের কাজ শিক্ষণীয় বিষয় হয় নাই; তাঁতের কাজ ও চামড়া সাফাই (tannery) ছিল প্রধান; কর্মকর্তারা বীরভূমের তাঁতি, জোলা ও রবিদাসদের সমস্যাকে তখন একান্ত করিয়া দেখিতেছিলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আদেশে লক্ষ্মীশ্বর শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের কাঠের কাজ শিখাইবার জন্য নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি 'কাঠের কাজ' নামে একখানি বই লেখেন (১৯২৫); বাংলাভাষায় হাতে-কলমে কাঠের কাজ শিখিবার ও শিখাইবার বই এই বোধ হয় প্রথম বাহির হয়। কারুশিল্পকে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত করিবার ইচ্ছা

Muni] to take charge of the same. I accepted the offer very willingly and felt thankful for the opportunity of spending even a few years in the cultural and inspiring atmosphere of Visvabharati, the grand creation of the great Poet Rabindranath" (p 3)।

১ ইনি এখন বিশ্বভারতীর বিনয়ভবন বা শিক্ষণ-কলেজের কারু অধ্যাপক।

লক্ষ্মীশ্বরের প্রবল ; তিনি সিউড়িতে বঙ্গীয়সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে 'মানবসভ্যতায় হাতের কাজের প্রভাব' নামে এক প্রবন্ধে তাঁহার মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।[১]

লক্ষ্মীশ্বরের বাংলা বইখানি লিখিবার উদ্দেশ্য— ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়াও যাহাতে কাঠের কাজ সহজে করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থখানি দেখিয়া খুশি হন এবং উহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। শিক্ষার মধ্যে যে সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়াছে, ভূমিকায় কবি সে কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলেন। "আমাদের মতে পঙ্গুতাই ভদ্রসমাজের লক্ষণ, হাতপাগুলোকে অপটু করিয়া তুলিলেই ভদ্রতা পাকা হয়। ইহার ক্ষতি যতদিন বুঝিতে পারি নাই ততদিন বাঙালি ভদ্রসন্তানের একমাত্র মোক্ষলাভ ছিল কেরানীতীর্থে। সেখানে জায়গার টানাটানি ঘটিতেই দেখা গেল তাহার মতো অসহায় প্রাণী আর জীবলোকে নাই। সংসার-সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার নৌকাডুবির পালা। সেই সংকটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুই দিকেই শক্ত হইতে হইবে এই তাগিদ আসিয়াছে। এই শুভদিনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 'কাঠের কাজ' বইখানি লিখিয়াছেন, ভদ্রলোকের ভয়ে 'ছুতারের কাজ' নাম দিতে পারেন নাই। যাহার হাত দুটো কর্মিষ্ঠ নয়, হাতের দিকে সে মূঢ়, তা হোক না সে নামজাদা, বা পণ্ডিত-বংশের কুলতিলক। দেশের এই-সব বোকা হাতের মানুষকে শিক্ষিত হাতের মানুষ করিবার অভিপ্রায়ে এই যে বইখানি লেখা, ইহা বাঙালির ঘরে এবং বিদ্যালয়ে আজকাল আদর পাইবে বলিয়া আশা হইতেছে।"[২]

ভদ্রলোকের শিক্ষার পূর্ণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অন্য পটভূমে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয়। তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে ভদ্রলোকের ছেলেদের কিয়ৎপরিমাণে 'ছোটোলোক' ও 'ছোটোলোক'কে কিয়ৎপরিমাণে ভদ্রলোক করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে। তথাকথিত 'ভদ্রলোক' ও তথাকথিত 'ছোটোলোকে'র মধ্যে তফাত হইতেছে যে একজন নিজ হাতে কাজ করেন না, আর-এক জন স্বহস্তে নিজের ও ভদ্রলোকদের কাজকর্ম করে। এই বিষয়ে মহামতি রাস্কিনের (Ruskin) কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্মরণীয়— "আমরা আজকাল সব সময়েই বিদ্যাবুদ্ধি ও হাতের কাজকে পৃথক করে দেখে থাকি। একজন কেবল সব সময় চিন্তার কাজ করবে, আর-একজন সারাক্ষণ খাটবে ; তাদের একজনকে বলব ভদ্রলোক, অন্যজনকে বলব হুকুমের চাকর ; কিন্তু উচিত হচ্ছে যে, শ্রমিক যে সেও কিছু সময় ভাববে এবং যে ভাবুক সেও তেমনি কিছু সময় গায়ে খাটবে। এই করে ঠিক যাকে ভদ্রলোক বলা যায়, দুজনেই তাই হবে। কিন্তু আমরা দুজনকেই অভদ্র করে তুলবার আয়োজন করছি ; একজন আর-একজনকে হিংসা করছে, অন্যজনও তার ভাইকে ঘৃণা করছে এবং এর দ্বারা মানুষের গোটা সমাজটাই কতকগুলি অসুস্থমন ভাবুক এবং দুর্গত শ্রমিকে ভরে উঠল।"[৩]

বিশ্বভারতী-পর্বের পূর্বেও শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম যুগে ছাত্রদিগকে কারুশিল্প ও বিশেষভাবে কাঠের কাজ শিখাইবার চেষ্টা বহুবারই হয় ; সে কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। তবে উপযুক্ত শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি কিনিবার অর্থাভাবে কারুশিল্প স্থায়ীভাবে চালু হয় নাই। শ্রীনিকেতনে গ্রাম-উদ্যোগের কেন্দ্র স্থাপিত হইলে

১ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩২। ইহার ইংরেজি রূপ 'Educational Value of Manual Training in Human Culture' নামে প্রবন্ধ অশোক চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত অধুনালুপ্ত *Welfare* পত্রিকার ১৯২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২ কাঠের কাজ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৩৩২। দ্র. Laksmiswara Sinha, *Education and Reconstruction*, Santiniketan Press, 1953.

৩ Quoted by Laksmiswara Sinha in his *Education and Reconstruction*, p 21। অনুবাদ, শ্রীসুধীরচন্দ্র কর, 'সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা', শিক্ষাব্রতী, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ ২৯৮-৯৯। দ্র. Ruskin, *Unto This Last*, 1862.

গ্রামের বেকার বয়স্কদের মধ্যে গৃহশিল্প-প্রবর্তনের প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ ক্রমশই অনুভব করিতেছিলেন। 'ইন্ডাস্ট্রি' বা শিল্পশিক্ষার সূত্রপাত হয় এই তাগিদে; কালে শ্রীনিকেতনে শিল্পভবন গড়িয়া উঠে ইহারই উপর। সাধারণ পঠন-পাঠন-রত বালকদের শিক্ষার সঙ্গে কারুশিল্প-প্রবর্তনের চেষ্টা হয় শান্তিনিকেতনে; কারুশিল্প-রত বালকদের শিক্ষার সঙ্গে পঠন-পাঠন প্রবর্তিত হয় 'শিক্ষাসত্রে'; আমরা গান্ধীজির ওয়ার্ধা-শিক্ষাপ্রণালী আলোচনাকালে 'শিক্ষাসত্র' সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিব।

তিন বৎসর শান্তিনিকেতনে কাজ করিয়া লক্ষ্মীশ্বর সিংহ হস্তশিল্পে পারদর্শী হইবার জন্য বিদেশে যাইতে উৎসুক হন; প্রথমে তিনি জাপান যাইবেন ঠিক করেন। রবীন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়া লক্ষ্মীশ্বরকে সুইডেনে যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন; কবি তাঁহাকে বলেন বৈজ্ঞানিকভাবে কারুশিল্প আয়ত্ত করিতে হইলে সুইডেনের Sloyd পদ্ধতি শিক্ষা করা উচিত। কবির নির্দেশেই লক্ষ্মীশ্বর ১৯২৮ মার্চ মাসে সুইডেন যাত্রা করেন। এ কথা লক্ষ্মীশ্বরের নিকট হইতে শোনা।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীশ্বরকে যে Sloyd শিক্ষাপদ্ধতি আয়ত্ত করিতে বলিলেন, তাহা কী, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার।

শিক্ষাক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক ফিন্ল্যান্ডের শিক্ষাব্রতী Cygnaeus[১]। বলা বাহুল্য তৎপূর্বেও শিক্ষাশাস্ত্রীরা শিশুদের শিক্ষার সঙ্গে কারুশিল্প-প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। ফিন্ল্যান্ডে এই শিক্ষাপদ্ধতি এতই প্রশংসিত হইতে লাগিল যে অবশেষে তথাকার গভর্নমেণ্ট গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের পক্ষে এই শিক্ষা আবশ্যিক বলিয়া ঘোষণা করেন।

ফিন্ল্যান্ড হইতে সুইডেন ও সুইডেন হইতে রাশিয়া এবং সেখান হইতে আমেরিকায় এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাবিধি প্রচারিত হয়। তবে সুইডেনেই স্লয়ড্ যথার্থ বৈজ্ঞানিক রূপ গ্রহণ করে। সামাজিক কারণে সুইডেনে এই পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে জনাদর লাভ করে। যান্ত্রিক শিল্পের প্রভাবে ও প্রতাপে গৃহস্থঘরের কারুশিল্প প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; শিক্ষার মাধ্যমে এই কারুশিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হইল গত শতাব্দীর মধ্যভাগে। এই আন্দোলনের নেতা Otto Salomon (১৮৪৯-১৯০৭) স্লয়ড্[২] স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার।

স্লয়ডের মূল কথা হইতেছে প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে সুন্দর করিয়া নির্মাণ করিতে হইবে। সলোমনের আর-একটি উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্ররা ব্যাবহারিক শিল্পসামগ্রী রচনার মধ্য দিয়া শ্রমের মর্যাদা, কর্মকুশলতা ও ব্যক্তিত্ববোধ অর্জন করিবে, সৃষ্টিমূলক কাজে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিবে। য়ুরোমেরিকার একদল শিক্ষাব্রতী মনে করেন যে, কারুশিল্পের মাধ্যমে ছাত্রদের মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইবে; অনেকেরই ধারণা স্লয়ড্ পদ্ধতি শিক্ষাবিধির চরম দান। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে।[৩]

১ The idea of constructive activities formulated by Froebel was taken up by Uno Cygnaeus (1810-88), the father of the Finnish school system, Cygnaeus's advocacy of handwork as a form of educational expression made hosts of friends and in 1866 the Finnish Government gave his idea its official blessing by making some form of manual training compulsory for boys in rural schools as well as in the training of its male teachers. From Finland the movement crossed the border to its Scandinavian neighbour, Sweden.—Meyer, pp 28-29.

২ Sloyd, সুইডিশ শব্দ, ইংরেজি sleight, দক্ষতা অর্থে। P. E. Lindstrom: Educational Sloyd. See *Sweden Historical and Statistical Handbook*, Edited by T. Guinchard, 2nd Ed. Stockholm, 1914, Vol. 1. pp 360-64।

৩ Adolph F. Meyer, *The Development of Education in the Twentieth Century*; Prentice Hall, 1951, pp 28-29।

এই স্লয়ড্ শিক্ষাবিধির অন্তর্গত কাঠের কাজ, কার্ডবোর্ড কাজ ও ধাতুর কাজ শিক্ষা করিয়া তিন বৎসর পর লক্ষ্মীশ্বর দেশে ফিরিয়া আসেন ; ইনি Naas Institute -এর শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হইতে ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন।[১]

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে লক্ষ্মীশ্বর শান্তিনিকেতনে কারুশিল্পের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষার্থীদের স্লয়ড্ পদ্ধতি (কার্ডবোর্ড) কার্য শিক্ষা দিবার জন্য 'মুকুট' ঘরে আয়োজন হইল। বয়স্কদের লইয়া শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা হয়, উদ্দেশ্য—তাঁহারাই যাহাতে ভবিষ্যতে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। নূতনত্বের উৎসাহে আশ্রম-বাসীদের অনেকেই কার্ডবোর্ড কাটিয়া নানাপ্রকার সামগ্রী বানাইতে লাগিয়া গেলেন।[২] আরিয়াম ও আশা দেবী উৎসাহী ছাত্র ছিলেন ; ইঁহাদের নাম বিশেষভাবে কেন করিলাম যথাস্থানে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন।

জনৈক সমসাময়িক ব্যক্তি লিখিতেছেন, "Not that we did not have handcrafts before—indeed, Rabindranath has all along insisted on their being included in the Asrama activities—but lately, thanks to our friend Laksmiswara Sinha, a new life has been put in the work of the hands . ."[৩]

কিন্তু লক্ষ্মীশ্বর শান্তিনিকেতনে কয়েকমাস মাত্র থাকিয়া পুনরায় সুইডেন যাত্রার আয়োজন করিলেন। শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজ শিক্ষার জন্য অর্থাভাব খুবই। লক্ষ্মীশ্বর স্থির করিলেন সুইডেনে গিয়া তিনি অর্থের ব্যবস্থা ও উপযুক্ত লোক প্রেরণেরও ব্যবস্থা করিবেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার মনোগত ভাব বলিলে তিনি লক্ষ্মীশ্বরের হাতে কয়েকখানি পত্র দিলেন ; তাহাতে তিনি বলেন যে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা শান্তিনিকেতনে নিখিল ভারত স্লয়ড্ শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। বিখ্যাত সুইড পর্যটক সোয়েন হেডিন[৪] (Sven Hedin)-কে কবি এ বিষয়ে পত্র দেন (২৬ এপ্রিল ১৯৩৩)। সাধারণভাবে যে পত্রখানি প্রচারের জন্য লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল :

"I am glad to record that Mr. L. Sinha has been successful in introducing the Sloyd system in our manual work department, Visvabharati, Santiniketan, after having studied this system in Sweden for over two years. His work here is daily gaining ground and has already proved its efficiency both for young students and the men and women workers in our Institution. It is our idea to open here an All-India Centre for the study of Sloyd but owing to lack of funds we are not able to develop this work according to our expectation.

১ **Naas Sloyd larar seminarium (Naas Sloyd Training College) was founded by August Abrahamson (1817-98) in 1874. Otto Salomon (1849-1907) was the Superintendent of the College from the start and he it was that devised or evolved the Swedish Educational Sloyd System the so-called Naas System and created the Naas Sloyd Training College.—Laksmiswara Sinha, 'Sloyd in the sphere of Education', *Modern Review*, June 1932 ; also reproduced in his *Education and Reconstruction*.**

২ আশ্রমের ছাত্র ও অন্যান্য অধিবাসী ও অধিবাসিনীদিগকে তাঁতের কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয় বহু পূর্বে। কবি ১৩২৬ সালের পূজাবকাশে আসাম-ভ্রমণে গিয়াছিলেন ; সেখানে অসমিয়া মেয়েদের বয়নশিল্পের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়া তিনি আশ্রমের জন্য একজন অসমিয়া মহিলা শিক্ষিকা আনেন ; ইনি মেয়েদের তাঁতের কাজ শিখাইতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে শ্রীরামপুর হইতেও একজন শিক্ষিত তাঁতিকে আনানো হয়। (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩২৬, পৃ ৮) কিন্তু দীর্ঘকাল কোনোটিই চালু থাকে নাই।

৩ ***Visva-Bharati News*, November 1932, p 35 ; quoted also in Sinha's *Education and Reconstruction*. p 61 ।**

৪ **Sven Hedin, *Stromän och Kungar*, Fahlcrantz & Gumaelius, Stockholm, 1950, p 357-58 ।**

"Mr. Sinha believes that in view of the success already achieved here in introducing the Sloyd and its great usefulness for our country, it will be possible for him to find adequate response in Sweden itself to maintain a work like this which will be of permanent value and link up Sweden and India in ties of closer collaboration. Nothing could be more welcome to me than such beneficial cooperation between these two countries and, I eagerly look forward to gesture of help from a country which I love and honour so much.

"Mr. Sinha goes to Sweden with our good wishes and it is my sincere hope that he will be helped in obtaining resources and necessary equipment for establishing this much-needed work in India in a permanent work." (MSS)

রবীন্দ্রনাথের পত্রাদি লইয়া লক্ষ্মীশ্বর সুইডেনে গিয়া শান্তিনিকেতনে স্লয়ডশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রে তাঁহার সহিত কাউন্টেস হ্যামিলটন[১] (Hamilton) নামে এক সম্ভ্রান্ত সুইড্ মহিলার পরিচয় হয়। কয়েক শত বৎসর পূর্বে হ্যামিলটন পরিবার স্কটল্যান্ড হইতে সুইডেনে আসেন এবং এখন ইঁহারা সর্বতোভাবে সুইড্। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সুইডেন যান, সে সময়ে কাউন্টেস হ্যামিলটনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার কথা জানিতে পারিয়া কাউন্টেস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শান্তিনিকেতনে স্লয়ড্ শিক্ষিকা পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই ব্যবস্থায় জিয়ানসন ও সেডারব্লম আশ্রমে আসেন। ইঁহাদের ব্যয়ভার তিনিই বহন করিয়াছিলেন। এই দুই শিক্ষিকা বয়নশিল্প-পারদর্শী। লক্ষ্মীশ্বর বহু চেষ্টা করিয়া বন্ধুবান্ধব-মহল হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সুইডিশ লুম (তাঁত) ও বয়নশিল্পের বিবিধ সরঞ্জাম ক্রয় ও সংগ্রহ করেন; এবং এক সুইড্ জাহাজ কোম্পানির পরিচালকের সহায়তায় ঐ-সব জিনিসপত্র বিনা মাশুলে ও মিস্ জিয়ানসনকে বিনা ভাড়ায় কলিকাতা বন্দরে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করেন।

প্রথম স্লয়ড্ শিক্ষিকা মিস জিয়ানসন শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯৩৪-এর শেষ দিকে; এক বৎসর থাকিয়া ১৯৩৫-এর শেষ ভাগে দেশে ফিরিয়া যান। ইঁহার কর্মকেন্দ্র ছিল শান্তিনিকেতনে; নাট্যঘরকে কর্মশালায় রূপান্তরিত করা হয়। ইঁহার নিকট হইতে শান্তিনিকেতনের অনেকেই বয়নশিল্প শিক্ষা করেন; তাঁহাদের মধ্যে কলাভবনের কয়েকজন ছাত্রী ও বিশেষভাবে শ্রীসন্তোষচন্দ্র ভঞ্জ এই কারুকলাকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। পরে সন্তোষচন্দ্রই সুইডিশ বয়নধারা চালনা করিয়া আসিতেছেন।

মিস্ জিয়ানসন শারদাবকাশ আরম্ভ হইলে দেশের দিকে যাত্রা করেন; তৎপূর্বে তাঁহার প্রতি প্রীতিজ্ঞাপনার্থে কবি যে প্রীতি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন, তাহার কথা দিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদের আরম্ভ করিয়াছি। কবি এই সময়ে কাউন্টেস হ্যামিলটনকে মিস্ জিয়ানসন সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"Miss Jeansen would be leaving us soon and I shall be failing in my duty if I did not tell you how much we have appreciated her quiet, unostentatious, good work. She has already laid the foundation of the department quite well and I am sure it will go on flourishing under the able guidance of Miss Cederblom, whom I understand from a letter from Mr. Sinha— you are sending out to us. Our gratitude to you is immense and it will

১ কাউন্টেস হ্যামিলটন বিশ্বভারতীর আজীবন সদস্য হন ১৯৩৬ সনে।

give you pleasure to know that your kindness and beneficence has been deeply appreciated by my countrymen."

মিস্ জিয়ানসন চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে আসিলেন মিস্ সেডারব্লম। এই মহিলা সম্বন্ধে কাউন্টেস কবিকে লিখিতেছেন (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫)— "This time we have had the great luck to send— what I consider to be— the ideal worker for your school. Miss Cederblom is a great friend of mine, and I am sure you all will like her as she is a personality and an idealist full of enthusiasm, good ideas and energy."[১]

সত্যই সেডারব্লমের ন্যায় শীতের দেশের বাসিন্দার স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা, উৎসাহাতিশয্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কর্মী ও কর্মকর্তাদের পক্ষে প্রথম প্রথম সামলানো কঠিন হয়।[২] অদ্ভুতকর্মা এই-সব মহিলা যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহার যথাযথ মূল্য নিরূপিত হয় নাই। ইঁহাদের শিক্ষাদানের ফল যে কী হইয়াছে তাহা যাঁহারা গত বিশ বৎসর শ্রীনিকেতনের শিল্পভবনে বয়ন-বিভাগের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই জানিবেন। বাংলাদেশের নানা স্থানে এইখানকার শিক্ষিত তন্তুশিল্পীরা ছড়াইয়া গিয়াছে; ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।

শান্তিনিকেতনে কবির নিখিল ভারত স্লয়ড্ শিক্ষাগার স্থাপনার পরিকল্পনা ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ১৯৩৭ সালের গোড়ায় লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বিদেশ হইতে ফিরিয়া বিশ্বভারতীর কার্যে যোগদান করিলেন; কিন্তু এবার তাঁহার কর্মকেন্দ্র করা হইল শ্রীনিকেতনের শিল্পভবনে। নানা কারণে সেখানে তাঁহার পক্ষে থাকা সম্ভব হইল না। ১৯৩৭-এর শেষভাগে মহাত্মাজি প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম খসড়া বাহির হইলে লক্ষ্মীশ্বর বুঝিলেন এই কর্মকেন্দ্রিক জ্ঞানকে দেশের শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে হইলে মহাত্মাজির শিক্ষা-পরিকল্পনার সহিত সহযোগিতা প্রয়োজন। ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসে তিনি ওয়ার্ধার শিক্ষাকেন্দ্রে চলিয়া গেলেন।

কবির নিখিল ভারত স্লয়ড্ শিক্ষাগারের পরিকল্পনা সরাসরি রূপ না লইলেও, বিশ্বভারতীর কারুশিল্পে ও বিশেষভাবে বয়নশিল্পে এই স্লয়ড্ শিক্ষার ছাপ রহিয়া গিয়াছে; বয়নশিল্পে বিশ্বভারতী নূতন ভাবের পথিকৃৎ হইয়াছে।

মিস্ সেডারব্লম শান্তিনিকেতনে থাকিবার কালেই কাউন্টেস হ্যামিলটন তাঁহার পুত্রকে লইয়া এখানে আসিলেন (১৯৩৬)। তিনি ভারতভক্ত; একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি স্বদেশেই সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের নিকট ভারতীয় সাধকদের বাণী শ্রবণ করেন; সংস্কৃত হইতে শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন করিলেন দুর্গাপ্রসাদ পাণ্ডে নামক অধ্যাপকের নিকট। তিন মাস আশ্রমে বাস করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন। কাউন্টেস কবি ও ক্ষিতিমোহন সেনকে কী শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা তাঁহার পত্রাবলী হইতে জানা যায়। ক্ষিতিমোহনের নিকট হইতে তিনি যে আধ্যাত্মিক বল সংগ্রহ করেন তাহার কথা তিনি এখনও বিস্মৃত হন নাই।[৩] দেশে ফিরিয়া গিয়া কাউন্টেস কবিকে লিখিয়াছিলেন (২৫

১ MSS. রবীন্দ্র-সদন।

২ ভারতে আসিবার সময় সেডারব্লম কলম্বো পর্যন্ত জাহাজে আসিয়া নিজের মোটরবোটে বঙ্গোপসাগর দিয়া কলিকাতায় যাত্রা করেন। কিন্তু পথে বহু বিপদে পড়েন; একখানি সমুদ্র-জাহাজ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া মাদ্রাজে পৌঁছাইয়া দেয়। তখনো তাঁহার 'শিক্ষা' হয় নাই, পুনরায় মোটর-বোটে যাত্রা করেন; কিন্তু বিশাখাপত্তন পর্যন্ত আসিয়া আর সম্ভব হয় না দেখিয়া ট্রেনযোগে এখানে আসিলেন। ১৯৩৮ সালে এপ্রিল মাসে দেশে সেই মোটর-বোটে করিয়া ফিরিতে গিয়া পুনরায় বিপদে পড়েন। (*The Statesman*, 10 May 1938) দ্র *Visva-Bharati News*, June 1938. p 95।

৩ কাউন্টেস হ্যামিলটন আচার্য ক্ষিতিমোহনের নিকট হইতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা দীর্ঘ পনেরো

এপ্রিল ১৯৩৬) — "I was so happy in Santiniketan! It was the happiest time in my life and I have left a great part of my heart there. But my longing for you and Kshiti Babu is so great that I can't help crying. To love is to suffer. But it is better to suffer than to be unable to love."[১] অন্যদিন লিখিতেছেন, "I met you in my dream, and I felt happy. A part of my soul is still living in India, and daily my thoughts wander back to you and my teacher."[২] কবির ৭৯তম জন্মদিনে কাউন্টেস যে পত্র দেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্‌ধৃত হইল : "Today is your birthday and therefore my thoughts are near you wishing that they could reach you with their warmth and love . . Gurudeva, if we can avoid a new war, may I then come to Santiniketan for a few months in your winter time? I have reached that point when all my friends say, that I must go away for a time and take rest and the only place I long for with my whole soul is Santiniketan. There are you and my teacher and you are the only one that could help my empty, dry and tired soul. It is a shame that I cannot alone help myself back to the realm of peace and bliss— but I cannot . .

"But my failure does not depend upon the work and the many sufferings and so on. It depends upon that my heart is so bitterly filled with hatred feelings towards the cruel system that has created those innumerable sufferings. It is impossible to live in peace with feeling of hatred.

"May I come for a little time to rest and recover new strength for my work?"

পূজাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইবার সময় আসিয়া গেল। ছুটির পূর্বে শান্তিনিকেতনে ছাত্র-অধ্যাপকে মিলিয়া কিছু-না-কিছু অভিনয় করার রেওয়াজ বহুকালের। স্থির হইল 'শারদোৎসব' অভিনয় হইবে। মহড়া কবির সম্মুখেই হয়। তাঁহার শরীর অশক্ত, হাঁটিতে চলিতে কষ্ট হয়— তৎসত্ত্বেও স্বয়ং সন্ন্যাসীর ভূমিকায় নামিলেন। অভিনয়কে হাস্যোজ্জ্বল করিবার জন্য জনতার দৃশ্যে 'গেছোবাবা'র কথা অবতারণা করেন। এই অংশ এখন 'সে'র অন্তর্গত। অভিনয় হইয়াছিল গ্রন্থভবনের সম্মুখে।

পত্রপুটের পর্ব

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে (১ অক্টোবর - ১ নভেম্বর ১৯৩৫) কবি কোথাও নড়িলেন না। দিন কাটে কবিতা লিখিয়া, ছবি আঁকিয়া, পত্র লিখিয়া, পড়েনও অনেক। একদিন গিয়া দেখি নন্দলাল বসুর সহিত Epstein-এর আর্ট সম্বন্ধে সদ্যপ্রকাশিত একখানি গ্রন্থ লইয়া আলোচনা হইতেছে। আর-একদিন দেখি *Architecture of the Universe* নামে অতি আধুনিক বিজ্ঞানের বই পড়িতেছেন; অন্যদিন দেখি Eskimoদের সম্বন্ধে নূতন

বৎসরে ম্লান হয় নাই। তিনি ক্ষিতিমোহনকে গুরু ও বন্ধু বলিয়া পত্রমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন : ক্ষিতিমোহন সেনকে লিখিত কতকগুলি পত্র আমরা দেখিয়াছি।

১ MSS. রবীন্দ্র-সদন।

২ MSS. ২৪ জুন ১৯৩৬। রবীন্দ্র-সদন।

একখানি গ্রন্থ অভিনিবেশ-সহকারে পাঠে রত। কবি যে কত রকমের বই পড়িতেন তাহার সংবাদ বাহিরের লোকের জানা নাই এবং জানাও সম্ভব নহে।[১]

বাংলা বই পড়েন মাঝে মাঝে, দুই-একটির সমালোচনাও লেখেন। বুদ্ধদেব বসুর 'বাসরঘর' পাঠ করিয়া তাঁহার মন্তব্য পত্রযোগে জানান।[২] মহেন্দ্রনাথ সরকারের *Eastern Lights* পড়িয়া যে পত্র দেন তাহাও বোধ হয় এই সময়ের লেখা।[৩]

রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়নশীলতা সম্বন্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যাহা কিছুকাল পরে রেডিও মারফত ব্যক্ত করেন তাহা হইতে আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারি। তিনি লিখিতেছেন, "তাঁকে সবাই কবি বলেই জানে। তিনি যে কিরূপ পণ্ডিত, ও কত রকমের বই তিনি পড়েছিলেন, তা লোকে জানে না। তাঁর কবিত্ব-খ্যাতি না থাকলে পাণ্ডিত্য-খ্যাতি রটত।" রামানন্দবাবুর এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি লিখিতেছেন, "১৯২৬ সালে অক্টোবর মাসে ভিয়েনায় তিনি [কবি] যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তাঁকে শুয়ে শুয়ে কত বই-ই যে পড়তে দেখেছিলাম, বলতে পারি না।.. হোমিওপ্যাথির বড় বড় বই তিনি দস্তুরমত অধ্যয়ন করেছিলেন, বায়োকেমিক চিকিৎসাও ভালো জানতেন। চিকিৎসা করতেনও ভালো। কখনো কখনো রহস্য করে বলতেন, আমি ফী নেই না ব'লে আমার প্রশংসা বা পসার হয় নি।"[৪] কবি কত বিষয় সম্বন্ধে বই পড়িতেন তাহার তালিকা এই ভাষণে আছে।

আপন মনে লেখাপড়া করেন, বাহিরের কাজকর্মে আহ্বান কম, মনে ভাবেন চুপচাপ থাকিবেন কিন্তু পারেন না— নানারূপ আলোচনার মধ্যে জড়াইয়া পড়েন। এই সময়ে হিন্দুসমাজের এক শ্রেণীর লোকের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় কবিকে তীব্র সমালোচনা সহিতে হয়। পূজাবকাশের পূর্বে রাজস্থান জয়পুর-নিবাসী রামচন্দ্র শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক মন্দিরে জীববলি বন্ধ করিবার জন্য কালীঘাটের কালীমন্দিরে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন; কিন্তু কোনো দিক হইতে তিনি কোনো সহানুভূতি পাইলেন না। রবীন্দ্রনাথ যুবকের অনশন-পণের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার উদ্দেশে আশীর্বাদপূর্ণ এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন।[৫] হিন্দু-পাব্‌লিকের একাংশ এই বিষয়ে কবির বাণী দানে আদৌ প্রীত হইতে পারে নাই।

এক শ্রেণীর সাংবাদিক বলিলেন যে, হিন্দুধর্ম-বিষয়ে মতামত দানে রবীন্দ্রনাথ অনধিকারী, তিনি চিরদিনই হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকর্মবহুল ধর্মের নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। তা ছাড়া, তাঁহারা বলিলেন, জয়পুরী ব্রাহ্মণের নৈতিক জুলুম বাঙালি মানিবে না। রবীন্দ্রনাথ তো চিরদিনই নৈতিক চাপের বিরোধী, আজ কেন তিনি তাহা সমর্থন করিতেছেন। আমাদের কথা, রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে জীববলির বিরোধী আজ নূতন করিয়া হন নাই— রাজর্ষি ও পরে বিসর্জন[৬]-এর মধ্যে তিনি তাঁহার মত খুব স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

কবি প্রবীণ সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে জীববলি সম্বন্ধে যে পত্র[৭] দেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্‌ধৃত

১ দ্র জয়ন্তী-উৎসর্গ; অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, কবি সার্বভৌম।
২ পত্র, ২৫ অক্টোবর ১৯৩৫। বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃ ৪৫৬।
৩ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃ ২৯৩।
৪ ২৫ বৈশাখ ১৩৪৫। রেডিও ভাষণ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫।
৫ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪২, পৃ ৮৭০। অপিচ দ্রষ্টব্য কার্তিক ১৩৪২, পৃ ১২০। এখানে চতুর্থ স্তবক সংযোজিত।
৬ Miss Rachel S. Jeffry, artist and social worker, Scotland, শান্তিনিকেতন ঘুরিয়া গিয়া কবিকে যে পত্র দেন তাহার মধ্যে আছে—" . . you dedicated your English version of 'Sacrifice' to 'those heroes who bravely stood for peace when human sacrifice was claimed by the Goddess of War.' I particularly welcome this dedication."—*Visva-Bharati News*, February 1936, p 61।
৭ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত পত্র, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫; প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪২, পৃ ১২১। অপর একখানি পত্র অন্যকে লেখা, হেমেন্দ্রপ্রসাদকে তাহার প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেন; সে পত্রখানি লিখিত হয় ২৪ ভাদ্র (১০ সেপ্টেম্বর)। ১৯৫২ সালে রামচন্দ্র শর্মা পুনরায় বলিবন্ধের জন্য অনশন আরম্ভ করেন।

করিলাম : "শক্তিপূজায় এক সময়ে নরবলি প্রচলন ছিল, এখনও গোপনে কখনো কখনো ঘটে থাকে। এই প্রথা এখন রহিত হয়েছে। পশুহত্যাও হবে এই আশা করা যায়।" অন্য পত্রে লিখিয়াছিলেন, "জনসাধারণের মধ্যে চরিত্রের দুর্বলতা ও ব্যবহারের অন্যায় বহুব্যাপী, সেইজন্যে শ্রেয়ের বিশুদ্ধ আদর্শ ধর্মসাধনার মধ্যে রক্ষা করাই মানুষের পরিত্রাণের উপায়। . . নিজের লুব্ধ ও হিংস্র প্রবৃত্তিকে দেবদেবীর প্রতি আরোপ ক'রে তাকে পুণ্য শ্রেণীতে ভুক্ত করাকে দেবনিন্দা বলব। এই আদর্শ-বিকৃতি থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে যিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রবৃত্ত তিনি তো ধর্মের জন্যেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত। . . রামচন্দ্র শর্মা আপনার প্রাণ দিয়ে নিরপরাধ পশুর প্রাণ-ঘাতক ধর্ম-লোভী স্বজাতির কলঙ্ক ক্ষালন করতে বসেছেন, এইজন্যে আমি তাঁকে নমস্কার করি।"[১]

এই সময়ে নানা পত্রিকায় দেবমন্দিরে বলিদানের সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু রচনা ও পত্রাদি প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক অনিলবরণ রায় এককালে বিশিষ্ট কন্‌গ্রেস-কর্মী ছিলেন, পরে পন্দিচেরীবাসী হইয়া শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ১৭ অক্টোবর (১৯৩৫) অমৃতবাজার পত্রিকায় এই বলিদান বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন— আমাদের দেশে পূজায় যে পশুবলি দেওয়া হয়, তাহাতে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করা যায় না; এবং পশুবলির সহিত আধ্যাত্মিকতার যখন সম্পর্ক নাই তখন ইহা পূজা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাধনা হইতে পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত। এই মতকে আমরা শ্রীঅরবিন্দেরও মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; তবে এ বিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ সমসাময়িক কোনো মত দেখি নাই।

অপর পক্ষে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'পূজায় পশুবলি'[২] সমর্থন করিলেন শাস্ত্রবাক্য দিয়া। আবার 'নৃতত্ত্বের এবং মনস্তত্ত্বের দিক হইতে পশুবলির আলোচনা' করিলেন ডাক্তার সরসীলাল সরকার। তিনি বলিলেন, "এ কথা বলিলে ভুল হয় না যে পশুবলি আমাদের আদিম মনোবৃত্তির পুনরাবৃত্তি। অন্যান্য দেশে এই বলিদানের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া উন্নততর মনোবৃত্তিতে বিকাশ হইয়াছে, আমাদের দেশে সাত্ত্বিক পূজাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে, পশুবলিদান-সংযুক্ত পূজাকে আধ্যাত্মিকজ্ঞানসম্পন্ন কোনো শাস্ত্রকারই প্রশংসা করেন না, বরং ইহা যে আধ্যাত্মিকতার বিরোধী এবং পাপকার্য, এমন-কি এরূপ পাপকার্য যে তাহাতে নরকগামী হইতে হয়, ইহাও মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।"[৩] জীববলির নিন্দাবাদে রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গ ছিলেন না; কিন্তু যেহেতু তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এবং হিন্দুসমাজের কঠোর সমালোচক, বোধ হয় সেই অপরাধেই লোকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদেরই প্রতিবাদী বেশি করিয়া হইয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি পূজাবকাশে এবার কবি বাহিরে কোথাও গেলেন না। তবে বাহির হইতে আহ্বান আসে এখনও; কিন্তু শরীর সহজে আর সাড়া দিতে পারে না। আমাদের এই আলোচ্য পর্বে ফরাসি ভাবুক-লেখক আঁরি বার্বুস্ (Henri Barbusse)[৪] ছিলেন মস্কোতে। তাঁহার ইচ্ছা নভেম্বর মাসে (১৯৩৫) প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক

১ এই পত্র লিখিবার একুশ বৎসর পূর্বে নরেন্দ্রনাথ নন্দীর পত্রের উত্তরে কবি বিলাত হইতে অকারণ পশুবধ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়া এক পত্র দেন। তিনি এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, মানুষের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে বনের পশুর আবির্ভাব বিষম ব্যাঘাতকর। মশা, ছারপোকা, বাঘ মারিব না বলিলে কেহ মানিবে না, খেতে পাখি ফসল নষ্ট করে বলিয়া মানুষ পাখিও মারে। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো শেষ কথা বলা যায় না। তবে পশুজীবনের সঙ্গে মানবজীবনের একটা পূর্ণতর সামঞ্জস্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতে থাকিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। (রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ ৩৯৫)। বলা বাহুল্য এখন কবি পশুহত্যা সম্বন্ধে যে-কথা বলিলেন তাহা ধর্মবিষয়ক, অর্থাৎ দেবতার নামে পশুহত্যা— কবি তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

২ বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৪২। ৩ বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৪২।

৪ **Henri Barbusse (1873—d. 30 August 1935). French writer, Barbusse took degree in philosophy, and earned his living in journalism. He fought in the first world war and won fame with his *Le Feu*, a huge and epic**

শান্তি-কন্‌গ্রেসের ব্যবস্থা হয়। ভারত হইতে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, সরোজিনী নাইডু ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য বলা হয়।[১] বলা বাহুল্য, কবির শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বিদেশে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া বার্বুসের মস্কোতে মৃত্যু হইলে বোধ হয় সম্মেলনের কথাও চাপা পড়ে।

বার্ধক্যজনিত ব্যাধি ও দুর্বলতা ক্রমেই সুস্পষ্টভাবে দেখা দিতেছে। শ্রবণ ও দর্শন-শক্তি ক্ষীণতর হইতেছে; কোমরে ব্যথা, নড়িতে চড়িতে কষ্টবোধ হয়। কোমরে আল্‌ট্রা-ভায়লেট রে বা অতিবেগনি রশ্মি লইয়া থাকেন— মনে করেন ফল পাইতেছেন। অভ্যাসমত প্রতিদিন প্রাতে লেখার সরঞ্জাম লইয়া ও দুপুরে ছবি-আঁকার আসবাবপত্র গুছাইয়া বসেন। সন্ধ্যার পর আশ্রমবাসীরা কেহ কেহ আসেন— কখনো কিছু পড়িয়া শোনান, কখনো কথাবার্তা চলে।

পাঠকের স্মরণ আছে, কবির 'বীথিকা' গুচ্ছের শেষ স্তবক রচিত হয় ভাদ্রের শেষ দিকে (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫)। প্রায় একমাস পরে 'পত্রপুটে'র নূতন কাব্যধারা দেখা দিল শরতের মাঝামাঝি সময়ে: '. . ছুটি চার দিকে ধূ ধূ করছে, . . আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি'; আর কবির 'ছুটি ব্যাপ্ত হয়ে গেল দিগন্তপ্রসারী বিরহের জনহীনতায়' নিঃসঙ্গতার মাঝে। এই ছুটিতে হাওয়া-বদলের তত্ত্ব লিখিতেছেন এক পত্রে; প্রথমে লেখা হয় পত্রাকারেই, পরে তাহা গদ্যছন্দে রূপায়িত করেন। পত্রখানি লেখেন কালিদাস নাগকে।[২]

শরতের রৌদ্রছায়াময়ী শোভা দেখিতে দেখিতে বিচিত্র এ ধরণীর অখণ্ড রূপটি মনের মধ্যে বিকসিত হইয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন 'পৃথিবী'[৩] কবিতাটি (১৬ অক্টোবর ১৯৩৫)। এই কবিতাটি যেন পৃথিবীর স্তব— গদ্যছন্দে লিখিত বলিয়া রসগ্রহণে কোনো বাধা হয় না, এমনই তাহার সাবলীল গতিছন্দ। যে সৌন্দর্য-সম্ভোগ কবির আবাল্যের সংস্কার ও সাধনা, তাহারই ভাষাময়ী মূর্তি এই কবিতা; কাব্যের মধ্য দিয়া কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি নূতন রূপ লইতেছে; 'ধ্যানেতে আর গানেতে' ঈশ্বরানুভূতি নূতন নাম পরিগ্রহ করিতেছে কবির সাধনায়। কবির আধুনিক গান ও কবিতার ভাষা ও ভাব গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্বের ভাষা ও ভাব হইতে সরিয়া আসিয়াছে বা বিবর্তিত হইয়াছে। 'বলাকা' ও তদুত্তর কাব্যে ও গীতে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' -উপদেশমালার ঈশ্বর হইতে রূপান্তরিত। এই ঈশ্বরবোধ কিভাবে তাঁহার সাহিত্যে নব নব রহস্যলোকে রূপায়িত হইতেছে, তাহা আমরা স্থানে স্থানে নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু এ বিষয়টি বিশেষজ্ঞের সম্যকদৃষ্টি-সম্ভূত আলোচনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। পরিশেষ, শেষ সপ্তক, বীথিকা, পত্রপুট, প্রান্তিক প্রভৃতির কবিতাগুলি যদি এই পরিপ্রেক্ষণী হইতে পাঠ করা যায়, তবেই ইহাদের নিগূঢ় অর্থ অন্তরে প্রবেশ করিবে এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার নূতন রূপ প্রকাশ পাইবে।

'পৃথিবী'[৪] হইতে যাত্রা করিয়া 'দেহাতীত'[৫] লোক পর্যন্ত জীবের প্রয়াণ স্বাভাবিক— স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর

panorama of and against war. He later founded the revolutionary group *Clarte*, and gave the remaining years of his life to fighting for peace and a better social system. He died while visiting the U. S. S. R.— Cassell's *Encyclopaedia of Literature*. vol. II. ১৯২২ সালে ৪ মাঘ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে প্রমথ চৌধুরীকে *Clarte* পত্রিকার কথা ও Barbusse-র কথা লেখেন। বার্বুস্ কবিকে লেখেন যে তাঁহার পত্রিকার জন্য ভারত সম্বন্ধে ভারতীয়ের লেখা চান। দ্র. চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮৯, পৃ ২৭৪।

১ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪২, পৃ ৯১৪।

২ ছুটি। পত্রপুট, ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৭।

৩ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪২। দ্র পত্রপুট, ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ১২।

৪ তু 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' (গানটি ১৩০৩ সালের পূর্বে রচিত)। গীতবিতান, পৃ ৪২৭।

৫ 'দেহাতীত' (পত্রপুট, ১০। প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪২) কবিতাটি যেদিন লেখেন সেদিন খবর পান যে পূর্বদিন (৬ নভেম্বর) প্যারিসে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই সংবাদের সঙ্গে কবির 'দেহাতীত' ভাবনার কোনো যোগ আছে কি না তাহা বিবেচ্য। সিলভ্যাঁ লেভি ১৯২১-২২ সালে বিশ্বভারতীর প্রথম ভিজিটিং প্রোফেসর রূপে শান্তিনিকেতনে আসেন। দ্র মালতী চৌধুরী, সিলভ্যাঁ লেভির স্মৃতি [হরিপদ রায় -অঙ্কিত ২ খানি স্কেচ্ সহ]— প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৩, পৃ ৩৭-৩৯।

লোকে গতি। দেহাতীতের ভাবনায় পাই সবিতার ধ্যান— কবির গায়ত্রীমন্ত্রসাধনার রূপ। এ ভাবনা নূতন নহে। পূর্বে যাহা ছিল জ্ঞানের ও রসের ক্ষেত্রে সীমায়িত, এখন ক্রমেই তাহা রূপ লইতেছে নূতন রাহস্যিক অজ্ঞেয়তার মধ্যে।

পূজাবকাশের পর[১] শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় খুলিল কার্তিকের মাঝামাঝি (১৫ কার্তিক। ১ নভেম্বর ১৯৩৫)। কবি শ্যামলীর নূতন গৃহে আছেন। ভাবজগৎ ও কর্মজগৎ কবিজীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত; বিশ্বভারতীর বিচিত্র কাজ, ভাঙাগড়া, রদবদল নিরন্তর চলিতেছে— সমস্তের সঙ্গে কবি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত— ভালোমন্দ ফলাফলের জন্য প্রশংসা বা নিন্দার ভাগী তিনিই একা— যদিও এমন অনেক কাজ হয় যাহার প্রবর্তক তিনি নহেন, অথচ শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সামলাইতে হইয়াছে তাঁহাকেই। পাঠকের স্মরণ আছে শ্রীভবনের পরিদর্শিকা হেমবালা সেন চলিয়া যাইবার পর হইতে সেখানে নানা প্রকার অস্থায়ী ব্যবস্থা চলিতেছে। প্রথম দিকে প্রতিমা দেবীকে নামতঃ 'প্রনেত্রী' করিয়া অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমন্তী দেবীকে পরিদর্শিকা নিযুক্ত করা হয়। সে ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারিল না। অবশেষে পূজাবকাশের মধ্যে Miss Christiana Bossenec নামে এক ফরাসী মহিলাকে এই পদে নিয়োগ করা হইল। মিস্ বস্‌নেক ভালো ইংরেজি জানিতেন না; তৎসত্ত্বেও স্বদেশে ছাত্রী-পরিচালনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া তিনি অচিরকালের মধ্যে এই কার্য আয়ত্ত করিয়া লইলেন। তাঁহার এই কার্যে সুধাময়ী দেবী দুই মাস সহায়তা করিলেন। সুধাময়ী দেবী বিদ্যালয়ে দুই বৎসর কার্য করিয়াছিলেন; পূজার পূর্বে (অক্টোবর ১৯৩৫) তাঁহার কার্যকালের অবসান হয়।[২]

পূজাবকাশের কিছুকাল পরে শ্রীনিকেতনে একটি নূতন উৎসব প্রবর্তিত হয়—'নবান্ন'। কবি তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি পৌরোহিত্য করিলেন। আমাদের পল্লী-জীবনের যে-সব উৎসব আচারমাত্রে পর্যবসিত হইয়া অর্থহীন হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে সুন্দরভাবে প্রাণবন্ত করিবার জন্য কবির যে চেষ্টা ছিল তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বন-মহোৎসব ও হলচালনা বা সীতা-যজ্ঞ ইতিপূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল; এবার 'নবান্ন'। বহু বৎসর পূর্বে[৩] কবি এ বিষয়ে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাকে নূতন রূপ দান করা হইল শ্রীনিকেতনে।[৪]

১ পূজাবকাশের মধ্যে নূতন ধারায় লিখিত এই কয়টি কবিতা— পত্রপুটের অন্তর্ভুক্ত: 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো' (পৃথিবী, ১৬ অক্টোবর ১৯৩৫)। 'একদিন আষাঢ়ে নামল' (১৯ অক্টোবর)। 'অতিথিবৎসল, ডেকে নাও পথের পথিককে' (পথের মানুষ, ২৪ অক্টোবর)। 'সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে' (হাটে, ২৫ অক্টোবর)। জন্মদিনে, 'তোমার জন্মদিনে আমার' ([সমিল কবিতা] ২৪ অক্টোবর ১৯৩৫; দ্র. বিচিত্রা, পৌষ ১৩৪২)। 'চোখ ঘুমে ভরে আসে' (সার্থক আলস্য, ১৬ কার্তিক, শুক্লাষষ্ঠী, ১৩৪২ ॥ ২ নভেম্বর ১৯৩৫)। 'আমাকে এনে দিল এই বুনো চারাগাছটি' (পিয়ালী, ৫ নভেম্বর)। 'এই দেহখানা বহন ক'রে আসছে দীর্ঘকাল' (দেহাতীত, ৭ নভেম্বর)। এবারকার মতো এইখানে কবিতাচক্রের শেষ। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৪৩৩।

২ ১৯৩৫ ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৪ পর্যন্ত সুধাময়ী দেবী বোলপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। কবি এই বিদ্যালয়ের বিস্তারিত সংবাদ রাখিতেন।

৩ তু জননী, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী, তোমার আহ্বানলিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।
—শরৎ। কল্পনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ ১৪৪

৪ *Visva-Bharati News*, December 1935, p 42।

যে-প্রাতে 'নবান্ন' উৎসব হয়, সেইদিন আশ্রমে কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক জাপানী কবি য়োনে নোগুচি[১] আসিলেন। পরদিন প্রাতে (৩০ নভেম্বর) আম্রকুঞ্জে নোগুচির সংবর্ধনা হইল। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৬ সালে জাপানে নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন ও তাঁহার সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। নোগুচির সংবর্ধনা-সভায় রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, তিনি জাপানে যে অযাচিত সংবর্ধনা ও সমাদর লাভ করেন তাহা কল্পনাতীত; আজ সেই দেশের কবিকে তাঁহার আশ্রমে সম্মান দান করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি কৃতার্থবোধ করিতেছেন।[২]

নোগুচি যে-ভাষণ দান করেন তাহা কবি-উচিত ভাষণ। পরে *Amrita Bazar Patrika*তে (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) তিনি যে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল; শান্তিনিকেতনের যথার্থ আদর্শ কী তাহা তাঁহার কবি-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল। Walter Pater-এর একটি বাক্য (Art struggles after the law of music) উদ্‌ধৃত করিয়া তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন মানবাত্মা সম্পূর্ণতা লাভ করিলে "reach the condition which music alone realizes. Apart from music, there would be no mental training for man because rhythmical harmony alone rescues man from artificiality and corruption . . If Tagore's is musical education, it means the development of human minds in the most natural way."[৩]

শান্তিনিকেতনে নোগুচির সংবর্ধনা হইল, কলিকাতায় দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সংবর্ধনা হইতেছে। উদ্যোক্তাদের অনুরোধ কবির উপস্থিতির জন্য; শরীরের জন্য তিনি কলিকাতায় যাইতে পারিলেন না— একটি কবিতা[৪] লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন (১ ডিসেম্বর ১৯৩৫)।

রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্রজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ বহু কালের। কবি ও দার্শনিকের বন্ধুত্বের একটি ধারাবাহিক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতার শেষাংশে বলিতেছেন—

মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি,
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি।
স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায়কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর।

এই সময়ে কবিকে আর-একজন মহাপুরুষের জন্য একটি বাণী লিখিয়া দিতে হয়। দেশময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন হইতেছে। পরমহংসদেবের ভক্তদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কবি *Prabuddha Bharat* পত্রিকার জন্য নিম্নলিখিত বাণীটি ইংরেজিতে লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন।[৫]

১ Yone Noguchi. Tokyo, Japan। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর যে সাতজন 'প্রধান' (Vice-President)-এর পদ সৃষ্ট হয় নোগুচি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৯৪০ পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। দ্র Annual Reports of the Visva-Bharati।

২ *Visva-Bharati News*, December 1935, p 44।

৩ Quoted in *Visva-Bharati News*, October 1936, p 27। দ্র কালীচরণ মিত্র, জাপানী কবি নোগুচি, বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃ ৬৭৫-৭৭। দ্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত 'মণিমঞ্জুষা'; ইহাতে নোগুচির কয়েকটি ইংরেজি কবিতার তর্জমা আছে।

৪ দ্বিসপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত। প্রবাসী, মাঘ ১৩৪২, পৃ ৫৮২। অবিস্মরণীয়, দেশ পত্রিকা, ২ পৌষ ১৩৬১।

৫ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২, পৃ ৭২৫। অবিস্মরণীয়, দেশ পত্রিকা, ২ পৌষ ১৩৬১।

Diverse courses of worship from varied springs of fulfilment
have mingled in your meditation.
The manifold revelation of the joy of the Infinite has given form
to a shrine of unity in your life,
Where from far and near arrive salutations to which I join mine own.

কবি ইহার নিম্নলিখিত বাংলা মর্মানুবাদ করিয়া দেন :

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ;
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

বিদ্যালয় খুলিবার কিছুকাল পরে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা মিলিয়া 'অরূপরতন' অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকা গ্রহণ করেন। শান্তিনিকেতনে অভিনয় করিলে সকলের মন ভরে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের ধনাগম হয় না; অথচ ইহারই প্রয়োজন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। তাই স্থির হইল কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করা হইবে। ৯ ডিসেম্বর কবি ও অভিনয়ের দল কলিকাতায় গেলেন। নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে দুই দিন পর পর অরূপরতনের অভিনয় হইল।[১] কবি ঠাকুরদার অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু পঁচাত্তর বৎসর বয়সে এই পরিশ্রম, উদ্‌বেগ ও উত্তেজনা সহ্য হইবে কেন! অভিনয়ান্তে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কলিকাতায় দশদিন থাকিয়া ১৯ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। উৎকল-সংগীত-সম্মেলনে যাইবার কথা ছিল কিন্তু অসুস্থতার জন্য যাওয়া হইল না।

কলিকাতা হইতে আসিয়া কবি শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবের প্রথম দিন মন্দিরে উপাসনা[২] করেন, বিশ্বভারতীর অন্যান্য উৎসব বা কর্ম-সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভায় এবার গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল; সভাপতিত্ব করেন সুধীরচন্দ্র লাহিড়ী।[৩] পাঠকের স্মরণ আছে ১৯২২ সালে বিশ্বভারতীর কনস্টিটিউশন প্রথম প্রস্তুত হয়। তাহার পর প্রয়োজনের তাগিদে মাঝে মাঝে নিয়মাবলীর রদবদল হইয়াছিল। গত বারো বৎসরের মধ্যে বিশ্বভারতী বড়ো ও বিচিত্র হইয়া পড়িয়াছে; নানা লোক নানা অভিপ্রায়ে ও কর্মোপলক্ষে সেখানে আসা-যাওয়া আরম্ভ করিয়াছে; পুরাতন যুগের বা tradition-এর দোহাই দিয়া সকলপ্রকার অধিকার ও দাবি-দাওয়াকে সকল শ্রেণীর কর্মীর পক্ষে সুগম করা ভবিষ্যতের নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল না হইতে পারে, এই আশঙ্কা অনেকের মনেই সেদিন দেখা গিয়াছিল; এই ভাবনা হইতে নূতন কনস্টিটিউশন গড়া হইল। যে democratic আদর্শে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের সূত্রপাত তাহা ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। নূতন কনস্টিটিউশনে অধ্যাপকমণ্ডলীর অনেকখানি ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংকুচিত হইল; সংসদ ও

১ *Visva-Bharati* News, January 1936, p 50 (১১-১২ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ॥ ২৫-২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪২)। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' অভিনয়, বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, পৌষ ১৩৪২, পৃ ৪৪৪।

২ উদ্বোধন। যাত্রী, ৭ পৌষ ১৩৪২ ('প্রবাসীর পক্ষ হইতে অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত')। প্রবাসী, মাঘ ১৩৪২, পৃ ৫০০-৫০২।

৩ ইনি বিশ্বভারতীর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। ইঁহার সংগৃহীত গ্রন্থরাজি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আসিয়াছে।

বিশেষভাবে কর্মসমিতির উপর শাসন-দায়িত্ব গিয়া বর্তাইল। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এই-সকল বিস্তারিত আইন-কানুন প্রণয়নের মধ্যে থাকিতেন না ; এখন তাঁহার যে বয়স তাহাতে কোনো বিষয় জোর করিয়া প্রতিবাদ বা সমর্থন করিবার শক্তি পান না— তিনি ভালো করিয়াই জানেন, অন্যের উপর নির্ভর তাঁহাকে করিতেই হইবে। যাহাই হউক, বার্ষিক সভায় নূতন বিধান পেশ হইল এবং নিয়মানুসারে দ্বিতীয় অধিবেশন হইল শ্রীনিকেতনের উৎসবের সময় (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬)।[১]

ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নানারূপ প্রদর্শনী সভা সম্মেলন বহুকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে তাঁহার ছাত্রদের এবং অন্যান্য শিল্পীদের কাজের প্রদর্শনী মধ্যে মধ্যে করেন। তাঁহার ইচ্ছা যে বাংলাদেশে একটি স্থায়ী জাতীয় মিউজিয়ম বা National Art Gallery শ্রেণীর কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। আমাদের আলোচ্য পর্বে তিনি এই সাধু পরিকল্পনা পাবলিকের কাছে পেশ করেন। বিষয়টি কবির খুবই ভালো লাগে, তিনি মুকুলচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন :

"I have read with great interest your scheme for a Bengal National Museum. I agree with you that an organized centre such as you suggest could do much to educate our public in the value of indigenous arts and crafts of this province and create a genuine interest in their promotion It is an object very dear to my heart and I cannot help welcoming any endeavour towards its realization. You have my best wishes."[২]

দুঃখের বিষয়, মুকুলচন্দ্র তাঁহার অধ্যক্ষতা-পর্বে ইহা কার্যকর করিয়া তুলিতে পারেন নাই ; কবির dear to my heart প্রতিষ্ঠানও তাঁহার জীবিতকালে রূপ লয় নাই ; বহুকাল পরে দেশবাসী ও গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি এ দিকে গিয়াছে।[৩]

গুরুসদয় দত্তের অতি মূল্যবান শিল্পসংগ্রহ লইয়া একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ কেন্দ্রে যে সংগ্রহালয়ের প্রস্তাব হইয়াছে, কয়েক মাস পূর্বে কুমারাপ্পাকে কবি তৎসম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণীয়। গান্ধীজির প্রেরণায় কিছুকাল পূর্বে (১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪) ওয়ার্ধার আশ্রমে All India Village Industries Association বা গ্রামোদ্যোগ সমিতির জন্ম হয়। যমুনালাল বাজাজ সংগ্রহালয়ের জন্য গৃহ ও জমি দান করেন। 'Its object was defined as village reorganization and village reconstruction।' জে. সি. কুমারাপ্পা হইলেন সম্পাদক, পরিচালকমণ্ডলীতে থাকিলেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শঙ্করলাল ব্যাংকার ও ডক্টর খান সাহেব।[৪] পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ,[৫] স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সি. ভি. রমন, ডক্টর আনসারি প্রভৃতি। সেই সূত্রে কুমারাপ্পা শান্তিনিকেতনে আসেন (মে ১৯৩৫)। নন্দলাল

১ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪২, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ ৮৯-৯২। ২ *Visva-Bharati News*, February 1936, p 63।

৩ আমাদের ভরসা 'গান্ধীঘর' প্রভৃতি যে-সব পরিকল্পনা চলিতেছে তাহাতে স্থানিক শিল্পকলার নিদর্শন রক্ষিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের নামে নানা স্থানে পাঠাগার ও স্মৃতিমন্দির আছে ; ঐ-সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে পারেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের মধ্যে মানুষের শিল্প ও কলার সাধনা বড়ো স্থান জুড়িয়া ছিল। কলিকাতায় প্রস্তাবিত 'রবীন্দ্রভারতী'র সহিত একটি সংগ্রহালয় সংযুক্ত করিলে অবান্তর হইবে না বলিয়া মনে হয়।

৪ ডক্টর খান সাহেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খুদাইখিদমদগার সমাজের প্রাণস্বরূপ আবদল গফর খানের ভ্রাতা। পাকিস্তান হইয়া গেলে ডক্টর সাহেব তথাকার প্রধানমন্ত্রী হন। ইনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

৫ D. G. Tendulkar, *Mahatma*, Vol. IV, p 10।

বসু প্রভৃতির সহিত আলোচনা করিয়া কুমারাপ্পা কবির সহিতও এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখা করিলেন; কবি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, মহাত্মাজি সমস্ত জাতির জন্য যে-সংগ্রহালয় (মিউজিয়ম) স্থাপন করিতে চাহিতেছেন— "..not to limit it to crafts as crafts. Crafts have been the media of artists in all ages, and our artists, as painters, as architects, as decorators, have helped our folks to get finer satisfaction out of the same material. The economic life of a nation is not such an isolated fact as Mahatmaji imagines and, today, side by side with economic poverty, we are faced with a cultural poverty which puts us to shame .. Our art treasures today are found in museums outside India .. Perhaps one day we will have no art treasures left; we will have to go visiting museums in foreign lands .. Please tell Mahatmaji to consider that art is not a luxury of the well-to-do. The poor man needs it as much and employs it as much in his cottage-building, his pots, his floor-decorations, his clay deities and in many other ways. If Mahatmaji's men go round collecting specimens of village industries, why may they not also look for and collect specimens of the various indigenous arts spread all over our land and waiting to be recherished? .. I would do it myself, but I know only too well that I do not command the resources nor the necessary popular confidence that Mahatmaji commands."[১]

এবার কন্‌গ্রেসের স্বর্ণ-জয়ন্তী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ১৮৮৫ সালে অতি দীন ভাবে ইহার আরম্ভ হয়। জয়ন্তী উপলক্ষে কবি (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫) অবসরগ্রাহী (retiring) প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিলেন: "My warmest greetings on the occasion of the Golden Jubilee celebrations. The destiny of India has chosen as its ally the power of soul and not that of muscle. And she is to raise the history of man from the muddy level of physical conflicts to a higher moral altitude."

কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হইবে লখনৌ নগরীতে— জওহরলাল নেহরু নূতন প্রেসিডেণ্ট হইবেন। এবার লখনৌ-এ কন্‌গ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সমিতির প্রদর্শনী হইতেছে। প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও সাজ-সজ্জার ভার পড়িয়াছিল নন্দলাল বসুর উপর।[২] তাহার আয়োজন চলিতেছে। নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্তা বলিয়াই এই কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রামোদ্যোগ পরিকল্পনার আলোচনা প্রসঙ্গে কবির মনে বাংলার গ্রামের সমস্যার কথা জাগিতেছে।

তিনি কন্‌গ্রেসের বাণী পাঠাইবার পরদিন বাংলার কুটীরশিল্পের সমস্যা সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রদান করিলেন। কবি দেখিতেছেন, বাংলাদেশের বুনিয়াদি industry— ধান হইতে চাউল তৈয়ারি। আজ সে-শিল্প মুমূর্ষু। দেশের অর্ধেক জনশক্তি নারী। সেই নারীসমাজের উপজীবিকা ছিল ধান-ভানা বা চাউল তৈয়ারি। জনসংখ্যার অর্ধেক এখন সেই শিল্প হইতে বিচ্যুত। গ্রামের ঢেঁকি চরকার ন্যায়ই লোপ পাইতে বসিয়াছে। কবি দেখিতেছেন যে, যে-শিল্প ছিল গ্রামের সর্বজন-মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তাহা ক্রমেই গ্রাম ছাড়িয়া শহরে ধনিক শ্রেণীর হস্তগত

১ *The Visva-Bharati Quarterly*, May 1935, p 112।

২ নন্দলাল বসু তাঁহার ছাত্রদের সহায়তায় প্রদর্শনী সজ্জিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। দ্র. *Mahatma*, Vol. IV, pp 82-83।

হইতেছে; কবির আশঙ্কা, এই শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শ্রেণীগত বিরোধ সমাজে দেখা দিবে। কবি লিখিলেন (২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫):

"When a people's diet takes a vicious path of its own impoverishment, it causes a graver mischief than any act of cruelty inflicted by an alien power. Rice-mills are menacingly spreading fast extending throughout the province an unholy alliance with malaria and other flag-bearers of death robbing the whole people of its vitality through a constant weakening of its nourishment.

"We have to take into account the immense importance of our rural economic life whose course has been cruelly obstructed by the iron-monster robbing our village women of some of their natural means of livelihood and the labouring class of its right to gather its simple living out of the gleanings from the peoples own green field of life."[১]

কিছুকাল পূর্বে *Harijan* পত্রিকায় (১৬ নভেম্বর ১৯৩৪) 'Village Industries' প্রবন্ধে গান্ধীজি এই সমস্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"Rice-mills and flour-mills not only displace thousands of poor women workers, but damage the health of whole population. It is time when medical men and others combined to instruct the people on the danger attendant upon the use of white flour and polished rice." এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'আহারের অভ্যাস'[২] স্মরণীয়। ১৯১৯ সালে তিনি খাদ্যসমস্যা লইয়া লেখেন। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় 'খাদ্য চাই' বলিয়া একটি প্রবন্ধ আছে; তাহাতে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য উপদেশ আছে।

প্রসঙ্গত বলিতে পারি, খাদ্য-সমস্যা লইয়া রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঙালি ভাতের মাড় বা ফেন ফেলিয়া দেয়— এই লইয়া কবি বহু প্রতিবাদ করেন; শান্তিনিকেতনের রান্নাঘরে বড়ো বড়ো 'কুকার' কিনিয়া দেন যাহাতে খাদ্যের প্রাণবস্তু নষ্ট না হয়। কয়েক মাস সে-সব ভালোই চলিয়াছিল, তার পর— তাঁহার বহু প্রচেষ্টা যেভাবে কার্যকর হয় নাই এ প্রচেষ্টাও তেমনিভাবে ব্যর্থ হয়। ডাক্তার চুনীলাল বসু, ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল প্রভৃতি আসিয়া খাদ্য-সংস্কারের জন্য বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু স্থায়ী হয় নাই; আমরা সহজ পথ অনুসরণ করিয়াছি। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—"রান্নাঘরে চুলার যে সাবেক ব্যবস্থা আছে, সকলেই জানেন, তাহাতে যেমন দুঃখ বেশি তেমনি ব্যয়ও বেশি এবং তাহাতে রান্নাঘর যথোচিত পরিষ্কার রাখা দুঃসাধ্য। আধুনিক প্রণালীতে চুলা নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়তা-বশত পাচকদের তাহা ভালো লাগে নাই। তাহারা নানা ছুতা করিয়া সেই চুলা বর্জন করিল। ইহাতে রান্নাঘরের দুঃখ তাপ পূর্ববৎ প্রবল হইয়া উঠিল, আমরাও ইহা সহিয়াই গেলাম; নূতন প্রণালীর দায় কেহ গ্রহণ করিলাম না, নূতন করিয়া চিন্তা করিলাম না।"[৩]

১ *Visva-Bharati News*, January 1936, p 51। 'রবীন্দ্রনাথ ঢেঁকির চালের পক্ষপাতী', প্রবাসী, মাঘ ১৩৪২, পৃ ৫৯৬। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীনিকেতন হইতে 'রবীন্দ্র ধান্য কল' নাম দিয়া এক ধানভাঙা কল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়; তজ্জন্য হ্যাণ্ডবিল ছাপানো হয়। পরিকল্পকদের ইচ্ছা ছিল যে সমবায়নীতিতে এই কল স্থাপিত হইবে। বর্তমানে সমস্ত কলই ধনিকদের সম্পত্তি। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় কোষ (*Visva-Bharati Central Co-operative Bank*)-কে কেন্দ্র করিয়া এই কল-স্থাপনের কথা ওঠে। সে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই।

২ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৬।

৩ উদ্যোগ শিক্ষা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬, পৃ ৫।

আমাদের আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' নূতন কলেবরে 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে প্রকাশিত হইল (অগ্রহায়ণ ১৩৪২)। শব্দতত্ত্ব' প্রথম প্রকাশিত হয় গদ্যগ্রন্থাবলীর পঞ্চদশ খণ্ড রূপে (ফেব্রুয়ারি ১৯০৯)। ভাষা-বিষয়ক যে-সব আলোচনা এই কয় বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল তাহা এই নূতন সংস্করণে সংযোজিত হয়। গ্রন্থখানি কবি উৎসর্গ করেন পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্যকে[২]; পাঠকের স্মরণ আছে গত বৎসর বিধুশেখর শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

অচিরকালের মধ্যে বিধুশেখর কবি-কর্তৃক পুনরভিনন্দিত হইলেন। ১৯৩৬ সালের নববর্ষদিন সরকারি উপাধি বা খেতাব বিতরণের সময় বিধুশেখর 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে প্রীত হইয়া প্রথমে বিধুশেখরকে পত্র দ্বারা (১৮ জানুয়ারি ১৯৩৬) ও কয়েকদিন পরে একটি কবিতা লিখিয়া (২৬ জানুয়ারি) আনন্দজ্ঞাপন করিলেন।[৩]

কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯২১) অসহযোগ-আন্দোলন-পর্বে বিধুশেখর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সহিত সরকারি সাহায্য-প্রাপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য সম্বন্ধ রক্ষার বিরোধী ছিলেন; আর, রবীন্দ্রনাথ একদা 'রাজটীকা' গল্প লিখিয়া খেতাবধারীদের বিদ্রূপ করেন, পরে স্বয়ং রাজসম্মান গ্রহণ করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করেন। আজ বিধুশেখর সরকারি উপাধি-ভূষিত এবং তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথের হর্ষ প্রকাশ উভয়ই কালান্তরের সূচক।

মাঘোৎসবের সময় কবি শান্তিনিকেতন-মন্দিরে যথানিয়মে উপাসনা করিলেন ও তৎপূর্বে (৬ মাঘ) মহর্ষির মৃত্যু-বার্ষিকী দিনেও উপদেশ দিলেন।[৪] মাঘ মাসে (৫ই) শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক প্রভাতচন্দ্র গুপ্তর বিবাহের আনন্দ-জ্ঞাপন উপলক্ষে কবি নিম্নলিখিত গানটি উপহার দিলেন—'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা'।[৫] গানটি 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র অন্তর্গত।

শীতকালে শান্তিনিকেতনে দেশবিদেশের অতিথি-সমাগম হয়; নোগুচির কথা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। অন্যান্যদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করা যায়, যাঁহারা কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন। Young Women's Christian Association-এর আমেরিকা শাখার সেক্রেটারি Miss Ethel Cutler আসেন (১৬-১৭ নভেম্বর ১৯৩৫)। তিনি একখানি সুন্দর পত্রে তাঁহার ভাবগুলি ব্যক্ত করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "In and through all I have beheld the dreams of a poet coming alive, not only in the Poet's own most kindly and gracious greeting to me who come from a far land, but in the very lives of those who share his purposes for this place and seek to live them out. I came a stranger with great expectations. I leave a friend with deep satisfaction in all that Visvabharati means."[৬]

১ শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক হইতে বি. এ. পর্যন্ত কোথাও রবীন্দ্রনাথের বই পাঠ্য ছিল বলিয়া চোখে পড়িতেছে না। ১৯১৫-১৬-এর University Calendar (p 445) Comparative Philologyতে শব্দতত্ত্বের নাম দেখা যায়।

২ শান্তিনিকেতনে কার্যকালে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর ব্যতীত আর কেহই কবির নিকট হইতে গ্রন্থ-উৎসর্গ লাভ করেন নাই।

৩ ১২ মাঘ ১৩৪২। দ্র প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২, পৃ ৬৫১।

৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় -কর্তৃক অনুলিখিত। প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২, পৃ ৬৭১। মাঘোৎসব, উদ্বোধন ও উপদেশ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় -অনুলিখিত, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪২, পৃ ২।

৫ বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৪২। 'আঁখি-সংগম'। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ও রেণু দেবীকে তাঁহাদের শুভপরিণয় উপলক্ষে কবিগুরুর আশীর্বাদ। গানটির তলায় '৫ই মাঘ ১৩৪২' তারিখ দেওয়া আছে। দ্র *Visva-Bharati News*, March 1936, p 66 এবং গীতবিতান, পৃ ৩০০, ৬৯৮।

৬ Of my visit to Santiniketan, 16-17 November, 1935 [Ethel Cutler B. A., B. D., Secretary to the National Board of the Young Women's Christian Association, U. S. A.], *Visva-Bharati News*, January 1936, p 53।

আর-একজন বিশিষ্ট অতিথি হইতেছেন য়েট্‌স্‌-ব্রাউন (Lt. Col. F. B. Yeats-Brown), *Bengal Lancer* নামক গ্রন্থের লেখক। তিনি কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও বিশেষভাবে শ্রীনিকেতনের গ্রামোদ্যোগ দেখিতে আসেন (২৮ জানুয়ারি ১৯৩৬)। Yeats-Brown পনেরো বৎসর পূর্বে একবার শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন, "Santiniketan still seems to me one of the most spiritually stimulating places in the world, looking beyond our day to a world-harmony which will come through no synthetic superstate, but through beauty, born in many forms and many lands, in the soil and soul of nationhood. Tagore has been described by his enemies as a *poseur*, and his University as a place where students spend their time in the blissful beatitude of communicating with the incommunicable. That is easy to say. Santiniketan does not always show results that can be measured by the world's coarse thumb and finger: but it is exactly as a protest against such material standards of success that its founder will be remembered by posterity, not only in India, but throughout the world. He is ahead of the ruck and run of us."

প্রবন্ধ-শেষে তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাঁহার মনে হইল, "Tagore remains in my mind as a beautiful but somewhat tragic figure . . behind Santiniketan there is not yet the driving force of a great popular movement, but only a great man : a man who makes the arc of the sky seem bigger after one has met him."[১]

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (১৯৩৫) মিসেস মার্গারেট স্যাংগার কবির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিলেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ-আন্দোলনের ইনি অন্যতম নেত্রী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা দেয়। যুদ্ধান্তে অসংখ্য বেকারদের সমস্যা সকল দেশকেই ভাবিত করিয়া তোলে। কিন্তু এ সমস্যা প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে নারীদের। ইংলন্ডের ডক্‌টর মেরি স্টোপস্‌ (Stopes, 1880), সুইডেনের Ellen Key (Karoliva Sofia, 1849-1926), আমেরিকার মিসেস মার্গারেট স্যাংগার (Margaret Sanger, 1883) এই সমস্যা লইয়া আলোচনা ও আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। জীবতত্ত্ব, আয়ুর্বেদ বা medicine, মনস্তত্ত্ব, নীতিধর্ম, মোক্ষধর্ম, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে রাজনীতিকরাও এই বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিতেছেন না; কারণ ক্রমবর্ধমান উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যার স্থান ও আহারদানের সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়াউঠিতেছে। শ্রীমতী স্যাংগার (Sangar) ভারতে আসিয়াছেন নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের আমন্ত্রণে, দক্ষিণ-ভারতে ত্রিবাঙ্কুরে ডিসেম্বরের শেষ দিকে সম্মেলন বসিবে। তৎপূর্বে তিনি ওয়ার্ধায় গিয়া মহাত্মাজির সঙ্গে মোলাকাত করেন। উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাহার বিস্তারিত প্রতিবেদন গান্ধীজির জীবনীতে প্রদত্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত মিসেস স্যাংগারের যে আলোচনা হয় তাহার কোনো বিবৃতি আমরা পাই নাই। তবে দশ বৎসর পূর্বে শ্রীমতী স্যাংগার -সম্পাদিত *Birth Control Review* পত্রিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে-মত অকুণ্ঠিত চিত্তে বিবৃত করেন (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৫), তাহাকেই আমরা তাঁহার এখনকারও মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। দশ বৎসর পূর্বে

১ The Bengal-Lancer on Santiniketan, *Visva-Bharati News*, November-December 1936, pp. 39-41. Francis Yeats-Brown (1886-1944) : British army-officer and writer, served in India (1906-13), France and Mesopotamia (1914-15); prisoner of war in Turkey (1915-18); author of *Bengal Lancer* (1930) & other books।

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইলে গান্ধীজি তীব্র-প্রতিবাদ-পূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া মিসেস স্যাংগার রবীন্দ্রনাথকে (১২ অগস্ট ১৯২৫) লিখিয়াছিলেন : "The Indian Papers just received report that Mahatma Gandhi has been visiting you at Shantiniketan. Perhaps you have seen his recent statement in opposition to Birth Control. You have travelled all over the earth and you have observed the joys and sorrows and miseries of the world, and we take it for granted that with your international outlook on life and human society you cannot but feel friendly towards Birth Control."

এই পত্র পাইবার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়া এক দীর্ঘ পত্র মিসেস্ স্যাংগারকে লিখিয়া পাঠান, তাহাই *Birth Control Review* -তে প্রকাশিত হয়। কবি লিখিয়াছিলেন :

"I am of opinion that Birth Control movement is a great movement not only because it will save women from enforced and undesirable maternity, but because it will help the cause of peace by lessening the number of surplus population of a country scrambling for food and space outside its own rightful limits. In a hunger-stricken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children into existence than could properly be taken care of, causing endless suffering to them and imposing a degrading condition upon the whole family. It is evident that the utter helplessness of a growing poverty very rarely acts as a check controlling the burden of over-population. It proves that in this case nature's urging gets better of the severe warning that comes from the providence of civilized social life. Therefore, I believe, that to wait till the moral sense of man becomes a great deal more powerful than it is now and till then to allow countless generations of children to suffer privations and untimely death for no fault of their own, is a great social injustice which should not be tolerated. I feel grateful for the cause you have made your own and for which you have suffered . . "

গান্ধীজি জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ; তবে তাঁহার পথ কঠোর ব্রহ্মচর্য ও সংযমের পথ। অর্থাৎ ধর্মনীতির উপর তাঁহার নির্ভর।[১] এইখানে গান্ধীজির সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি বড়োরকম পার্থক্য ; রবীন্দ্রনাথ রক্তে-মাংসে-গড়া মানুষের দুর্বলতার প্রতিষেধ করিবার জন্য উৎসুক— বাস্তব সত্যের দিক হইতে তিনি মানুষকে দেখিতেছেন ; গান্ধীজি সেইখানে ধর্মনীতির কঠোর নির্দেশে জীবনকে সার্থক করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। আজ ভারতব্যাপী এই সমস্যা, ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর ভয়াবহ সংখ্যা সকলকে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছে।

অন্যান্য বিদেশী যাঁহারা এই শীতকালে আশ্রমে আসেন, তাঁহাদের অন্যতম Miss Louise Wallace Hackney। ইনি আমেরিকার একজন কবি-সাহিত্যিক— চীনা চিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, "To spend a few days here [Santiniketan] has been a privilege. For it is art made concrete in life . . To talk with the poet is to enter into a realm of serenity."[২]

১ দ্র Tendulkar, *Mahatma*, Vol VII।

২ *Visva-Bharati News*, February 1936, p 62।

কলিকাতায় শিক্ষাসপ্তাহ। ১৯৩৬

ফেব্রুয়ারি মাসের (১৯৩৬) প্রথম দিকেই রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতায় যাইতে হইতেছে— সেখানে 'শিক্ষাসপ্তাহে'র ও 'নবশিক্ষাসংঘে'র (New Education Fellowship) উদ্‌বোধন-সভায় তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা। এ দিকে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব। উৎসবের পূর্বেই কলিকাতায় যাইতে হইতেছে বলিয়া কবি ৫ই তারিখে শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সহিত মিলিত হন। ৭ ফেব্রুয়ারি কবি কলিকাতায় গেলেন— পরদিন 'শিক্ষাসপ্তাহে' তাঁহার ভাষণ।

এখানে শিক্ষাসপ্তাহ ব্যাপারটি কী তাহা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। আমাদের আলোচ্য পর্বে অখণ্ড বাংলার শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক। শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁহার খুবই উৎসাহ ছিল। তাঁহারই সময় মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারের কথা উঠে। আজিজুল হক কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন (১০ অগস্ট ১৯৩৫)। কিন্তু ইহারও পূর্বে ১৯৩০ সালে যখন তিনি কৃষ্ণনগরের উকিল তখন শ্রীনিকেতন দেখিতে আসেন।[১] যাহাই হউক এখনকার শিক্ষামন্ত্রী আজিজুলের প্রেরণায় ও চেষ্টায় এই শিক্ষা-উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক প্রদর্শনী বক্তৃতা প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা হয়; এই প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতন-শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের হাতের কাজের নমুনা প্রেরিত হয়।

এই অধিবেশনের সঙ্গেই নবশিক্ষাসংঘের ভারতীয় শাখার সম্মেলন আহূত হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, কারণ ভারতীয় শাখার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ও ইহার দুইজন সম্পাদক শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক— ধীরেন্দ্রমোহন সেন ও অনিলকুমার চন্দ।

বিংশ শতকের শুরু হইতে ও বিশেষভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে সভ্য জগতের সর্বত্রই শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একদল লোক সজাগ হইয়া উঠেন। আমেরিকায় জন্‌ ডিউই ও ভারতে রবীন্দ্রনাথ নবশিক্ষাবিধি প্রবর্তনের গুরু। পশ্চিমে ডিউই Progressive Education -এর জনক; তাঁহার শিষ্য ও সহকর্মী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক ইহার অন্যতম প্রচারক। প্রসঙ্গত বলিতে পারি, ১৯২৬ সালে কিলপ্যাট্রিক ভারত-ভ্রমণে আসিয়া শান্তিনিকেতন দেখিয়া যান এবং তথাকার শিক্ষাবিধি দেখিয়া মুগ্ধ হন। আমেরিকায় এই দুই শিক্ষাশাস্ত্রীর চেষ্টায় Progressive শিক্ষাবিধির সম্বন্ধে লোকে সচেতন হইয়া উঠে, ইংলন্‌ডে এবং অন্যত্রও শিক্ষা-সংস্কারের জন্য মনীষী ও মনস্বিনীর অভাব হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের দুই বৎসর 'পরে (১৯২১) ফ্রান্সে ক্যালে (Calais) নগরীতে নবশিক্ষার ভাবুকদলের প্রথম সম্মেলন হয়। লন্‌ডনের স্কুল-ইন্‌স্‌পেকট্রেস শ্রীমতী বিএট্রিস্‌ এসনোর (Esnor)-এর উৎসাহে New Education Fellowship[২] নামে সংঘ গঠিত হইল। এই আন্তর্জাতিক সংঘের প্রথম অধিবেশন হয় সুইস দেশের Montreux শহরে। অতঃপর হাইডেলবার্গ (১৯২৫), লোকার্নো (১৯২৭), এলসিনোর (১৯৩০), নিস্‌ (১৯৩৩), চেলটেনহাম (১৯৩৬) -এ সম্মেলন বসে। এলসিনোর-এর অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই নবশিক্ষাসংঘের শাখা নানা দেশে ইতিপূর্বে গঠিত হইয়াছিল, ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল এই বৎসরে।

১ *Annual Report, Visva-Bharati*, 1936, p 25; Non-official visitors -এর তালিকা দ্রষ্টব্য।

২ "Founded in 1921 . . the New Education Fellowship had operated internationally for the furtherance of progressive education in every part of the world.

". . Europe's leading Progressives found it desirable to band together, and for this purpose they organized

শিক্ষাসপ্তাহের[১] আঙ্গিক রূপেই নবশিক্ষাসংঘের সম্মেলন আহূত হয়। এই যৌথ সম্মেলনের ব্যবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-হলে প্রথম দিন কবি 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' ও শেষ দিন 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।[২] শেষ প্রবন্ধ পাঠের দিন সিনেট-হলে রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য জনতার যে আগ্রহ দেখিয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করা কঠিন।

শিক্ষার মধ্যে সংগীতের স্থান আজ দেশ মানিয়া লইয়াছে; কিন্তু আলোচ্য পর্বে তখনও শিক্ষাশাস্ত্রী ও শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তাগণ এ তত্ত্বটিকে অন্তর হইতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস অতঃপর 'শিক্ষা-বিভাগ কলা-বিদ্যার সম্মানকে শিক্ষিত মনে স্বাভাবিক করে দেবেন।'

দ্বিতীয় ভাষণ বা শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ[৩] প্রবন্ধে নূতন কথা কিছু ছিল না। গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য কবি যে যুক্তি দিয়া আসিতেছেন, এবারও তাহাই বলিলেন— তবে বলিবার ভাষা ও ভঙ্গিই ছিল নূতন। কবি এখানে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন— য়ুরোপের ন্যায় ভারতও বহু ভাষাভাষীর দেশ; রাজনৈতিক মিলনের অভিপ্রায়ে সেই-সব ভাষাকে সংকুচিত করিয়া অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান বণ্টনের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। যেখানে ভেদ সুস্পষ্ট সেখানে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া মিলনের পথ আবিষ্কার করিতে হইবে; এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

এই শিক্ষাসপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে এক ভাষণ প্রদান করেন।[৪] বিশ্বভারতী কেন স্থাপন করেন ও উহার অন্তর্নিহিত বাণী কী, তাহাই ছিল বক্তৃতার মর্মকথা। প্রসঙ্গত শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা আসিয়াছে এবং তাহারই অনুক্রমণে গান্ধীজি সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। কবি যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত হইল—

in 1921 the *Ligue internationale pour l' education novelle* at Calais. The new organization was international with many branches in many countries, .. In England the society became the New Education Fellowship. Its first president was Beatrice Esnor, School-Inspectress at London."— Meyer, *Development of Education in the Twentieth Century*, p 108।

১ *Proceedings of the Bengal Education Week*, 1936, Edited by Dr. Muhammad Qudrat-i-Khuda, Calcutta, 1936। শান্তিনিকেতন হইতে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়— রবীন্দ্রনাথ, Ideals of Education, পৃ ৭৮। রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, পৃ ৮৪। রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, পৃ ৪২৫। ডক্টর প্রেমচাঁদ লাল, Rural Education, পৃ ২০৭। ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন, Extra curriculum work in Schools and Colleges, পৃ ২২৯। তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ, Freedom and Discipline, পৃ ৪০২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, স্কুল-লাইব্রেরি, পৃ ৩২৮। ক্ষিতিমোহন সেন, শিক্ষার স্বদেশী রূপ, পৃ ৪১২। নন্দলাল বসু, শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান, পৃ ৪২০।

২ Education Naturalised, *Visva-Bharati Bulletin*, No. 20 [মাঘ ১৩৪২]। শিক্ষার ধারা : The New Education Fellowship, Santiniketan, Bengal। প্রকাশক— শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন এম.এ.পি.এইচ.ডি, সেক্রেটারি, নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ। বঙ্গীয় শাখা— শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)। প্রথম সংস্করণ— ভাদ্র ১৩৪৩, পৃ ৮৯। সূচী— (১) শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২) শিক্ষার স্বদেশী রূপ— ক্ষিতিমোহন সেন (৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪) শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান— নন্দলাল বসু (৫) আশ্রমের শিক্ষা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; এই প্রবন্ধটি প্রবাসী ১৩৪৩ আষাঢ়ে প্রকাশিত হয়।

৩ শিক্ষা, ২য় সংস্করণ (১৩৫১), পৃ ২২৯।

৪ সভায় কলিকাতার Lord Bishop এবং Metropolitan of India সভাপতি ছিলেন। *Visva-Bharati News*, February 1936, p 63।

"We have been waiting for the Person. Such a personality as we see in Mahatma Gandhi. It is only possible in the East for such a man to find recognition. This man has neither physical nor material power, but his humanity reveals itself in its simple majesty and invokes within us a strong assurance of Man the indomitable: and the people downtrodden for centuries, their backs bent down under loads of indignity, suddenly stand up ready to suffer, and through suffering, conquer . .

"Not an association, not an organization, not a politician, but a Man! And his message goes deep into our veins. He attacks the enemies that are within us . . The people believe in him . .

"When times were dark, there came a man in other days to people who needed salvation, emancipation from the fetters of materialism. He came to their door. The babe, born in obscurity, brought exaltation to man . . And when all the machinery will be rusted, he will live.

"I have felt that the civilization of the West today has its law and order, but no personality. It has come to the perfection of a mechanical order but what is there to humanize it! It is the person who is in the heart of all beings. We have seen, we have known him within us, in the depth of our consciousness. Only when West comes to him will there be peace. And I who belong to an unrecognized corner of the world have been cherishing the hope for long years that Visva-Bharati will find voice to proclaim that peace is not waiting to be concocted out of their cleverness by men who do not believe in it, to be constructed through political manœuvering performed by nations boasting of their power, but peace can only be realized in the spiritual revelation of man whose inexhaustible wealth is in his own fulfilment."[১]

বঙ্গের শিক্ষাসপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ) পাঠ করেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়; প্রবন্ধটির শেষ পৃষ্ঠায় একটি 'পুনশ্চ' আছে। তাহার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হইতে নিম্নে আমরা কয়েকটি পংক্তি উদ্‌ধৃত করিলাম; প্রস্তাবটি কবি বাংলার শিক্ষা-মন্ত্রীকে পাঠাইয়া দেন। প্রস্তাবটি এই:

"দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে ছোটোবড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমত ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। তাই

১ Proceedings of the Bengal Education Week, 1936. pp 78-83. The ideal of Visvabharati: Address by Dr. Rabindranath Tagore।

আশা করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীর দেয় অর্থ থেকে অনায়াসে এর ব্যয় নির্বাহ হবে। এই উপলক্ষে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে করে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নির্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল। তা ছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রার কর্ণধার।"[১]

শিক্ষাসপ্তাহের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব[২] পেশ করেন অর্থাৎ বাংলাভাষার মাধ্যমে যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারিত হইবে— এই প্রস্তাব বাংলার লীগ গভর্নমেণ্ট সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন ও গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে কিছুটা উৎসাহ দেখাইলেন; শ্যামাপ্রসাদ তখন ভাইস-চান্‌সেলর। বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা-পরিচয়' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। দুঃখের বিষয় এই লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় খুব বেশি বই বাহির হয় নাই।

বাংলায় গ্রন্থ-রচনার প্রধান অন্তরায় তাহার পরিভাষার দীনতা; এই বিষয়ে এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান-সংস্কার এবং বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ সংকলন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ উভয়টিতেই অংশ গ্রহণ করেন।[৩]

কলিকাতায় নবশিক্ষাসংঘের সভায় বক্তৃতাদি শেষ করিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন; পথে অল্প সময়ের জন্য বর্ধমানের উকিল ও ধনিকোত্তম দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে বর্ধমানের মহারাজ উদয়চাঁদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এক সভায় কবি-সংবর্ধনা করিলেন। বর্ধমানে কবির এই প্রথম ও শেষ সংবর্ধনা।[৪]

বসন্তকাল; কিন্তু ঋতুরাজ এবার যেন কবিচিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে না। 'দেহাতীত' কবিতা (৭ নভেম্বর ১৯৩৫) লিখিবার পর প্রায় তিন মাস গিয়াছে। কাব্যশ্রীর সহিত কচিৎ সাক্ষাৎ হয়, তাই বসন্ত-সমাগমে বড়ো দুঃখে বলিতেছেন—

একদিন আপন হাতে আমার চোখে বিছিয়েছিলে বিহ্বলতা,
রক্তে দিয়েছিলে দোল,
চিত্ত ভরেছিলে নেশায়, হে আমার সাকী।
পাত্র উজাড় ক'রে
জাদুরসধারা আজ ঢেলে দিয়েছ ধুলায়।
আজ উপেক্ষা করেছ আমার স্তুতিকে,
আমার দুই চক্ষুর বিস্ময়কে ডাক দিতে ভুলে গেলে;
আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো আকূতি নেই, . .
একদিন নিজেকে নূতন নূতন ক'রে সৃষ্টি করেছিলে মায়াবিনী,
আমারি ভালোলাগার রঙে রঙিয়ে।

১ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৩, পৃ ১৪৩-৪৪।

২ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন যে, ১৩২৪ সালে (প্রবাসী, শ্রাবণ) এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম উদয় হয়। পাটনার অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের উপর কাজের ভার পড়ে।— প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৩। কবির তিরোধানের দুই বৎসর পর বিশ্বভারতী প্রকাশন-বিভাগ 'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ' নামে গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

৩ দ্রষ্টব্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় -লিখিত ভূমিকা, ৮ মে ১৯৩৬।

৪ দেবীপ্রসন্নবাবু বিশ্বভারতীর জন্য কবিকে পাঁচ শত টাকা দান করেন। *Annual Report, Visva-Bharati*, 1936; p 39।

আজ তারি উপর তুমি টেনে দিলে
যুগান্তের কালো যবনিকা—
বর্ণহীন, ভাষাবিহীন।[১]

সৃষ্টিকার্য না থাকিলেও সমালোচক ও সম্পাদকের কার্য করিতে হয় নিজের গ্রন্থপ্রকাশনকালে। এই সময়ে কবির ‘পঞ্চভূত’ নূতনভাবে প্রকাশনের আয়োজন চলিতেছে। পাঠকরা অবগত আছেন ‘পঞ্চভূতের ডায়ারি’ নামে প্রবন্ধগুলি ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। তার পর ১৩১৪ সালে গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড ‘বিচিত্র প্রবন্ধে’ পঞ্চভূতের ডায়ারি সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হয়— পৃথক পুস্তকের অস্তিত্ব সেই হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। ১৩৪২ সালের শেষ ভাগে কবি গ্রন্থখানি ভালো করিয়া দেখিয়া দিলেন ; ‘সাধনা’ পত্রিকা হইতে বর্জিত অংশগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন। এ ছাড়া কোনো অংশ নূতন করিয়া লিখিয়া দেন। গ্রন্থখানি ১৩৪২ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইল।[২]

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

পাঠকের স্মরণ আছে, গত কয়েক বৎসর হইতে শান্তিনিকেতনে নৃত্যের বহুবিধ পরীক্ষা হইতেছে। অবশেষে কবি বুঝিলেন, নাট্যকাব্যই নৃত্যনাট্য হইবার পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত ; শিশুতীর্থ ও শাপমোচনে নৃত্যনাট্যের শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ পায় নাই, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই নাটকীয় বিষয়বস্তুর বিস্তার ছিল সংকীর্ণ। তাই এবার নৃত্যছন্দে সংগীতকে রূপ দিবার জন্য তিনি ‘চিত্রাঙ্গদা’ নাট্যকাব্যকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করিলেন। বোধ হয় সাতদিনের মধ্যে এইটি লিখিত হয় (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬। ৮ ফাল্গুন ১৩৪২)।

স্থির হইল কলিকাতায় ‘নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা’র অভিনয় হইবে। তজ্জন্য মহড়া চলিতে লাগিল ; মহড়ার সময় ছোটোখাটো কত যে পরিবর্তন হইতে লাগিল, তাহার হিসাব নাই ; স্রষ্টা ও শিল্পীর (artist ও technician) যুগ্মরূপের সাধনায় নৃত্যনাট্য রচিত হইয়া চলিল। অভিনয়কে সুন্দর করিবার জন্য রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথের অশেষদান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। আশা করি ভবিষ্যতে কোনো কৃতিমান এই গবেষণাকার্য করিবেন।

চিত্রাঙ্গদা গীতময় নৃত্যনাট্য, তবে ইহার কয়েকটি গান পুরাতন ; যেমন, ‘ওরে ঝড় নেমে আয়’, ‘বঁধু, কোন্ আলো (মায়া) লাগল চোখে’, ‘সন্ত্রাসের (সংকোচের) বিহ্বলতা’, ‘এসো এসো বসন্ত ধরাতলে’। এ ছাড়া ‘কেটেছে একেলা বিরহের বেলা’[৩] গানটি কয়েকদিন পূর্বে রচিত হয়।

কবির আজিকার এই কাব্য-অনুভূতির কী সংজ্ঞা দিব ? মানসিক না বৈ-দেহিক ! এ যেন সেই শক্তি, যাহার মধ্যে আলো আছে, তাপ নাই— তেজ আছে দাহ নাই। বার্ধক্যে যৌবনের প্রেমকে মানসিকভাবে অনুভব করার মধ্যে

১ উদাসীন [১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬। ৩ ফাল্গুন ১৩৪২] প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৩। পত্রপুট ১১, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৩২-৩৪।

২ দ্র সুধীরচন্দ্র কর, কবিকথা, পৃ ৬৪-৬৫। নরনারী প্রবন্ধের শেষাংশ ৪ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, পৃ ৫৬৬-৬৮।

৩ কবির স্বহস্ত-লিখিত আশীর্বাদপত্রে লিখিত আছে—“কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের শুভপরিণয় উপলক্ষে উৎসর্গ-করা গান।” প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ২৪-১২-৫৩ তারিখে লেখককে লিখিতেছেন, “আমাদের আশীর্বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গানটি রচনা করেছিলেন আমাদের বিয়ের তারিখেই, অর্থাৎ, ৫ই মাঘ ১৩৪২।” তবে, শান্তিদেব ঘোষ লিখিতেছেন, “চিত্রাঙ্গদা রচিত হবার কয়েক বৎসর পূর্বে ‘সেদিন দুজনে’ গানের সঙ্গে একটি যুগ্মনৃত্য রচনা করা হয়। গানের সঙ্গে নাচটি বেশ মানিয়েছিল। এই নাচটি চিত্রাঙ্গদায় রাখবার জন্য যখন প্রস্তাব এল তখন গুরুদেব ‘চিত্রাঙ্গদা’র সঙ্গে কথা মিলিয়ে ‘কেটেছে একেলা’ গানটি লিখলেন।”—রবীন্দ্রসংগীত, পৃ ২৩৬।

অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই আছে। আপনার শুদ্ধ মনের উপর যৌবনের প্রেমলীলার তরঙ্গ উচ্ছলিত করিয়া তাহাকে উপভোগ করিবার দৃষ্টান্ত কবিজীবনে অসংখ্য— 'মহুয়া' শেষ বয়সের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' লিখিয়া অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করিলেন ; অথবা বলিতে পারি, নৃত্যের সঙ্গে সুরের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করিয়া অভিনয়ের জন্যই পুরাতন নাট্যকাব্যখানিকে নৃত্যনাট্যে নূতন রূপ দান করিলেন। মূল নাট্যকাব্য লিখিবার সময় মন ছিল ভাব ভাষা ও ছন্দের 'পরে নিবিষ্ট— অপরূপ সে সৃষ্টি।

চিত্রাঙ্গদার অভিনয় বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। যুগের পরিবর্তন হইয়াছে। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমপর্বে, অর্থাৎ কবির বিলাত যাইবার পূর্বে, 'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' ও নাট্যকাব্যের 'চিত্রাঙ্গদা' ছাত্ররা পড়িতে পারিত না। সেইজন্য ছেলেদের বইয়ের ঐ অংশগুলি অধ্যাপকরা সেলাই করিয়া দিতেন। মাঝে কথা ও কাহিনীর এক সংস্করণে পরিশোধ কবিতার পরিবর্তে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতা সংযোজিত হয় ; এইটি ঘটে বিশ্বভারতী প্রকাশন-বিভাগের আদিপর্বে। এই-সব ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও তাঁহার অজ্ঞাতে যে এ-সব হইত তাহাও নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শান্তিনিকেতনে এমন একদিন ছিল, যখন পৌষের একদিনের সামান্য মেলায় আশ্রমের মেয়েরা যাইতে পাইত না। শান্তিনিকেতনের অতিথিশালার দ্বিতল গৃহে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকায় মেয়েরা অভিনয় করে, কোনো অধ্যাপক বা ছাত্র দেখিতে যাইতে পায় নাই। এখন রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সর্বত্র সুস্পষ্ট। নহিলে সেই শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকে মিলিতভাবে চিত্রাঙ্গদা, পরিশোধের ('শ্যামা') অভিনয় করা সম্ভব হইত না। এখানে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে। জীবন-দর্শন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনোপ্রকার obscurantist মনোভাব ছিল না, সমাজ-জীবনের অনিবার্য পরিবর্তনকে সহজ প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি রূপেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন এক দিকে যেমন গভীর আধ্যাত্মিক হইতেছিল, তেমনি বাহিরের দিকে unconventional ও secular হইয়া বিস্তৃতক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে রূপ লইতেছিল। তা না হইলে 'জন্মদিনে'র পাশাপাশি 'ল্যাবরেটরি' লিখিতে পারিতেন না।

চিত্রাঙ্গদা-অভিনয়ের মহড়া চলিতেছে, কবির সম্মুখেই রিহর্সল হয়। শান্তিনিকেতনের বিচিত্র কাজ চলিতেছে যুগপৎ, সমস্তের সঙ্গেই কবির অক্ষুণ্ণ যোগ। এই সময় বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের আহ্বানে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহম্মদ হবীব 'সুফিবাদ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আসেন। কবি একদিন সভায় উপস্থিত হন (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬)। শ্রীনিকেতন ও New Education Fellowship -এর যৌথ ব্যবস্থায় বোলপুর ও ইলামবাজার থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্মেলন আহূত হয়। একদিন সন্ধ্যায় কবির নিকট তাঁহারা উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার কথা উত্থাপন করেন।[১]

শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব বা হোলি প্রতিবৎসর অতি সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হয় ; এখানকার এই উৎসব যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে সৌন্দর্য ও শালীনতা রক্ষা করিয়া এই দিনে পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করা যায়। ৮ মার্চ (১৯৩৬) দোলের দিন জবহরলাল নেহেরুর পত্নী কমলা নেহেরুর মৃত্যু-সংবাদ আসিলে মন্দিরে কবি উপাসনা করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে তিনি জবহরলাল সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়।[২] কবি বলেন, "আজ হোলির দিন, আজ সমস্ত ভারতে বসন্তোৎসব। চারি দিকে শুষ্ক পত্র ঝরে পড়বে তার

১ *Visva-Bharati News*, March 1936, p 71।

২ *Visva-Bharati News*, March 1936, pp 75-76। অনুবাদ সমসাময়িক দৈনিক, ২৪ ফাল্গুন ১৩৪৩। কমলা নেহেরুর সুইট্জারল্যান্ডের Lausanne শহরে ২৮ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু হয়।

মধ্যে নব কিশলয়ের অভিনন্দন। আজ জরাবিজয়ী নূতন প্রাণের অভ্যর্থনা জলে স্থলে আকাশে। এই উৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের নবজীবনের উৎসবকে মিলিয়ে দেখতে চাই। আজ অনুভব করব যুগসন্ধির নির্মম শীতের দিন শেষ হল, এল নবযুগের ঋতুরাজ জবহরলাল। আর আছেন বসন্তলক্ষ্মী কমলা তাঁর সঙ্গে অদৃশ্য সত্তায় সম্মিলিত। তাঁদের সমস্ত জীবন দিয়ে ভারতে যে বসন্ত-সমাগম তাঁরা ঘোষণা করেছেন, সে তো অনায়াস আরামের দিক দিয়ে করেন নি। সাংঘাতিক বিরুদ্ধতার প্রতিবাদের ভিতর দিয়েই তাঁরা দেশের শুভ সূচনা করেছেন। এইজন্যে আমাদের আশ্রমে এই বসন্তোৎসবের দিনকেই সেই সাধ্বীর স্মরণের দিন রূপে গ্রহণ করছি। তাঁরা আপন নির্ভীক বীর্যের দ্বারা ভারতে নবজীবনের বসন্তের প্রতীক।"

পরদিন অভিনয়ের দল লইয়া কবি কলিকাতায় গেলেন। এম্পায়ার থিয়েটরে পর পর তিন দিন চিত্রাঙ্গদার অভিনয় হইল ১১, ১২ ও ১৩ মার্চ ১৯৩৬। সমসাময়িক *Statesman* ১৭ মার্চ ১৯৩৬ তারিখে চিত্রাঙ্গদা-অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "The form of the dance-drama 'Chitra' makes it embarrassing to label it by a class-name. It is a ballet yet rebelling against its accepted conventions; it is a pageant of dances, yet its theme, dramatic elements and continuous 'story' carry it on a plane higher than recitals of thematic dances; it is a drama, but the dialogue is reduced to a minimum, and its monuments are expressed not through events and happenings but through songs and dances. .

"One cannot leave out of the picture and relegate below the foot-lights— the musicians who offer such valuable co-operation to the dancers and the actors. Their musical threads help to hold the bits of fragrances in their places and sew them into a garland of colour, song and gestures. The orchestra represented by a single *Esraj* and some cymbals and with a variegated group of voices, are skilfully selected, the voice of the leading lady providing the 'high lights'.

"A word of commendation is due to the designer of the costumes. He borrows ideas from the repertories of the continental Asiatic stage— from the Javanese and Cambodian dancers, from the Burmese Pwe, as well as the Indian nautch girl and exploits old models with effective innovations.

"In the style of the dances which make up the warp and woof of the play, the same tendency was apparent. The production has the dash and colour of the ballet, the piquancy of a drama, the fragrance of a lyric, the symbolism of a Tibetan mystery play, and the pagentry of lavishly staged dance-recitals."[১]

অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে'র মর্মকথাটি রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত রূপে ব্যক্ত করেন—

প্রভাতের প্রথম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে,
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারি আঘাত।

১ *Visva-Bharati News*, April 1936, p 74।

অবশেষে সেই আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে জাগ্রত জগতে।
তেমনি সত্যের প্রথম আবির্ভাব সাজ-সজ্জার বহিরঙ্গে বর্ণবৈচিত্র্যে,
তাই দিয়ে অসংস্কৃত চিত্তকে সে করে মুগ্ধ।
অবশেষে নিজের সেই আচ্ছাদন যখন সে মোচন করে
তখন প্রবুদ্ধ মনের কাছে নির্মল মহিমায় তার বিকাশ।
এই কথাটিই চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।
এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে আছে প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
নিরলংকার সত্যের সহজ মহিমায়।[১]

বাংলা সাময়িক সাহিত্যে একদিন 'চিত্রাঙ্গদা' অশ্লীল রচনা বলিয়া অপাংক্তেয় ছিল। লোকের রুচির পরিবর্তন হইয়াছে। এই নৃত্যনাট্যের উপর অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক রবীন্দ্রসাহিত্যামোদীর পাঠ করা আবশ্যক। তিনি আলোচনার এক স্থলে বলিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী, তাই তাঁর সৃষ্টিকে স্থাপত্য বলতে ইচ্ছা হয়— যেখানে মন্দিরের সঙ্গে পরিবেশের মিলন অঙ্গাঙ্গী, যার মধ্যকার ভাস্কর্য স্থাপত্যের অন্তরঙ্গ, যার দেওয়ালের চিত্র ভাস্কর্যের অনুরূপ, যার পূজারি, উপাসক সম্প্রদায়ের গঠন, আচার-ব্যবহার, গতিভঙ্গিটিও অত্যন্ত সুসদৃশ, যার নৃত্য গীত যেন সেই মন্দিরের পাথরগলা স্রোত, যার নৃত্য নিষ্ঠাচারের অঙ্গ। কল্পনা-কৈবল্যর জন্যই চিত্রাঙ্গদা নৃত্য-নাট্য একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি।"[২] গ্রন্থের অধিকাংশই গান এবং সে-গান নাচের উপযোগী করিয়াই রচিত; সেইজন্য ভূমিকায় কবি লেখেন, "এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহু দূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে প্রাণীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপর চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।"

কবিতা বা ছন্দোবদ্ধ পদ্য চিরদিনই 'গীত' (গাথা) হইয়া আসিয়াছে, কি এদেশে কি বিদেশে। কবিতা যন্ত্রাদি-সংযোগে গীত হইলে তাহা হয় 'সংগীত'। সংগীত সহজেই মনে ছন্দের দোলা ও দেহে নৃত্যের আবেগ আনে। মানবের আদিযুগ হইতে সংগীত ও নৃত্য যমজের ন্যায় সমাজের মধ্যে লালিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নৃত্য সংগীত ও সংলাপপূর্ণ অভিনয়ের ত্রিধারা-সংযোগে যে রস সৃষ্টি হইতে পারে তাহার পরীক্ষা বাংলায় করিলেন রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে সমস্ত রস সমভাবে বণ্টিত হইয়াছে কি না তাহার বিচারক সুরশিল্পী ও রূপদক্ষরা। তবে সংক্ষেপে এই কথাটি বলা যাইতে পারে যে, নাটকীয় ঘটনায় স্বচ্ছন্দগতি রক্ষার জন্য কবিকে এমন-সব বস্তুর আমদানি করিতে হইয়াছে যাহা হয়তো এই নাটকের অঙ্গ নহে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা বিষয়ে দুই-একজন সমালোচকের মত এই যে, "কোনো কোনো স্থানে নাটকের গতি সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকে নি, হয় বাধাপ্রাপ্ত নয় গতি মন্থর হয়েছে।" কেন এইটি ঘটিয়াছে সে বিষয়ে শান্তিদেবের মত এই যে, চিত্রাঙ্গদা ও তৎশ্রেণীর "নাটকগুলি সব সময়েই নাচের তাগিদে লেখা"। তিনি

১ দ্র প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪২, পৃ ৮৮৯। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য অভিনয় [সচিত্র]। পরে এই পাঠ বদলাইয়া দেন। দ্র ভূমিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ ১২৯ ও ৪২৩।

২ কথা ও সুর, পৃ ৮৭।

বলেন, "অনেক সময়ে এই-সব নাটকের কতক অংশ কেবলমাত্র নাচের প্রয়োজনে লিখিত, মহড়ার সময় এখানে সেখানে নতুন কথা সংযোজিত হয়। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় বাড়াবার জন্যেও এখানে সেখানে তিনি গান জুড়েছেন। সাজবদলের জন্যে সময়ের দরকার, তখনো গান বসিয়েছেন। তা ছাড়া 'চিত্রাঙ্গদা'তে এমন কতকগুলি নাচ আছে যা এটির বহু পূর্বে রচিত। সেগুলি তখনকার যুগে শান্তিনিকেতনে ভালো নাচ হিসেবে পরিচিত ছিল। কেবলমাত্র ভালো নাচ বলে 'চিত্রাঙ্গদা'য় যখন সেগুলি রাখার কথা হয় তখন তিনি তাতে আপত্তি করেন নি, কিন্তু নাটকের যে যে জায়গায় সেগুলিকে বসানো হয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে গানের কথা বদলে দিয়েছেন, যাতে ভারসাম্য থাকে। সুর ও ছন্দ -বদলে তিনি হাত দেন নি। 'চিত্রাঙ্গদা'য় এই ধরনের গান ও নাচ অনেক বসেছে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য' প্রবন্ধে প্রতিমা দেবী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কবির মত ও বিশ্লেষণ রূপেই উদ্‌ধৃত করা যাইতে পারে—

"চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে যে, নৃত্যনাট্যে কলাকৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে না, তার ভাষা হল সুর ও তাল; ভাব খেলে তার দেহরেখায়। এই রেখার খেলা মাত্রেই ছবির বিষয় এসে পড়ে, তাই তার জন্যে পটভূমির দরকার হয় রঙ ও আলো। এই রঙ আলো ছাড়া নৃত্যকলার পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলা শক্ত, বিশেষতঃ যখন সে নাটকীয় রাজ্যে গিয়ে পৌছয়। নাচেতে দেহের রেখা খুব নিখুঁত হওয়া চাই, কোথাও তার কোনো অবান্তর ভঙ্গি হলে তালের সঙ্গে ভঙ্গির সংগতি রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন ছাড়া নৃত্যকলা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কবিতা ও গদ্যে যে তফাত, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই-রকমই পার্থক্য।"[২] প্রতিমা দেবী এই প্রবন্ধে শান্তিনিকেতনে নৃত্য কিভাবে ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হয় তাহার ইতিহাস বলিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ভারতীয় নৃত্যকলার মণিপুরী ও দক্ষিণী শৈলী ছাড়া য়ুরোপের নৃত্যভঙ্গিও তিনি ইংলন্‌ডে ডার্টিংটন-হলে ভালোভাবেই দেখিবার সুযোগ পান; এবং সেটি 'চিত্রাঙ্গদা'র নৃত্য শিখাইবার সময় কাজে লাগে।

উত্তর-ভারতে সফর ও তার পরে

কলিকাতায় চিত্রাঙ্গদার অভিনয় সর্ববিষয়ে সফল হইল। ইহার পর বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন যে, উত্তর-ভারতের প্রধান প্রধান নগরে এই অভিনয় দেখানো হইবে; শান্তিনিকেতনের কলাচর্চার আদর্শ প্রচার ও বিশ্বভারতীর শূন্য তহবিল আংশিকভাবে পূর্ণ করা— এই সফরের উদ্দেশ্য।

কলিকাতায় অভিনয়ের পর একদিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া রবীন্দ্রনাথ পঁচাত্তর বৎসর বয়সে অভিনয়ের বিরাট বাহিনী লইয়া উত্তর-ভারত যাত্রা করিলেন; ছাত্রছাত্রীদের পরিদর্শন করিবার জন্য যথোপযুক্ত লোক ছিলেন।

১৬ মার্চ কবি পাটনা পৌঁছিলেন। "The Poet was received by a large and enthusiastic, though unmanageable crowd on his arrival at the Patna station and practically every one of note was there to welcome him on behalf of the city."[৩]

পাটনায় দুই রাত্রি অভিনয় হইল (১৬ ও ১৭ মার্চ ১৯৩৬)।[৪] দ্বিতীয় দিন হুইলার-হলে কবি-সংবর্ধনা;

১ শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্র-সংগীত, পৃ ২৬৮। ২ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৭৯২।

৩ *Annual Report, Visva-Bharati*, 1936, p 6।

৪ *The Searchlight*, Patna, 18 March 1936. Quoted in *Visva-Bharati News*, May-June 1936, p 63।

পাটনা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস সভাপতি। নাগরিকগণ কবির হস্তে বিশ্বভারতীর জন্য একটি টাকার তোড়া উপঢৌকন দেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সেই রাত্রেই কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা এলাহাবাদ যাত্রা করেন; সেখানে ১৯শে চিত্রাঙ্গদার অভিনয় হইল।[১] পর দিন তাঁহাদের লাহোর যাত্রা করিতে হইল, সেখানে ২২শে ও ২৩শে মার্চ অভিনয়ের দিন ধার্য ছিল। লাহোরে দুই দিন থাকিয়া কবি দিল্লী ফিরিলেন (২৫ মার্চ)।

দিল্লী পৌঁছিবার দিন অপরাহ্ণেই লালা রঘুবীর সিংহের[২] বাটীতে পার্টি; কবি ইতিপূর্বে রঘুবীর-পরিচালিত মডার্ন স্কুল -এর উপাসনা-গৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়াছিলেন। পূর্বের ব্যবস্থামত রিগ্যাল থিয়েটরে দুই দিন (২৬ ও ২৭ মার্চ) চিত্রাঙ্গদা -অভিনয় হয়। ইতিমধ্যে দিল্লীতে একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়া যায়; দিল্লী ম্যুনিসিপালিটির তরফ হইতে কবিকে সংবর্ধনা করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সরকারী সাহেব চেয়ারম্যান আপত্তি করেন। ইহাতে কয়েকজন ভারতীয় সদস্য শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি ও দেশবন্ধু গুপ্তের নেতৃত্বে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যান ও কুইন্‌স্‌ গার্ডেনে জনসভা করিয়া কবির সংবর্ধনা করেন। সভায় স্বাগত সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে কবি এই ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত প্রচ্ছন্ন উল্লেখ করিয়া দিল্লীর নাগরিকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "In this busy season when numerous important functions crowd your days, you have, against some obvious difficulties, created this opportunity to receive me on behalf of the citizens of Delhi."[৩]

কবি যেদিন দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিলেন সেইদিনই সন্ধ্যায় গান্ধীজি ও কস্তুরাবাই কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। গান্ধীজি[৪] তাঁহার হস্তে ষাট হাজার টাকার একখানি চেক্‌ দিয়া বলেন যে, কবির যে-বয়স তাহাতে তাঁহার পক্ষে এভাবে অর্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ানো সমীচীন হইবে না; এই টাকায় বিশ্বভারতীর ঋণভার শোধ হইবে। এই অপ্রত্যাশিত দান মহাত্মাজির মারফত পাইয়া কবি যে কী পরিমাণ সুখী ও নিশ্চিন্ত হইলেন তাহা বলা যায় না।[৫]

১ *The Leader*, Allahabad, 20 March 1936।

২ প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে পিয়ার্সন সাহেব এই রঘুবীরের গৃহশিক্ষক ছিলেন; পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইলে রঘুবীরের পিতা সুলতান সিংহ পিয়ার্সনকে বলিয়াছিলেন, আপনি শান্তিনিকেতনকে সাহায্য করিতে চান অর্থ দিয়া করুন। কিন্তু পিয়ার্সন আশ্রমের জন্য আত্মত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন— অর্থমাত্র নহে। সামান্য একশত টাকা বেতন লইয়া পিয়ার্সন আশ্রমের কাজ গ্রহণ করেন। C. F. Andrews, *The Modern School*, New Delhi; *The Modern Review*, February 1935 (*Ill.*), pp 166-69।

৩ সমগ্র ভাষণ দ্র Reply to the public address in Delhi, *Visva-Bharati News*, May-June 1936, pp 90-91।

৪ কাগাওয়া জাপানের একজন বিখ্যাত জনহিতকর্মী ও শান্তিকামী। তিনি কয়েকমাস পূর্বে যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন গান্ধীজির সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কাগাওয়া বলেন, বাংলাদেশে তিনি গোসাবা দেখিতে যাইবেন। গান্ধীজি প্রশ্ন করেন, শান্তিনিকেতন যাইবেন না? তিনি 'না' বলায় মহাত্মাজি বলেন— 'গোসাবা গোসাবা, কিন্তু শান্তিনিকেতন ভারতবর্ষ' ('Well, Gosaba is Gosaba, but Santiniketan is India')। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৩, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ ৪২১-২২।

৫ "The donation of Rs. 60,000 from an anonymous friend . . relieved the Founder President of a heavy constant source of anxiety and apprehension . . Mainly owing to this gift and the strict methods of economy in the working of the various departments, we have been *able to clear off all our past accumulated debts* and have had pleasure of seeing the financial year end this September (1936) *without any deficit in the balance*." — *Annual Report*, *Visva-Bharati*, 1936, p 1, *(Italics are ours)*।

অভিনয়ের দল লইয়া অন্যান্য শহরে যাইবার যে-ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হইল; কেবল মিরাটে অভিনয়ের ও কবি-সংবর্ধনার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া সেখানে একদিনের জন্য কবিকে যাইতে হইল (২৯ মার্চ ১৯৩৬)।

মিরাট হইতে ফিরিবার পরদিন দিল্লীর হিন্দু-কলেজে কবির সংবর্ধনা হইল; সেইদিন অপরাহ্ণে নয়াদিল্লীর বাঙালি সমাজ কবিকে এক উদ্যান-সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করিলেন। সেই সন্ধ্যায় দিল্লী রেডিও স্টেশন হইতে কবি কয়েকটি আবৃত্তি করেন।

অতঃপর ১ এপ্রিল (১৯৩৬) কবি দিল্লী ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শান্তিনিকেতনে এক সপ্তাহ থাকিয়া কবি কলিকাতায় যান (৯ এপ্রিল); কিন্তু নববর্ষের (১৩৪৩। ১৫ এপ্রিল) পূর্বেই আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। সেইদিন হইতে আবার শুরু হইল গদ্যছন্দের কবিতা লেখা। নববর্ষের দিন লিখিলেন, 'বসেছি অপরাহ্ণে পারের খেয়া ঘাটে'।[১] এই কবিতাটিকে আমরা বলিতে পারি তাঁহার জন্মদিনের কবিতা। কারণ সেদিন আশ্রমে তাঁহার জন্মদিনের উৎসব প্রবর্তিত হয়। 'পঁচিশে বৈশাখ' গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে পড়ে বলিয়া এই বৎসর হইতে এই নববর্ষের দিন জন্মোৎসবের ব্যবস্থা হইল। নববর্ষের প্রাতে মন্দিরে কবি যে ভাষণ দান করিলেন (জন্মদিন। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩) তাহার মধ্যে এই কবিতাটির মর্মকথা পাই, দুইটি রচনা পাশাপাশি পড়িলেই তাহা স্পষ্ট হইবে। এই কবিতায় অনেক কথা, অনেক অভিযোগ, অনেক তত্ত্ব আছে, যাহা পাঠ করিলে কবির বিষাদঘন মনেরই দুর্বলতা প্রকাশ পায়—

দেখেছি শুধু আপনার নিভৃত রূপ
ছায়ায় পরিকীর্ণ,
যেন পাহাড়তলিতে একখানা অস্ফুটতরঙ্গ সরোবর।

.. ..

পাথর ডিঙিয়ে আপন সীমানা চূর্ণ করতে করতে
নিরুদ্দেশের পথে
অজানার সংঘাতে বাঁকে বাঁকে
গর্জিত করল না সে আপন অবরুদ্ধ বাণী,
আবর্তে আবর্তে উৎক্ষিপ্ত করল না
অন্তর্গূঢ়কে।
মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।[২]

১ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩। পত্রপুট ১২; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৩৪।

২ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩। পত্রপুট ১২, ১ বৈশাখ ১৩৪৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৩৪-৩৮।

এই মনোভাবকে নিজেই তিরস্কৃত করিলেন কয়েক দিন পরে লেখা 'শেষ মৌন' কবিতায়।[১]—

কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাতি,
এইবার থামো তুমি। বাক্যের মন্দিরচূড়া গাঁথি'
যত ঊর্ধ্বে তোল তারে তার চেয়ে আরো ঊর্ধ্বে ধায়
গাঁথুনির অন্তহীন উন্মত্ততা। থামিতে না চায়
রচনার স্পর্ধা তব; ভুলে গেছ, থামার পূর্ণতা
রচনার পরিত্রাণ; . . নির্মাণ-নেশায় যদি মাত
সৃষ্টি হবে গুরুভার, তার মাঝে লীলা রবে না তো।

পত্রপুটের শেষ দুইটি কবিতা[২] গভীরভাবে অধ্যয়নের উপযোগী, বিশেষভাবে 'ব্রাত্য' সম্বন্ধে রচনাটি। এখানে নিজের জীবনের কথাই যেন কহিয়াছেন— নিজ অন্তরের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষার কথা, আদর্শের কথা :

আমি ব্রাত্য, আমি পংক্তিহারা।
বিধান-বাঁধা মানুষ আমাকে মানুষ মানে নি, . .
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।

Convention বা সংস্কার -হীন কবিমনের এই কথা; ধর্মীয় সামাজিক সকলপ্রকার সংস্কার ও বন্ধনের বিরোধী মন। রবীন্দ্রনাথ দল বা সম্প্রদায় গড়েন নাই, তাই সর্বদলের দ্বারা উপেক্ষিত তিনি চিরদিনই। সমাদৃতও সেইজন্য।

কবিকে কখনো উপেক্ষা করে নাই নারী, আর তিনিও উপেক্ষা করেন নাই নারীকে। রবীন্দ্রনাথের নিকট অবচ্ছিন্ন নারীমূর্তি চিরকাল নানা প্রতীকে রূপ লইয়াছে— তাঁহার কবিতায়, তাঁহার পত্রধারায়। যুগযুগান্ত হইতে কবি ও শিল্পীর ধ্যানের ও রূপায়ণের বিষয় নারী; চিরদিনই সে তথাকথিত সংসার-অনাসক্ত বীতকাম বৈরাগীর উপেক্ষার পাত্রী, 'নেতি নেতি'র দ্বারা অস্বীকৃত; তৎসত্ত্বেও মনের মধ্যে সেই মোহিনীশক্তি আসা-যাওয়া করে। কবির জীবনে ও সাহিত্যে নারী যে কতখানি স্থান জুড়িয়া আছে তাহা এই কবিতায় অতি স্পষ্ট ভাষায় উদ্গীত হইয়াছে; এখানেও সেই 'দুই নারী', বারে বারে যাহার কথা বলিয়াছেন নানা ভাবে, নানা সুরে—

সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে,
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত -বাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান ক'রে উঠেছে

১ পত্রপুট ১৮, ৫ বৈশাখ ১৩৪৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৫২।
২ পত্রপুট ১৪ (১৯ বৈশাখ ১৩৪৩) ও ১৫ (ব্রাত্য, ১৮ বৈশাখ ১৩৪৩)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৪০-৪৮।

তারি অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহে-মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।
সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে, . .

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য— আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য— ভালোবাসার অমৃত।[১]

সেই 'অপরিসীম ধ্যানরূপে'র তরুণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

ওগো তরুণী,
ছিল অনেক দিনের পুরানো বছরে
এমনি একদিন নতুন কাল,
দক্ষিণ হাওয়ায় দোলায়িত,
সেই কালেরই আমি। . .
ওগো চিরন্তনী,
আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এল—
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।
ডাকতে এলেম আমার হারিয়ে-যাওয়া পুরোনোকে
তার খুঁজে-পাওয়া নতুন নামে।[২]

কাব্যের ধারা চলে অন্তরে, ঘটনার ধারা চলে সংসারে। ঘটনার ধারায় কবি সাধারণ মানুষের মতোই— সেখানে পরিবারের, সমাজের, দেশের লোকে টানাটানি করে— মানুষ রবীন্দ্রনাথকে সাড়া দিতে হয়। পারিবারিক ঘটনা হইতেছে দৌহিত্রী নন্দিতা গাঙ্গুলির বিবাহ; নন্দিতা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর একমাত্র সন্তান। মীরা দেবীর পুত্র নীতীন্দ্রনাথের ইতিপূর্বে মৃত্যু ঘটিয়াছিল; মীরা দেবীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বহুকাল হইতে এই পরিবারের সহিত বন্ধনহীন। নন্দিতার বিবাহাদির সকল ব্যবস্থা মাতুল রথীন্দ্রনাথকেই করিতে হইয়াছিল। নন্দিতার বিবাহ হইল কৃষ্ণ কৃপালনীর[৩] সহিত। ইঁহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ; তজ্জন্য যথাযথ ভাবে সিউড়িতে ১৮৭২ সালের ৩ আইন বা সিবিল-বিবাহ আইন মতে বিবাহ রেজিস্টারি করা হয়। আবার পারিবারিক রীতি অনুসারে 'শুভদিন' দেখিয়াও বিবাহের দিন ধার্য হয় (১২ বৈশাখ ১৩৪৩)। আশ্চর্যের বিষয়, যে-রবীন্দ্রনাথ

১ পত্রপুট ১৫; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৪২-৪৮।
২ পত্রপুট ১৪, ১৯ বৈশাখ ১৩৪৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৪০-৪১।
৩ কৃষ্ণ কৃপালনী, জন্ম ১৯০৭, সিন্ধুদেশে। B. A., Bar-at-Law. ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে আসেন। বিবাহ এপ্রিল ১৯৩৬। শান্তিনিকেতন ত্যাগ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬।

স্বয়ং 'তিন আইন' অনুসারে বিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং 'দিন-দেখা' প্রভৃতি পঞ্জিকা-দেখা ধর্মকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাকে অসহায়ভাবে এ-সব মানিয়া লইতে হইল।

এই বিবাহ উপলক্ষে একটি কবিতা লিখিয়া কবি 'পত্রপুট' কাব্যখণ্ড নবদম্পতিকে উপহার দিলেন। অতঃপর কবির জন্মদিনে কাব্যখণ্ড প্রকাশিত হয়।

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ। শান্তিনিকেতনে পঁচিশে বৈশাখে জন্মদিন অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে উদ্‌যাপিত হইল। পরদিন কবি কলিকাতায় গেলেন (৭ মে ১৯৩৬); উঠিলেন বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাটিতে। বরাহনগর-বাস-কালে কবির নূতন কাব্যগুচ্ছের সূত্রপাত হইল 'দ্বৈত'[১] ও 'শেষ পহরে'[২] কবিতা দুইটিতে (২৩ মে) — একই দিনে লিখিত। এবার কলিকাতায় আসার প্রত্যক্ষ কারণ P. E. N. ক্লাবের বঙ্গীয় শাখা কর্তৃক কবির জন্মদিন উপলক্ষে সংবর্ধনা। প্রশান্তচন্দ্রের বাটিতেই এই সভা হইয়াছিল। অতঃপর কলিকাতার আশ্রমিক সংঘের দ্বারা কবির জন্মোৎসব পালিত হইল; কবি সেখানে যে ভাষণ দান করেন তাহা 'প্রাক্তনী' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। ভাষণের শেষাংশ উদ্‌ধৃত হইল: "আমার ভাগ্যক্রমে আমি পৃথিবীতে প্রশস্ত আসন পেয়েছি, সেই আসন আমি পেতেছি শান্তিনিকেতনে। নিঃসন্দেহ সেই যোগ শ্লাঘ্য, তার মূল্য আছে। শান্তিনিকেতনের সে গৌরব রক্ষা করবার ভার তোমাদের উপর— তোমরা যদি অনুভব কর যে তোমরা এক সময় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলে, তোমাদের প্রীতি ও নিষ্ঠা যদি অটুট থাকে, তা হলে আমি তোমাদের কাছে থেকে আর কোনো প্রতিদান চাই নে। যদি কখনো এই বিদ্যালয়ের আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, যদি বাধাবিপত্তি আত্মদ্রোহ আসে, তা হলে তোমাদের নিষ্ঠা যেন অবিচলিত থেকে এ'কে রক্ষা করে।"[৩] পুরাতন ছাত্রদের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা। বিশ্বভারতী 'বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত হইয়া গেলেও তাঁহাদের স্থান অ্যাক্টে সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

কবি যখন শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন তখন সেখানে দারুণ গরম। সে বৎসর বীরভূমে যেমন জলাভাব তেমনি অন্নাভাব। রবীন্দ্রনাথ আপনার সাহিত্যসাধনায় মগ্ন থাকিলেও চারি দিকের অন্নকষ্ট কিভাবে শমিত করা যাইতে পারে তজ্জন্য ভাবিতেছেন। এই সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানীয় লোকদের সাহায্যকল্পে জীবনীলেখক শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠস্থিত একটি সুবৃহৎ জলাশয়ের সংস্কারকার্যে ব্রতী হন। তাঁহার এই কার্যে শ্রীনিকেতনের একনিষ্ঠ কর্মী শ্রদ্ধেয় কালীমোহন ঘোষ ও তাঁহার অন্যতম সহকারী নিশাপতি মাঝির সহায়তা স্মরণীয়। নন্দিতার বিবাহ উপলক্ষ করিয়া কবি কয়েকশত টাকা দান করেন[৪] এবং সাধারণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়া দেন। কবির পত্রের সাহায্যে সংগৃহীত ভিক্ষালব্ধ অর্থ, বিশ্বভারতী সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণকৃত অর্থ ও জেলাবোর্ডের সভাপতি জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান-সাহায্যে বাঁধের পঙ্কোদ্ধার হইল। বলা বাহুল্য, এ কাজে ভুবনডাঙা গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলেই সাধ্যমত আর্থিক ও কায়িক সহায়তা দান করিয়াছিলেন। কবি প্রায়ই লেখকের নিকট হইতে পুষ্করিণীর খবর লইতেন। কাজ শেষ হইয়া গেলে বাঁধের তীরে বর্ষামঙ্গল উৎসবে উপস্থিত হইয়া তিনি স্বয়ং বৃক্ষরোপণ করেন।

কবি যে পত্রখানি লেখকের হাতে দেন তাহা উদ্‌ধৃত হইল: "যে সময়ে দাতার অভাব ছিল না ব'লে বাংলা-

১ দ্বৈত, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৩। শ্যামলী; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৬১। দুইটির পাঠ ভিন্ন।

২ শেষ পহরে, বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৪৩। শ্যামলী; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৬২।

৩ প্রাক্তনী, কলিকাতা, ২৭ বৈশাখ ১৩৪৩, পৃ ১৮-১৯।

৪ এই টাকা দিয়া বাঁধের মধ্যে জমিদারদের বন্দোবস্তী কিয়ৎপরিমাণ জমি বোলপুরের জনাব গনি মিঞার নিকট হইতে ক্রয় করা হয়।

দেশের গ্রামে জলের অভাব ছিল না সেই সময়ে ভুবনডাঙার জলাশয়ের সৃষ্টি। এরই জলসঞ্চয়ের উপর চারি দিকের পাঁচখানি গ্রামের তৃষ্ণা নিবারণ ও ফসল-খেতে জলসেচন নির্ভর করে। ক্রমশই এর জল এসেছে শুকিয়ে, জলাশয়ের পরিধি এসেছে সংকীর্ণ হয়ে, অসহায় গ্রামের লোকের দুঃখের অন্ত নেই। পঙ্কোদ্ধার ক'রে এই জলাশয়কে যথাসম্ভব ব্যবহারযোগ্য করবার চেষ্টায় দরিদ্র গ্রামবাসীরা ঋণযোগে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছে। তাদের পক্ষে এই দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে সাহায্য করার জন্য আমরা সকলকে আহ্বান করি। এ কথাও স্মরণ করা কর্তব্য, দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে প্রত্যহ তিন শত লোক এই কর্ম উপলক্ষে অন্ন উপার্জন করতে পারছে, এমন অবস্থায় অতি সামান্য দানও মূল্যবান হয়ে উঠবে। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩৪৩।"[১]

ভুবননগরের এই পুষ্করিণী খনন ব্যাপারে বিশ্বভারতীর কর্মীগণ যে আদর্শ দেখাইলেন তাহার ফল দূরব্যাপী হইয়াছিল। সমবায়ের শক্তিবলে কী হইতে পারে, এই কাজটি তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।[২] এই ঘটনাটি অল্পকাল পরে স্থানীয় রাজপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তৎকালীন মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট বিনোদবিহারী সরকার ও তদীয় বন্ধু সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে গভর্নমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেন বলিয়া শুনিয়াছি; ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় সরকার Bengal Tank Improvement Act পাস করেন (Act XV of 1939)। পর-বৎসর (১৯৪০) বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে এই আইন চালু হইল।[৩]

এই গ্রীষ্মাবকাশের (১৩৪৩) আর-একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঠকের স্মরণ আছে গত মাঘ মাসে (১৩৪২) বঙ্গীয় শিক্ষাসপ্তাহে কবি যে ভাষণ দান করেন, তাহার অনুক্রমণিকা-অংশে বাংলাদেশে লোকশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, কবিদের নির্দেশে গভর্নমেণ্টের নীতির বা রীতির পরিবর্তন হয় না। অতঃপর বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের নিকট কবি তাঁহার প্রস্তাব পেশ করিলে তাঁহারা সানন্দে উহা গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল বিশ্বভারতী লোকশিক্ষার আয়োজন করিবেন।

লোকশিক্ষার পাঠক্রম ও পরীক্ষাদির ব্যবস্থার ভার পড়ে জীবনীলেখকের উপর; তিনি কবির পরামর্শ ও উপদেশমত 'লোকশিক্ষা সংসদ' গঠন কার্যে ব্রতী হন ও পাঠক্রম পাঠ্যসূচী প্রভৃতি প্রস্তুত করেন।[৪]

কবি শ্যামলীতে আছেন; আপন মনে ছবি আঁকেন, পড়াশুনা করেন। এবার ছুটির নিরালায় জবহরলালের *Autobiography*খানি পড়িয়া শেষ করিলেন; জবহরলালকে লিখিলেন (৩১ মে ১৯৩৬) "I feel intensely

১ দ্র সুধীরচন্দ্র কর, প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ; মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৫৭, পৃ ৬৩৭। লোকসেবক রবীন্দ্রনাথ, অগ্রহায়ণ ১৩৬০, পৃ ১৯৪। এই পত্রখানি গ্রামের অন্যতম কর্মী জনাব রোস্তম আলির নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি সেখানি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন।

২ লাবপুরের জমিদার সাহিত্যিক ও নাট্যরসিক রায় বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে এই বাঁধটিকে ভুবনডাঙা জল-সরবরাহ সমিতির সভাপতি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাঁহাকে জমা দেন; পরে অন্য শরিকরা দেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে রায়পুরের ভুবনমোহন সিংহ যখন এই গ্রাম পত্তন করেন তখন এই বাঁধটিও তৈয়ারি হয়। তার পর দীর্ঘকালের অযত্নে জলাশয় মজিয়া আসে; এবং যে জলাশয় এককালে প্রায় আশি বিঘা ছিল বলিয়া শোনা যায় তাহা সেটেলমেণ্টের সময় (১৯২৭-২৮) মাত্র ২৬ বিঘায় পরিণত হইয়াছিল। জল-সরবরাহ সমিতি যখন বন্দোবস্ত পায় তখন উহা ২০ বিঘা মাত্র। দশ বৎসর পর বাংলা সরকার এই জলাশয় শান্তিনিকেতনের জল সরবরাহের জন্য acquire করেন।

৩ অ্যাক্ট সম্বন্ধে তথ্যগুলি বি. কে. গুহ, আই. সি. এস. আনাইয়া দেন (৬-১০-৫৩)।

৪ লোকশিক্ষা-সংসদের পরিচালকদের মধ্যে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষিতদের নাম ছিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর কর্মসচিব তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক, সহকারী সম্পাদক। দ্র. Visva-Bharati Bulletin No. 23. August 1937.

impressed and proud of your achievement. Through all its details there runs a deep current of humanity which overpasses the tangles of facts and leads us to the person who is greater than his deeds and truer than his surroundings."[১] এই পত্র পাইয়া জবহরলাল খুবই প্রীত হইয়া কবিকে এলাহাবাদ হইতে লিখিলেন (১০ জুন ১৯৩৬), "Need I say how proud and grateful I feel to have your commendation in such generous language ? Many friends have used words of praise for my book, some have critisized it. But what you have written goes to my heart and cheers and strengthens me. With your blessings and goodwill I feel I can face a world of opposition. The burden becomes lighter and the road straighter . ." ।

পড়া, ছবি-আঁকা, পত্রালাপ— তাহার ফাঁকে ফাঁকে চলে কবিতা লেখা ; এবারকার রচনাগুলি গদ্য-কবিতা 'শ্যামলী' খণ্ডে (ভাদ্র ১৩৪৩) প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াই নিষ্কৃতি নাই, কেন লিখিলেন তাহারও কৈফিয়ত দিতে হয়। ইতিপূর্বে কাব্য লিখিয়া তাহার 'মানে' লইয়া জবাবদিহি করিয়াছেন অরসিকদের কাছে। 'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে সীতা সম্বন্ধে সন্দীপের কোনো উক্তি লইয়া কবিকে এককালে লেখকরা কিভাবে বিড়ম্বিত করেন তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি।[২] এবার বিড়ম্বনা শুরু হইয়াছে মুসলমান লেখকদের রচনায়। তাঁহাদের চোখে রবীন্দ্রনাথের কাব্য অধর্ম ও পাপাচরণের সমর্থক।

কিছুকাল হইতে মুসলমানদের একদল লোক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু পৌত্তলিকতার ছায়া দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছেন। মুসলমান ছাত্রদের সেই-সব রচনা স্কুলে কলেজে পড়িতে হয় বলিয়া তাঁহাদের ঘোর আপত্তি। বাংলা ভাষা অতি সংস্কৃত-ঘেঁষা, এ লইয়াও আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি 'মোহম্মদী' নামে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক মাসিকপত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে নীতি ও ধর্ম -বিরোধী কথা আবিষ্কার করিয়াছেন 'পূজারিনী' কবিতায় ও 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকাব্যে।

মোহম্মদীর লেখকের মতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩) "বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার" ও "এক কালে ধর্মাধর্ম দুই তরী 'পরে পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ, তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে"— এই-সকল ইসলাম-নীতি-বিগর্হিত কথা রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিতেছেন ! এই-সব লেখা মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে পড়া অনুচিত।[৩]

এই মূঢ়তা নীরবে সহ্য করা ধৈর্যশীল কবির পক্ষেও সম্ভব হইল না। তিনি জবাবের এক স্থানে লিখিলেন, "লেখক পাপ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন ; আমি সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে তাঁকে এই উপদেশটুকু দেব যে, কাব্যে নাটকে পাত্রদের মুখে যে-সব কথা বলানো হয় সে কথাগুলিতে কবির কল্পনা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ সময়েই কবির মত প্রকাশ পায় না। প্যারাডাইস লস্টে The Arch-fiend বলছেন, 'To do aught good never will be our task, But ever to do ill our sole delight'। সন্দেহ নেই, কথাগুলো উদ্ধতভাবে সুনীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ছাত্র বা অধ্যাপক, কোনো মাসিকপত্রের

১ *Visva-Bharati News*, July 1936, P. 4।

২ প্রবাসী লিখিতেছেন, "কবির উল্লিখিত সাহিত্যিক দুর্ঘটনা মনে পড়িতেছে। যিনি রবীন্দ্রনাথকে আসামী খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহারই পিতার কোন নাটক থেকে সীতা সম্বন্ধীয় কিছু দুর্বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন।" আষাঢ় ১৩৩৩, পৃ ৪৫৭।

৩ ইতিপূর্বে 'পূজারিনী' সুনীতিমূলক নয় বলিয়াও কথা উঠিয়াছিল।

সম্পাদক বা পাঠক মিল্‌টনকে এ বলে অনুযোগ করে নি যে, পাঠকের মনে দুর্নীতি ও ঈশ্বরবিদ্রোহ বদ্ধমূল করা কবির অভিপ্রেত ছিল। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা থেকে প্যারাডাইস লস্ট্‌কে উচ্ছেদ করার প্রস্তাব এখনো শোনা যায় নি ; কিন্তু বাংলা দেশে কখনোই শোনা সম্ভব হতে পারে না, জোর ক'রে এমন কথা বলার মুখ আজ আর রইল না।

"হোমারের ইলিয়ড বা মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট্‌ মুখ্যত: পৌত্তলিকও নয় অপৌত্তলিকও নয়— ওরা সাহিত্য। ওদের গ্রহণ বর্জন সম্বন্ধে বিচার করবার সময় একমাত্র রসের দিক থেকেই বিচার কর্তব্য, ধর্মমতের দিক দিয়ে নয়। লজ্জা হয় এই সাদা কথাটারও ব্যাখ্যা করতে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে 'বিচারক' (কথা ও কাহিনী) কবিতাটির জন্য শিক্ষাবিভাগীয় পাঠ্যনির্বাচন সমিতির নিকট হইতে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কবি এই প্রবন্ধের এক স্থানে অতিদুঃখে বলিয়াছিলেন, "সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিয়ে ভাঙা-কপাল আমরা পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করছি, অবশেষে কি সাহিত্যের ললাটে বাড়ি পড়তে শুরু হবে?" কিছুকাল পূর্বে শিখদের হস্তেও তাঁহার লাঞ্ছনা হয় গুরুগোবিন্দ সম্বন্ধে 'শেষ শিক্ষা' (কথা ও কাহিনী) কবিতার জন্য।[২]

বাহিরের ঘটনার ধারা যেমনই চলুক, কবির কাব্যধারা পথ কাটিয়া আপন পথে বহিয়া চলে। বরাহনগরে বাস-কালে যে কাব্যখণ্ডের পত্তন হয় (২৩ মে ১৯৩৬), তাহা ধীর মন্দ গতিতে চলিতেছে শান্তিনিকেতনের এই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও। জুলাই-এর গোড়াতেই 'শ্যামলী'র প্রায় সব কবিতাই লেখা শেষ হয়; কেবল শেষটি লেখেন একমাস পরে (৬ অগস্ট) আর উৎসর্গটি লেখেন আরও পরে (১৭ অগস্ট)। কাব্যখণ্ড প্রকাশিত হয় ভাদ্র মাসে (১৩৪৩)।

শ্যামলীর কবিতাগুলি গদ্যছন্দে লেখা, সাম্প্রতিক রচনা হইতে পৃথক সুরে বাঁধা ; কতকগুলি কথিকা-ধর্মী। শেষ সপ্তক, পত্রপুট প্রভৃতির অত্যন্ত নিবিড় (intense) অনুভূতি প্রকাশের পরে যেন একটু relief খুঁজিতেছেন ; পত্রপুটের শেষ কবিতায় দুই নারীর অন্যতমা প্রিয়া নারী— কবিজীবনে 'অপরিসীম ধ্যানরূপে' 'চিরবিরহের প্রদীপ শিখা'র ন্যায় বিরাজমান ; এ কথা ও এ ভাব বারে বারে তাঁহার কাব্যে আসিয়াছে, আমরাও তাহার কথা বলিয়াছি। চিরপুরাতন, চিরনবীনা সেই উর্বশীর উদ্দেশ্যেই কবিতাগুলি মুক্তি পাইয়াছে— কখনো নিছক গদ্য লিরিক রূপে, কখনো কথিকা রূপে।

যত-সব ভাবনার আবছায়া
উড়ছে ঝাঁক বেঁধে মনের চারি দিকে
হালকা বেদনার রং মেলে দিয়ে। . .
এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,

১ দ্র প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৩, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ ৪৫৫-৫৭।

২ জনাব রেজাউল করিম 'হিন্দু-প্রভাবিত বাংলা-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৩, পৃ ৭৫) এই সমস্যাটিকে অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "নিজ ধর্মের আদর্শ-অনুরূপ নহে বলিয়া যদি মুসলমানকে কোন সাহিত্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে সারা বিশ্বে পড়িবার মত সাহিত্য তাহার জন্য একটিও পাওয়া যাইবে না।"

তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া—
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি[১]

'তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া'য় কয়েকটি কবিতা রচিত ; 'মিলভাঙা'[২] নিজ জীবনের কৈশোর স্মৃতি—

শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে
কখন একলা গেছ নেমে ;
আমি ভেসে চলেছি স্রোতে,
তুমি বসে রইলে ওপারের ডাঙায়। . .
যখন তোমাকে দেখি মনে মনে,
দেখতে পাই তুমি আছ
সেইদিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।
তোমার বয়স গেছে থেমে। . .
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর-বয়সের শ্যামল পারের থেকে ;
এর মধ্যে আছে তার বেগ। . .

কবির শেষ জীবনের কয়েক বৎসরের বহু কবিতা ও গানের মধ্যে এই কৈশোরের 'যত কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ' নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'মিলভাঙা' কবিতায় তাঁর পশরা যেন পূর্ণ হইয়াছে। 'মিলভাঙা'র দুইদিন পরে লেখা 'কালরাত্রে' (২৩ জুন ১৯৩৬) নিজ জীবনের কথা রূপক ছলে বলিয়াছেন। প্রথম জীবনে 'জড়ত্বে ছিলেম পরাভূত', 'চাই চাই' ব'লে শূন্য হাতড়ে বেড়িয়েছিল রাতকানা'। যাহাকে ধরা যায় না তাহাকে না পাইয়া মন হইয়াছিল 'নাস্তিত্বের শিকল-বাঁধা ভৃত্য'। তার পর—

ভোর হল রাত্রি। . .
মন দাঁড়িয়ে উঠল,
বললে, আমি পূর্ণ।
তার অভিষেক হল
আপনারি উদ্বেল তরঙ্গে। . .
উপচে উঠে মিলতে চলল
চারি দিকের সব-কিছুর সঙ্গে।
চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান। . .
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম, 'চাই নে কিছু চাই নে'।

জীবন শুরু হইয়াছিল 'চাই চাই' দিয়া ; মাঝে না-পাওয়ার অভিমানে সমস্তকে সে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিল—

১ বিদায়-বরণ, শান্তিনিকেতন, ৩ জুন ১৯৩৬। শ্যামলী ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৭৯-৮০।

২ মিলভাঙা, শান্তিনিকেতন, ২০ জুন ১৯৩৬। শ্যামলী ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৯৯-১০২।

'নাই নাই'। যেদিন প্রভাতসূর্যের অন্তরে আপনাকে দেখিতে পাওয়া গেল হিরণ্ময় পুরুষ রূপে, সেদিন মন বলিল 'চাই না, চাই না।' যখন মানুষ অনুভব করে 'আমি পূর্ণ' তখনই সে ঘোষণা করিতে পারে— 'চাই না, কিছু চাই না।'

শ্যামলীর কতকগুলি রচনা স্মরণ করায় 'পলাতকা'র কাহিনী— যেমন 'কনি'[১], 'দুর্বোধ'[২], 'বঞ্চিত ও অপর পক্ষ'[৩] 'অমৃত'[৪]। অমৃত কবিতাটিতে ধনী-কন্যা অমিয়ার জীবনে কবি কিসের আদর্শ দেখাইয়াছেন? অমিযা গ্রামে মহীভূষণের কাজ করিতেছে; মহীভূষণের 'বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে রাশিযার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা'। অমিয়ার শেষ কথা এই—

এসেছি তাঁরই কাছে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।
আমি শুধালেম, 'কোথায় আছেন তিনি।'
অমিয়া বললে, 'জেলখানায।'

কবির সহানুভূতি কোন্ দিকে চলিয়াছে— তাই ভাবি।

এই কাব্যখণ্ডের মধ্যে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বাঁশিওআলা' (১৬ জুন ১৯৩৬)। এ যেন বাংলার ব্যথাতুর নারীর অন্তর্বেদনা। স্মরণ হয, সবুজ পত্র -যুগের 'স্ত্রীর পত্র'-নামক ছোটোগল্পটির মর্মকথা। আর স্মরণ করাইয়া দেয় 'পুনশ্চ' কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে'।

সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে ভাষাসৃষ্টির সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড; ভাষার রহস্য রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই আনন্দ দিয়াছে। এই সমযে তিনি 'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক' ও বাংলার বানান-সমস্যা সম্বন্ধে কথা তুলিয়া সমসাময়িক কযেকজন ভাষানবীশকে আলোচনায যোগদান করিতে উদ্‌বুদ্ধ করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য অংশ গ্রহণ করেন।[৫]

গদ্যরচনার সঙ্গে যেমন গভীরভাবে যুক্ত ব্যাকরণের শাসন ও পারিভাষিক শব্দের সৃজন, কবিতা লেখার সঙ্গে তেমনি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছন্দ-বন্ধন। আমাদের এই আলোচ্য পর্বে কবির 'ছন্দ' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয (আষাঢ় ১৩৪৩), গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন দিলীপকুমার রায়কে। কবিকে পত্রালাপের দ্বারা যে কযজন নানা ভাবনায় ও রচনায উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম দিলীপকুমার; ইংরেজিতে যাহাকে বলে provoke করা তাহা করিতে পারিলে অনেক সময রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভাবনাগুলি পাওযা যাইত। দিলীপকুমারের সেই ক্ষমতা ছিল।

১ কনি, শান্তিনিকেতন, ১২ জুন ১৯৩৬। শ্যামলী; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৮৭-৯৪।

২ দুর্বোধ, শান্তিনিকেতন, ৫ জুলাই ১৯৩৬। শ্যামলী; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ১১৫-১১৮।

৩ বঞ্চিত ও অপর পক্ষ— এই যুগ্ম কবিতা 'পাত্র ও পাত্রী' ও 'চন্দ্রমল্লিকা' নামে পরিচিত মাসিকে প্রকাশিত হয়, বৈশাখ ১৩৪৩। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৪৪২।

৪ অমৃত, শান্তিনিকেতন, ৩ জুলাই ১৯৩৬। শ্যামলী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ১০৭-১১৪।

৫ রবীন্দ্রনাথ: শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক; প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৩। কালচার; প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪২। বাংলা বানান; প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৩। শহীদুল্লাহ: বাংলা বানান; প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য: 'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক'; প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৩। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য: 'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক'; প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৩। কবির 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ১৩৪২ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ছন্দ গ্রন্থের অনেক আলোচনার প্রত্যক্ষ উদ্‌বোধক দৌলতপুর কলেজের বাংলাসাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন ও রংপুর কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের সঙ্গে ছন্দ-বিষয়ক যে-সব বাদপ্রতিবাদ হইয়াছিল তাহাও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তি-শেষে কবি লিখিতেছেন (২০ আষাঢ় ১৩৪৩) : "তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও ছন্দের বিচারে তাঁদের প্রবীণতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে থাকি।"

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে কবির প্রবন্ধ বেশি নয়[১]; কবি লিখিতেছেন, "বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যত-কিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হল।" কিন্তু পত্রের মধ্যে আলোচনা করিয়াছেন বিস্তর। কয়েকখানি চিঠি 'ছন্দের' পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে বাংলায় কয়েকখানি গ্রন্থ ও অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে; এ বিষয়ে অগ্রণী অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। তাঁহার 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থখানি কবির ছন্দ-সম্বন্ধীয় ব্যাপক আলোচনার গ্রন্থ। অমূল্যধন, মোহিতলাল, দিলীপকুমার ও তারাপদ ভট্টাচার্য প্রভৃতি লেখকদের দান এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (বৈশাখ ১৩৪১) কবি 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' শীর্ষক যে প্রবন্ধ[২] পাঠ করেন তাহার দীর্ঘ ভূমিকা-অংশে ছন্দ ও নৃত্য সম্বন্ধে তিনি যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনজিজ্ঞাসার অন্যতম কথা। কৈশোরে তিনি বাল্মীকি-প্রতিভায় গাহিয়াছিলেন— "ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে, ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে, জলন্ত কবিতা তারকা সবে।" তখন কবির বয়স কুড়ি বৎসর। সেই হইতে অসংখ্য কবিতায় গানে ছন্দ সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়াছেন। প্রৌঢ়ত্বের অন্তে আসিয়া বিজ্ঞানের তথ্যরাজিকে ছন্দে নূতন রূপ দান করিয়াছেন 'নটরাজে'র কবিতা ও গানে অপরূপ সংশ্লেষণে। পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতার প্রারম্ভে কবি বলেন, "আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ; এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে; দেহটিকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।" এই কথাটিকে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ভালোরূপে বুঝিবার পক্ষে ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনাগুলি অবশ্যপঠনীয়— কেবল প্রকাশের শৈলী বা টেক্‌নিকের জন্য তাহাদের মূল্য নহে— মূলগত তত্ত্বের জন্যই তাহাদের প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছান্দসিক, বহু ছন্দের উদ্‌ভাবক; শব্দ ও ধ্বনি লইয়া তিনি যত পরীক্ষা করিয়াছেন, মনে হয় আর কোনো কবি ইতিপূর্বে কখনো কোথাও তাহা করেন নাই। 'মুক্তক' ছন্দের ভাবটি য়ুরোপ হইতে গৃহীত, কিন্তু বলা বাহুল্য ইংরেজি ও বাংলা ছন্দের আন্তর-প্রকৃতি যে বিভিন্ন এ তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার কাব্যজীবনের প্রত্যুষেই ধরা পড়ে; সেইজন্য তাঁহার ভাব বা ছন্দ কোনোটিই অনুকরণের কোঠায় পড়িয়া থাকে নাই। প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "তাঁর কবিজীবনের সূচনাতেই দেখতে পাই ছন্দের বাধাগুলোকে অতিক্রম করবার একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গানে' তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। এমন-কি 'শৈশব-সংগীতে'ও বালক কবির নবছন্দ-উদ্‌ভাবনের প্রয়াস ও সাফল্য দেখে বিস্মিত হতে হয়।.. 'মানসী'র যুগ থেকেই বিশেষভাবে দেখতে পাই, প্রচলিত রীতির ছন্দের বন্ধনকে অস্বীকার করে কবির ছন্দপ্রতিভার বহুমুখী ধারা যুগপৎ বহু বিচিত্র পথে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।"[৩]

১ ছন্দ, আষাঢ় ১৩৪৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১। 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা আছে; দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৪০১।

২ ছন্দ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, পৃ ৩৬১-৩৭২।

৩ ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১২১।

'ছন্দ' গ্রন্থে একজন মহাকবি ছন্দশাস্ত্রকে কিভাবে দেখিয়াছেন এবং নব নব ছন্দ নিজ প্রতিভাবলে রচিয়াছেন, তাহার ইতিহাস পাই; সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে এ যেন কবির আত্মকাহিনী যাহা ছন্দোরূপে প্রতিভাত হইয়াছে তাঁহার কবিমানসে।

বিচিত্র ঘটনা। ১৩৪৩

আষাঢ়ের (১৩৪৩) শেষ ভাগে কবির সাহিত্যসৃষ্টিতে হঠাৎ বাধা পড়িল। কলিকাতা হইতে কবির কাছে আসিলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও তুলসীচরণ গোস্বামী। তাঁহাদের আসিবার কারণ হইতেছে এই— বাংলাদেশের বর্ণহিন্দুদের মতে পুনাচুক্তি মানিয়া লওয়ায় তাঁহাদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি বিপন্ন। মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশের শাসন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ আবেদন বা মেমোরিয়াল ১৯৩৬ সালের গোড়ায় ভারতসচিবের নিকট পাঠানো হইয়াছিল; স্বাক্ষরকারীদের পুরোভাগে ছিল রবীন্দ্রনাথের নাম। এই মেমোরিয়ালের উত্তরে আর্ল অব্ জেটল্যান্ড্ (রোনাল্ড্‌সে) ২৫ জুন ১৯৩৬ বড়লাটকে জানাইয়া দেন যে, ১৯৩৫ সালে যে অ্যাক্ট পাস হইয়াছে তাহার পরিবর্তনের কোনো কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না।[১]

ভারতসচিবের নিকট যে মেমোরিয়াল পাঠানো হইয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দাবি জানানো হয়: ১. বাংলাদেশে হিন্দুরা একটি সংখ্যালঘু (minority) সম্প্রদায়; অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে যে-সকল বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বাংলার হিন্দুদের জন্যও সেই-সকল ব্যবস্থা হউক। ২. হিন্দুরা যৌথ বা সম্মিলিত নির্বাচনে বিশ্বাসী। পৃথক-নির্বাচন-প্রথা আত্মকর্তৃত্বশীল শাসনতন্ত্রের বিরোধী; গণতন্ত্র ও রাজনীতির ইতিহাসে পৃথক-নির্বাচন-প্রথার নজির নাই। ৩. যতদিন পর্যন্ত না বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন চুক্তি হয় ততদিন লখনৌ চুক্তি অনুসারেই ব্যবস্থা করা হউক। সাইমন কমিশন এই মতের সমর্থক। ৪. যাঁহারা আসন সংরক্ষণের পক্ষপাতী তাঁহারা সংখ্যালঘুদের জন্যই তাহার সমর্থন করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য আসন-সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনাবশ্যক ও অন্যায়। যদি আসন-সংরক্ষণ করিতেই হয় তবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্যই করা উচিত, সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য নহে। ৫. হিন্দুদের দাবি সম্পর্কে যতদিন পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত না হয় ততদিন যেন বর্তমান ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার হিন্দুদের সদস্যসংখ্যার অনুপাতেই ভবিষ্যতে তাঁহাদের আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়।[২]

ভারতসচিবের উত্তরের প্রত্যুত্তরের জন্য ১৫ই জুলাই (১৯৩৬) কলিকাতায় প্রতিবাদ-সভা আহূত হইয়াছে, তদুদ্দেশে শরৎচন্দ্র প্রমুখ নেতারা আসিয়াছিলেন কবিকে লইবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। ১৯৩৫-এর অ্যাক্ট অনুসারে ভারতে যে নূতন শাসননীতি

১ দ্র প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৩, পৃ ৭৫৬। ভারতসচিব জেট্‌ল্যান্ড্ (আর্ল অব্ রোনাল্ড্‌সে) বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গোকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "I made it abundantly clear that H. M.'s Government would not propose any alteration of the communal award under the section except with the assent of the communities affected।" তিনি গত বৎসরের তাঁহার আর-একটি বিবৃতি (৮ জুলাই ১৯৩৫) উদ্‌ধৃত করেন: "Now let me say once more, and I hope once and for all that not only is it not the intention of the Govt.. to make any alteration in the communal award unless it is desired by the communities themselves, but that no such alteration could be made under this clause without the specific consent of Parliament"।

২ দ্র প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ ৬০৭।

প্রবর্তিত হইতে চলিয়াছে তাহার মূল ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতা। তাহারই প্রতিবাদে আহূত সভায় কবি যোগদান করিলেন, হিন্দুসমাজের জন্য বিশেষভাবে ওকালতি বা মুসলমান সমাজের অন্যায় দাবির নিন্দা করিতে তিনি চাহেন নাই; ধর্ম তথা সম্প্রদায় -নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শই ভারতের গ্রহণীয়, এই ছিল কবির কথা।

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী বলিয়া মুসলমান পত্রিকাওয়ালারা কবির উপর খুবই বিরক্ত হইল; আর-এক দল ক্ষুণ্ণ এই ভাবিয়া যে, রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই আবেদন ও নিবেদনের বিরোধী, তিনি কেন ভারতসচিবের মেমোরিয়ালে সহি করিতে গেলেন। কিন্তু আমরা জানি দেশের ও দশের ডাকে কবি চিরদিনই সাড়া দিয়াছেন; এবারও তাহাই করিলেন।

দুই বৎসর পূর্বেও যখন দিল্লীতে মদনমোহন মালব্য সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ মালব্যজিকে টেলিগ্রাম করিয়া জানান[১], "You all know that I have always disapproved of the communal award. I hope our leaders will join their forces to save from its paralysing grip the political integrity of the nation"।

এই টেলিগ্রাম পাঠাইয়াই কবি এই পত্রখানি মালব্যজিকে লিখিয়াছিলেন—"I address the Mahomedans as well as Hindus with the most sincere desire for the good of all sections of the community. I urge that Hindus and Mahomedans should sit together dispassionately to consider the communal award and the implications to arrive at an agreed solution of the communal problem. It is needless to point out that self-government cannot be based on communal divisions, and separate electorate. No responsible system of government can be possible without mutual understanding of our communities and united representations at legislature. We must concentrate all our forces to evolve a better understanding and co-operation between different sections of our people and thus lay a solid foundation of our Motherland. I depreciate all expressions of angry feelings and most strongly appeal to Hindus and Musalmans to avoid saying and doing anything that may increase communal tension and further postpone the understanding between our communities without which there can be no peaceful progress of the country।"[২]

বলা বাহুল্য, কবির কথা শুনিবার জন্য রাষ্ট্রনীতিকদের আদৌ ব্যাকুলতা ছিল না; কিভাবে ধর্মের জিগির তুলিয়া দল পুষ্ট করা যায় ও ব্যক্তিগত বা দলগত আধিপত্য কায়েম করা যায়, তাহাই ছিল সাম্প্রদায়িক ভিত্তি-মূলক শাসন-ব্যবস্থার সমর্থনকারীদের প্রধান ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবের নিন্দা করেন এবারকার সভাতেও। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় যে ভাষণ দান করেন তাহার মর্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল:

আমি রাজনীতির লোক নহি। আজিকার আলোচনার বিষয়— সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা— মুখ্যত: রাজনীতিরই প্রশ্ন। স্বভাবগত কুণ্ঠা সত্ত্বেও এ আলোচনায় আমি যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ আমাদের জাতীয় ঐক্য-বোধকে বিচূর্ণ করিবার জন্য যে শক্তি আজ উদ্যত হইয়াছে তাহার প্রতিরোধকল্পে দেশব্যাপী সুদৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন।

১ **Rabindranath Tagore on the Communal Problem, *The Modern Review*, September 1934, p 347**।
২ ***The Modern Review*, September 1934, p 347-48**।

য়ুরোপ এখন এক তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চলিতেছে। নবযুগের যে আদর্শ একদিন সে সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিল আজ তাহাকে সে নিজেই অস্বীকার করিতেছে। প্রতারিত পক্ষকে চিরপঙ্গু করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে য়ুরোপীয় সংবাদপত্রগুলিও আজ প্রভুশক্তির পক্ষ হইতে বিদ্বেষবিষ উদ্‌গার করিতেছে। আমাদের সংবেদনশীল জাতীয় চেতনার মূলোচ্ছেদ-কল্পে উদ্‌ভাবিত যে অভিনব পরিকল্পনা আজ আমাদের গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সহিত পূর্বোক্ত কোনো ঘটনার তুলনা করিতে আমি সংকোচ বোধ করি। বৃহত্তর জগতের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে এ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করা কঠিন; যাহারা প্রত্যক্ষভাবে এ নির্দয় অপমানের ভুক্তভোগী তাহাদের কাছেই ইহা গভীরভাবে অর্থবহ। আমাদের কাছে ইহা আজ এত বড়ো সমস্যারূপে দেখা দিযাছে যে বার্ধক্য ও অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও আমি এ সভায় অনুপস্থিত থাকা লজ্জাজনক মনে করিলাম।

এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বিভেদ ও ব্যবচ্ছেদের যে দুর্বহ অভিশাপ বহন করিয়া আনিল, দেশ তাহা চাহে নাই। ভারতের রাষ্ট্রীয় সত্তাকে যে আঠারো শাখায় বিভক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী তাহাকে যথার্থই রাষ্ট্রের শবব্যবচ্ছেদরূপে অভিহিত করিয়াছেন। পৃথক-নির্বাচন-ব্যবস্থার কুফল আরো প্রকট হইয়া উঠিয়াছে সম্প্রদায়সমূহের গুরুত্ব-নিরূপণে (weightage) বৈষম্য থাকায়; ইহা সরকারের বর্তমান মনোভাবেরই উপযোগী, দেশবাসীর নহে। প্রস্তাবিত বিধানে হিন্দুসম্প্রদায়কে সহজবোধ্য কারণেই বিশেষভাবে অসুবিধাগ্রস্ত হইতে হইবে; বাঙালি হিন্দুরা তো উনজনসম্প্রদায়ভুক্ত (minority) হওয়ায় নিরাপত্তার পরিবর্তে সর্বাধিক অসুবিধার সম্মুখীন হইবে— তাহাদের স্বাভাবিক সংখ্যা-শক্তির উপযোগী প্রতিনিধিত্বটুকুও হারাইবে। এই অভিনব রাজনৈতিক ব্যবস্থা উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই অপমানকর, কারণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ভিত্তিকে ইহা চিরকালের জন্য শিথিল করিয়া দিতে পারে— সহযোগের স্থানে উৎপীড়নই ডাকিযা আনিতে পারে। মুসলমান-সম্প্রদায় তাহাদের সংখ্যাগুরুত্বের সুযোগসুবিধা হইতে বঞ্চিত হউক ইহা আমরা কখনোই চাহি না; তবে ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতার সমস্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হউক ইহাও কাহারও পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। আলোচ্য ব্যবস্থায় বিশ্বাসের পরিবর্তে সন্দেহই ডাকিযা আনিবে, ধর্মান্ধ নেতারা এই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিবে। জাতির রক্ত এভাবে কূটরাজনীতির বিষে জর্জরিত করিলে চরম অশুভক্ষণ উপস্থিত হইবে, এ কথা আজ শাসকবৃন্দকে স্মরণ করাইযা দিই।

দেখা যাইতেছে, এ প্রস্তাবের সূচনামাত্র এই প্রদেশের পরিস্থিতি জটিল হইযা পড়িযাছে, পারস্পরিক সহনশীলতা, সহযোগ ও সৌভ্রাত্রের ভিত্তিতে যে সভ্যজীবনের প্রতিষ্ঠা, তাহা একান্তই বিচলিত হইয়াছে। এমন-কি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অসংযত ও ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি দেখা দিযাছে। স্কটল্যান্ড্ যদি তাহার মাতৃভাষার সহিত পার্থক্য-হেতু ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং পরস্পর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হইতে বিরত হইত তবে এ ঘটনার একটা তুলনাস্থল মিলিত। এটি নিঃসন্দেহের আসন্ন বিপদেরই সংকেত, প্রতিবেশী সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে সংঘাত বাধিবার পূর্বসূচনা। সাধারণ জনকল্যাণের ভিত্তি যদি এভাবে বিচলিত হয় তবে আমাদের রাজনৈতিক শক্তিই যে শুধু খর্ব হইবে তাহা নহে, অর্থনৈতিক উন্নতির পথও প্রতিরুদ্ধ হইবে।

সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ ব্যাপারেও যে অনুপাতে বণ্টনব্যবস্থা শুরু হইয়াছে তাহাতে শাসনযন্ত্র অযোগ্য হস্তে পড়িয়া দুর্বল হইবারই সম্ভাবনা। নানা কারণে অবশ্য এতদিন মুসলমানসম্প্রদায় সুযোগসুবিধার অসাম্য হেতু নানারূপ কষ্ট পাইয়াছে। এ বৈষম্য হইতে তাহারা যাহাতে মুক্ত হয়, সর্বান্তঃকরণে তাহাই আমি চাই। কিন্তু যে ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে তাহা এ সমস্যার যথার্থ সমাধান নহে; তাহা আমাদের সর্বজনীন মঙ্গলের পরিপন্থী, অতএব অস্বাস্থ্যকর। এভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া কাহারও উন্নতি সাধন করা যায না; পক্ষান্তরে এ ব্যবস্থা চারিত্রিক

দৈন্যেরই পরিপোষক হইয়া পড়ে। মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু দুর্লভ ও প্রশংসনীয় গুণের সমাবেশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; বিশেষতঃ তাহাদের সহজাত গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি তাহাদিগকে স্বভাবতই বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে মুসলমান-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অল্প নহে ; আমি তাঁহাদের মনেপ্রাণে ভালোবাসিয়াছি, তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি সব সময়েই আশা করিয়াছি, যে মূঢ়তা ও অসংস্কৃত যুক্তিহীনতা আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এই ব্যক্তিগত নৈকট্যবোধ ও মৈত্রীবুদ্ধির কাছে পরাজিত হইবে। সহানুভূতিশূন্য স্বার্থপর বিদেশী রাজশক্তির পক্ষপাতপ্রবণতা এই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদকে অবশ্য বাড়াইয়া তুলিতেই চেষ্টা করিবে। পরিণামদর্শী সরকারের এ-জাতীয় আনুকূল্য দুর্নীতির পরিমাণ বাড়াইবে ; অনুগৃহীত ও বঞ্চিত উভয় পক্ষই শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমাদের যখন একই ভূমিতে বাস ও বিচরণ করিতে হইবে তখন সভ্যজনোচিত অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও অন্তত পারস্পরিক মৈত্রীর শরণাপন্ন হইতে হইবে— উভয় পক্ষকেই এ-সব সাময়িক প্রলোভন ও উত্তেজনার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। আমাদের মৈত্রী ও শান্তির পথ যাহারা কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে তাহাদের উপর আস্থা রাখিলে চলিবে না। অপর সম্প্রদায়ের আকস্মিক রাজকীয় আনুকূল্য লাভে হিন্দুদেরও ঈর্ষান্বিত হওয়া সমীচীন হইবে না। এই পক্ষপাতিত্ব ও প্রশ্রয়দান যখন নিরঙ্কুশ রাজ্যশাসনেও শোভনতার সীমা অতিক্রম করিবে তখন এক বিশ্রী প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, ইহাই প্রধান আশঙ্কার বিষয়। এ সমস্যার আলোচনায় যুক্তিতর্কের অবতারণা একান্তই নিরর্থক ; কারণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ যে কতদূর আত্মঘাতী তাহা পার্লামেণ্টী আদবকায়দায় সুশিক্ষিত ইংরাজশাসক ভালোই জানে। তাহাদের এ মনোবৃত্তি এক আসন্ন অমঙ্গলেরই সূচনা করিতেছে।

সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা— এ ব্যাপারে যে মুসলমান-সম্প্রদায়ের উপর আজ আমাদের প্রচণ্ড ক্রোধ উদ্রিক্ত হইয়াছে তাহাদিগকেও এই ধ্বংসাত্মক নীতির কুফল সমপরিমাণেই ভোগ করিতে হইবে। তাহারা হয়তো এ প্রস্তাবের মাদকতায় প্রথমটা মুগ্ধ হইবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায়ই হইবে, আমাদেরও শান্তিভঙ্গের কারণ হইবে। ঘটনাপ্রবাহে যখন অপর-পক্ষও বুঝিতে পারিবে, এভাবে কত শুভসম্ভাবনা বিনষ্ট হইতেছে, তখন তাহাদেরও শুভবুদ্ধির সূচনা হইবে। ইতিমধ্যে আমি হিন্দু-সম্প্রদায়কে মতি স্থির রাখিতে অনুরোধ করি; তাহারা যেন এ আঘাতে দিশাহারা না হইয়া পড়ে। যাহারা এই নীতি রচনা করিল তাহাদের রাজনৈতিক মতিভ্রংশের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, কারণ তাহাদের এই একতরফা অনুগ্রহ একান্তই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

য়ুরোপের আধুনিক পরিস্থিতি যাঁহারা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা এ শিক্ষা নিশ্চয়ই পাইয়াছেন যে, অসহায় কোনো জাতিকে তাহার অনিচ্ছাতে সাময়িকভাবে অন্যায় সহ্য করানো চলে, কিন্তু সে অন্যায়কে জোর করিয়া গ্রহণ করানো চলে না। যাহারা ভাবিয়াছে যে এই অনুগ্রহলাভে তাহারা চিরন্তন সৌভাগ্যের অধিকারী হইল তাহারা প্রচণ্ড ভুল করিতেছে। আমাদের ইতিহাসের বর্তমানপর্ব এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ ; এখন এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণা আমাদের স্বরাজসাধনার পথে বিপুল বাধার সৃষ্টি করিবে। শুধুমাত্র সুযোগসুবিধার বৈষম্যটুকুই আশঙ্কার মূল কারণ নহে— এই বৈষম্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধী মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিবে তাহাই বিপজ্জনক। ইহা উভয় পক্ষকেই জাতিদ্বেষে উৎসাহিত করিবে, প্রতিবেশী সম্প্রদায়দ্বয়ের সৌহার্দ্যের ভিত্তি আক্রমণ করিবে।

যুদ্ধোত্তর হতাশার যুগের বহুপূর্বেই আমার জন্ম। বহুনিন্দিত ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য ও মানবতা-সাধন সমুদ্রপার হইতেই আমার চিৎপ্রকর্ষের খোরাক জুটাইয়াছিল। আজ আবার দেখিতেছি সেই পশ্চিমের সভ্যতাই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করিতেও কুণ্ঠিত নহে, অন্যায় ও অবিচারের প্রচারেও তাহার সংকোচ নাই। তবু মানবতার

আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ পাশ্চাত্যমানসের বিশিষ্ট লক্ষণ, তাহার সম্বন্ধে আস্থা হারাইব না। আমাদের ভবিষ্যৎকে নির্জীব করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে যে কূটনৈতিক চক্রান্ত চলিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যই মর্মাহত হইয়াছি। তবু ইংরেজের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলির যে এখনো স্থান আছে তাহা অবিশ্বাস করিব না। আমি বিশ্বাস করি ইংরেজের মধ্যে যে আদর্শচ্যুতি দেখা দিতেছে তাহা হইতে সে যদি এখনো নিজেকে বাঁচায়, ভারতবাসীর মন আবার জয় করিতে পারে, তবে তাহা শুধু তাহার সভ্যতারই মর্যাদাবৃদ্ধি করিবে না— অন্যভাবেও নিজেকে উপকৃত করিবে। এ বিশ্বাস না থাকিলে আজিকার এ সভা ডাকা নিরর্থক হইত।[১]

টাউন-হলের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সভার পর কবিকে আর-একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেখি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে রবি-বাসরের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে কবি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (৩ শ্রাবণ ১৩৪৩। ১৯ জুলাই ১৯৩৬)। রবি-বাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন শ্রদ্ধানিবেদন করিলে কবি কিছু বলেন।[২]

কবি আজকাল সাধারণের নিকট দুর্লভ হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার অপবাদ করেন; কবি এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবসর পাইলেন। বক্তৃতা-শেষে তিনি বলেন, "সাহিত্যসাধনা বড়ো কঠোর সাধনা। রস-রচনায় প্রবৃত্ত হতে হলে, সাহিত্যের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করতে হলে কঠিন আবরণের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। অঙ্কুর যেমন কঠিন আঁঠির ভিতর থেকে আপনাকে সরস ক'রে সুন্দর ক'রে ধরণীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি কঠোর সাধনা করতে হবে, তবে তো সে সাধনা সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে, পুষ্পপল্লবে বিকশিত হবে।"

কলিকাতার বিবিধ উত্তেজনা হইতে মুক্তি পাইয়া এক সপ্তাহ পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (২০ জুলাই)। ফিরিয়া জবহরলাল নেহরুর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন।[৩] জবহরলাল তখন কংগ্রেসের সভাপতি; সিন্ধু-লরকানা হইতে (২১ জুলাই) তিনি কবিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংঘের (Indian Civil Liberties Union)

১ লেখকের অনুরোধক্রমে নিমাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। ২ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত -অনুলিপিত। বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ ১-৫।

৩ Pandit Jawaharlal Nehru sent a circular letter to Gurudeva from Allahabad on 22 April, 1936 in which the urgent need of starting an Indian Civil Liberties Union was discussed and the co-operation of the addressee was invited for forming such a union. In another circular letter dated July 8, 1936, Pandit Nehru asked for Gurudeva's permission to include his name in the list of the foundation members of the National Council of the Indian Civil Liberties Union. This circular letter had also a proposal that Mrs. Sarojini Naidu should be the President of the Union. Replying on July 13, 1936, Gurudeva gave his consent to serve as a foundation member of the National Council of the Civil Liberties Union and also his approval of Mrs. Naidu's election as the President of the Union.

In a personal letter dated camp Larkana, July 21, 1936, Pandit Nehru requested Gurudeva to agree to be the Honorary President of the Civil Liberties Union : "I had not suggested this before as I did not wish to add, in any way, to your burdens. But an honorary work of this kind would in no way put any burden on you and it would add to the prestige of our union very greatly. There is obviously no other person in India who could better fill that place. As you know some of us have suggested Mrs. Sarojini Naidu's name for the Presidentship or Chairmanship of the National Council. The idea is that she could be the active head of the Council, looking after its general direction,and that you would be the honorary head of the whole organisation. We do not want it to be in any way a Congress organisation or to be political in any narrow sense of the word. Fortunately, many prominent non-Congressmen and some people who are not politically inclined are agreeing to join the Union. This will give it a broad basis. But with you at the head this would

সম্মানার্হ সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কবি তদুত্তরে (২৮ জুলাই) তাঁহার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।[১]

জগতের মহত্তর ভাবের ক্ষেত্রে আহ্বান আসে— সাড়া দেন, পত্র লেখেন, বাণী পাঠান; এ-সবই খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন সমস্যা অত্যন্ত বাস্তব। কবির কাছে সকলেরই দ্বার মুক্ত, প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে অভাব অভিযোগ ত্রুটি লইয়া সরাসরি হাজির হইতে পারিতেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন এখন বড়ো হইয়া গিয়াছে, বহু বিভাগে বহু কর্তা; সুষ্ঠুভাবে কর্ম পরিচালনার জন্য ও ভবিষ্যতে অবাঞ্ছিতদের উপদ্রব হইতে বিশ্বভারতীকে রক্ষা করিবার জন্য এই সময়ে বিশ্বভারতীর কনস্টিটিউশন বা সংবিধানের যে-সব পরিবর্তন সাধিত হয় তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি।

নূতন ব্যবস্থায় পুরাতন অধ্যাপক-মণ্ডলীর স্থান বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়া গিয়া শাসনভার বহুল পরিমাণে গিয়া বর্তাইল মুষ্টিমেয় লোকের উপর। এ আদর্শে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; পুরাতন tradition ও নূতন পরিস্থিতির সামঞ্জস্য আছে কি না তাহাই ছিল সেদিনের প্রশ্ন। কবি ভালো করিয়া জানিতেন, দায়িত্ব দিয়া সম্মান দিয়া কর্মীদের নিকট হইতে যে কাজ পাওয়া যায়, তাহা কেবলমাত্র বর্ধিত হারে বেতন দিলে পাওয়া যায় না। অথচ সময়ের পরিবর্তনে নূতন ব্যবস্থারও একান্ত প্রয়োজন। তাই কবি একদিন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের আহ্বান করিয়া যে ভাষণ দিলেন তাহাতে কবির এই দোটানা মনের ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। 'হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে' বলিয়াও পূর্বস্মৃতিকে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছেন না, আবার নূতনের প্রতি আকর্ষণও তাঁহার কম নহে।

কবি সভায় অধ্যাপকদের আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আজকে তোমাদের ডেকেছি কোনো কিছু নতুন করবার বা বলবার জন্যে নয়, আগে আমাদের এখানে যে অধ্যাপকদের মিলনসমিতি ছিল তারই স্মৃতি মনে আনবার জন্যে। আগে ছাত্রদের এবং অধ্যাপকদের সামাজিকভাবে মেলামেশার ব্যবস্থা ছিল, তারই পুনরুদ্ধার করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। এখন কর্মবিভাগ উপলক্ষে নিজেদের মধ্যে পার্থক্য ঘটার দরুন ভুল বোঝা বা না বোঝার সম্ভাবনা এসেছে— এ আমি অনুভব করি। . .

" . . কোনো একটা বিশেষ দিনে অধ্যাপকরা সমবেত হয়ে পরস্পর খোলাখুলিভাবে বলবার কইবার সুযোগ যাতে পান, সেটা আমার ইচ্ছা। আমিও এইরকম মিলনসভা হলে তাতে যোগ দিতে পারব। তোমাদের আলাপ-আলোচনা শুনে জানতে পারব এখন কী নিয়মে কাজ হচ্ছে। যদি কারও মনে কোনো গ্লানি থাকে তবে সেটা স্পষ্ট করে বলবার সুযোগ থাকবে। অপ্রিয় হলেও যা অকৃত্রিম সত্য— তাকে স্বীকার করার মতো ধৈর্য ও ঔদার্য যেন

be still more assured. There is a general cousensus of opinion on this subject. I do hope that you will be good enough to agree."

Giving his consent to be the Honorary President of the Union, Gurudeva wrote to Panditji on July 28, 1936: "If my name gives you any help in the cause for which I have every sympathy, you should most certainly have it."

(Note supplied by Mohit K. Mazumder of the Rabindra-Sadan, at present Professor of English in Darjeeling College. সুধীরচন্দ্র কর এ-বিষয়ে প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, দ্র দৈনিক বসুমতী, ১২ মাঘ ১৩৪৮।)

১ এই সময় রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শরীরের জন্য যাওয়া হয় নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্ (Honoris causa) উপাধি প্রদান করেন (২৯ জুলাই ১৯৩৬)। শ্রীনিকেতনের ডক্টর প্রেমচাঁদ লাল ১৪ বৎসর পরে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন ৩১ জুলাই ১৯৩৬। ইঁহার রচিত The Rural Reconstruction গ্রন্থ কবির ভূমিকা -সমেত ১৯৩২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

আমাদের থাকে। যে-সব জায়গায় স্বার্থ বা ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি-সেখানে হয়তো এটা সহজ নয়। কিন্তু এই আশ্রমে এটা প্রত্যাশা করবারই বিষয়। কেবল কর্তাদের মন জুগিয়ে যে মিলন আমি সেইরকম মিলনের কথা বলছি না। চক্ষুলজ্জা বা মিথ্যা মিষ্টতার চর্চা করা যেন আমাদের না হয়। যদি অধ্যাপকসভা পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেখানে আমি থাকতে চাই এইজন্যে যে, কোনো অসামঞ্জস্য ঘটলে আমি সমন্বয়ের চেষ্টা করতে পারি।"

গত পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ে যে আত্মশাসন ও আত্মকর্তৃত্বের tradition গড়িয়া উঠে নাই, তাহা পরিতাপের বিষয় নিঃসন্দেহ। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, দায়িত্ব ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া সকল সময়ে আমরা তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি নাই। রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু কেন যে সে-সব রক্ষিত হয় নাই তাহার ইতিহাস সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। যাহাই হউক, কবি নূতন কন্‌স্টিটিউশনের সমর্থনকল্পে বলিতেছেন, "ঢিলেমির প্রশ্রয় ঘটেছিল ডিমোক্রেসির নামে। . . আমরা পরের শাসনে বাঁধা কাজ চালাতে পারি কিন্তু নিজের প্রবর্তনায় পারি নে। এই কারণে আমাদের এখানে উচ্ছৃঙ্খলতা এসেছিল। . . তাই এখানে চার দিকে পরস্পর-সম্বন্ধের অবাধ উদারতার মাঝখানে কর্মচালনার কর্তৃত্বপদ সৃষ্টি করতে হয়েছে।" এইভাবে নূতনকে সমর্থন করিয়া কবি পুরাতনের ভাবটিকে রক্ষা করিবার আশায় অধ্যাপকগণকে তাঁহার চারি পার্শ্বে কেন্দ্রিত হইবার জন্য অসহায়ভাবে আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "আমি সেজন্যে ঠিক করেছি যে তোমাদের যা বলবার তা আমার সমক্ষে বলবে, সাহস ক'রে। পৌরুষের অভাবে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা বলতে পারি না; . . পৌরুষের অভাবে আমাদের এই মেরুদণ্ডহীন দেশে আড়ালে লুকিয়ে কত যে গোলমাল, কত চক্রান্ত, কত বিদ্বেষ— এ যেন আমাদের জাতিগত। . . দেশে বাইরের বড়ো বড়ো কর্মক্ষেত্রে তো ক্রমাগত দলাদলি মারামারি হচ্ছে। যদি আমাদের এ আশ্রম তারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ হয় তবে সেটা তো বাঞ্ছনীয় হবে না। অথচ মন জুগিয়ে সত্যগোপন করার মতো প্রবৃত্তি যেন আমাদের না হয়। কারণ চিত্তের দুর্বলতা থাকলে সত্যকার মিলন হবে না— হতে পারে না।"[১]

কবির ইচ্ছা[২] সরকারীভাবে যে-সব অধিকার হইতে অধ্যাপকগণ নববিধান-মতে বঞ্চিত, ব্যক্তিগতভাবে কবি তাহা পূরণ করিবেন; বলা বাহুল্য কবির বয়স ও স্বাস্থ্য ইহার অনুকূল নহে, তাঁহার ইচ্ছার আগ্রহ যতই থাকুক না কেন।

কবি গ্রীষ্মকালে 'শ্যামলী' নামে মাটির বাড়িতে ছিলেন; কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হইলে বুঝা গেল বারিহীন ইরান, মিশরে মাটির ছাদ টিকিতে পারে, এ দেশে, যেখানে পঞ্চাশ-ষাট ইঞ্চি বারিপাত হয়, সেখানে উহা অচল। সেইজন্য শ্যামলীর পাশেই আর-একখানি বাড়ির পত্তন হইল – ইহার প্রাচীরাদি মাটির, তবে ছাদ কন্‌ক্রীটের; ইহার নামকরণ হয় 'পুনশ্চ'।[৩]

১ আশ্রমপ্রসঙ্গ, ১৭ শ্রাবণ ১৩৪৩। ২ অগস্ট ১৯৩৬। বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯, পৃ ১৫৮-৫৯।

২ Under the order of the Founder-President the Adhyapaka Mandali has been revived at Santiniketan and Shishir Coomer Mitra [now of Pondichery] has been elected as the Secretary . . the first meeting will take place on . . the 4th October (1936). *Visva-Bharati News*, October 1936, p 26। উত্তরায়ণে কবির সম্মুখে অধ্যাপক ও কর্মীগণ মিলিত হইয়া জলযোগ করিতেন। খাওয়াইতে ও খাওয়াদাওয়া দেখিতে তাঁহার যে কী আনন্দ ছিল তাহা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্মৃতিকথা' ও 'বিগতদিন' (গল্পভারতী) পাঠ করিলে জানা যায়। দ্র সুধীরচন্দ্র কর, কবিকথা, পৃ ৫।

৩ শ্যামলীর উদ্দেশে কবি লিখিলেন (৬ অগস্ট ১৯৩৬। ২১ শ্রাবণ ১৩৪৩)—

এই ক'টা দিন তোমায় আমায় কথা হল কানে কানে,
আজ কানে কানে বলছ আমায়,
"আর নয়, এবার তোলো বাসা।"

'শ্যামলী' কাব্য উৎসর্গ করেন 'কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবিশ'কে (১ ভাদ্র ১৩৪৩)। গত কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথ যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন প্রায়ই উঠিতেন বরাহনগরে অধ্যাপক মহলানবিশের বাসাবাটী শশিভিলাতে।[১] 'পথে ও পথের প্রান্তে'র ভূমিকায় কবি রানী দেবী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা স্মরণীয়।[২] দীর্ঘ-কালের আসা-যাওয়ায় এই বরাহনগরের বাড়িটির সঙ্গে কবির মনের একটা বিশেষ যোগ হইয়াছিল, সেই কথাটি 'শ্যামলী'র উৎসর্গে বলেন মিল-ছন্দের কবিতায়—

বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ।
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে
আপন স্নিগ্ধ হাতে
সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব-প্রণতি-ভরা,
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবটা কাব্যও নহে, কর্মও নহে। অত্যন্ত জটিল মনস্তত্ত্ব ও ভাবনা-পূর্ণ কবিতা লেখার মাঝে মাঝে মন সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন রচনায় আপনাকে ভাসাইয়া দিতে চায়— বাণীদান ও গুরুগম্ভীর কর্মসাধন— তাহারই ফাঁকে ফাঁকে হাসির পাথেয় পান ক্ষণে ক্ষণে, জীবন সরল হয়, মধুর হয়— সকল পার্থিব প্রতিকূলতার মাঝে মাঝে পাওয়া এই-সব পুরস্কার। খাপছাড়া, সে, প্রহাসিনী, ছড়ার ছবি, ছড়া, গল্পসল্প— সেই মুক্তিকামী মনের সৃষ্টি; অবচেতন মনের কৌতুক দেখিবার জন্য আপনাকে সহজ করিয়া দেন; relaxation, relief না থাকিলে সৃষ্টির পূর্ণতা হয় না। প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে কত যে অদ্ভুত কিম্ভূত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই; দেখিয়া মনে হয় ভগবানও কী রসিক।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে পূর্বেও এইটি দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি। হালকা মনের বল্গাহীন লেখনীর সঙ্গে যোগ দিয়াছে তুলির লিখন, রেখার অঙ্কন। কতকগুলি খাপছাড়া কবিতা এবং তার সঙ্গে জমা হইয়াছে ছবি। 'খাপছাড়া' কবিতাগুলি উৎসর্গ করিলেন রাজশেখর বসুকে (৩ ভাদ্র ১৩৪৩)।[৩] বসু-মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। রাজশেখরের 'গড্ডলিকা' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ তাহা পাঠ করিয়া আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন (১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩২), "আমি রস-যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলাম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড্ নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।"[৪] খাপছাড়া রাজশেখরকে

আমি পাকা করে গাঁথি নি ভিত,
আমার মিনতি কাঁদি নি পাথর দিয়ে তোমার দরজায়;
বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে—
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গ'লে শ্রাবণধারায়।

—রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ১২৪।

১ গিরিধিতে প্রশান্তচন্দ্রের বাড়ির নাম 'মহুয়া'।

২ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে কবি বহু পত্র লেখেন। দেশ পত্রিকায় ১৩৬৭ হইতে ধারাবাহিক ভাবে ৪৯৩টি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্রের নিকট লিখিত পত্রের সংখ্যা আমাদের অজ্ঞাত। প্রকাশিত হইলে জানা যাইবে।

৩ বই ছাপা হয় ১৩৪৩ পৌষ মাসে।

৪ দ্র সুশীল রায়, স্মরণীয়, পৃ ১৬৭।

উৎসর্গ করিয়া কবি লিখিলেন (৩ ভাদ্র ১৩৪৩)—

যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের,
যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের,
যদি ধরা পড়ে সে যে নয় ঐকান্তিক
ঘোর বৈদান্তিক,
দেখ গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক,
যদি দেখ কথা তার
কোনো মানে-মোদ্দার
হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছয় খ্যাপামির প্রান্তিক,
তবে তার শিক্ষার
দাও যদি ধিক্কার
শুধাব, বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।
একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ-উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা
রসে হয় দ্রবিতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।
নিশ্চিত জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।
চতুর্মুখের চেলা কবিটিরে বলিলে
তোমরা যতই হাস, রবে সেটা দলিলে।
দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা,
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না।

রাজশেখরকে কবি যে 'খাপছাড়া' উৎসর্গ[১] করিলেন তাহা অর্থপূর্ণ; কারণ রাজশেখর গল্পসাহিত্যে এই খাপছাড়ারই প্রবর্তক। শান্তিনিকেতনের সঙ্গেও কবি রাজশেখরের নাম যুক্ত করিলেন, কলেজ-ল্যাবরেটরির নাম দেওয়া হইল 'রাজশেখর বিজ্ঞান-সদন'। ছাপাখানার হাতার মধ্যে যে টিনের ঘরগুলি আছে, তাহাদেরই সম্মুখে এই অর্থহীন ফলক বহুকাল ছিল। বর্তমানের ল্যাবরেটরির সহিত কাহারও নাম জড়িত নহে।

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে বাৎসরিক বর্ষামঙ্গল উৎসব আসিল। "এবারকার বর্ষামঙ্গলের একটু নূতনত্ব ছিল। চিরপ্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন ক'রে এবার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভুবনডাঙা গ্রামে। সেখানকার একমাত্র সম্বল একটি বৃহৎ জলাশয় বহুকাল যাবৎ পঙ্কোদ্ধারের অভাবে লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। গ্রামবাসীদের জলাভাবের অন্ত ছিল না। বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মীদের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগে অধুনা এই পুকুরটি খনন ক'রে নির্মল জলের সম্বল ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা এবার আমাদের বর্ষামঙ্গল উৎসবের একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। তাই এই ভুবনডাঙা গ্রামের প্রান্তে এই জলাশয়ের তীরেই উৎসবের মণ্ডপ রচিত হয়েছিল।"[২]

কবি বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে যে অভিভাষণ দেন তাহাতে বলেন, "আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতীগণ নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুসারে নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন। এদের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সম্মুখের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অনেকেই তা জানেন। বহুকাল পূর্বে রায়পুরের জমিদার ভুবনমোহন সিংহ[৩] ভুবনডাঙার এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা ক'রে গ্রামবাসীদের জলদান করেছিলেন। তখনকার দিনে এই জলদানের প্রসার কিরকম ছিল তা অনুমান করতে পারি যখন জানি এই বাঁধ ছিল পঁচাশি বিঘে জমি নিয়ে।" অতঃপর 'বৃক্ষরোপণ' অনুষ্ঠান হয়। কবি স্বহস্তে জলাশয়-তীরে কৃষ্ণচূড়া রোপণ করিলেন। এবারকার বর্ষামঙ্গলে যে-সব গান গীত হয়, তার মধ্যে এই তিনটি নূতন— ১. চলে ছল ছল নদীধারা নিবিড় ছায়ায়, ২. আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু, ৩. ঐ মালতীলতা দোলে।

ভাদ্রের শেষ ভাগে কবি দিন-দশেকের জন্য (৫-১৫ সেপ্টেম্বর) কলিকাতায় যান; তাহার পূর্বে দুইটি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। লেখকের 'বঙ্গপরিচয়' নামে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কবি লিখিলেন (৪ সেপ্টেম্বর

১ খাপছাড়া [ছড়ার বই। কবি-কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র সমন্বিত], প্রকাশ মাঘ ১৩৪৩ [জানুয়ারি ১৯৩৭], রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১।

২ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৩, পৃ ৭৮-৮৭। বর্ষামঙ্গল, ৬ ভাদ্র ১৩৪৩,২২ অগস্ট ১৯৩৬।

৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী হইতে জানা যায়, তাঁহার ৪১ বৎসর বয়সে তিনি হিমালয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন (১৫ নভেম্বর ১৮৫৮। ১ অগ্রহায়ণ ১২৬৪)। অতঃপর রেলের লুপ লাইন খোলা হইলে দেবেন্দ্রনাথ গুসকরা স্টেশনের নিকটবর্তী আমবাগানে তাঁবুতে বাস করেন। বোধ হয় এই সময়ে বা ইহার পূর্বে বোলপুরের নিকটবর্তী রায়পুরের জমিদার ভুবনমোহন সিংহের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই ভুবনমোহন সিংহ বোলপুরের উত্তরে প্রান্তরের মাঝে একখানি গ্রাম পত্তন করেন। ঐ গ্রাম বা ডাঙার উত্তঃ দিয়া একটি খাদ বা এ দেশের ভাষায় কাঁদড় ছিল। এই কাঁদড়ের পশ্চিম দিকটা ঢালু। খাদের মাটি কাটাইয়া পশ্চিম দিকে একটি বাঁ. দেওয়া হয়। ইহাতে গ্রামবাসীদের জল সরবরাহের ও চাষবাসের সুবিধা হয়। ইহাই ভুবনডাঙার বাঁধ (দ্র শান্তিনিকেতন আশ্রম জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)। ১২৬৮ সালের ১৮ চৈত্র দেবেন্দ্রনাথ রায়পুরে ভুবনমোহনের গৃহে ব্রহ্মোপাসনা করেন; ইতিপূর্বে ফাল্গুন মাসেও তিনি সেখানে আসেন। ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহ দেবেন্দ্রনাথকে ভুবনডাঙার উত্তরে বিশ বিঘা জমি ৫৲ টাকা খাজনা. মৌরসী পাট্টা করিয়া দান করেন (১৮ ফাল্গুন ১২৬৯), ইহাই শান্তিনিকেতন। প্রতাপনারায়ণের পুত্র হেমেন্দ্রনাথ সিংহ 'প্রেম' প্রভৃতি গ্রন্থে: লেখকরূপে এককালে খ্যাতি লাভ করেন। হেমেন্দ্রনাথের পুত্র প্রেমানন্দ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদিযুগের ছাত্র। এই প্রেমানন্দ পরযুগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শেষ অবস্থায় উহাকে পুনর্জীবিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ভুবনডাঙার যথার্থ নাম ভুবননগর, মহর্ষির ট্রাস্টডীডে ও অন্যান্য জমিদারী কাগজে এই গ্রাম ভুবননগর রূপেই উল্লিখিত আছে।

১৯৩৬)— "বাংলাদেশকে আমরা অনেকেই যথোচিত চিনি নে। এই দুঃখে প্রভাতকুমারকে অনুরোধ করেছিলেম বঙ্গপরিচয় বইখানি লিখতে। তিনি সেইটি পালন করেছেন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।" কবি গ্রন্থখানি পাঠ করেন এবং লেখককে অনেক উপদেশ দেন।[১] এক পত্রে লেখেন, "তোমার 'বঙ্গপরিচয়'কে সংক্ষিপ্ত করে, অর্থাৎ আঁঠি বাদ দিয়ে শাঁস রেখে, ছাত্রদের জন্য সহজ ভাষায় একটা বই লিখলে বোধ হয় তোমার ঐহিক ও পারত্রিক দু দিকেই উন্নতি হবে। বাঙালির শিক্ষালয়ে বাংলা সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য খবর দরকার।"[২]

পরদিন Women's International League for Peace and Freedom[৩] নামক আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বাধীনতা -কামী নারী সংঘের জন্য কবি যে বাণী লিখিয়া দেন তাহার শেষ বাক্যটি এই— "We cannot have peace until we deserve it by paying it full price— which is, that the strong must cease to be greedy and the weak must learn to be bold।" দুর্বলের শক্তিহীনতার সুযোগে বলবান পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি'-সাধনায় বিশ্বাসী। এই শান্তিকামী বিশ্বনারী প্রতিষ্ঠানের বহু শাখা আছে; মার্কিন রাষ্ট্রের বাহিরে ৬৯৭টি ও ভারতের মধ্যে ১১টি শাখা। ইঁহারা পাঁচ কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধকামী জাতিদের মনোভাব পরিবর্তনের আশা করিয়াছিলেন। হায় রে, আদর্শবাদীদের দুরাশা!

ভারতের প্রগতিশীল লেখকরা ব্রুসেল্সের এই শান্তিকামীদের বৈঠকে যে মন্তব্যটি পাঠান তাহাও স্মরণীয়। তাহাতে তাঁহারা বলেন— "ভারতের নাগরিক অধিকার হইতে যে সাংঘাতিক ভাবে সর্বসাধারণকে বঞ্চিত করা হইয়াছে উহা কেবল রাজনীতির দিক হইতে অনর্থপাত নহে, কিন্তু উহা দ্বারা সংস্কৃতি ও তাহার বিস্তারচেষ্টাকে খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করা হইতেছে। নানাপ্রকার পুস্তকের মধ্যে . . ওয়েব্ দম্পতির পুস্তক (Sidney and Beatrice Webb, *Soviet Communism*) নিষিদ্ধ হইয়াছে; এমন-কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজি অনুবাদও নিষিদ্ধ হইয়াছে।"[৪] এতদ্‌সম্পর্কে জবহরলাল নেহেরু তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুশিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার পর রুশিয়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন; ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশ করার জন্য বাঙ্গলা গভর্নমেণ্ট 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টে সহকারী ভারতসচিব আমাদের সংবাদ দিয়াছিলেন যে, 'ঐ প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্যগুলি সম্পর্কে বিকৃত মত প্রচার করা হইয়াছে' বলিয়াই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। সাফল্যগুলির একমাত্র বিচারক 'সেন্সর'; আমাদের ভিন্ন মত থাকাও উচিত নহে, তাহা প্রকাশ করাও উচিত নহে। ডাবলিনে 'সোসাইটি অব্ ফ্রেণ্ডস্'-এর নিকট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরিত একটি সংক্ষিপ্ত বার্তাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় গভর্নমেণ্ট আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মত ঋষিতুল্য ব্যক্তি, যিনি রাজনীতি হইতে ইচ্ছা করিয়া দূরে থাকিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত ব্যাপার লইয়া আছেন, যিনি জগদ্বিখ্যাত এবং ভারতের সর্বত্র সম্মানিত, তাঁহার লেখাই যখন বন্ধ করিবার চেষ্টা হয় তখন সাধারণ লোকের কি কথা।"[৫]

১ তাঁহার চিহ্নিত কপি বোধ হয় রবীন্দ্রসদনে আছে। বঙ্গপরিচয় ১ম খণ্ড, হৃষীকেশ সিরিজ নং ১৯, ১৩৪৩।

২ দ্র. অমলেন্দু ঘোষ, বাংলা কোষগ্রন্থের কথা [জ্ঞানভারতী]। সাহিত্যের খবর, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ ২৩।

৩ Brussels-এ World Peace Congress অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ শান্তিনিকেতন হইতে লেখেন। *Visva-Bharati News*, September 1936, p 22।

৪ দ্র প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৩, পৃ ৯৪১।

৫ জওহরলাল নেহেরু, আত্মচরিত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক অনূদিত। ৩য় সং, ১৩৫৫, পৃ ৬২৮। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র এক কিস্তি মডার্ন রিভিউ ১৯৩৪ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদক ডক্টর শশধর সিংহ। মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় এই অনুবাদ প্রকাশিত হইলে বিলাতের পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে বিতর্ক হয়, এবং উহার অনুবাদ প্রকাশ বন্ধ হয়।

কবি যে বাণীটুকু আয়রল্যান্ডের কোয়েকার খ্রীষ্টানদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্‌ধৃত করিতেছি ; যদিও ইহা দুই বৎসর পূর্বে লিখিত, তৎসত্ত্বেও এই সম্পর্কে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :

"By segregating ethics to the Kingdom of Heaven and depriving the Kingdom of Earth from its use man has up to now never seriously acknowledged the need of higher ideals in politics or in practical affairs. That is why when disagreements occur between individuals, violence is not encouraged but punished ; but when the combatants are nations, barbaric methods are not only not condemned but glorified. The greatest men like Buddha or Christ have from the dawn of human history stood for the ideal of non-violence, they have dared to love their enemies and defied tyrannism by peace, but we have not yet claimed the responsibility they have offered us.

"Fight is necessary in this world, combat we must and relentlessly against the evils that threaten us, for by tolerating untruth we admit their claim to exit. But war on the human plane must be what in India we call Dharma-Yuddha— moral warfare, in it we must array our spiritual powers against the cowardly violence of evils. This is the great ideal which Mahatma Gandhi represents, challenging his people to fearlessly apply man's highest strength not only in the individual dealings, but in the clash of nation and nation.

"In the barbaric age man's hunger did not impose any limits on its range of food which included even human flesh but with the evolution of society this has been banished from extreme possibility ; in a like manner, we await the time when nothing may supposedly justify the use of violence whatever consequences we are led to face. Because, success in a conflict may be terrible defeat from the human point of view, and material gain is not worth the price we pay at spiritual cost. Much rather should we lose all than barter our soul for an evil victory. We honour Mahatma Gandhi, because he had brought this ideal into the sphere of politics and under his lead India is proving everyday how aggressive power pitifully fails when human nature in its wakeful majesty bears insult and pain without retaliating. India today, inspired by her great leader, opens the new chapter of human history, which has just begun."

রবীন্দ্রনাথ যাহাকে moral warfare বলিয়াছিলেন, আজ তাহাই moral armament নামে ভাবুকের দল প্রচার করিতেছেন।

ভাদ্র মাসে (৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) কবি কলিকাতায় আসিয়াছেন ; এবার কোনো বিশেষ কাজের আহ্বানে সেখানে আসেন নাই ; বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশদের নূতন গৃহ নির্মিত হইয়াছে— কবি ভাবিলেন সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিবেন। বলা বাহুল্য কলিকাতায় গেলে সেইটিই হয় না।

আমাদের আলোচ্য পর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'বাংলা বানানের নিয়ম' স্থির করিবার জন্য একটি কমিটি (নভেম্বর ১৯৩৫) গঠিত হয় ; উহার সভাপতি রাজশেখর বসু ও সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চানসেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৫ বৈশাখ ১৩৪৩ ‘বাংলা বানানের নিয়ম’ নামে পুস্তিকার ভূমিকায় লেখেন, “কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন।.. দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন।” কবি কলিকাতায় আসিলে তাঁহার সহিত আলোচনাদি শেষ করিয়া উক্ত সমিতি ১০ সেপ্টেম্বর প্রতিবেদন সহি করেন ও পরদিন কবির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিমত গ্রহণ করেন। কবি লিখিয়া দেন, “বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।” কবির স্বাক্ষরের নীচেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহি দেন (১৭ সেপ্টেম্বর)।

বরাহনগর-বাস-কালে প্রশান্তচন্দ্রের মাতুল ও ডাক্তার নীলরতনের কনিষ্ঠ, সুপ্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্য-লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকার আসিয়া কবিকে গল্পসঞ্চয়নের ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানান। পূজার পূর্বে শিশুদের উপযোগী গল্প সংগ্রহ করিয়া তিনি একটি বার্ষিকী[1] প্রকাশ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ গ্রন্থের জন্য একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিলেন (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬):

“ছেলেদের যেমন চাই দুধভাত, তেমনি চাই গল্প। যে মা-মাসিরা তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় গল্প জুগিয়ে এসেছে। ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিযুগে—আজকের দিনের মা-মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে—কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাশ ভোলে নি। ছেলেরা আজও বলছে, গপ্‌প বলো। কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গপ্‌প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যে যাঁরা কোমর বেঁধেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করছেন। ছেলেরা তো আশীর্বাদ করতে জানে না। সেই আশীর্বাদ করবার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।”

কবি যে এবার কলিকাতায় গিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে ‘বিশ্বভারতী নিউজ’ (অক্টোবর ১৯৩৬) লিখিতেছেন যে, “It was a private visit and there were no public engagements”। কিন্তু কবির মন—বোধ হয় দেবতাদেরও অগম্য। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া প্রতিমা দেবীকে লিখিলেন, “রাজধানীর উৎপীড়নে হাঁপিয়ে উঠল প্রাণ, পালিয়ে এলেম।”[2] কথা ছিল কবি ‘পুনশ্চ’র নূতন বাড়িতে উঠিবেন। “নতুন বাড়িতে মিস্ত্রির আক্রমণ। অবশেষে উদয়নে আশ্রয় নিতে হল—বৃহৎ পুরী শূন্য।” প্রতিমা দেবী অসুস্থতার জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া কবি ‘পরিশোধ’ নৃত্যনাট্যর মহড়া লইয়া পড়িয়াছেন। পরিশোধ ‘কথা ও কাহিনী’র সুপরিচিত কবিতা—সেই আখ্যান অবলম্বনে নৃত্যনাট্য রচিত হইয়াছে। কলিকাতা যাইবার পূর্বে তাহার মহড়া শুরু হয় প্রতিমা দেবীর পরিচালনায়। এখন কবিকেই মহড়ার জন্য ভাবিতে হইতেছে, তজ্জন্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িতেছেন। প্রতিমা দেবীকে অতিদুঃখে লিখিতেছেন (১৩ আশ্বিন ১৩৪৩) “এখান থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন প্রতি সন্ধ্যাবেলা তোমার সূর্যাস্তপ্রাঙ্গণ নূপুরে মুখরিত ছিল, এখন ‘নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী’। কেবল মনে হচ্ছে

১ বার্ষিকী। বাংলাভাষায় প্রথম বার্ষিকী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত ‘পার্বণী’ (আশ্বিন ১৩২৫)। পার্বণী পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ৯ আশ্বিন ১৩২৫ জামাতাকে লেখেন (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)—“প্রথম খণ্ড পার্বণীতে যে আদর্শে ডালি সাজাইয়াছ, বৎসরে বৎসরে তাহা রক্ষা করিতে পারিলে মা ষষ্ঠী ও মা সরস্বতী উভয়েরই তুমি প্রসাদ লাভ করিবে।” দ্র দেশ, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬২, পৃ ৩২৩। ১৩২৬ মহালয়ার সময়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি -সম্পাদিত ‘আগমনী’ প্রকাশিত হয়। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের ‘মাতৃবন্দনা’ ৬টি কবিতা প্রকাশিত হয়। দ্র জীবনস্মৃতি, পরিশিষ্ট। শ্রীহলধর হালদার (শ্রীপুলিনবিহারী সেন) -লিখিত প্রবন্ধ, দেশ, ৬ আষাঢ় ১৩৫৪।

২ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৪৯, ১৩ আশ্বিন ১৩৪৩,২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬।

দুঃসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, ভুল করেছি। আমার নৃত্যসাধনা গীতছন্দে উর্বশীদের মহলে কোনোদিন আসন পাব না। অতএব এখন থেকে তাঁদের সেলাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।" একটা অভিনয়কে খাড়া করিয়া তুলিতে কী পরিমাণ দুঃখ তাঁহাকে পাইতে হইত, এই কয় ছত্র তাহারই প্রমাণ।

আমাদের আলোচ্য পর্বে কবির 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থখানি প্রকাশনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। 'সবুজ পত্রে'র যুগ হইতে গত বিশ বৎসরের মধ্যে রচিত সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের সংগ্রহ-গ্রন্থ এইটি। কয়েকটি প্রবন্ধের কথা স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন্ প্রবন্ধ গ্রন্থমধ্যে যাইবে, কোন্ প্রবন্ধের কোন্‌খানটার রদবদল হইবে ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার কবি একাই করেন। বলা বাহুল্য, পাঁচমিশালি কাজের মধ্যে এই কাটাছাঁটা চলে। বইখানি উৎসর্গ করিলেন অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে (৮ আশ্বিন ১৩৪৩)। উৎসর্গ-পত্রখানি সাহিত্যবিচারপূর্ণ একটি প্রবন্ধ— সাহিত্য সম্বন্ধে কবির মতের চুম্বক। এই গ্রন্থে ১৩২১ হইতে ১৩৪১ সালের মধ্যে রচিত এগারোটি প্রবন্ধ ছিল।

এ দিকে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিনের মধ্যেই 'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে (৯ আশ্বিন ১৩৪৩) পুনরায় কলিকাতা যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিল— শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে আহূত সভায় কবির উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ। রবীন্দ্রনাথ পত্র পাইয়া সেইদিনই জবাবে লিখিলেন, "আজ তোমার চিঠি পেলুম, পর্শু [১১ই আশ্বিন, রবিবার] তোমাদের অনুষ্ঠান।" কবি জানাইলেন পরবর্তী রবিবারে [২৫ আশ্বিন] শরৎচন্দ্রের ৬১তম সাম্বৎসরিক উৎসব নিষ্পন্ন করিলে 'রবীন্দ্রের সমাগম অসম্ভব হবে না।'[১] কারণ কবিকে অবিলম্বে কলিকাতায় যাইতে হইতেছে— সেখানে 'পরিশোধ' নাটিকার অভিনয়; তাহা ছাড়া নিখিল-বঙ্গ মহিলা সম্মিলনের উদ্‌বোধন তাঁহাকে করিতে হইবে। ১১ আশ্বিন প্রাতে শান্তিনিকেতন মন্দিরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু-বার্ষিকীতে কবি ভাষণ দান করিলেন।[২]

কবি যথাসময়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর দল লইয়া কলিকাতায় গেলেন—ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজ হলে 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যের অভিনয় হইবে। 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করিয়া ভূমিকায় কবি লিখিতেছেন "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।"[৩] পরিশোধের[৪] এই নৃত্যনাট্যরূপ বহুল পরিমাণে বহুবার পরিবর্তিত হইয়া 'শ্যামা' নামে পরে প্রকাশিত হয়। আমরা ইহার আলোচনা যথাস্থানে করিব। মূল কাহিনী লিখিত হয় ২৩ আশ্বিন ১৩০৬ (৯ অক্টোবর ১৮৯৯) তারিখে।

পরিশোধ নৃত্যনাট্য ও মূল পরিশোধের গল্পাংশ প্রায় অবিকল একই আছে; স্থলে স্থলে কবিতার অংশবিশেষের উপরই গানের সুর দেওয়া হইয়াছে; নূতন গান যাহা উল্লেখযোগ্য সেইটি হইতেছে 'ক্ষমিতে পারিলাম না যে ক্ষমো হে মম দীনতা, পাপীজনশরণ প্রভু।' পুরাতন কয়েকটি গান শ্যামার মুখে দেওয়া হইয়াছে; যেমন— 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে' (গীতিমাল্য, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১), 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী' (গীতিমাল্য, ২৬ চৈত্র

১ বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৪৩, পৃ ৪২৬।

২ ১১ আশ্বিন ১৩৪৩,২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬। রামমোহন মৃত্যুবার্ষিকীতে কবি মন্দিরে যথাবিধি উপদেশ দান করিয়াছিলেন। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তাকর্তৃক সংশোধিত। প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৩, পৃ ৬৩৫-৩৭। দ্র ভারতপথিক রামমোহন, পৃ ৩৮-৪৪।

৩ পরিশোধ (নাট্যগীতি)। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৩, পৃ ১-১১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, 'শ্যামা'র পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত, পৃ ২০৯-১৮। গীতবিতান পরিশিষ্ট ২, পৃ ৯৩১।

৪ পরিশোধের আখ্যানবস্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Asiatic Society c Bengal, 1885), p 182 হইতে গৃহীত। মূল আখ্যানটি মহাবস্তু-অবদানের অংশ।

১৩১৮), 'ওই রে তরী দিল খুলে (গীতাঞ্জলি, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭)। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য পর্বের গান যে ভাব হইতে লিখিত ও সকলের কাছে পরিচিত, তাহাতে শ্যামার মুখে উহাদের প্রয়োগ বিসদৃশ ঠেকিতে পারে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি, তাঁহার কবিচিত্ত একই রচনাকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিত না, এবং সে অধিকার তাঁহার ছিল। পরযুগে রবীন্দ্রনাথের গান সিনেমায় অসংগতভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় সমালোচনার কারণ হইয়াছে। এই নাট্যগীতির যবনিকার পূর্বে নেপথ্য হইতে যে সংগীত উদ্‌গীত হয় তাহা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে নাই।

কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে,
যাও চিরবিরহের সাধনায়,
ফিরো না, ফিরো না— ভুলো না মোহে।
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
জয়ী হও অন্তরবিদ্রোহে।
যাক পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা,
যাক মিলায়ে কামনাকুয়াশা।
স্বপ্ন-আবেশ-বিহীন পথে
যাও বাঁধনহারা,
তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে ব'হে।[১]

কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে দুই সন্ধ্যায় পরিশোধের অভিনয় হয়।[২] *Statesman* দৈনিকের সমালোচক নাটিকার মর্মকথাটি প্রকাশ করিয়া যে দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন তাহা লেখকের রসজ্ঞতার পরিচায়ক। তিনি লেখেন, "He (Tagore) makes the stage human. Everyone else on the stage may be acting but he is not. He is reality. Moreover he gives a dignity to the performance— *nautch* is transformed into dance. The dancers are no longer to be exploited for our pleasure but are brothers and sisters, as the winds and the stars are our brothers and sisters, joyously dancing and shining around us"। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "স্টেটস্‌ম্যানে পরিশোধের যে বড়ো সমালোচনা করেছে সেটা প'ড়ে মন কতকটা আশ্বস্ত হল।"[৩]

'পরিশোধ' অভিনয়ের শেষদিন (১১ অক্টোবর) অপরাহ্ণে শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী-উৎসব-সভায় কবি তাঁহার কথামত উপস্থিত হইলেন (২৫ আশ্বিন ১৩৪৩)। সেখানে যে ভাষণ পাঠ করেন তাহাতে শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির স্নেহ প্রতি পংক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, "শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে।.. অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি।.. তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।"[৪]

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কী যে শ্রদ্ধা করিতেন তাহার কথা বাঙালি পাঠকের সুবিদিত নহে। দুই-একটি ঘটনার

১ গীতবিতান, পৃ ৪০৪, ৯৩৫।

২ ২৪, ২৫ আশ্বিন ১৩৪৩। ১০, ১১ অক্টোবর ১৯৩৬।

৩ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৬০। দ্র *The Statesman*, 14 October 1936। *Visva-Bharati News*, November-December, p 37-38।

৪ শরৎচন্দ্রের প্রতি, ২৫ আশ্বিন ১৩৪৩। বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, পৃ ৫৬৩-৬৪। দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ-পরিচয়, মাঘ ১৩৫৭, পৃ ৬৩-৬৫।

উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অমল হোমের বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথকে বহুকাল পরে দেখিয়া তিনি অমলকে লিখিয়াছিলেন, "অনেক দিন পরে রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কী আশ্চর্য সুন্দর— চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়— সৌন্দর্য। জগতে এত বড়ো বিস্ময় জানি না।" এইটি লেখেন ১৯২৭ সালের শেষে। জয়ন্তী উৎসবের পর (১৯৩১) তিনি লিখিয়াছিলেন, "কবির সম্বন্ধে মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি— এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড়ো ভক্ত কেউ নেই— আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু ব'লে— আমার চাইতে কেউ মকৃশো করে নি তাঁর লেখা। আমার চাইতে বেশী করে কেউ পড়ে নি তাঁর উপন্যাস, আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা প'ড়ে ভালো বলে, সে তাঁর জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি।"[১] এই সম্পর্কে আর-একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৯১৭ সালে কলিকাতার বিচিত্রা-ভবনে শরৎচন্দ্র প্রায়ই আসিতেন; লেখক তখন কলিকাতায় থাকিতেন। একদিন নবীন সাহিত্যিকের দল নানা প্রশ্নের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে, কবির 'গোরা' তিনি পড়িয়াছেন কি না। শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বভাবচঞ্চল ভঙ্গিতে বলিলেন, "গোরা! চৌষট্টি বার— চৌষট্টি বার পড়েছি।"

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং রবীন্দ্রভক্ত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তিনি লিখিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য সে খুব মনোযোগ দিয়াও পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়বার ঢাকা গিয়া সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেই সময়ে দেখিয়াছি দু-একদিন জ্বরের ঘোরে অনর্গল সে 'বলাকা'র কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে, প্রত্যেকটি কবিতা তার সম্পূর্ণ মুখস্থ।.. কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখার নিন্দা করিলে সে বড়ো ব্যথিত হইত।"[২]

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কবির এবার কলিকাতায় আসিবার অন্যতম কারণ নিখিলবঙ্গ মহিলা কর্মী -সম্মেলনের উদ্‌বোধন। কলেজ স্ট্রীটে আলবার্ট হলে এই সভা; অভ্যর্থনাসমিতির সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমোহিনী দেবী ও সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীনির্মলনলিনী ঘোষ; কংগ্রেস-কর্মী শ্রীলাবণ্যলতা চন্দ ছিলেন উদ্যোক্তাদের অন্যতমা। এই সম্মেলনের জন্য কবি পূর্বেই ভাষণ লিখিয়াছিলেন (২ অক্টোবর ১৯৩৬); কিন্তু সভায় (১২ই) তিনি সেটি পড়েন নাই, তাঁহার বক্তব্য মুখে মুখেই বলেন।[৩] রবীন্দ্রনাথ সম্মেলনের উদ্‌বোধন করিতে প্রথমে স্বীকৃত হন; কিন্তু তখন 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যের জন্য খুবই ব্যস্ত বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হয় যে হয়তো সময়মত সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তাই 'নারী' শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখিয়া ফেলেন (২ অক্টোবর ১৯৩৬) ও রামানন্দবাবুকে পত্রযোগে জানান যে শান্তা দেবী যেন সেটি সভায় পাঠ করেন। আশুতোষ কলেজে ১১ অক্টোবর অভিনয়— ১২ই সম্মেলনের আরম্ভ-দিন। কলিকাতায় আছেন, অথচ সভায় উপস্থিত হইবেন না, তাহা তাঁহার ঠিক মনে হইল না। তিনি সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিলেন— লিখিত ভাষণটি পঠিত হইল না।[৪]

'নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি ভাবী সমাজে নারীর স্থান কী রূপ গ্রহণ করিবে বা গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে রেখাঙ্কন করিয়া দেন। কবি বলেন যে, সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প যদি আসে তবে সেই "সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৯১-১৯৫২], শরৎ-পরিচয়, পৃ ১০৫-০৭।

২ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎস্মৃতি, প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৫, পৃ ৬৭। দ্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের পথের দাবি ও রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৬০, পৃ ৪৭০-৭৬।

৩ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪১, পৃ ১৮০-৮৪। দ্র কালান্তর। ৪ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ৬৬৩।

পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহুযুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে। নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ।"[১]

দিন পনেরো কলিকাতায় থাকিয়া কবি শান্তিনিকেতন ফিরিলেন (১৩ অক্টোবর ১৯৩৬)। পূজাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইল, ১৭ই নভেম্বর খুলিবে। ছাত্রছাত্রীরা যে-যার আপন বাড়িতে ২০ অক্টোবর চলিয়া গেল। উত্তরায়ণের বৃহৎ পুরী প্রায় জনশূন্য। প্রতিমা দেবী আছেন পুরীতে স্বাস্থ্যের জন্য; রথীন্দ্রনাথ নৌকায় ভ্রমণ করিতেছেন।[২] ইন্দিরা দেবী রাঁচি হইতে কবিকে আহ্বানলিপি পাঠাইয়াছেন; কবি কিন্তু যাইতে নারাজ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবিতকালেও তিনি সেখানে কখনো যান নাই; শুনিয়াছি সেজন্য মনে মনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটু অভিমান ছিল। প্রতিমা দেবীকে কবি লিখিতেছেন যে হাওয়া বদল করিবার জন্য, "আমি যাচ্চি বাস্‌-এ চড়ে লেনর্ড-রোড্‌ বেয়ে সুরুলে শ্রীনিকেতনের তেতলার ঘরে। সেখানে চারিদিকে পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে সবুজ রঙের সমুদ্র। পুরীর সমুদ্রের চেয়ে কম নয়।"[৩]

সুরুলের বাড়ির তেতলায় কবি ছিলেন ২৭ অক্টোবর হইতে ২৭ নভেম্বর (১৯৩৬) পর্যন্ত, অর্থাৎ ১২ কার্তিক হইতে ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩। এখানে "ভালো লাগচে— আকাশ খুব কাছে এসেছে, আলোর বাধা নেই কোথাও, লোকজন সর্বদা ঘাড়ের উপর এসে পড়চে না।"[৪] এই তিনটি কথা অতি সত্য তাই মন বেশ প্রসন্ন। 'সে' লেখেন, ছবি আঁকেন, খুচরো কবিতা রচেন। 'মাসপয়লা' নামে ছোটোদের মাসিকের সম্পাদক শ্রীহট্টবাসী ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরোধে ১৫ কার্তিক (১ নভেম্বর) একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান।[৫] এইদিন লেখেন 'প্রহাসিনী'র 'ভাইদ্বিতীয়া'[৬] (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১৩৪৩)। এই কবিতার ইতিহাস আছে; বরাহনগরের শ্রীমতী পারুল দেবী রবীন্দ্রনাথকে নাতনীরূপে কয়েকবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠাইয়াছিলেন; এই কবিতাটি তাহারই স্বীকৃতি। ইহারই অনুক্রমণে ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৭ শান্তিনিকেতন হইতে কবি পারুল দেবীকে লেখেন, "বাংলাদেশের সমস্ত দিদি-জাতীয়ার স্তবগানকে তোমার বন্দনাগানের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছি। এটা তোমার পছন্দ হয় নি। তবু বরাহনাগরিকাই অগ্রগণ্যা হয়ে রইল, এটা তুমি উপলব্ধি করলে না কেন। দেবীর কোপ দূর হোক, প্রসন্ন হয়ে তিনি বরদানস্বরূপে বড়িদান করুন, এই আমার প্রত্যাশা।"[৭]

১ "Many strange things happened in those days, [of 1930-31 Civil Disobedience Movement] but undoubtedly the most striking was the part of the women in the national struggle"—Jawaharlal Nehru, *Autobiograhy*, p 214।

২ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৬১, বিজয়া দশমী [৮ কার্তিক ১৩৪৩। ২৫ অক্টোবর ১৯৩৬]

৩ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৫১, ৯ কার্তিক ১৩৪৩। লেনর্ড রোড— শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের পথ। এলমহার্স্টের নামের প্রথম অংশ লেনর্ড।

৪ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৫৩। ৫ দ্র মাসপয়লা, ২১শ বর্ষ, ৫ বৈশাখ ১৩৫৫।

৬ 'ভাইদ্বিতীয়া' কবিতাটির মধ্যে বাংলাদেশে বোন হইয়া জন্মগ্রহণ করার মধ্যে যে সামাজিক দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়, তাহাই বিদ্রূপিত হইয়াছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে 'নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটিতে বঙ্গমহিলা অনাবশ্যক!' শীর্ষক বিবিধ প্রসঙ্গে এই কবিতাটিকে অন্যভাবে দেখিয়াছেন। ফাল্গুন ১৩৪৩, পৃ ৭৪৬।

৭ দেশ, ৯ মাঘ ১৩৪৯, পৃ ৩৬১। ইহাকে লিখিত অন্যান্য পত্র দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৪ পৌষ ও ৯ মাঘ ১৩৪৯। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫৩০-৩১। শ্রীনিকেতন-বাস-কালে 'ঘরছাড়া' (২২ নবেম্বর ১৯৩৬, সেঁজুতি) ছাড়া আর বেশি কবিতা চোখে পড়ে না; যদি লিখিয়াও থাকেন তারিখ না দেওয়ার জন্য সনাক্ত করা কঠিন। 'ঘরছাড়া' অসম ছন্দে সমিল কবিতা।

কবি যখন শান্তিনিকেতনে সেই সময়ে একদিনের জন্য কলিকাতা হইতে জবহরলাল নেহেরু কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে সমসাময়িক প্রবাসী লিখিতেছেন, "ভারতবর্ষের সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী মনস্বীর সহিত কংগ্রেস অধিনায়কের কী কথা হইয়াছিল, জানিতে শুধু যে অলস ও বৃথা-কৌতূহল হয় তাহা নহে, জানিতে পারিলে সর্বসাধারণ উপকৃত হইতেন।

"মহাত্মা গান্ধীর সহিত যেমন বিখ্যাত অবিখ্যাত দেশী বিদেশী বহু ব্যক্তি দেখাসাক্ষাৎ করেন, রবীন্দ্রনাথের সহিত সেইরূপ বহু বৎসর হইতে বিস্তর লোক দেখা করিয়াছেন, কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজির সহিত এই-সব সাক্ষাৎকারের ও কথোপকথনের বৃত্তান্ত ও অনুলেখন রক্ষিত ও প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন লিখিয়া রাখিবার এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হইত।"[১] দুঃখের বিষয় সন্ধান করিতে গিয়া এই-সব তথ্য আমরা বেশি কিছু পাই না। যদিই-বা কেহ রাখিয়া থাকেন তাহা হয়তো পরে প্রকাশিত হইতেছে; এবং আমাদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে তাহা মুদ্রিত হইবে। তবে সেই ভাবী রবীন্দ্রোক্তির মধ্যে কতখানি রবীন্দ্রনাথ, এবং কতখানি লেখক-ব্যক্তি আছেন বা থাকিবেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোনো উপায় নাই। আমাদের মতে, সে-সব 'কথা-বার্তা' অত্যন্ত সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, এক দিকে আমরা 'গুরুবাদী', অন্যদিকে অনৈতিহাসিক অতিরঞ্জন ও অপরঞ্জন দুইই আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। সেইজন্য এই শ্রেণীর রচনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ পাঠকদের বিশেষ critical হইতে হইবে। কোনো কোনো লেখক তাঁহাদের গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মুখে যে ভাষা দিয়াছেন, তাহা যে রবীন্দ্রনাথের ভাষা হইতেই পারে না তাহা তাঁহার সাহিত্য-পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার কয়েকদিন পরে কবি শ্রীনিকেতন হইতে শান্তিনিকেতন ফিরিয়া আসিলেন (২৭ নভেম্বর ১৯৩৬, ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩)। 'পুনশ্চ' নামে নূতন বাড়িতে কয়েকদিন থাকিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেখানকার কাজকর্ম এখনো শেষ হয় নাই, তাই উদয়নের তেতলায় আশ্রয় লইলেন। সেখানে খুপরি-খুপরি ঘর, উঁচুতে নিচুতে; সম্মুখে খোলা ছাদ; নূতন পারিপার্শ্বিক। এবার দীর্ঘকাল কবি এইখানে বাস করিলেন।

শ্রীনিকেতন হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিবার দুইদিন পরে (১৩ অগ্রহায়ণ) লিখিলেন 'পুপুদির জন্মদিনে' কবিতাটি; কবিতাটির মধ্যে কবির শিশু-ভোলানো মনের ভাবখানি পাই যাহা হইতে 'সে'র উদ্ভব। আজ যাহা লিখিতেছেন তাহা 'বয়স-চোরার কাজ' বলিয়াই জানেন। তবে 'সে'র সবটাই নূতনও নহে, এই সময়ে লিখিতও নহে। পূর্বে লেখা কয়েকটি আখ্যায়িকা সমসাময়িক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়; সেগুলি অবলম্বন করিয়া এখন লিখিলেন 'সে'।[২] 'সে' লেখার প্রত্যক্ষ কারণ, রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিনীর চিত্তবিনোদন। সেই প্রেরণায় এই অদ্ভুত গল্পগুলির সৃষ্টি। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করিয়া লিখিলেন—

১ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, পৃ ৩০৭।

২ সন্দেশ, নবপর্যায় ১৩৩৮, আশ্বিন কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'সে'র প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের কোনো কোনো অংশের পূর্বতন পাঠ প্রকাশিত হয়। 'রংমশাল', কার্তিক ১৩৪৩ (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ১-৬) সংখ্যায় যাহা মুদ্রিত হয় তাহা 'সে'র পঞ্চম অধ্যায়ে সংকলিত হইয়াছে। ভূমিকা অংশটি (রংমশালের পাঠ)। 'সে'র প্রথম অধ্যায়ে ঈষৎ রূপান্তরিত ভাবে গ্রথিত হইয়াছে। 'মুকুল', নবপর্যায় বৈশাখ ১৩৪১, সংখ্যায় 'বাঘের শুচিতা'— এই গ্রন্থে 'এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ'। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৬৫২। 'গেছো বাবা' আখ্যানটি নাটকাকারে 'শারদোৎসব'-অভিনয়-কালে (আশ্বিন ১৩৪২) সংযোজিত হয়। অবশ্য গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই।

আমারও খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে। . .
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা।

হয়তো এইগুলির কথা মনে রাখিয়াই তিনি বলিয়াছেন—

ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ
যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে—
যার কোনো দাম নেই
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয় নি কখনো।

'সে' গ্রন্থের উৎসর্গ এই কবিতা ও খাপছাড়ার ভূমিকা কাছাকাছি সময়ে লিখিত।[১]

'পরিশোধ' নাটক অভিনয়ের পর ১৩ অক্টোবর কবি বোলপুর ফিরিয়াছিলেন। তার পর একাদিক্রমে ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭) পর্যন্ত চারি মাস শ্রীনিকেতনে ও শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেন। এই পর্বের মধ্যে 'সে' ও 'খাপছাড়া' প্রকাশিত হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পৌষ-উৎসব[২], মাঘোৎসব, শ্রীনিকেতনের উৎসব এই পর্বের অন্তর্গত।

এই-সব ভাষণের মধ্যে আমরা বিশেষভাবে খ্রীষ্টোৎসব সম্বন্ধে তাঁহার ভাষণের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাঠকের স্মরণ আছে যে, ১৯১০ হইতে বরাবর খ্রীষ্টের জন্মদিন আশ্রমে পালিত হইয়া আসিতেছে এবং কবি উপস্থিত থাকিলে খ্রীষ্টমাস দিনে তিনি উপাসনা করিতেন। অধুনা (১৯৩৬) পৃথিবীর নানা স্থানে ঘনায়মান যুদ্ধায়োজনের মহোৎসবের মধ্যে খ্রীষ্টের অহিংস মন্ত্র গ্রহণেই মানবের মুক্তি, এই কথা কবির মনে জাগিতেছে :

"খ্রীষ্টের প্রেরণা মানবসমাজে আজ ছোটো বড়ো কত প্রদীপ জ্বালিয়েছে, অনাথ-পীড়িতদের দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁরা অপরিসীম ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। . . শাস্ত্রবাক্যকে তো আমরা ভালোবাসতে পারি নে . . মহাপুরুষেরা . . আপন জীবনে প্রদীপ জ্বালান ; তাঁরা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তাঁরা আমাদের দিয়ে যান মানুষরূপে আপনাকে। . . এই বিরাট কলুষনিবিড়তার মধ্যে দেখা যায় না তাঁদের যাঁরা মানবসমাজের পুণ্যের আকর। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই আছেন— নইলে পৃথিবী অভিশপ্ত হত, সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেত, সমস্ত মানবলোক অন্ধকারে অবলুপ্ত হত।"

১ খাপছাড়া, ভূমিকা, ১৬ পৌষ ১৩৪৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১। সে-র উৎসর্গ পৌষ মাসে লিখিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬।

২ ৭ই পৌষ [১৩৪৩], শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত -কর্তৃক অনুলিখিত, প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৩, পৃ ৫৫০-৫২। খ্রীষ্ট উৎসব (২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৬), শান্তিনিকেতন মন্দিরে বড়দিন উপলক্ষে কথিত, শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত; প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৭৮৭-৮৮। দ্র. খ্রীষ্ট (বিশ্বভারতী), ২৫ ডিসেম্বর ১৯৫৯, শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত।

মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় যাইবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছিল ; কবি প্রত্যাখ্যান করিয়া ইন্দিরা দেবীকে লিখিলেন, "আমার এখানে ১১ই মাঘ উৎসব আছে, এখানকার অনুষ্ঠান আমাকেই সম্পন্ন করতে হয়।"[১] রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসবকে ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান বলিয়া 'সাম্প্রদায়িক' জ্ঞান করিতেন না। জীবনের শেষ বৎসর পর্যন্ত যথারীতি মাঘোৎসবকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বেও ইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছিলেন, "শান্তিনিকেতনে ১১ই মাঘের উৎসব করতে আমার একটুও সংকোচ বোধ হয় না কিন্তু আমাদের বাড়িতে অর্থহীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর আমাকে বড়ো লজ্জা দেয়।"[২]

এবারকার শান্তিনিকেতনের মাঘোৎসবের দিনে কবির তিনটি নূতন গান পাই : ১. হৃদয়ে হৃদয় আসি মিলে যায় যেথা, ২. দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক, ৩. শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান।[৩] এই গানগুলির সহিত তুলনীয় কয়দিন পরে লিখিত সেঁজুতির কবিতা 'পরিচয়' (১৩ মাঘ ১৩৪৩) ও 'যাবার মুখে' (২২ মাঘ)।

কিন্তু জীবনের সবটাই তত্ত্ব নয়, এবং উদয়-অস্ত কোনো মহাপুরুষই একটি তুরীয়তার মধ্যে থাকিতে পারেন না ; রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বদর্শী কবি হইলেও বিচিত্রের সাধক ; তাই তাঁহার জীবনে উষায় ও সন্ধ্যায় বিচিত্র রসের উৎস উৎসারিত হয় রচনায়, বাক্যে ও কর্মে। তাই দেখি মাঘোৎসবের গান ও সেঁজুতির কবিতার সঙ্গে আছে প্রহাসিনীর 'অনাদৃতা লেখনী'।[৪]

জানুয়ারি (১৯৩৭) মাসের শেষ দিনে কবি সংবাদ পাইলেন প্রাগ-এ (Prague) অধ্যাপক Winternitz-এর মৃত্যু হইয়াছে ; বিন্টারনিটজ ১৯২৩-২৪ সালে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক-রূপে আসিয়াছিলেন ; কবির সহিত তাঁহার একটি প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে কবি গভীর বেদনা বোধ করেন ; তিনি অধ্যাপকের ভগিনীকে যে পত্র দেন তাহাতে বলেন, "During my long life and extensive travels, I never met a savant more worthy of respect than the learned doctor. . . In him I have lost a faithful comrade, India has lost one of its truest Pandits and best friends, and humanity one of its sincere champions।"[৫]

ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে কবির কাছে অনুরোধ আসিয়াছে আগামী 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস'-এর (২৪ জানুয়ারি) জন্য একটি বিশেষ গান লিখিয়া দিতে হইবে। সেই অনুরোধে কবি প্রথমে লেখেন 'শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান' ও পরে লেখেন 'চলো যাই, চলো যাই'[৬], শেষ গানটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত হয়। শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন এই গানের মহড়া চলে ; ছাত্ররা এই গানটি শিখিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষকদের সঙ্গে অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রমোহন সেনের নেতৃত্বে মন্দিরে যাইত। কিন্তু এ গানটি চালু হইল না। কিন্তু 'শুভ কর্মপথে' গানটি নানা অনুষ্ঠানে গীত হইতে দেখা যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে ছাত্ররা গানটি গাহিয়াছিল। দুঃখের বিষয় শ্যামাপ্রসাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠাদিবসের উৎসব সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয় নাই ; কারণ মুসলমান ছাত্ররা উৎসবে যোগদান করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীল্ (seal)-এ 'পদ্ম' ও 'শ্রী' পৌত্তলিকতার প্রতীক বলিয়া তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য মুসলমানরা

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৪, ৮ জানুয়ারি ১৯৩৭।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৩৬, ১ বৈশাখ ১৩৩৮।

৩ দ্র প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৩, পৃ ৬০৩-০৪। গীতবিতান, যথাক্রমে পৃ ১৯৮, ৮৭ ও ২৬৪।

৪ ১৪ মাঘ ১৩৪৩ 'অনাদৃতা লেখনী'র কয়েকটি পংক্তির খসড়া দেখা যায় ; কবিতাটি ছাপা হয় বিচিত্রায়, বৈশাখ ১৩৪৪। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫৩৩।

৫ *Visva-Bharati News*, February 1937, p 58।

৬ গীতবিতান, পৃ ২৬৩।

কিছুকাল হইতে জিদ করিতেছিল ; সেই আন্দোলনের অভিঘাতে প্রতিষ্ঠাদিবসের উৎসব অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।[১]

কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বা কনভোকেশন-এ পৌরোহিত্য করিবার আহ্বান পাইয়াছেন, তজ্জন্য ভাষণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে অমিয় চক্রবর্তীর নিকট হইতে 'আফ্রিকা'[২] সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছে। কবি সেটি লেখেন ২৮ মাঘ, কলিকাতায় যাইবার আগের দিন। আফ্রিকার ইতিহাস কবি ভালোরূপই জানিতেন ; মোরেল (E. D. Morel) প্রভৃতির বই তাঁহার পড়া ছিল। এই হতভাগ্য মহাদেশের কৃষ্ণকায় মানুষের প্রতি শ্বেতকায় তথাকথিত সভ্যমানুষের অত্যাচার সুবিদিত। কবি লিখিতেছেন—

সভ্যের বর্বর লোভ
    নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
    পঙ্কিল হ'ল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে।
সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
    মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
    সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে ;
        শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে ;
        কবির সংগীতে বেজে উঠেছিল
            সুন্দরের আরাধনা।

অমিয় চক্রবর্তী এক পত্রে কবিকে লেখেন (১৯৩৮) যে 'আফ্রিকা'র ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হইলে তিনি বিলাতে নির্বাসিত ইথিওপীয় সম্রাট হাইলে সেলেসীর হস্তে সেটি দেন। তিনি পাঠ করিয়া শান্তি পান। এ ছাড়া উগাণ্ডার রাজকুমার নীয়াবঙ্গো এই কবিতাটি বাণ্টু ও সুহালি -ভাষী আফ্রিকানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া দেন।[৩]

১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭। ২৯ মাঘ ১৩৪৩) কবি কলিকাতায় গিয়া উঠিলেন বরাহনগরে মহলানবিশদের বাড়ি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ উদ্‌বোধক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বৎসরের ইতিহাসে (১৮৫৭-১৯৩৭) তথাকার কর্তৃপক্ষের নিঃসম্পৃক্ত ব্যক্তি বা বেসরকারী কোনো লোক কখনো কন্‌ভোকেশন বা সমাবর্তনের পৌরোহিত্য করেন নাই। এই অঘটন ঘটাইবার কৃতিত্ব তৎকালীন ভাইস-চান্‌সেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-২৩ জুন ১৯৫৩)। সিনেট হলে স্থান সংকুলান হইবে না জানিয়া কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্‌সি কলেজের প্রাঙ্গণে বিশেষ মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বার্ষিক পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভা'য় তাঁহার 'কন্‌ভোকেশন অ্যাড্রেস'

১ ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation-এ মিঃ এনড্রুজ ভাষণ দান করেন। সে সভায় মুসলমান মন্ত্রীদের ছয়জনের মধ্যে একজনও এমন-কি প্রধান তথা শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবও উপস্থিত হন নাই। প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৪, পৃ ৮৮৪।

২ পত্রপুট ১৬। প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩। ইহা ২য় সংস্করণে প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়, ১৩৪৫। ইহার আরও দুইটি পাঠ মুদ্রিত আছে : কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৪ ; বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৪৯-৫০ ; ৪৩৪-৩৬। এই সময়ে ইথিওপিয়ার উপর ইতালির উৎপাত শুরু হইয়াছে।

৩ অমিয় চক্রবর্তীর পত্র। লাহোর হইতে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের পুঁথিশালা হইতে প্রাপ্ত।

বাংলায়[1] পাঠ করেন (১৭ ফেব্রুয়ারি। ৫ ফাল্গুন); ইহাও অভূতপূর্ব ঘটনা; ইতিপূর্বে কেহ বাংলাভাষায় বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় কনভোকেশনের বক্তৃতা করেন নাই। এ দেশের ভাষা-বিভ্রাট বহু দিনের; এবং সে-সমস্যা যে আজও নিরাকৃত হইয়াছে তাহা নহে। "ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। . . সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা। . . দীর্ঘকাল ধ'রে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার ক'রে এসেছি।"[2] কবি বলেন, "আমাদের দেশে শিক্ষা অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ।" বক্তৃতাশেষে কবি প্রার্থনা আবৃত্তি করেন—

হে বিধাতা,
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে।
সবলে ধিক্কৃত করো দীনতার ধুলায় লুণ্ঠন।
দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদা-বিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসংকোচে

১ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৯১১-১৩। ছাত্রসম্ভাষণ, শিক্ষা (১৩৫১ সং) পৃ ২৫০-৬০।

২ চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বিংশ অধিবেশনে (ফাল্গুন ১৩৪৩) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার ভাষণের এক স্থানে বলেন— "১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাংলার জন্য যোগ্য স্থান নির্দিষ্ট হয় এবং প্রবেশিকা ও এফ-এ পরীক্ষায় [Entrance ও First Arts নাম তখন ছিল, Matriculation ও Intermediate in Arts, I. A.-র স্থলে] যাহাতে ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বাংলার বাহনে বিতরিত হয়— তজ্জন্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া (আমিও কমিটির একজন সদস্য ছিলাম) একটি কমিটি গঠিত করেন। ঐ কমিটি সসংকোচে প্রস্তাব করেন— 'That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics at the Entrance examination, the answer may be given in any of the living languages recognised by the Senate'। ঐ প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলে বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। . . সিনেট এইরূপ বিধান করেন যে, 'An optional examination be held in original composition in Bengali and other vernaculars for the F. A. and B. A. candidates, proficiency in it entitling candidates to a special certificate।" দ্র প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৯০১-০২। এণ্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৯১০ পর্যন্ত ছাত্রদিগকে বাংলায় পরীক্ষা দিতে হইত না। থার্ডক্লাস (class VIII) পর্যন্ত বাংলা পড়ানো হইত। মেয়েরা বাংলা লইতে পারিত। মনে আছে আমাদের স্কুলে আমাদের উপরের ক্লাসে একটি ছেলে বাংলায় পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হয়; এই সংবাদ পাইয়া আমাদের ক্লাসে কী হাস্য! সে ছেলেটি যেন অদ্ভুত কিছু করিয়াছে। এই ছিল বাংলার দশা।

মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে,
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।

কবির এই বাংলা ভাষণ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত ইহার ইংরেজি তর্জমা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

সমাবর্তন-উৎসবের চারিদিন পরে কবি একদিনের জন্য চন্দননগর যান। সেখানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ২০তম অধিবেশন; এই সম্মেলন ছয় বৎসর পরে আহূত হইয়াছে। মূল সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি চন্দননগরের সর্বজনপরিচিত দানবীর হরিহর শেঠ। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা-বরাহনগর হইতে নৌকাযোগে চন্দননগর যান ও সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্‌বোধন করিয়া সেই রাত্রেই ফিরিয়া আসেন (৯ ফাল্গুন ১৩৪৩। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭)।[১]

বরাহনগরে কবি ১১ ফেব্রুয়ারি হইতে ৭ মার্চ পর্যন্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে ৩ মার্চ (১৯ ফাল্গুন ১৩৪৩) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে সর্বধর্ম-সম্মেলন হইল। মূল সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, তিনি অসুস্থ হওয়ায়, অন্যে তাঁহার ভাষণ পাঠ করিয়া দেন; সভায় উপস্থিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষণ পড়িয়াছিলেন। বক্তৃতা-শেষে কবিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্‌ড্‌ বলেন, যদি এই ধর্ম-সম্মেলনে কেবল এই অভিভাষণটিই পঠিত হইত, তাহা হইলেও অধিবেশন সার্থক মনে করা যাইতে পারিত।[২]

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ পরমহংসদেব সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সংক্ষিপ্ত; ধর্মের মূলতত্ত্ব ও ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিচারই ছিল ভাষণের মূল কথা। কবি বলেন, "ভগবান বুদ্ধ প্রচার করেন মৈত্রী— অর্থাৎ বিশ্বশান্তির সম্বন্ধ— জীবে জীবে— তথা নিখিল সৃষ্টিতে। এ জগতকে আমরা অসত্য সম্বন্ধে বাঁধি যখন তাকে শুধু আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার উপাদান করতে চেষ্টা করি। বুদ্ধ কি এইটি বুঝাতে চান নি যে সৃষ্টির আসল অর্থবোধ হয় প্রেমে? .. সে মুক্তি নেতিবাচক নয়, কারণ প্রেম কখনো শূন্যতায় নিয়ে যায় না। শুধু বন্ধন ছিন্ন করায় নয়— সম্বন্ধের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যেই মুক্তি। যেখানে মুক্তি শুধু ফাঁকা ও বস্তুবর্জিত সেখানে তার কোনো মানে নেই।"

কবি বলিতেছেন, "যে ধর্ম আমাদের মুক্তি দিতেই এসেছিল সেই হয়ে ওঠে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রচণ্ড শত্রু। সব বাঁধনের মধ্যে ধর্মনামাঙ্কিত বাঁধনই ভাঙা সব চেয়ে কঠিন। সব গারদের মধ্যে জঘন্যতম সেটা— যা অদৃশ্য, যেখানে মানুষের আত্মা মোহজনিত আত্মপ্রবঞ্চনায় বন্দী। .. নির্লজ্জ অহমিকার ধর্ম মরে গিয়ে জড় সাম্প্রদায়িকতা ও ঘৃণ্য বিষয়বুদ্ধি ধর্মের মুখোশ হয়ে দাঁড়ায়। এ জগতে অর্থনৈতিক হিসেবী মন মানুষকে যেমন সংকীর্ণ করে, তার চেয়েও মানুষের হৃদয়টা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িকতার চাপে। .. ধর্মের পবিত্র উৎসমূল থেকে যতই আমরা দূরে যাই

১ তদুপলক্ষে কবি যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য তাঁহার দ্বারা সংশোধিত ও অনুমোদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। দ্র প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৮৯৬-৯০১।

২ [Sri Ramkrishna Centenary Parliament of Religions. Address by Rabindranath Tagore, Town Hall, Calcutta, 3rd March 1937, Pages 9. Art Press, Calcutta]. Rabindranath Tagore, Religion of the Spirit and Sectarianism (Address at Sri Ramkrishna Centenary Parliament of Religions)— *The Modern Review*, April 1937; সভায় পড়িবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ মুদ্রিত পুস্তিকাটি অল্প কিছু সংশোধন করেন। এই সংশোধিত পাঠ মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত হয়। দ্র প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৯১০। কবির ভাষণের বাংলা তর্জমা পাই নাই, উদ্বোধন অফিসে লিখিলে, তাঁহারাও হদিশ দিতে পারেন নাই। ষোলো বৎসর পরে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে ডক্টর কালিদাস নাগ অনুবাদ করেন।

ততই দেখি আমরা ক্রমশ হারাই সেই প্রাথমিক গতিবেগ, আর সেই সঙ্গে দেখা দেয় যুক্তিহীন অভ্যাস ও যান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের শূন্যতা ও ধার্মিকতার অহংকার।"[১]

এই দীর্ঘ ভাষণে কবি সম্প্রদায়-অতীত ধর্মবোধের কথাই বলেন। সর্বধর্ম-মহাসম্মেলনের বাণীই হইতেছে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ধর্মের বাণী। "When .. religions travel from their sacred sources, they lose their original dynamic vigour, and degenerate into the arrogance of piety, into an utter emptiness crammed with irrational habits and mechanical practices ; then is their spiritual inspiration befogged in the turbidity of sectarianism, then do they become the most obstinate obstruction that darkens our vision of human unity, piling up out of their accretions and refuse deadweights of unreason across our path of progress,—till at length civilised life compelled to free its education from the stifling coils of religious creeds." মহাপুরুষদের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার ভয় শিষ্যদের লইয়া— কারণ তাহারাই obscure and distort the ideas originating from the higher source. কবি এই ভাবটির উপর খুবই জোর দিয়া বলেন, "The history of great men .. ever runs the risk of being projected on to a wrong background of memory where it gets mixed up with elements that are crudely customary and therefore inertly accepted by the multitude."

কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে একটি বিশ্বব্যাপারিক ঘটনা সম্পর্কে প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করিতে দেখা যায়। বিষয়টি এই: আমাদের আলোচ্যপর্বে য়ুরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু উদ্ধত রাষ্ট্রশক্তি-সমূহের অত্যাচার উৎপীড়ন নানারূপে প্রকাশমান। ইতালির সর্বময় কর্তা মুসোলিনী আফ্রিকার স্বাধীন ইথিওপীয়দের দেশ (আবিসিনিয়া) আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছেন (অক্টোবর ১৯৩৫ - মে ১৯৩৬)। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে অগণিত ইথিওপীয়দের ইতালীয়ানরা নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সমকালীন জাগতিক প্রবাহের সকল সংবাদই মোটামুটিভাবে রাখেন। 'আফ্রিকা' কবিতাটিতে মনের তাপ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

য়ুরোপের অপর প্রান্তে স্পেনেও বিপ্লব চলিতেছে। সেখানে রাজতন্ত্রের অবসান হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এবং রিপাবলিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ডিমক্রেসির জন্য দেশ প্রস্তুত ছিল না। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধ হইল। ১৯৩৬-এ বিদ্রোহ আরম্ভ হয়; সৈন্যসমষ্টির মধ্য হইতে সেনাপতি ফ্রাংকো হইলেন নেতা। পুরোহিত সম্প্রদায় ও প্রতাপশালী জমিদারশ্রেণীর সহিত হাত মিলাইয়া ফ্রাংকো রিপাবলিকানদের ধ্বংস করিলেন। য়ুরোপের বহু দেশ হইতে স্বেচ্ছাসেবকরা এই স্বাধীনতার পক্ষ লইয়া সংগ্রাম করিতে সে দেশে আসিল, কত বীরহৃদয় প্রাণ দিল! বরাহনগর হইতে স্পেনের ঘটনা সম্পর্কে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মার্চের স্টেটসম্যান দৈনিকে রবীন্দ্রনাথের এক বিবৃতি প্রকাশিত হইল—

"In this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal to the conscience of humanity. Help the people's front in Spain, help the Government of the people, cry in million voices, halt to reaction, come in your millions to the aid of democracy, to the success of civilization and culture."

১ দ্র দৈনিক বসুমতী, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৯, অনুবাদক ডক্টর কালিদাস নাগ, পৃ. ১৮-২০, ১৬৯।

আলমোড়ায় লিখিত (মে ১৯৩৭) 'চলতি ছবি' কবিতায় (সেঁজুতি) এই স্প্যানীশ যুদ্ধের কথা শুনিতে পাই—

যুদ্ধ লাগল স্পেনে ;
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।
সংবাদ তার মুখর হল দেশ মহাদেশ জুড়ে,
সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে
দিকে দিকে যন্ত্রগরুড় রথে
উদয়রবির পথ পেরিয়ে অস্তরবির পথে।

এই সময়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে League against Fascism and War নামে একটি সংঘ গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে ইহার সভাপতি করা হয়। সম্পাদক হন সৌম্যেন্দ্রনাথ। অন্যান্য সদস্য ছিলেন সজ্জদ, জবহর, ডাংগে, কমলা দেবী, জয়প্রকাশ, রঙ্গ প্রভৃতি।[১]

আলমোড়া

কলিকাতার বিচিত্র কার্য শেষ করিয়া প্রায় এক মাস কাল পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (৭ মার্চ ১৯৩৭)। পরদিন আশ্রমে আসেন স্যর জন্ রাসেল সস্ত্রীক। স্যর জন্ ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী, কৃষি-রসায়নবিদ্ বলিয়া জগৎ-খ্যাতি। তিনি বিশ্বভারতীর উভয় প্রতিষ্ঠান— বিশেষভাবে শ্রীনিকেতন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলেন। শ্রীনিকেতনের গ্রাম-উদ্যোগ ও শান্তিনিকেতনের কলা ও জ্ঞানযোগ উভয়ই-যে জাতীয় জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ এই তত্ত্বটি স্যর জন্ স্বল্পকাল অবস্থানের মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লেখেন, 'It is rare to find so much of the University ideal realized within so small a compass.'[২] বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপূর্ণ আদর্শ এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান এইটি তিনি বুঝিয়া যান।[৩]

এক সপ্তাহ পরে শান্তিনিকেতনে "রবিবাসরের অধিনায়ক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে . . ৩০শে ফাল্গুন রবিবাসরের অধিবেশন" হইল। রবিবাসরের সদস্যগণের শান্তিনিকেতনে আসিবার ইচ্ছা বহু দিনের। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষে কবি যখন কলিকাতায়, সেই সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন (৯ ফাল্গুন ১৩৪৩) যে ফাল্গুন মাসের শেষ দিকে রবিবাসরকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করা সম্ভব হইবে। তদনুযায়ী তাঁহারা আসিলেন। অতিথিদের মধ্যে জনৈক লিখিতেছেন, "কবির আদর, অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তায় ও তাঁর অমৃতময়ী বাণীর মধ্য দিয়া তাঁহার অভিজাত ও উদার হৃদয়ের যে অপূর্ব পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে বিশেষ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।"

ইতিপূর্বে সাহিত্যিকরা সংঘবদ্ধ ভাবে কখনো শান্তিনিকেতনে আসেন নাই— অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে বহু লেখক-

১ দ্র. *Amrita Bazar Patrika*, 4 March 1937। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ মার্চ ১৯৩৭।

২ *Visva-Bharati News*, April 1937, p 74, 78. Sir John Russell, F. R. S., Director of Rothamstead Experiment Station।

৩ "বিশ্ববিখ্যাত Sir John Russell সম্প্রতি এসেছিলেন। তিনি এই অনুষ্ঠান দেখে সত্যিকার অভাব কোথায় তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁকে বোঝাবার কোনো প্রয়োজন হয় নি।" রবিবাসরে অভিভাষণ ; বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৩৩১।

লেখিকা কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। রবিবাসরের যে-সব সদস্য শান্তিনিকেতনে আসেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।[১]

উত্তরায়ণে রবিবাসরের সভা হয়। জলধর সেন উদ্‌বোধনে বলেন, "কলকাতা থেকে কয়লা নিয়ে রাণীগঞ্জে বিক্রয় করতে আমরা আসি নি। আমরা এসেছি এই পবিত্র তীর্থে, এই পুণ্য আশ্রমে, এই পবিত্র স্বর্গে নিজেদের পবিত্র করতে, সার্থক করতে, আর আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শুনতে।"

কবির ভাষণ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংকেতিক অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। কবি বলেন, "আপনাদের আমি এখানে আহ্বান করেছি দেখবার জন্য বোঝবার জন্য আমি কিভাবে এখানে দিন কাটাই। আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করি নে। আমার এই কার্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যে বাণী এখানে প্রকাশ পেয়েছে, যে আলোকপ্রভা এখানে দীপ্তি দিয়েছে, তার ভিতর সমস্ত দেশের অভাব ও ভাবনার উত্তর রয়েছে। এখানে আমার সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা নয়, এখানে আমার কর্মই রূপ পেয়েছে। এখানে আমার এই কর্মের ক্ষেত্রে আমি এতদিন কী করেছি না করেছি তারই পরিচয় আপনারা পাবেন।"[২] সাহিত্যিকগণ শান্তি-নিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বিচিত্র কর্ম-অনুষ্ঠান দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।[৩]

বাহিরের লোকজনের আসা-যাওয়া, নানা বিষয়ের মৌখিক আলাপ-আলোচনা, কখনো আলোচনার উপর চলে লেখনী চালনা—এইভাবে দিন যায়। সমস্তের সঙ্গে আছে নিত্যপ্রাতের কাব্যসাধনা। তবে সেখানে বেগ বা আবেগ কোনোটাই তীব্র নহে। সেঁজুতি, নবজাতক, প্রহাসিনীর মধ্যে এই সময়ে রচিত কবিতাগুলি[৪] ছড়াইয়া আছে, কালানুক্রমে একস্থানে পাইবার উপায় নাই। এগুলি ২৭ ফাল্গুন ১৩৪৩ হইতে ১৩ বৈশাখ ১৩৪৪-এর মধ্যে লিখিত।

একমাস পূর্বে লিখিত 'যাবার মুখে' (২২ মাঘ ১৩৪৩) হইতে 'স্মরণ' (২৫ চৈত্র ১৩৪৩) কবিতা কয়টির মধ্যে মনের একটি বিশেষ ভাব দেখা যায়— সর্বানুভূতি, সর্বত্যাগের বাসনা ও সর্বক্ষণিকতার অনুভাব।

যে-আমি রয়েছে তোমার আমায় সে-আমি আমারি আমি।
সে আমি সকল কালে,
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।[৫]

১ এই নামের তালিকা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীতিনকড়ি দত্ত মহাশয় লেখককে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখে পাঠাইয়া দেন: অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ রায়, খগেন্দ্রনাথ সেন, গিরিজাকুমার বসু, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তিনকড়ি দত্ত, দিব্যেন্দু লাহা, ননীমাধব চৌধুরী, নরেন্দ্র দেব, নরেন্দ্রনাথ বসু, নরেশচন্দ্র মিত্র, নিধিরাজ হালদার, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার সরকাব, প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ফণীভূষণ গুপ্ত, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিভাস রায়চৌধুরী, বৈষ্ণবদাস সেন, ব্রজমোহন দাস, ভূতনাথ দে, মন্মথনাথ ঘোষ, মুনীন্দ্রদেব রায়, মুরারিমোহন রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যোগেশচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু।

২ রবিবাসরে অভিভাষণ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩, শান্তিনিকেতন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত -অনুলিখিত। বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৩২৮-২৯।

৩ শান্তিনিকেতনে রবিবাসর (সচিত্র), নরেন্দ্রনাথ বসু; বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৩৭২-৭৮। অর্ঘ্য, বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি রবিবাসর, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র; বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ২৮১-৮২।

৪ সেঁজুতি: অমর্ত (১১ মার্চ ১৯৩৭ ॥ ২৭ ফাল্গুন ১৩৪৩), পলায়নী (১৯ চৈত্র), স্মরণ (২৫ চৈত্র)। নবজাতক: হিন্দুস্থান (১৯ এপ্রিল ১৯৩৭ ॥ ৪ বৈশাখ ১৩৪৪)। প্রহাসিনী: খাপছাড়া (৫ বৈশাখ)। সেঁজুতি: সন্ধ্যা (১০ বৈশাখ), ভাগীরথী (১৩ বৈশাখ)।

৫ যাবার মুখে, ২২ মাঘ ১৩৪৩ ॥ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭। সেঁজুতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৩১-৩৩।

অন্যত্র—

যে দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,
যে-দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে—
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।[১]

২৫ চৈত্র ১৩৪৩ 'স্মরণ'[২] কবিতাটি লেখেন। মনে হয়, নববর্ষের দিন যে জন্মোৎসব হইবে এইটি তাহারই স্মরণে লেখা—

যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

. . . . . .

বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে আমি চায় নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার,
সে আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায়,
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা— এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

এ দিকে সংসারের মধ্যে আলমোড়া যাত্রার আয়োজন চলিতেছে; চলার নামেই কবির মন উৎসুক হয়। উত্তর-ভারতের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে— হিন্দুস্থান[৩] ও ভাগীরথী মনে নানা রূপ ও রসের খোরাক জোগাইতেছে।

মোরে হিন্দুস্থান
বারবার করেছে আহ্বান
কোন্ শিশুকাল হতে পশ্চিমদিগন্ত-পানে,
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে।

১ অমর্ত, ১১ মার্চ ১৯৩৭ ॥ ২৭ ফাল্গুন ১৩৪৩। সেঁজুতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৩৪-৩৫।
২ স্মরণ, ২৫ চৈত্র ১৩৪৩ ॥ ৮ এপ্রিল ১৯৩৭। সেঁজুতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৩৭-৩৯।
৩ হিন্দুস্থান, ১৯ এপ্রিল ১৯৩৭ ॥ ৬ বৈশাখ ১৩৪৪। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ১৫-১৬।

ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়,
বলে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অস্তদিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের।

উত্তর-ভারতের সম্পদের উৎস গঙ্গা স্রোতস্বিনী ; 'ভাগীরথী'[১] কবিতায় তাহারই স্তব ধ্বনিয়াছে। বালককালে হিমালয়-যাত্রা, যৌবনে গাজিপুরবাস ও প্রৌঢ়ারম্ভে আলমোড়ায় দুই মাস আসা-যাওয়ার স্মৃতি কি আজ জাগিতেছে? মাঝখানে একদিন 'খাপছাড়া'[২] কবিতা— 'পাবনায় বাড়ি হবে, গাড়ি গাড়ি ইঁট কিনি' লিখিলেন। কবিমনের এই আকস্মিক ঋতুপরিবর্তনের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তবে আলমোড়া-যাত্রার আয়োজনের বাহুল্য-ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করিলেন কি না জানি না।

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তন বন্ধ হইবার পূর্বে নববর্ষের (১৩৪৪) দিন যথারীতি মন্দিরে উপাসনা ও তৎপরে কবির জন্মদিনের উৎসব উদ্‌যাপিত হইল। সেইদিনই অপরাহ্নে (১৪ এপ্রিল ১৯৩৭) চীনাভবনের দ্বার-উদ্‌ঘাটন উৎসব নিষ্পন্ন হয়।

এইখানে চীনাভবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি চীনদেশে গিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, কালিদাস নাগ ও এল্‌ম্‌হার্স্ট। তৎপূর্বে ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে সিলভ্যাঁ লেভি সাহেব শান্তিনিকেতনে চীনা ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ক্যাণ্টনের শ্রীমতী হারদুন বিশ্বভারতীর জন্য বহুশত চীনা গ্রন্থ (চীনা ত্রিপিটক ও পরে চতুর্বিংশ রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থমালা) শান্তিনিকেতনে দান করেন ; চীনা গ্রন্থ সংগ্রহের সেই সূত্রপাত।

তার পর ইতালীয় অধ্যাপক জোসেফ তুচ্চি (Tucci) ও চীনা অধ্যাপক ঙো লিম্ (Ngo Lim) চীনাভাষা শিক্ষা দেন (১৯২৫-২৬)। দুই বৎসর পর তান্ য়ুন-শান নামে এক তরুণ চীনা শান্তিনিকেতনে আসেন ; ইনি ১৯২৮ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজি ভাষা ও ভারতীয় ধর্ম বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া যান ও দুই বৎসর নানা স্থানে ঘোরাঘুরি করিয়া নান্‌কিঙে ১৯৩৩-এ Sino-Indian Cultural Societyর পত্তন করেন। পর-বৎসর তান য়ুন-শান শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার চীনা-ভারত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার কথা বলেন। কবি এই সংবাদে খুবই আনন্দিত হইয়া নিম্নলিখিত বাণীটুকু লিখিয়া দিলেন (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪)—

"I gladly offer hospitality to the Sino-Indian Cultural Society to use my university at Santiniketan as the centre of its activity in India. It is my hope that my Chinese friends will heartily welcome the Society and give generous help to my friend Prof. Tan Yun-Shan to realise this scheme of making a permanent organisation for facilitating closer cultural contact between China and India." অধ্যাপক তান য়ুন-শান ১৯৩৪ অক্টোবর মাসে চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় অর্থ ও গ্রন্থ -সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শান্তিনিকেতনে

১ ভাগীরথী, ২৬ এপ্রিল ১৯৩৭ ॥ ১৩ বৈশাখ ১৩৪৪। সেঁজুতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৪১-৪২।

২ খাপছাড়া, ৫ বৈশাখ ১৩৪৪ ॥ ১৮ এপ্রিল ১৯৩৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, পৃ ৫৭।

Sino-Indian Cultural Society-র কেন্দ্রগৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাইলেন ; তাই-চি তাও-এর উইল হইতেও দশ হাজার টাকার উপর পাওয়া গেল। অধ্যাপক তান প্রথম বিশ হাজার টাকা গৃহনির্মাণের জন্য রবীন্দ্রনাথের নামে পাঠাইয়া দিলেন।[১] চীনাদের প্রদত্ত সেই অর্থে চীনাভবনের গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

এই নববর্ষে তাহারই উদ্‌বোধন ; কথা ছিল কন্‌গ্রেসের সভাপতি জবহরলাল নেহেরু দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবেন। কিন্তু তিনি অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় আসিতে পারিলেন না, তাঁহার কন্যা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী ইন্দিরা মারফত তাঁহার ভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মহাত্মাজির আসিবার ইচ্ছা ছিল। তিনিও আসিতে পারিলেন না ; বেলগাঁও-এ জরুরি কাজে তাঁহাকে যাইতে হইতেছে। সেখানে যাইতে না হইলে তিনি নিশ্চয়ই আসিতেন। তিনি কবিকে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"Had I not to go to Belgaum on the very date you will have the opening ceremony, I would most certainly have come, not only for the ceremony but also to see you and Santiniketan which I have not seen now for years. As it is I shall be with you in spirit. May the Chinese Hall be a symbol of living contact between China and India."[২]

জবহরলাল যে ভাষণ লিখিয়া পাঠান তাহা হইতে একটি মাত্র অংশ উদ্‌ধৃত করিলাম— "China and India, sister nations from the dawn of history . . have to play a leading part in the world drama, in which they themselves are so deeply involved."[৩]

রবীন্দ্রনাথ China and India নামে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। তেরো বৎসর পূর্বে চীনদেশে কবি যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ এই বক্তৃতায় উদ্‌ধৃত হয়। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, "Its one object is to let India welcome the world to its heart . . let us unite . . inspite of our differences . . For differences can never be wiped away, and life would be so much the poor without them. Let all human races keep their own personalities, and yet come together, not in a uniformity that is dead, but in a unity that is living"

আজিকার ভাষণে কবি বলিতেছেন, "That has happened and friends are here from China with their gift of friendship and co-operation. The Hall which is to be opened today will serve both as the nucleus and as a symbol of that larger understanding that is to grow with time. Here students and scholars will come from China and live as part of ourselves, sharing our life and letting us share theirs, and by offering their labours in common cause, help in slowly rebuilding the great course of fruitful contact between our peoples that has been interrupted for ten centuries.

"For this Visvabharati is, and will, I hope, remain a meeting place for individuals

১ *Viva-Bharati News*, June 1935 p 99. The Visvabharati Cheena-Bhavana and the Sino-Indian Cultural Society by Prof. Tan Yun-San. The Sino-Indian Cultural Society, Chunking and Santiniketan. Pamphlet No. 10, December 1944. Also Bulletin No. 1। মোট এ পর্যন্ত ৮,৮৫,৪৫৭৷৹ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

২ Annual Report Visva-Bharati 1937, p 7. *Visva-Bharati News*, May 1937, p 82।

৩ Message of Jawaharlal Nehru, *Visva-Bharati News*, May 1937, p 83।

from all countries, East or West, who believe in the unity of mankind and are prepared to suffer for their faith. I believe in such individuals even though their efforts may appear to be insignificant to be recorded in history."[১]

আমাদের আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথকে আর-একটি বিষয়ে আলোচনা করিতে দেখিতেছি; সেটি হইতেছে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে। পাঠকের স্মরণ আছে বহু বৎসর পূর্বে Home University Library-র অনুরূপ গ্রন্থমালা বাংলাভাষায় প্রকাশনের কথা কবির মনে আসিয়াছিল। এতকাল পরে বিশ্বভারতী প্রকাশন-বিভাগের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হইল। কবির মতে 'সাধারণজ্ঞানের সহজবোধ ভূমিকা'র আরম্ভ হইবে বিজ্ঞানচর্চায়। তদুদ্দেশ্যে কবির ইচ্ছা যে, এই লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ হইবে বিজ্ঞানবিষয়ক বিশ্বপরিচয়। কবি বলেন, "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার। .. জ্ঞানের এই পরিবেশনকার্যে পাণ্ডিত্য (pedantry) যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি।" এই প্রথম গ্রন্থখানি লিখিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল প্রমথনাথ সেনগুপ্তর উপর। প্রমথনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রিয় শিষ্য, শিক্ষাভবনে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি 'বিশ্বপরিচয়ে'র খসড়া প্রস্তুত করিয়া কবির হাতে না দিলে কবির লেখনী হইতে এই অপরূপ রচনা আমরা আশা করিতে পারিতাম না। আদ্যন্ত পাঠ করিয়া কবির মনে হইল ভাষার দিক হইতে জটিল বিষয়গুলিকে আরো সরল করা প্রয়োজন। তজ্জন্য স্থির করিলেন পাণ্ডুলিপিকে নূতন রূপ দিবেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সহজবোধ্য নহে, তদ্‌বিষয়ক গ্রন্থগুলিও সহজ ও সুখপাঠ্য নহে। কবি পশ্চাৎপদ না হইয়া স্বয়ং আধুনিক বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থসমূহ পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। জটিল তত্ত্ব-সমূহ প্রমথনাথের সহিত আলোচনা করিতেন। অতঃপর স্থির করিলেন আলমোড়া-বাসকালে স্বয়ং বিশ্বপরিচয় নূতন করিয়া লিখিবেন। পাঠকের স্মরণ আছে বহু বৎসর পূর্বে (১৯০৩) কবি এখানে তাঁহার রুগ্ণা কন্যা রেণুকার বায়ু-পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে এখানে বসিয়া লেখেন 'শিশু'র কবিতাগুচ্ছ। এবার আসিয়া লেখেন 'ছড়ার ছবি' ও 'বিশ্বপরিচয়'।

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে কবি সপরিবারে আলমোড়া চলিলেন (২৯ এপ্রিল ১৯৩৭); সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী ও নন্দিতা। অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দ কবির সেক্রেটারি রূপে সঙ্গে আছেন। অনিলকুমার দুইখানি পত্রে কবির আলমোড়া-যাত্রা ও তথায় বাসের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা উপভোগ্য।[২] তিনি লিখিতেছেন যে, গত চারি বৎসর তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে আছেন, তিনি কবিকে কখনো 'বিশ্রাম' করিবার জন্য 'ছুটি' লইতে দেখেন নাই। তাই আলমোড়া গিয়া কবি বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সকলেই সুখী হইয়াছিলেন। কবির বয়স এখন সাতাত্তর বৎসর। কিন্তু কবি সঙ্গে লইলেন রাশিকৃত পুস্তক— তার অধিকাংশই বিজ্ঞানের গ্রন্থ। আর লইলেন নন্দলাল বসুর কতকগুলি স্কেচ, এ ছাড়া ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম। অনিলকুমার লিখিতেছেন, "Rest is a mere illusion so far as our Gurudeva is concerned."

বৈশাখের (১৩৪৪) দারুণ গরমে পথে খুবই কষ্ট পান; বিশেষত বেরিলি পৌঁছিয়া জানিতে পারা যায় যে, সেখানে সাত ঘণ্টা অপর ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। তার পর কাঠগোদামে নামিয়া আলমোড়া পৌঁছাইতে আরও ৯০ মাইল মোটরের পথ। যাহা হউক, ক্লান্তদেহে আলমোড়ায় পৌঁছিয়া দেখেন ডক্টর বশী সেন ও তাঁহার

১ *Visva-Bharati Quarterly*, 1937, p 29-32।

২ *Visva-Bharati News*, June 1937, p 93-95; July 1937, p 3-4।

আমেরিকান পত্নী সুলেখিকা Gertrude Emerson[১] কবির আরাম ও বিরামের সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। বশী সেন জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানমন্দিরের সহিত বহুকাল সংযুক্ত ছিলেন।

আলমোড়া ক্যান্টনমেন্টের একটা উচ্চ শৈলশিখরে সেণ্টমার্কস্‌ নামে একটি সুবৃহৎ বাটী কবির জন্য ভাড়া করা হইয়াছিল। বাড়ির আশেপাশে ভিড় নাই দেখিয়া কবি খুবই খুশি। "বাড়িটা বড়ো, জায়গাটা নির্জন, অভিনন্দনের বালাই নেই।"[২]

আলমোড়া আসিতে গিয়া "দুঃখকর পথে জীবনীশক্তির অনেকখানিরই অপব্যয় হয়েছিল।" কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই জীবনীশক্তির "উদ্বৃত্ত জমা হয়েছে ব'লে বোধ" করিতেছেন। তাই ইন্দিরা দেবীকে পত্রে লিখিতেছেন, "এখানে আমি যে শুধু বিশ্রাম করচি তা নয়। বস্তুত বিশ্রামের অংশটাই সব চেয়ে কম। নানাবিধ কাজ চেপে বসে যখন পাওয়া যায় অবসর, হাওয়া হাল্কা হলেই চার দিক থেকে ধেয়ে আসে ঝড়। . . লেখা চলছে পুরো দমে।"[৩] এইটি লিখিতেছেন আলমোড়া পৌঁছিবার একমাস পরে। পত্রে 'পুরো দমে' যে লেখার কথা বলিতেছেন সে হইতেছে বিশ্বপরিচয়ের খসড়া।

'বিশ্বপরিচয়' নূতন করিয়া লিখিবার জন্য বহু গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন; বিশ্বতত্ত্বর আধুনিকতম মতাদি আয়ত্তে আনিয়া যতদূর সরল করিয়া সেই কথাগুলিকে লেখা সম্ভব তাহার চেষ্টা হইতেছে। বশী সেন কাছে থাকায় কবির খুব সুবিধা হইয়াছে; তিনি বিজ্ঞানের লোক, অনেক দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা হয় তাঁহার সহিত আলোচনায়। কবির দৃষ্টি শুধু বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ নহে; তাঁহার উদ্দেশ্য 'শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া।' অথচ 'জলো' করিবেন না— এ বিষয়েও তিনি দৃঢ়সংকল্প। তাই লেখার মুনশীয়ানায় মেহনত হইতেছে বেশি।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে বই লেখা ছাড়া কবিতা লিখিতেছেন প্রায় প্রতিদিনই। আলমোড়া পৌঁছিবার পর 'জন্মদিন' স্মরণে লিখিলেন—

দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ঐ লোক।
জন্মদিনের মুখর তিথি যারা ভুলেই থাকে,
দোহাই ওগো, তাদের দলে লও এ মানুষটাকে[৪]—

কবির এই সময়ের অন্য কবিতা যাহা 'ছড়ার ছবি'র অন্তর্গত হইয়াছে তাহাদেরই অনুরূপ ছন্দে আপাত-হালকা সুরে এইটি লিখিত— লঘুগতি তার ছন্দে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি আলমোড়া আসিবার সময় নন্দলাল বসু -অঙ্কিত কতকগুলি স্কেচ কবি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া 'ছড়ার ছবি' একটির পর একটি লিখিয়া যান। 'ছবি-আঁকিয়ে' কবিতাটির মধ্যে এই ঋণ স্বীকৃত; আর্টিস্টের দৃষ্টিশক্তির অপরূপ রহস্যের কথা ব্যক্ত হইয়াছে ছোটো এই কবিতাটির মধ্যে। সাধারণ লোকের দৃষ্টি যাহাদের উপর পড়ে না, সেই অভাজনের দল জীবন্ত, অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে শিল্পীর

১ বহু বৎসর পূর্বে আমেরিকার বিখ্যাত মাসিকপত্র ASIA-র প্রতিনিধিরূপে ভারতে আসেন; সেই সময়ে ইনি শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। কবির নির্দেশে জীবনী-লেখক মিস্‌ এমার্সনকে ভারত সম্বন্ধে তথ্যাদি সরবরাহ করেন।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৬। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৪।

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৭, St. Marks, Almora. ৩০ মে ১৯৩৭।

৪ ২২ বৈশাখ ১৩৪৪। জন্মদিন, সেঁজুতি। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৫২-৫৪।

তুলির লিখনে। শিল্পীর রূপসৃষ্টিকে কবি আজ শব্দের প্রতীক-দ্বারা ছন্দের সাহায্যে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতেছেন—

তুমি বললে, দেখার ওরা অযোগ্য নয় মোটে,
সেই কথাটিই তুলির রেখায় তক্ষনি যায় রটে।
. . . .
অনেক খরচ ক'রে রাজা আপন ছবি আঁকায়,
তার পানে কি রসিক লোকে কেউ কখনো তাকায়।
সে-সব ছবি সাজে-সজ্জায় বোকার লাগায় ধাঁধা,
আর এরা সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা।[১]

আলমোড়ায় লেখা কবিতার মধ্যে কবির বিজ্ঞানী মনের ছাপ পাই, যাহা পাওয়া গিয়াছিল 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি যৌবনের কবিতায়। সেঁজুতির 'চলতি ছবি'[২] কবিতায় আছে—

এই পৃথিবীর প্রান্ত হতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি
জেনেছে আজ তারার বক্ষে উজ্জ্বলিত সৃষ্টি
উন্মথিত বহ্নিসিন্ধু-প্লাবননির্ঝরে
কোটি যোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে।. .

'ছড়ার ছবি'র 'পাথরপিণ্ড'[৩] কবিতাটি তুলনীয়—

অনেক যুগের আগে
একটা সে কোন্ পাগলা বাষ্প আগুন-ভরা রাগে
মা-ধরণীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বাঁধন-পাশ
জ্যোতিষ্কদের উর্ধ্বপাড়ায় করতে গেল বাস।
বিদ্রোহী সেই দুরাশা তার প্রবল শাসন-টানে
আছাড় খেয়ে পড়ল ধরার পানে।. .

বলা বাহুল্য এই-সব বৈজ্ঞানিক কথা লইয়াই কবি এখন আলোচনা করিতেছেন বিশ্বপরিচয় রচনা প্রসঙ্গে।

আলমোড়া-বাসকালে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (১৩৪৪) মাসে যে কবিতাগুলি লিখিলেন, তাহার সব কয়টিই যে 'ছড়ার ছবি'তে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে। নন্দলালের ছবিগুলি কবিতা লিখিতে তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল নিঃসন্দেহেই, কিন্তু কাগজে-আঁকা ছবির বাহিরে বৃহত্তর জগতের চলতি ছবিও তাঁহাকে কয়েকটি কবিতা লিখিতে উদ্রিক্ত করে। আবার ছবি দেখিয়া লিখিত অথচ 'ছড়ার ছবি'তে ভাবের অন-অনুসঙ্গতার জন্য অন্যত্র স্থান পাইয়াছে এমন কবিতাও আছে। আমরা নিম্নে পাদটীকায় এই পর্বের কবিতাগুলির তালিকা দিলাম।[৪]

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪। ছবি-আঁকিয়ে, ছড়ার ছবি। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, পৃ ১০৭-১০৮।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৪৯।

৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, পৃ ৯৯।

৪ আলমোড়া-বাসকালে লিখিত কবিতা : ২২ বৈশাখ ১৩৪৪, জন্মদিন (সেঁজুতি)। জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন ১৯৩৭) মাসে লিখিত, তারিখ নাই : জলযাত্রা, ভজহরি, কাঠের সিঙ্গি, খাটুলি, যোগীনদা, বুধু, পাথরপিণ্ড, খেলা, ছবি-আঁকিয়ে, অজয় নদী, পিছু ডাকা (ছড়ার ছবি), চলাচল, (সেঁজুতি), ক্যাণ্ডীয় নাচ (নবজাতক)। ২ জ্যৈষ্ঠ (১৬ মে ১৯৩৭), ভাগ্যরাজ্য (নবজাতক)। ৩ জ্যৈষ্ঠ, পিসনি (ছড়ার ছবি)। ৮ জ্যৈষ্ঠ, তীর্থযাত্রিনী (সেঁজুতি), ১১ জ্যৈষ্ঠ, নতুন কাল (সেঁজুতি)। ১৩ জ্যৈষ্ঠ, হঠাৎ মিলন (সানাই)। ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ঘরের খেয়া (ছড়ার ছবি)। ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ইসটিশনে (নবজাতক ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪১৩। পুনরায় লিখিত, ৭ জুলাই ১৯৩৮)। ২১ জ্যৈষ্ঠ, শনির দশা (ছড়ার ছবি)।

'ছড়ার ছবি'র অনেকগুলি কবিতাই গল্প ; স্বল্পপরিসর কাহিনীর কোনোটির মধ্যে করুণ, কোনোটির মধ্যে হাস্যরস উছলিয়া উঠিয়াছে। 'শনির দশা' পড়িলে আমাদের অনেকের মধ্যে যে সুপ্ত ডন্ কুইক্‌সোট আছে — সে লজ্জিত হয়। 'যোগীনদা', 'কাশী' ও 'মাকাল'[1] পড়িলে হাসির খোরাক যথেষ্ট পাই।

"এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা।" চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে আলমোড়া-বাসকালে যে 'শিশু' কাব্যখণ্ড লেখেন তাহাও ছেলেদের জন্যে লেখা। উভয় কাব্যের মধ্যে কালের দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে নৈকট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কতকগুলি কবিতা 'স্মৃতি দিয়ে আঁকা', যেমন— কাঠের সিঙ্গি, প্রবাসে, পদ্মায়, বালক, আতার বিচি। এই ছড়াগুলি সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন যে এগুলি ছেলেদের জন্য রচিত হইলেও "সবগুলো মাথায় এক নয় ; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।

"ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্রসমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গীতে এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমর রাখে না। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল, যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সব চেয়ে কম সহজ। ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা।"[2]

আলমোড়া-বাসকালে লেখাপড়ার বাহিরে ছবি আঁকা ছিল অন্যতম কাজ। এইটি তাঁহার চিত্তবিনোদন, সমস্ত ভাবনা ও কাজ হইতে মুক্তি বা relief। ছবি আঁকা বিষয়ে কবি বহু প্রকারের পরীক্ষা করিয়াছেন ; এখানে আসিয়া কুমায়ুনের চিত্রীরা যে-সব দেশীয় রঙ ব্যবহার করে, তাহা জোগাড় করিয়া ছবির পরীক্ষা করিতেছেন।

বাহিরের লোকজন এই সুদূর শৈলাবাসে কমই আসিয়া পৌঁছায়। কিন্তু পত্রিকা ও পুস্তক মারফত বৃহত্তর জগৎ আসিয়া মনের দ্বারে হানা দেয়। বাংলা ভাষায় বানান-সংস্কার বিষয়ক একটি আলোচনার তরঙ্গ আসিয়া কবিকে স্পর্শ করিল।

আমাদের আলোচ্যপর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ বাংলা বানানের সরলীকরণের জন্য একটি পরিকল্পনা সাধারণ্যে পেশ করেন। এই সংস্কার-প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ একটি দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতের সমালোচনা করেন। উহা

২৩ জ্যৈষ্ঠ, পদ্মায় (ছড়ার ছবি)। ২৫ জ্যৈষ্ঠ, পালের নৌকা (সেঁজুতি)। ২৬ জ্যৈষ্ঠ, যাত্রাপথ (আকাশপ্রদীপ)। ২৬ জ্যৈষ্ঠ, বাসাবাড়ি, আকাশ (ছড়ার ছবি)। ২৭ জ্যৈষ্ঠ, কাশী, রিক্ত (ছড়ার ছবি)। ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ঝড় (ছড়ার ছবি)। ৩০ জ্যৈষ্ঠ, তালগাছ (ছড়ার ছবি)। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, চলতি ছবি (সেঁজুতি)। আষাঢ় মাসে লিখিত— চড়িভাতি, প্রবাসে (ছড়ার ছবি)। ৬ আষাঢ়, ভ্রমণী (ছড়ার ছবি)। এইখানে আলমোড়া-পর্ব শেষ। শান্তিনিকেতনে আষাঢ় মাসে লিখিত— বালক, দেশান্তরী, অচলা বুড়ি, খুধিয়া (ছড়ার ছবি)। শ্রাবণে লিখিত— মাধো, আতার বিচি (ছড়ার ছবি)। পতিসরে লিখিত— ৮ শ্রাবণ ১৩৪৪, আকাশপ্রদীপ (ছড়ার ছবি)।

১ মাকাল, ৮ ডিসেম্বর ১৯৩১-এ রচিত। পুরাতন কবিতা ছড়ার ছবিতে অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, পৃ ৯৭-৯৮।

২ এই ভূমিকা লিখিত হয় ২ আশ্বিন ১৩৪৪। দ্র নূতন কবিতা, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ ৫৩-৫৪ [ছড়া-ছন্দে নূতন কবিতাপাঠের ভূমিকা স্বরূপে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের উদ্দেশে কথিত], শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত। এই ভাষণটি প্রদত্ত হয় ১৩৪৬ সালের শেষ ভাগে ; তখন কবির 'ছড়া' কাব্য মুদ্রিত হয় নাই ; সেটি প্রকাশিত হয় তাঁহার মৃত্যুর পর, ভাদ্র ১৩৪৮। কিন্তু আলোচনাটি অপ্রকাশিত 'ছড়া'র উপরই হয়।

পাঠ করিয়া কবি আলমোড়া হইতে এক দীর্ঘ পত্র-প্রবন্ধে অধ্যাপক ঘোষের বক্তব্যের জবাব দেন। এই রচনার ভাষা যেমন সংযত, প্রয়োজনমত তেমনই তীব্র। রবীন্দ্রনাথ বাংলা বানানকে সংস্কৃতের অনুগত করিবার পক্ষপাতী নহেন— এই মতটাই ব্যক্ত করেন স্পষ্ট ভাষায়; তার পর উপসংহারে এই কথাটি বলেন যে, "বানানের বিধিপালনে আপাতত হয়তো মোটের উপরে আমরা 'বাধ্যতামূলক' নীতি অনুসরণ করে একান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে যোগ দেব। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে ব্যাপারটা থামবে না। অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে যাঁরা নিঃসংকোচে বানানকে দিয়ে সম্পূর্ণভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন।" বাংলাদেশে— কি স্টেট হইতে, কি সর্বদলস্বীকৃত বিশিষ্ট সাহিত্য-পরিষদ্‌ হইতে বানান-বিধি সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ সর্বজন-অবশ্য-পালনীয় না হওয়ায় এ ক্ষেত্রে অরাজকতা চলিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী এ বিষয়ে পথনির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে তাহার সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন, এবং বিশ্বভারতী হইতে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থে নব বানান-বিধির প্রয়োগ অনুমোদন করেন।[১]

আলমোড়ায় ভ্রমণবিলাসী আগন্তুকের সংখ্যা স্বভাবতই কম। কবির সঙ্গে যাঁহারা দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হইতেছে, মিঃ মাসানি, মিঃ য়ুসুফ মেহের আলি ও অধ্যাপক বীরবল সাহানী। অধ্যাপক সাহানী সপরিবারে নিকটেই এক বাসায় থাকিতেন। তিনি কুটিরশিল্প পুনরুত্থানের পক্ষপাতী; কবিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, তাঁহার গ্রন্থের কয়েকটি খণ্ডও যেন হাতে-তৈয়ারি কাগজে মুদ্রিত হয়; তাহা হইলে কুটিরশিল্প সমাদর পাইবে। বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ কবির শেষদিককার কয়েকখানি কাব্য 'দেশী' কাগজে মুদ্রিত করেন।

প্রায় দুইমাসকাল কবি আলমোড়ায় ছিলেন; তাঁহার ৭৭তম জন্মদিনের উৎসব এখানে বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। এই দিনের স্মরণে 'জন্মদিন' (২২ বৈশাখ ১৩৪৪, সেঁজুতি) নামে যে কবিতা লেখেন, তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। এখানে এবার বাহিরের উৎসব-সংবর্ধনা বেশি ছিল না; তবে কয়েকটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে তাঁহাকে যাইতে হয়, যেমন আমেরিকান মেথডিস্ট মিশন -পরিচালিত বালিকাবিদ্যালয় ও ছেলেদের র‍্যাম্‌সে স্কুল। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে কবি এক লিখিত ভাষণ দেন।

কবি আলমোড়া ছাড়িলেন ২৭ জুন (১৯৩৭); এবার বেরেলির পথে নয়। পথে রানীখেতের ছাত্ররা কবিকে স্বাগত করিল; অনিলকুমার লিখিয়াছেন যে এই স্থানের পরিপাটি উৎসবক্ষেত্রের কথা তাঁহার চিরদিন মনে থাকিবে। লখনৌতে ট্রেন বদলের জন্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয়; সকলে কাসমণ্ডার যুবরাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর ২৯ জুন (১৬ আষাঢ় ১৩৪৪) কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা কলিকাতায় পৌঁছিলেন। বিদ্যালয় খুলিবে ১ জুলাই, কবি বিদ্যালয় খোলার সময়ে বরাবর আশ্রমে থাকিতে চাহিতেন।

১ আলমোড়া, ১২ জুন ১৯৩৭। বানান-বিধি; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৪, পৃ ৪২২-২৫ এবং শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃ ৫৬৩-৬৯। দ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা বানান সম্পর্কে কয়েকটি কথা, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬, পৃ ৬৭-৭০। দেবপ্রসাদ ঘোষের পত্র (কলিকাতা, ৮ জুন ১৯৩৭), আলমোড়ায় কবিকর্তৃক প্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের উত্তর (আলমোড়া, ১২ জুন ১৯৩৭)। দেবপ্রসাদের পত্র (কলিকাতা, ২২ জুন ১৯৩৭)। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর (আলমোড়া, ২৯ জুন)। দেবপ্রসাদের পত্র (কলিকাতা, ১৯ জুলাই ১৯৩৭)। রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত উত্তর (শান্তিনিকেতন, ৬ অগস্ট ১৯৩৭)। দেবপ্রসাদের পত্র (কলিকাতা, ৮ অগস্ট ১৯৩৭)। দ্র দেবপ্রসাদ ঘোষ -প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বানান' (মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৩৪৬), পৃ ৮৯-১৭৮।

পতিসরে ও তৎপরে

দুই মাস পরে আলমোড়া হইতে কবি শান্তিনিকেতন ফিরিলেন (১৬ আষাঢ় ১৩৪৪)। বিদ্যালয় খুলিলে যথাবিধি কাজকর্মে কবি মগ্ন হইলেন। 'বিশ্বপরিচয়' কাটা-ছাঁটা চলিতেছে। 'ছড়ার ছবি'র সুর এখনো মিলাইয়া যায় নাই; বালক, দেশান্তরী, অচলা বুড়ি, সুধিয়া, মাধো, আতার বিচি প্রভৃতি এই সময়ের লেখা।

এমন সময়ে তাগিদ আসিল হুইটম্যান[১] সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য। কলিকাতার সিটি কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা হুইটম্যানের স্মৃতিসভার[২] উদ্যোক্তা; তাহাদের উদ্দেশ্যে কবি সংক্ষেপে হুইটম্যান সম্বন্ধে তাঁহার মত লিখিয়া পাঠাইলেন (৩০ আষাঢ়)। সংক্ষিপ্ত হইলেও এই সমালোচনাটি মূল্যবান, কারণ স্বল্প কথার মধ্য দিয়া হুইটম্যানের স্বরূপটি প্রকাশ পাইয়াছে। কবি লিখিতেছেন, "তোমাদের হুইটম্যানের কাব্যালোচনার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক, এই ইচ্ছা করি। প্রকাণ্ড একটা খনি, ওর মধ্যে নানান-কিছুর নির্বিচারে মিশাল আছে, এ-রকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন— আদিম কালের বসুন্ধরার সেটা ছিল— তার কারণ তখন তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড— এই আগুনে নানা মূল্যের জিনিস গলে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন যা-তা কাণ্ড করে বসেছে। জাগতিক সৃষ্টিতে যেরকম নির্বাচন নেই, সংঘটন আছে, এ সেইরকম, ছন্দোবন্ধ সব লণ্ডভণ্ড— মাঝে মাঝে এক-একটা সুসংলগ্ন রূপ ফুটে ওঠে, আবার যায় মিলিয়ে। যেখানে কোনো যাচাই নেই, সেখানে আবর্জনাও নেই, সেখানে সকলের সব স্থানই স্বস্থান। এক দৌড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে এই জন্যে সাহিত্যে এর জুড়ি নেই— মুখরতা অপরিমেয়— তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ করছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ করতে হলে মরিয়া হওয়ার দরকার।"

প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, আমেরিকান যে-কয়জন সাহিত্যিক কবির প্রিয় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে থরো, এমার্সন ও হুইটম্যান উল্লেখযোগ্য। হুইটম্যানের শিষ্য এডোয়ার্ড কার্পেণ্টারের কবিতা কবির খুব ভালো লাগিত। হুইটম্যানের কবিতা কবি আমাদের কাছে পড়িয়া শুনাইতেন।

আলমোড়া হইতে ফিরিবার সপ্তাহ দুইয়ের মধ্যে কবির জমিদারিতে যাওয়া স্থির হইল। প্রজাদের ইচ্ছা 'পুণ্যাহ' দিনে সেখানে 'বাবুমশায়' উপস্থিত হন। কবিরও ইচ্ছা শেষবারের মতো বহুদিনের সুখদুঃখের স্মৃতি-জড়িত স্থান দেখিয়া আসেন। তদুদ্দেশ্যে ২০ জুলাই কবি কলিকাতায় গেলেন;[৩] বরাহনগরে শশিভিলায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে কয়েকদিন থাকিয়া ২৬শে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া কবি পতিসর যাত্রা করিলেন।[৪]

১০ শ্রাবণ রাত্রি এগারোটার সময় শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে রওনা হইয়া পরদিন মধ্যরাত্রিতে পতিসর পৌঁছিলেন।

১ Walt Whitman (31 May 1819 - 26 March 1892): American poet and journalist. In 1855 appeared his Leaves of Grass, a pamphlet of 12 poems. Each revised edition added more poems. In 1873 he was stricken with paralysis and settled in Camden, New Jersey. "Revolt against all convention was in fact his self-proclaimed mission. In his versification he discards rhyme almost entirely, and metre as generally understood."— *Dictionary of English Literature* (Everyman) p 405।

২ সভায় সভাপতিত্ব করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৪, পৃ ৭৪৯। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন।

৩ ২৪ জুলাই ১৯৩৭, অন্ধ্রদেশীয় ভারতীতীর্থ নামে প্রতিষ্ঠান কবিকে 'কবি-সম্রাট' উপাধি দান করেন। জয়পুরের রাজা সভাপতি; অনিলকুমার চন্দ কবির পক্ষে উপাধি গ্রহণ করেন। *Visva-Bharati News*, August 1937, p 10।

Visva-Bharati News, August 1937, p 10। পতিসর যাত্রা, ২৬ জুলাই ১৯৩৭। 'ছড়ার ছবি'র আকাশপ্রদীপ নামে কবিতাটি পতিসরে লিখিত; তারিখ ৮ শ্রাবণ ১৩৪৪॥ ২৪ জুলাই ১৯৩৭— অর্থাৎ যাত্রার দুই দিন পূর্বে রচিত। একটা তারিখের গোলমাল আছে মনে হয়।

১২ শ্রাবণ পুণ্যাহ। রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন— সেজন্য প্রজারা পুণ্যাহক্ষেত্রে কী আয়োজনই না করিয়াছে। উৎসব-স্থলে কবি উপস্থিত হইলে দলে দলে প্রজারা তাঁহাকে দেখিতে আসিল। কবির সঙ্গী সুধাকান্ত লিখিতেছেন "সাম্প্রদায়িক এই দুর্দিনে পতিসরে মুসলমানবহুল প্রজামণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায় সেটা চোখে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা যতটা বুঝবেন— চোখে যাঁরা দেখেন নি তাঁদের সে কথা লিখে বুঝিয়ে বলা খুবই শক্ত।"

কবি নৌকায় ছিলেন; যাঁহারা সেখানে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন তাঁহাদের অনেকেরই অবস্থা ভালো. কোনোপ্রকার আর্থিক উপকারের প্রার্থী তাঁহারা ছিলেন না। প্রজাদের পক্ষ হইতে মোঃ কাফিল উদ্দীন আকন্দ কবিকে মুদ্রিত যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন তাহার মধ্যে আছে—

প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি দেবরূপে এসে দিলে দেখা,
দেবতার দান অক্ষয় হউক হৃদিপটে থাক্ স্মৃতিরেখা।

একজন বৃদ্ধ মুসলমান কবিকে বলিলেন, "আমরা তো হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চল্‌তি পথে, আপনিও চল্‌তি পথে; বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়। ছেলেপিলেদের মতিগতি বদলে যাচ্ছে, তারা আমাদের সব নাদান মনে করে— এমন জমিদারের জমিদারিতে বাস করবার সৌভাগ্যবোধ তাদের বুঝি হবে না।" মুসলমানদের সহিত কবির হৃদ্যতা দেখিয়া সুধাকান্ত আশ্চর্য হইয়া লিখিতেছেন, "অতীতের পুরানো কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছল ছল ক'রে উঠেছে— আনন্দের অশ্রুবাষ্প। এ দৃশ্য দেখতে পাব কোনোদিন ভাবতে পারি নি।"[১]

অন্তরীণাবদ্ধদের অনশন

পতিসর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া শান্তিনিকেতনে প্রতিমা দেবীকে এক পত্রে 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবের আয়োজন করিবার জন্য পত্র দিলেন; "সংগীত বিভাগের এই কাজটি তোমার, দায়িত্ব তোমারই। গান, নাচ এবং যন্ত্রসংগীতের প্রোগ্রাম তোমাকে তৈরি করতে হবে। . . সংগীত বিভাগের দুঃসাধ্য কাজ তোমারই 'পরে নির্ভর করবে।"[২] এই পত্র হইতে সংগীতভবনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়; কবির যত আনন্দের উৎস ছিল এইখানেই বহু সমস্যার কণ্টকও ছিল এইখানেই। দিনেন্দ্রনাথের সময় হইতে নীলকণ্ঠের ন্যায় সমস্ত অমৃত ও গরল পান করিয়া আসিতেছেন।

পতিসর হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই কবিকে টাউন-হলের এক জনসভায় সভাপতিত্ব করিতে হইল (২ অগস্ট ১৯৩৭ ॥ ১৭ শ্রাবণ ১৩৪৪)। এই সভার উদ্দেশ্য, আন্দামানে দ্বীপান্তরিত রাজনৈতিক বন্দীর অনশন ধর্মঘট করায় জনগণের সহানুভূতি প্রদর্শন ও গভর্নমেন্টের আচরণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

আমাদের আলোচ্যপর্বে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ছিল ভারত গভর্নমেন্টের পেনাল সেট্‌ল্‌মেণ্ট, অর্থাৎ যে-সব অপরাধী যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকালের জন্য কারাবাসের শাস্তি পাইত তাহারা ঐ দ্বীপে স্থানান্তরিত হইত। সাধারণ অপরাধী ছাড়া বহু রাজনৈতিক বন্দীও এইখানে দ্বীপান্তরিত হয়। এই বন্দীদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক দেশের স্বাধীনতা আনিবার জন্য তাহারা উৎসর্গ-প্রাণ; সেই অপরাধে গভর্নমেন্টের রোষনয়নে পড়িয়া তাহারা অন্তরায়িত ও দেশ হইতে নির্বাসিত।

১ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, পৃ ২০৭-১০। দ্র প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্র, চিঠিপত্র ৩, পত্র ৫৩।
২ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৫৪।

বহু কাল বহু প্রকারে নির্যাতিত হইয়া অতঃপর বন্দীগণ ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট তাহাদের অভাব-অভিযোগ যথাযথভাবে পেশ করিয়াছিল। সেখান হইতে কোনো সহানুভূতিপূর্ণ সাড়া তাহারা পাইল না; অবশেষে রুদ্ধদ্বারে ব্যর্থ করাঘাতে ক্লান্ত হইয়া তাহারা মৃত্যুপণে অনশনব্রত গ্রহণ করিল। কিন্তু এই অনশন গ্রহণের সংবাদটিও এ দেশে সরকার বাহাদুর কয়েকদিন চাপিয়া রাখেন।[১]

তৎকালীন বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর এইরূপ মনোভাব কেন হইল তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত দ্বৈরাজ্য বা ডাইআর্কির অবসানে ১৯৩৫-এ যে ভারতশাসন আইন চালু হইল তাহার নাম দেওয়া হয়, প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বমূলক শাসনতন্ত্র বা প্রভিন্সিএল অটোনমি। এই আইন অনুসারে এপ্রিল ১৯৩৭ হইতে নূতন শাসনবিধি সর্বপ্রদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কন্‌গ্রেস তখন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন গভর্নমেণ্ট-প্রতিরোধী দল। সকল প্রদেশেই তাঁহারা নির্বাচনে নামেন। ছয়টি প্রদেশে— বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা— এবং পরে আসাম ও সীমান্তপ্রদেশে কন্‌গ্রেস এবং মুসলমানপ্রধান সিন্ধু, পঞ্জাব ও বঙ্গদেশে মুসলিম লীগ জয়যুক্ত হন। তখন অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক্; তাঁহার ইচ্ছা ছিল কন্‌গ্রেস ও লীগ যৌথভাবে বা কোআলিশন করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। কিন্তু কন্‌গ্রেস হাইকমাণ্ড লীগ-প্রস্তাবিত কোআলিশনে রাজি হইলেন না। বাংলাদেশে লীগের প্রাধান্যই কায়েম হইল এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বৈরীভাব ধূমায়িত হইতেছিল তাহা অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হইল। আশ্চর্যের বিষয়, ইহার অনতিকালের মধ্যে কন্‌গ্রেস-পক্ষীয় নেতৃস্থানীয়রা বহু টালবাহানা করিয়া, হাঁ-না না-হাঁ করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন— গভর্নমেণ্টকে অচল করিবার যে উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা নির্বাচনে নামেন তাহা ত্যাগ করিয়া গঠনমূলক কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। মধ্য হইতে বঙ্গদেশে তাঁহারা কোআলিশন মন্ত্রিত্ব হইতে দিলেন না; এবং সেই দিন হইতে বাংলার শাসন ও সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদটি স্পষ্ট ও উগ্রতর হইয়া চলিল। এই পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশের আন্দামান-বন্দীশালার বন্দীদের ধর্মঘট বিচারণীয়।

বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে ও অনশনকারী অন্তরায়িতদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য (২ অগস্ট ১৯৩৭)[২] কলিকাতা টাউন-হলে সভা আহূত হয়; রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতি। তিনি তাঁহার মৌখিক ভাষণে যাহা বলেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ—

সপ্তাহকাল অতীত হইতে চলিল প্রায় দুইশত বন্দী আন্দামানে অনশন-ধর্মঘট গ্রহণ করিয়াছে; এই সংবাদ আমাদের কাছ হইতে গভর্নমেণ্ট দীর্ঘকাল গোপন রাখেন। জনসমাজের sentiment-এর প্রতি গভর্নমেণ্টের এই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য আমাদের জাতীয় অসহায়তারই স্মারকমাত্র। ইংলণ্ড বা অন্য কোনো ডিমক্রেটিক দেশে গভর্নমেণ্টের পক্ষে জাতীয় জীবনের এমন বিশেষ ঘটনাকে লোকসমাজের নিকট হইতে অবিদিত রাখা সম্ভব হইত না। বন্দীদের দাবি ন্যায়সংগত ও সামান্যই। শাসনকর্তারা দেশের লোকের কাছে দায়ী নহে; সে-অবস্থায় লোকের এ আশঙ্কা খুবই স্বাভাবিক যে ভারত হইতে সহস্র মাইল দূরে দ্বীপের মধ্যে এই বন্দীরা ন্যায্য ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইতেছে; জনসমাজের দাবি এই যে, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ভারতেই রাখা হউক; সেখানে জনমত আর কিছু না পারে, কারাগারের অমানুষিক রূঢ়তাকে কিয়ৎপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ও শমিত করিতে পারিবে।

১ আন্দামানে বন্দীদের প্রায়োপবেশন; প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৪, পৃ ৭৩৬-৪২।

২ এইদিন অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী চারি বৎসর পর ইংলণ্ড হইতে অক্সফোর্ডের ডক্টরেট লাভ করিয়া দেশে ফিরিলেন (২ অগস্ট ১৯৩৭)। শান্তিনিকেতনে তিনি কিছুদিন থাকেন। এখান হইতে তিনি লাহোর যান (সেপ্টেম্বর)। সেখানে তিনি Humanism in Modern Indian Thought সম্বন্ধে গবেষণার্থ নিযুক্ত হন।

শাস্তিদানের হৃদয়হীন পদ্ধতি এখনো যাহা পৃথিবীর বেশির ভাগ স্থানে চলিতেছে, তাহা আধুনিক সভ্যতাকে লজ্জিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। অধুনা পাশ্চাত্য জগতে রাজনৈতিক মতবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব অনেক রাষ্ট্রেই দেখা দিতেছে। দেশের বিধিবদ্ধ আইন ও মানুষের স্বাধীনতার বিধিসংগত দাবির প্রতি শ্রদ্ধাহীন এই ফাসিস্ট মনোভাব হইতে ভারত-সরকারও আজ মুক্ত নহে।

এই হতভাগ্য প্রদেশের শত শত উৎপীড়িত ঘরে নিরাশার অন্ধকার আজ পরিব্যাপ্ত; এখানে অপরিণত বয়সের নরনারী অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিনাবিচারে, নানাপ্রকার দৈহিক ও মানসিক শাস্তিভোগ করিতেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসী-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি আমাদের শাসকসম্প্রদায়ের নিকট, শাসনব্যাপারে কোনো আমূল সংস্কারের দাবি— যদিও তাহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে— পেশ করিতেছি না, কেবলমাত্র বন্দীদের প্রতি যে কঠোর ব্যবহার চলিতেছে তাহাই শমিত করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ আন্দামানের বন্দীদের নিকট টেলিগ্রামে জানাইলেন, "বঙ্গদেশ তাহার অনশন-ধর্মঘটী নির্বাসিত সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানিবার জন্য ব্যাকুল। দেশ তোমাদের পশ্চাতে আছে।"[১]

টাউন-হলের সভার পর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। এবার পতিসর-ভ্রমণের ফলে পদ্মা আবার তাঁহার মনকে গানের সুরে উদ্‌বোধিত করিয়াছে। ১৫ অগস্ট বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হইবে— কবি সুরলক্ষ্মীর সাধনায় বসিয়াছেন।

এদিকে ১৪ অগস্ট বাংলাদেশে 'আন্দামান দিবস' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও কর্মীগণ এই দিন উদ্‌যাপন করিবার জন্য সভা আহ্বান করেন। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি রূপে যে ভাষণ দিলেন তাহা বিশেষভাবে আলোচনীয়; কারণ তাহার সুর কলিকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

কবি ছাত্র ও কর্মীদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আজ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে বন্দীদের দুঃখে দরদ জানাবার জন্যে তোমরা সভা আহ্বান করেছ। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ দিনে দল বেঁধে আন্দোলন করবার একটা রীতি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের নালিশ উপভোগ করবার একটা নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। সেটার রাষ্ট্রীয় সার্থকতা যদি কিছু থাকে তো থাক্ কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে এইরকম পোলিটিক্যাল দশা-পাওয়ার উত্তেজনা উদ্রেক করা আমাদের এখানকার কাজের ও ভাবের সঙ্গে সংগত হয় ব'লে আমি মনে করি নে।

"দেশের বিশেষ অনুরোধে ও প্রয়োজনে আমার যা বলবার সে আমি আশ্রমের বাইরে যথোচিত জায়গায় বলেছি, আজ আমার এখানে যদি কিছু বলতে হয় তবে আমি বলব প্রচলিত দণ্ডনীতি সম্বন্ধে আমার সাধারণ মন্তব্য।"

এই ভাষণে কবি, আধুনিক দণ্ডনীতির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বর্বরতা রহিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ করেন ও সাম্প্রতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দণ্ডিতদের প্রতি দণ্ডনীতির অপপ্রয়োগের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।[২]

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রাজনীতি সম্বন্ধে মতামত দান ও প্রয়োজনবোধে অংশও গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি শান্তিনিকেতনকে সকল শ্রেণীর রাজনীতি ও উত্তেজনা হইতে দূরে রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশ হইতে এনড্রুজকে যে পত্রধারা লেখেন তাহা এখানে স্মরণীয়। তবে কালের দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কবির একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনের কর্মী ও বিদ্যার্থীরা সে আদর্শ সর্বদা মনে রাখিতে পারেন নাই। দেশসেবার গঠনমূলক স্থায়ী কর্মের মধ্যে মন উদ্‌বুদ্ধ হইতে চাহে না।

১ রবীন্দ্রসদন হইতে মোহিতকুমার মজুমদার তথ্যগুলি লেখককে সরবরাহ করেন।

২ গত ২৯শে শ্রাবণ ১৩৪৪ বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের কবি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তিনি প্রবাসীর জন্য লিখিয়া দেন। প্রচলিত দণ্ডনীতি, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৪, পৃ ৭৬৪-৬৬।

উত্তেজনাকে সাময়িকভাবে উপভোগ করিবার নিরতিশয় লোভ সংবরণ করা নেতাদের পক্ষে কঠিন। তাঁহাদের প্ররোচনায় স্বল্পমতি ছাত্রসমাজ উত্তেজিত হয়; অথচ দেশের স্থায়ী কর্মের স্থলে সে ঔৎসুক্য দীর্ঘকাল থাকে না। উত্তেজনার অবসানে আসে অবশ্যম্ভাবী অবসাদগ্রস্ত ক্লান্তি। রবীন্দ্রনাথ সেই সাময়িক প্লাবনকে স্থায়ী জলধারায় পরিবাহিত করিবার জন্য চিরদিন পথনির্দেশ করিয়া আসিতেছেন; আজিকার সভায় সেই কথাই বলেন।

এই 'আন্দামান দিবসে' (১৪ অগস্ট) প্রাতঃকালে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী সাঁওতাল গ্রামে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়, কবিই পৌরোহিত্য করেন।[১] ঘটনাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমানে Community Project প্রভৃতির আয়োজন হইতেছে; ইহার মূলকথা গণসংযোগ (mass contact)। কিভাবে এই গণসংযোগ হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাশিবির স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীনিকেতনে এই গণসংযোগ-প্রচেষ্টা বহু বৎসর হইতে চলিতেছে।

সাঁওতাল গ্রামে (পিয়ার্সন-পল্লী) হলকর্ষণাদি উৎসবের পরদিন (১৫ অগস্ট ১৯৩৭) আশ্রমে বর্ষামঙ্গলের উৎসব। কিন্তু সেই রাত্রে অধ্যাপক পণ্ডিত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী বা গোঁসাইজির একমাত্র পুত্র বীরেশ্বর বা বীরুর মৃত্যু ঘটায় তাহা স্থগিত হইল। শিশুকাল হইতে এই মাতৃহীন বালককে গোঁসাইজি আশ্রমে লালন করেন; বীরু বিদ্যালয়ের সকল কাজে, বিশেষভাবে মন্দিরের উপাসনাদির ব্যবস্থায় উৎসাহী ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বালককে খুবই স্নেহ করিতেন। মৃত্যুর পর ছাত্রদের সভায় কবি বীরেশ্বরের প্রতি তাঁহার স্নেহের কথা বলেন।[২]

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসব স্থগিত হইল। অতঃপর স্থির হইল এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে কলিকাতায় 'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে। কবি লিখিতেছেন, "রবির সম্মিলনে সেটা হবে রবিচ্ছায়া।"[৩]

কবি ছাত্রছাত্রীদের লইয়া ২৬ অগস্ট কলিকাতায় গেলেন। তিনি উঠিলেন বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্রের বাটীতে, অন্যেরা জোড়াসাঁকোর বাটীতে। আপার সার্কুলার রোডের উপর ছায়া প্রেক্ষাগৃহে ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর (১৯,২০ ভাদ্র ১৩৪৪) বর্ষামঙ্গল উৎসব হইল। এবার উৎসবে যে গানগুলি গীত হইল তাহার প্রায় সবই নূতন— তবে সবগুলিই বর্ষাসংগীত নহে। কবি 'গীতবিতানে' প্রেম পরিচ্ছেদের মধ্যে কয়েকটিকে শ্রেণীত করিয়াছেন। প্রেমের রহস্য বিরহে ও প্রতীক্ষায়; এইবার কয়েকটি গানের মধ্যে সেই সুর ধ্বনিয়াছে যাহা চিরকাল প্রেমিক-হৃদয়কে মধুময় করিয়াছে। গানগুলি আলমোড়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পর শ্রাবণ মাসের মধ্যে রচিত বলিয়া মনে হয়। বহুকাল শুষ্ক বিজ্ঞান ও অপরের চিত্র-অনুপ্রেরিত কবিতা লেখার মধ্যে মন আবদ্ধ ছিল। সেই পর্বকে অতিক্রম করিয়া কবি পুনরায় 'গীত-সুধারসে' প্রবেশ করিয়াছেন। বর্ষামঙ্গল উৎসবে এই গানগুলি[৪] গীত হয়— ১. এসো শ্যামল সুন্দর। ২. আমি শ্রাবণ-আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি। ৩. চিনিলে না আমারে কি। ৪. মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে। ৫. আজি গোধূলি-লগনে, এই বাদলগগনে। ৬. থামাও রিমিকি ঝিমিকি। ৭. বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে। ৮. আমি তখন ছিলেম মগন গহন। ৯. ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী। ১০. মেঘছায়ে সজল বায়ে মন আমার। ১১. গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা। ১২. মধুগন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া। ১৩. আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে। ১৪. আজি পল্লিবালিকা অলক-গুচ্ছ সাজালো। ১৫. শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়। ১৬. আমার যে দিন ভেসে গেছে।

১ "শ্রীনিকেতন হলকর্ষণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবার মুখে কে একজন বললে গোঁসাইজির ঘরে দুশ্চিন্তাজনক রোগ দেখা দিয়েছে।"— প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৪।

২ ৮ ভাদ্র ১৩৪৪ বীরেশ্বরের শ্রাদ্ধবাসরে অপরাহ্ণে সিংহসদনে শোকসভায় আচার্যদেবের অভিভাষণ; প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৪, পৃ ৫৭। দ্র মঞ্জরী, বীরেশ্বর গোস্বামী, আশ্রম-সম্মিলনীর উদ্যোগে সংকলিত, ১৩৪৬।

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৮, পৃ ১১২-১৩। শান্তিনিকেতন, ২৪ অগস্ট ১৯৩৭। ৪ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৪, পৃ ১-৮।

প্রান্তিক

কলিকাতা হইতে উৎসবান্তে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (২১ ভাদ্র ১৩৪৪)। কথা ছিল গোয়ালিয়র-মহারাজার আমন্ত্রণে সেখানে যাইবেন। এমন সময় একদিন সন্ধ্যার পর সকলের সহিত কথাবার্তার মধ্যে কবি হঠাৎ হতচৈতন্য হইলেন (২৫ ভাদ্র। ১০ সেপ্টেম্বর)।[1] কবির অসুস্থতার কথা তড়িতবার্তায় প্রচারিত হইল। কত যে পত্র, টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। পরদিন ডাক্তার নীলরতন সরকার আসিয়া কবির রোগ নির্ণয় করিলেন ও তাঁহার চিকিৎসায় অচিরকালের মধ্যে কবি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

মহাত্মাজি নিয়মিতভাবে তারযোগে কবির সংবাদ লইতেছেন। সুস্থ হইয়া কবি গান্ধীজিকে লিখিলেন, "The first thing which welcomed me into the world of life after the period of stupor I passed through, was your affectionate anxiety and it was fully worth the cost of sufferings which were unremitting in their long persistence." কিন্তু নিজহাতে কবি প্রথম যে পত্র লেখেন সেটি হইতেছে দুইটি শিশুর পত্রের জবাব। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদে আগত বহুশত পত্র ও তারের মধ্য হইতে বাছিয়া তিনি শিশুদের পত্রের উত্তর আগে লেখেন।[2]

কবির অসুস্থতার সংবাদ চীন দেশে পৌঁছিলে, Dr. Tsai Yuan-Pei ও Hon. Tai-Chi Tao কবির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথ্য জানিবার জন্য cable করেন। কবি তাহার উত্তরে জানাইলেন যে, তাঁহাদের দেশের এই জীবন-মৃত্যুর কঠোর সংগ্রামের মধ্যেও তাঁহারা যে তাঁহার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইবার জন্য উৎসুক, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। চীনের উপর জাপানের আক্রমণ চলিয়াছে তাহারই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, "My sympathy and the sympathy of our people is wholly with your country .. I who have many friends in Japan feel grievously hurt that the brave people of Japan should be misled by their rulers into betraying the best ideals of the East and that we who should be loving them, should now invoke their defeat that they may wake to their wrong."[3] গত বৎসর হইতে জাপান চীন আক্রমণ করিতেছে; শাংহাই, নানকিঙ প্রভৃতি মহানগরী অচিরকালের মধ্যে তাহাদের করায়ত্ত হইবার মতো হইয়াছে।

কবির আশ্চর্য জীবনীশক্তি। দুইদিন হতচৈতন্য থাকিবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন ও আপনার কাজকর্মে পুনরায় নিমগ্ন হইলেন। সপ্তাহান্তে অক্লান্তকর্মী কবি বিশ্বপরিচয় ও ছড়ার ছবির ভূমিকা লিখিয়া দিলেন (২ আশ্বিন ১৩৪৪)। দুইখানি বই মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার ভূমিকার অভাবে প্রকাশিত হয় নাই। উভয় গ্রন্থই পূজার পূর্বে আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইল।

এই অকস্মাৎ হতচৈতন্য-লোক হইতে প্রত্যাবর্তনকে কবি নবজীবন লাভের সহিত তুলনা করিয়াছেন; মনে

১ কবি যখন অজ্ঞান হইয়া যান তখনই কলিকাতায় টেলিগ্রাম করা হয়। কিন্তু টেলিগ্রামে সব কথা ঠিক বুঝানো যায় না। তাই ধীরেন্দ্রমোহন সেন রাত্রে বোলপুর হইতে এক মালগাড়িতে করিয়া খানাজংশন পর্যন্ত চলিয়া গেলেন। সেখান হইতে হাঁটিয়া রাত্রে বর্ধমান যান ও সেখান হইতে টেলিফোন-যোগে কলিকাতায় সংবাদ পাঠান। সেই টেলিফোন পাইয়াই স্যর নীলরতন প্রথম ট্রেনে চলিয়া আসেন। তৎপূর্বে আশ্রমের দুই প্রাক্তন ছাত্র প্রমোদকুমার রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ মোটরযোগে বোলপুর রওনা হইয়া যান। দ্র স্মৃতিচারণ, বুলা মহলানবিশ, Rabindranath the Traveller, *Lifeline.* Eastern Railway Publication, Ed. Kalyan Kumar Das। এই ঘটনার পর শান্তিনিকেতনে টেলিফোনের ব্যবস্থা হয়।

২ দ্র সুধীরচন্দ্র কর, কবিকথা, পৃ ৯।

৩ *Visva-Bharati News*, October 1937, p 28।

হইতেছে অধ্যাত্মলোকের নবতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। মৃত্যুযবনিকার তোরণ হইতে অজানার যেটুকু আভাস পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তাহাই ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশের চেষ্টা করিলেন নূতন কবিতায়, যেগুলি পরে 'প্রান্তিক'এর অন্তর্গত হইয়াছে।[১] বলা বাহুল্য, মানুষ এখনো সে ভাষা ও সে শব্দসম্পদ খুঁজিয়া পায় নাই, যাহার সাহায্যে সে তাহার সকল অনুভবকে মুক্তি দিতে পারে।

যাহাই হউক, সুস্থ হইয়া উঠিবার দশ-বারো দিন পর হইতে তিনি প্রান্তিকের কয়েকটি কবিতা লিখিলেন (২৫ সেপ্টেম্বর হইতে ৯ অক্টোবর ১৯৩৭)। অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের মধ্যে কালের সামান্য ব্যবধান থাকাতেই কবিতাগুলি নানা তত্ত্বে পূর্ণ হইয়াছে— যাহা হয়তো সম্ভব হইত না কালের দূরত্বে ; কিন্তু "কোনো সদ্য-আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রং ফোটে ভালো।"[২]

প্রান্তিকের কবিতাগুলি[৩] লিখিবার প্রায় আট মাস পরে নববর্ষের (১৩৪৫) ভাষণে কবি তাঁহার অভাবনীয় অনুভূতির বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যুগুহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি। যে-মূলধন নিয়ে সংসারে এসেছিলাম, কর্মপরিচালনার জন্য শরীর-মনের যে শক্তির আবশ্যক তা যেন আজ পূর্ণ পরিমাণে নেই, অনেকটা তার লুপ্ত হয়েছে অতলস্পর্শে। আমার নিজের কাছে আমার প্রশ্ন এই, জীবনে এই-যে রিক্ততার পর্ব নিয়ে এসেছি একি একটা নূতন পূর্ণতার ভূমিকা ? যে-জীবনকে নানা দিক থেকে নানা অভিজ্ঞতায় বিচিত্র ক'রে সার্থক করেছি, যাত্রার শেষ প্রান্তে সে আমাকে সহসা একান্ত শূন্যতার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়ে তার সমস্ত উপলব্ধিকে নিঃশেষে ব্যর্থ করে মিলিয়ে যাবে এ কথা ধারণা করা যায় না। আমার মনে হয়, ক্রমে ক্রমে এই বোঝা ঘুচিয়ে দেবার রিক্ততাই সবচেয়ে আশ্বাসের বিষয়। . .

"জীবনে অনেক কর্ম করেছি, সুখ দুঃখ ভোগ অনেক হয়েছে ; এখন যদি ইন্দ্রিয়শক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে অধ্যাত্মলোক বাকি আছে ; আমাদের যে-শক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার দিকে আসক্তির দিকে আমাদের গুহাবাসী জন্তটাকে তাড়না করে তা যদি ম্লান হয় তবেই আশা করি অন্তরের দিক থেকে মনুষ্যত্বের সিংহদ্বার খোলা সহজ হবে। রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে। বোঁটার বাঁধন থেকে ফল খসে যায়, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নবপর্যায়ে তাদের বন্ধনমোচন হয়। তেমনি দেহতন্ত্রে প্রাণের আসক্তি যদি শিথিল হয় তবে তাকে নবজীবনের ভূমিকা বলেই জানব।"[৪]

ইহারও কয়েকদিন পরে কালিম্পং-বাসকালে 'জন্মদিন'[৫] উপলক্ষে যে কবিতা লেখেন তাহার মধ্যে এই ভাবেরই

১ প্রান্তিক, পৌষ ১৩৪৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৫-১৯।

২ জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, পৃ ৪০৮।

৩ প্রান্তিকের মোট কবিতা-সংখ্যা ১৮টি। ইহার মধ্যে ২৫ সেপ্টেম্বর হইতে ১০ অক্টোবরের মধ্যে যে ৮টি কবিতা আছে, সেই কয়টি এক ঝাঁকের রচনা। ১৪-সংখ্যক কবিতাটি রচিত হয় তিন বৎসর পূর্বে (২৮ এপ্রিল ১৯৩৪) ; ১৫-সংখ্যকটি লিখিত হয় ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ ; ১৬-সংখ্যকটি লেখেন ২০ এপ্রিল ১৯৩৪। ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৭ -সংখ্যক কবিতাগুলি ডিসেম্বর মাসে রচিত— জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইবার পর। ইহার মধ্যে ১৩-সংখ্যক কবিতাটিও পুরাতন— উহার দুইটি পাঠ : একটি জয়শ্রী ১৩৪১ বৈশাখে (৮ পংক্তি) ও দ্বিতীয়টি প্রবাসী ১৩৪৩ অগ্রহায়ণে (৬ পংক্তি) মুদ্রিত হয়। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৩৭-এ পুনর্লিখিত হয় (১০ পংক্তি)। ১৮-সংখ্যক কবিতাটি খ্রীষ্ট-জন্মদিন স্মরণে রচিত (২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৭)। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৫০৩-০৪।

৪ নববর্ষ ১৩৪৫, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ ১৭৬-৭৮।

৫ ২৫ বৈশাখ ১৩৪৫, সেঁজুতি। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ২৫-২৯।

পুনরুক্তি পাই— কালের ব্যবধানে এখন তারা ক্রমেই আরো কাব্যময় অনুভূতি রূপে প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে, তত্ত্বময় কবিতার স্তরে আর নাই।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি 'বিশ্বপরিচয়' ভাদ্র মাসের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; ২ আশ্বিন (১৩৪৪) কবি ভূমিকা লিখিয়া দিলে উহা প্রকাশিত হইল। বিশ্বপরিচয় উৎসর্গ করা হয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

দীর্ঘ উৎসর্গপত্রে কবি, বিশ্বপরিচয় কেন লিখিতে আরম্ভ করেন তাহার কারণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে "শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষায়তনে শুরু হইতেই এই বিষয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন। আর তাঁহার নিজ জীবনে জ্যোতিষ ও জীবতত্ত্ব অধ্যয়নের প্রভাব যে কী গভীর তাহা তাঁহার গদ্য পদ্য রচনা সাক্ষ্য দিতেছে। এই পত্রভূমিকায় বলিতেছেন, "জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলেকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করি নে।"[১]

বিশ্বপরিচয়ের পত্রভূমিকায় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে কবি কয়েকটি মত প্রকাশ করেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। কবির মতে শিশুদের বা বালকদের শিক্ষার প্রথম যুগে সমস্ত কিছুকেই স্পষ্ট করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ "জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয়, আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না এ কথাও বলা চলে না। . . কতক পরিমাণে না-বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়।" কবি নিজেও এখানে বলিতেছেন এবং আমরাও জানি যে তিনি স্কুলের ছেলেদের জন্য বড়ো-বয়সের সাহিত্য পড়াইতেন— রাস্‌কিন পাঠ্য ছিল (থার্ডক্লাস) অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের! অজিতকুমার চক্রবর্তী স্কুলের বড়ো ছেলেদের এমার্সন শেক্‌স্‌পীয়র পড়াইতেন, আমিএলের জার্নাল থেকে অংশ তর্জমা করিতে দিতেন, ব্রাউনিং বুঝাইতেন। বলা বাহুল্য, এ-সব তিনি কবির আদর্শানুযায়ী করিতেন। এগুলি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রভূমিকায় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আরও বলিতেছেন যে ছেলেদের বই-এ "মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে হালকা করা কর্তব্য" নয়। তিনি বলেন, "দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না।" তাঁহার মত "যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। . . অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। . . ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়।" সেইজন্য স্কুলে বাংলা পড়াইবার সময় শব্দসৃষ্টির রহস্য, বাক্যরচনার রীতি প্রভৃতি ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার না করিয়াও বলিয়া যাইতেন, শক্ত হইবে বলিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, "চিবিয়ে খাওয়াতেই এক দিকে দাঁত শক্ত হয় আর-এক দিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়।"

বিশ্বপরিচয় প্রকাশিত হইলে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ইহার একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা লেখেন।[২] অধ্যাপক মৈত্র সাহিত্যিক মহলে কবিরূপে পরিচিত, কিন্তু আসলে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি দীর্ঘ সমালোচনা

১ বিশ্বপরিচয়, পত্রভূমিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ ৩৫৭-৩৫২। ২ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ ২৪৪-৪৬।

করিয়া গ্রন্থ হইতে দুইটি অংশ উদ্‌ধৃত করেন, নিম্নে তাহাই সংকলিত হইল—

"নাক্ষত্র জগতের দেশকাল পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি এ কথা মানতে হবে বিশ্বে সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জেনেছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব-ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছ-ঘেঁষা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে— এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি কালে কী জানি আর কোনো লোকে আর কোনো চিত্তকে অধিকার ক'রে আর কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি না। কিন্তু এ কথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।"

গ্রন্থের উপসংহার অংশে কবি লিখিয়াছেন, "আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাতদৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরও সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহা চৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।"[১] এই স্থলে এই পংক্তিটি স্মরণীয়— "চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।"

রবীন্দ্রনাথ কবি ও দ্রষ্টা; তাই, তাঁহার কাছে জড় ও জীববিজ্ঞানের তথ্যরাজি অন্তরের রসের সঙ্গে মিশিয়া অনুভূতির মধ্যে নূতন ভাবে রূপ লইয়াছে। বিশ্বপরিচয় পড়িতে গিয়া সীমার মধ্যে সীমাতীতের কবিকে আমরা পাই।[২]

আরোগ্যলাভের পর

কবি অসুস্থ হন ১০ সেপ্টেম্বর (১৯৩৭); তাহার একমাস পরে ১২ অক্টোবর তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যান। সেখানে প্রায় তিন সপ্তাহ (৪ নভেম্বর পর্যন্ত) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরাহনগরের বাড়িতে রানীদেবীর স্নেহময় তত্ত্বাবধানে থাকিলেন।

কবি কলিকাতায় আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া নানা লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেখানে তখন নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির বিশেষ অধিবেশন, তদুপলক্ষে ভারতের নেতৃস্থানীয় সকলেই উপস্থিত। জবহরলাল নেহরু, আচার্য কৃপালনী, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অনেকেই কবিকে দেখিতে আসিলেন।

মহাত্মাজিও[৩] কবির সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন, কিন্তু মোটরগাড়িতে উঠিতে গিয়া হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া

১ বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ ৪১৩।

২ বিশ্বপরিচয়ের মধ্যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ভুল ছিল। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক বিভূতিভূষণ সেন এবং বোম্বাই থেকে ইন্দ্রমোহন সোম 'বিশেষ যত্ন করে ভুলগুলি দেখিয়ে দেওয়াতে সেগুলি সংশোধন করবার সুযোগ হল।' তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা, কালিম্পঙ, ২৭ জুন ১৯৩৮। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ ৪৩৬।

৩ কলিকাতার বিশিষ্ট বাঙালি সাহিত্যিকরা সমবেত হইয়া বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে তাঁহাদের মত গান্ধীজির নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উপর ভার দেন। রামানন্দবাবু দীর্ঘ এক পত্রে বাংলাদেশের মুসলমানদের বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মনোভাব কিরূপ তাহা

যান। শরৎচন্দ্র বসু টেলিফোন-যোগে কবিকে এই সংবাদ দিলে কবি অবিলম্বে স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন; সন্ধ্যার উপাসনায় যোগদান করিয়া তিনি ফিরিলেন। কন্‌গ্রেস কমিটির কাজ ব্যতীত মহাত্মাজির এবার কলিকাতায় আসিবার প্রধান কারণ ছিল রাজবন্দী-সমস্যার সমাধান। বাংলাদেশের এখনো সহস্রাধিক যুবক কারারুদ্ধ, অন্তরায়িত অথবা দ্বীপান্তরিত। এই-সব কার্যব্যপদেশে তাঁহাকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। তাঁহার শরীর যে অতিরিক্ত শ্রমে ভিতরে ভিতরে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই; অথবা বুঝিয়াও প্রতিকার করিবার অবসর পাইতেছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন, বাংলাদেশের রাজবন্দী-সমস্যা লইয়া কবিও চিন্তান্বিত, তাহা তিনি জানেন; সেই উদ্দেশ্যেই কবির কাছে আসিতেছিলেন— তা ছাড়া কবির কঠিন পীড়ার পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্তব্য।

প্রশান্তচন্দ্রের বাড়িতে একদিন সুভাষচন্দ্র বসু কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপ হইতে সদ্য ফিরিয়াছেন, সেখানকার রাজনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁহার সঙ্গে হইয়াছিল কিন্তু তাহার কোনো বিবৃতি আমরা পাই নাই।

এবার কলিকাতার নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মুখে নানা সমস্যার মধ্যে একটি ছিল 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সংগীত রূপে গৃহীত হইতে পারে কি না সেই প্রশ্নের সমাধান। এই আলোচনার সহিত রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়েন।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় (১৯০৫) হইতে গত ত্রিশ বৎসরের উপর 'বন্দেমাতরম্'[১] ধ্বনি বাংলার দেশসেবী যুবকদের মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কালে উহা সর্বভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ধ্বনি হইয়া উঠে। কিন্তু কিছুকাল হইতে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজের মধ্যে বন্দেমাতরম্-এর বিরুদ্ধে মত দেখা দিতেছে। কোনো কোনো সার্বজনিক সভায় মুসলমান ছাত্র ও জনতার আপত্তির ফলে এই গান গাওয়াই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে— মুসলমানদের মতে 'বন্দেমাতরম্' গান পৌত্তলিকতার পরিপোষক; 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' প্রভৃতি ভাবকে কোনো মুসলমানের পক্ষে জাতীয় সংগীতের অজুহাতেও মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে, এমন-কি মহা-জাতীয়তাবাদী মুসলমানের পক্ষেও নহে। উগ্র মুসলমানেরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর খড়্গহস্ত— তাঁহার আনন্দমঠ, রাজসিংহ ও দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থত্রয় তাহাদের অপাঠ্য। কোনো কোনো উগ্রপন্থী মুসলমান প্রকাশ্যভাবে 'আনন্দমঠে'র বহ্নি-উৎসব করিয়াছে।[২]

রবীন্দ্রনাথ বরাহনগর হইতে ২৬ অক্টোবর (১৯৩৭) বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে তাঁহার মত লিখিয়া কন্‌গ্রেস প্রেসিডেন্ট জবহরলালের নিকট তাঁহার সেক্রেটারি মারফত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।[৩] তিনি লেখেন— "An unfortunate

বিবৃত করেন। এই পত্রে তিনি বন্দেমাতরম্‌কে জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণের সুপারিশ করেন। দ্র *The Modern Review*, December 1938, p 711-13।

১ ১৮৯০ সালে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনচরিত লেখেন। গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্তের 'উদ্বোধনা'র উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সকলে গগন বিদারিয়া গাও 'বন্দে মাতরম্' 'বন্দে হরিচরণারবিন্দম্'। স্বদেশানুরাগ ভগবদ্ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া নবযুগের উৎপত্তি করুক।" আমাদের মনে হয় বাংলা ভাষায় 'আনন্দমঠে'র বাহিরে 'বন্দেমাতরম্'কে জাতীয় ধ্বনিরূপে স্বীকৃতি এই প্রথম। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় পৌষ ১২৮৯ (১৮৮২)।

২ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ ২৯০। এক মুসলমান লেখক 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাল্টা জবাব রূপে 'বঙ্কিম দুহিতা' নামে এক কদর্য উপন্যাস লেখেন।

৩ Pandit Jawaharlal Nehru had been to see Gurudeva on the previous day and had a long talk with him about the various problems which are receiving the attention of the Congress leaders.—*Visva-Bharati News*, November 1937, p 34।

controversy is raging round the question of suitability of 'Bande Mataram' as national song. In offering my own opinion about it I am reminded that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine when the author was still alive and I was the first person to sing it before a gathering of the Calcutta Congress. To me the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficient aspects of our motherland made special appeal so much so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem and from those portions of the book of which it is a part, with all sentiments of which, brought up as I was in the monotheistic ideals of my father, I could have no sympathy.

"It first caught on as an appropriate national anthem at the poignant period of our strenuous struggle for asserting the people's will against the decree of separation hurled upon our province by the ruling power. The subsequent developments during which 'Bande Mataram' became a national slogan cannot, in view of the stupendous sacrifices of some of the best of our youths, be lightly ignored at a moment when it has once again become necessary to give expression to our triumphant confidence in the victory of our cause.

"I freely concede that the whole of Bankim's 'Bande Mataram' poem read together with its context is liable to be interpreted in ways that might wound Moslem susceptibilities, but a national song though derived from it which has spontaneously come to consist only of the first two stanzas of the original poem, need not remind us every time of the whole of it, much less of the story with which it was accidentally associated. It has acquired a separate individuality and an inspiring significance of its own in which I see nothing to offend any sect or community।"[১]

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির মতকে সমর্থন করিয়াছিল। জবহরলাল ঐখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে বলেন, ". . the first two stanzas are such that it is impossible for anyone to take objection to, unless he is maliciously inclined. Remember, we are thinking in terms of a national song for all India।"

কন্‌গ্রেসের বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে Visva-Bharati News (October 1937)-এ কৃষ্ণ কৃপালনী[২] Bande Mataram and Indian

১ *Amrita Bazar Patrika*, 2 November 1937।

২ *Hindusthan Standard*-এ (24 October 1937) নিম্নলিখিত তথ্যটি প্রকাশিত হয়: "*Pending his discussions with the leaders the Poet is not issuing any statement to the Press.* Correspondence, however, is going on between the Poet and different leaders on this question. Mr. Rathindranath Tagore, the Poet's son, told a reporter of *The Hindusthan Standard* that the first stanza of the 'Bande Mataram' song was first set to tune by the

Nationalism নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহা কবির মতের সমার্থক।[১]

জবহরলালকে লিখিত জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে পত্র প্রকাশিত হইলে কোনো কোনো 'জাতীয়তাবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হীন অভিসন্ধি আরোপ পর্যন্ত হইল। কোনো কোনো অতি-উৎসাহী স্বাদেশিক ঘোষণা করিলেন যে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতগুলির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নাই, স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের গান কোনো প্রেরণা দেয় নাই![২] বলা বাহুল্য, কবি এ-সব বাদানুবাদে কোনো অংশ গ্রহণ করেন নাই। জবহরলাল গোড়া হইতেই রবীন্দ্রনাথের মতবিশ্বাসী। প্রায় ২৬ বৎসর পূর্বে রচিত 'জনগণমন' আজ স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত রূপে স্বীকৃত হইয়াছে;[৩] বন্দেমাতরমের যে প্রথম অংশ অসাম্প্রদায়িক সেইটুকুই অন্যতম জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হইয়াছে।

তিন সপ্তাহ পরে কবি কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (৪ নভেম্বর। ১৪ কার্তিক ১৩৪৪)। এবার পূজাবকাশের পর বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনে কিছু কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হইল। শিক্ষাভবন বা কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রমোহন সেন ১৯৩৭-এর অক্টোবরে বিলাত চলিয়া গেলে প্রমোদারঞ্জন ঘোষ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ধীরেন্দ্রমোহন ১৯৩২ নভেম্বর হইতে ১৯৩৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। বিলাতে এল্‌মহার্স্ট-প্রবর্তিত ডার্টিংটন হল ট্রাস্ট হইতে রিসার্চ-ফেলোশিপ লাভ করিয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। পুঁথিগত বিদ্যার সহিত বৃত্তি-কেন্দ্রিক বিদ্যা বা শিল্পশিক্ষার সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনে অর্জন করেন, তাহারই আলোকে গবেষণা করিবার জন্য তাঁহার বিলাত যাত্রা।

এই সময়ে বোলপুরে 'বীরভূম জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী'র প্রথম অধিবেশন আহূত হয় (৪-৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪॥২০-২১ নভেম্বর)। তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত বাণীটি পূর্বাহ্ণে (১৪ নভেম্বর ১৯৩৭) লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "বোলপুরে এই প্রথম রাষ্ট্রসভা অধিবেশনে আমি আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জবহরলালের নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেস জনহিতকর যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন এই সভার যোগে এখানকার জনসাধারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইলাম। সভার উদ্দেশ্য সার্থক হউক।"

সম্মিলনীতে বহু লোক গ্রাম হইতে আসে; কলিকাতা হইতে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক ও ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত্যু অক্টোবর ১৯৬১) প্রভৃতি শ্রমিক-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও সমাগম হয়। সভায় যে-সব বক্তৃতা হয় তাহার রিপোর্ট মুখে মুখে রবীন্দ্রনাথ পান। নেতাদের বক্তৃতাগুলি জনসাধারণের উপযুক্ত আদৌ হয় নাই। স্থানীয় কর্মীরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে (৫ অগ্রহায়ণ) তিনি বলেন যে লোকসাধারণের কাছে লোকের

Poet himself and also sung by him for the first time at the Indian National Congress at its Calcutta Session in the nineties of the last century.

"Mr. Rathindranath Tagore further told the reporter that the *views on 'Bande Mataram' that had found expression in Prof. Krishna Kripalani's article in the 'Visvabharati' magazine published from Santiniketan, did not represent the official view of Visvabharati or of the Poet*".

১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম, নিষ্ঠাবান ধার্মিক বলিয়া পরিচিত। তিনি ব্রাহ্ম হইবার পর কখনো প্রতিমাদি পূজা করেন নাই। তিনি রবীন্দ্র-ভক্ত; কিন্তু 'বন্দেমাতরম্‌' সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তাঁহার মতে গানটি 'পৌত্তলিকতা-ব্যঞ্জক বা পৌত্তলিকতা-প্রণোদক নহে.. মুসলমানবিদ্বেষ-প্রসূত বা মুসলমানবিদ্বেষ-জনক নহে। — প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ ২৯২।

২ দ্র প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ ২৯১।

৩ দ্র প্রবোধচন্দ্র সেন, ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত (১৩৫৬)। রবীন্দ্রজীবনী ২, পরিশিষ্ট।

ভাষায় কথা বলাই উচিত ; তাহাদের বোধের ও জ্ঞানের বাহিরের কথা বলিলে তাহাদের মন সাড়া দেয় না। কবির এ কথা অতি সত্য ; আমরা সভায় উপস্থিত ছিলাম, বক্তাদের সংস্কৃতবহুল অলংকারপূর্ণ ভাষা ও বিশ্বসমস্যা প্রভৃতির গুরুগম্ভীর আলোচনা জনতার কর্ণে শব্দমাত্ররূপে প্রতিভাত হইতেছিল।[১]

কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন যে বাংলা গভর্নমেণ্ট ১১০০ জন অন্তরীণাবদ্ধ যুবককে মুক্তি দিয়াছেন। কবি কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিবৃতি হইতে প্রকাশ পায়। এই মুক্তি-আন্দোলনে মহাত্মাজির চেষ্টা ভুলিবার নহে ; গভর্নমেণ্ট ও বন্দীদের মধ্যে বোঝাপড়া তাঁহারই মাধ্যমে হইয়াছিল। কবি বলিলেন, "The only way our people can truly acknowledge our gratitude is to strive honestly to create that moral atmosphere of non-violence, which is the only true means of attaining our final emancipation. Mahatmaji has given such assurance on our behalf and if we fail to carry it out we shall have betrayed the trust of our greatest benefactor."[২]

কবি কলিকাতা হইতে ৪ নভেম্বর ফিরিয়াছিলেন ; এবার একাদিক্রমে দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে থাকেন, মাঝে দিন সাতের জন্য কলিকাতায় যাইতে হয় (২৭ নভেম্বর) ডাক্তারদের তাগিদে। ৪ ডিসেম্বর আশ্রমে ফিরিয়া আসেন।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল গিরিধিতে স্যর জগদীশচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত জগদীশচন্দ্রের যে নিবিড় যোগ এককালে ছিল, তাহার কথা আমরা এই জীবনীমধ্যে আলোচনা করিয়াছি। ক্রমে কালের ব্যবধানে, কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা হেতু দুইজনের মধ্যে পূর্বের সে নিবিড়বন্ধন শিথিল হইয়া যায় ; তৎসত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। আচার্যের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কবি যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন তাহার মধ্যে তিনি একস্থানে বলেন— "তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীর্তির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন . . সেই সময়ে আমি তাঁর ভাবী সাফল্যের প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধাদৃষ্টি রেখে বারে বারে গদ্যে পদ্যে তাঁকে যেমন করে অভি-নন্দন জানিয়েছি, জয়লাভের পূর্বেই তাঁর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছি, আজ চিরবিচ্ছেদের দিনে তেমন প্রবল কণ্ঠে তাঁকে সম্মান নিবেদন করতে পারি সে শক্তি আমার নেই। আর কিছুদিন আগেই অজানা লোকে আমার ডাক পড়েছিল। ফিরে এসেছি। কিন্তু সেখানকার কুহেলিকা এখনও আমার শরীর মনকে ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে আমাকে তিনি তাঁর অন্তিমপথের আসন্ন অনুবর্তন নির্দেশ করে গেছেন।[৩]

জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কবির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার যে কয়টি সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার 'অব্যক্ত' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি কবিকে পাঠান (৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৮)।— "বন্ধু, সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম। তোমার জগদীশ।" আচার্য-পত্নী

১ দ্র *The Modern Review*, December 1937, p 714. Note, Birbhum District Conference।

২ *Visva-Bharati News*, December 1937, p 42।

৩ জগদীশচন্দ্র ; প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৪, পৃ ৩৩৫-৩৬। "আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মদিন ৩০শে নভেম্বর। বসু-বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠাও তিনি করেন ৩০শে নভেম্বর। তাঁহার জীবিতকালে ঐদিন তাঁহার জন্মদিনের উৎসব হইত, বসু-বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবও ঐদিন হইত। তাঁহার দেহত্যাগের পর গত ৩০শে নভেম্বর প্রথম বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ঐদিন রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত বক্তৃতা পড়িবার কথা ছিল। তিনি আসিতে না পারায় উহা আচার্য মহাশয়ের এক বৃদ্ধ প্রাক্তন ছাত্র কর্তৃক পঠিত হয়। প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৪, পৃ ৪৭২। দ্র *Visva-Bharati News*, December 1937, p 43-44।

অবলা দেবী প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জানাইয়াছিলেন যে জীবনের শেষ বৎসরও জগদীশচন্দ্র প্রত্যহ গ্রামোফোনে কবির স্বর—

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে—
আজি হতে শত বর্ষ পরে . .

শুনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন। "উনি আজীবন কবির গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং সর্বদাই বলিতেন যে, কবির মতন সর্বতোমুখী প্রতিভা বিরল, প্রায় দেখা যায় না।"[১]

আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইবার পর কবির 'প্রান্তিক'-চেতনা যেন পুনরায় সাড়া দিয়া উঠিল; আর একবার মৃত্যুপারের কথা স্মরণ হইল। প্রান্তিকের ৯-১৩ ও ১৭ -সংখ্যক কবিতা ৮ ডিসেম্বর হইতে ২৫ ডিসেম্বরের (১৯৩৭) মধ্যে লিখিত হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় অন্তঃলোকে আলোক ও অন্ধকার, জানা ও অজানার দ্বন্দ্ব চলে; কবির জীবনে তাহার প্রকাশ হয় কাব্যে, অথবা গদ্যরচনায় বা ভাষণে। সেই ভাবনার ধারা প্রকাশ লাভ করিলেই মন একটা সমে আসিয়া স্তব্ধ হয়; নূতন অনুভূতি ও আবেগের অপেক্ষায় থাকে। অনুকূল পরিবেশ বা অভিঘাতে নূতন ঋতু-উৎসবের আয়োজন চলে— পুরাতনকে অতিক্রম করিয়া নূতন কাব্যধারার প্লাবন আসে। চিত্তলোকে প্রান্তিকের কবিতা রচনার পালা এখানেই শেষ হইল।[২]

কিন্তু রবীন্দ্র-সত্তার সবটাই আধ্যাত্মিক তুরীয়তা নহে, কাব্যও নহে, সাময়িক ও স্থানিক ঘটনা ও অপঘটনা তাঁহার স্পর্শচেতন মনকে উত্তেজিত করে— বিশ্বমানবের দুঃখ আপনারই দুঃখরূপে বরণ করেন। দেশের মধ্যে পরাধীনতার দুঃখ ও অপমান তো আছেই; বিদেশে কোথায়ও শান্তি নাই, সুখ নাই। কোথায় ইথিওপিয়া, কোথায় স্পেন, কোথায় চীন— স্বাধীনতা-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে— এ-সবের জন্য বাঙালি কবির কী বেদনা!

সাতই পৌষ উৎসবের দিন (১৩৪৪) কবির মনে এই বিশ্বব্যাপী দুঃখের কথাই উদিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন, "চীনের প্রতি [জাপানের] নিষ্ঠুর অত্যাচারে[৩] আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত, কিন্তু আমাদের কী করবার

১ শ্রীযুক্তা অবলা বসুর নিকট হইতে 'অব্যক্ত' সম্বন্ধে যে পত্রখানি প্রবাসী-সম্পাদক পান, সেটি প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের নিকট ছিল। দ্র প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৫, পৃ ৪৭২।

২ রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' প্রকাশিত হইলে দিলীপ রায় এই কয়টি পংক্তি লেখেন:

O Bird of Fire, enskied above,
Whose voice is a dream, a song:
Pilgrim of loveliness and love,
A guest of the starry throng:
You warble of our ancient quest
Of bloom and bell and musk.
In the dark of sleep you cannot nest:
Your flame-wings burn the dusk.

— Dilipkumar Ray, To Rabindranath on reading 'Prantika', *The Modern Review*, March 1938, p 313।

৩ শাংহাই, নানকিঙ জাপানীরা অধিকার করিয়াছে ১৯৩৭-এর শেষভাগে।

আছে, আমরা কী করতে পারি? . . এই দুঃখবোধের দ্বারা দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ ক'রে আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি; এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও সৃষ্টির কাজ। আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু মন আছে; আমরা লড়াই না করতে পারি, কিন্তু এ কথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে অধর্মের দ্বারা আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনাশ, যদি এ কথা বিস্মৃত না হই যে মানব-ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে— এ কথা মনে রেখে সেই কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি। আমাদের মেশিন-গান নেই। কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে— তার মূল্য যতটুকুই হোক তাকে আমরা মহত্তের দিকে প্রয়োগ করব।"[১] এই আদর্শই ভারত গ্রহণ করিয়াছে; এই সর্বজীব-মঙ্গল-চিন্তার জন্য ভারত আজ সর্বজাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।

এই ভাষণের সঙ্গে পঠনীয় খ্রীষ্টমাস দিনে (২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৭) লিখিত প্রান্তিকের দুইটি কবিতা (১৭ ও ১৮ -সংখ্যক)।

দেখিলাম এ কালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ . .
রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে।

জাগতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা পৌষ-উৎসবের ভাষণে ছিল— "অপর দিকে আছে আপন সাম্রাজ্য-লোভী ভীরুর দল, তারা এই দানবের কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। ক্ষীণ এরা, ইতিহাসে এদের সাক্ষ্য লুপ্ত। চীনকে যখন জাপান অপমান করেছে . . তখন এই প্রতাপশালীর দল কোনো বাধা দেয় নি।"

খ্রীষ্টের জন্মদিনে দেশে দেশে দেবতার মন্দিরে মন্দিরে ধার্মিকদের দল শান্তির জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু কোথায় সে শান্তির প্রয়াস—

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস।
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—[২]

চীনাদের উপর জয়ী হইবার জন্য জাপানী সৈন্যদল বুদ্ধমন্দিরে বর প্রার্থনা করিয়াছিল— এই সংবাদ সংবাদপত্রে পড়িয়া বড়ো বেদনায় লিখিলেন 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'[৩]—

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে। . .
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।

১ প্রলয়ের সৃষ্টি, ৭ পৌষ ১৩৪৪। প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৪, পৃ ৫৬-৫৭।

২ তুলনীয়, Maxim Gorky, Reply to an intellectual (1931), Articles and Pamphlets, Moscow, 1951, p 255 ff।

৩ শান্তিনিকেতন, পৌষ ১৩৪৪। প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৪। পত্রপুট ১৭, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৫১।

সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।

মহতের নামে, দেবতার নামে এত বড়ো ব্যঙ্গ কবির পক্ষে দুঃসহ।[১]

বুনিয়াদি শিক্ষা ও শিক্ষাসত্র

কলিকাতায় নবশিক্ষাসংঘ বা New Education Fellowship -এর সম্মেলন ডিসেম্বরের (১৯৩৭) শেষভাগে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শাখার সভাপতি; শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাঁহার ভাষণ লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন; এই ভাষণের বিষয়বস্তু লইয়া আমরা পরে আলোচনা করিব।

সম্মেলনে যে-সব বিদেশী সদস্য আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবির সহিত দেখা করেন। NEF-এর সভাপতি ফিন্‌ল্যান্‌ডের Tolo Svenska Samkola, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ Rector Lavrin Zilliacus, ইংলন্‌ডের কেন্ট কাউন্টির শিক্ষা-পরিচালক Salter Davies, সুইস NEF-এর সহকারী সভাপতি ও জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক Pierre Bovet এই দলে ছিলেন। সঙ্গে আসেন বুনিয়াদি শিক্ষার সম্পাদক আর্যনায়কম্‌।

NEF-এর সদস্যগণ অস্ট্রেলিয়া ঘুরিয়া ভারতে আসেন। ওয়ার্ধায় অক্টোবর মাসে (১৯৩৭) মহাত্মাজির আহ্বানে যে শিক্ষাসম্মেলন হয়, সেখানে Dr. Zilliacus প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। এই শিক্ষাসম্মেলনের কথা আমরা পরে বলিব।

নবশিক্ষাসংঘের সদস্যগণ শান্তিনিকেতনে তিন দিন ছিলেন; তাঁহারা থাকিতে থাকিতে লর্ড লোথিয়ান[২] কবির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসেন। একদিন সন্ধ্যায় একটি সভায় ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনা লইয়া আলোচনা হয়; আর্যনায়কম্‌ এই পরিকল্পনা কমিটির আহ্বায়ক ও সম্পাদক; তিনি সভায় গান্ধীজির শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে বলিলেন।

আমাদের আলোচ্যপর্বে ভারতে সর্বত্র গান্ধীজির পরিকল্পিত নূতন শিক্ষাদর্শ লইয়া আলোচনা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ নবশিক্ষাসংঘের জন্য যে প্রবন্ধটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং যাহা ইতিপূর্বে সেখানে পঠিত হইয়াছে, তাহাতে গান্ধীজির শিক্ষাবিধির সমালোচনা ছিল। শান্তিনিকেতনের এই ঘরোয়া সভায় যে-সব আলোচনা হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই নাই। রবীন্দ্রনাথের সহিত ডক্টর জিলিকাস প্রমুখ পণ্ডিতদের যদি কোনো আলোচনা হইয়া থাকে, তাহাও সমসাময়িক কোনো পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয় নাই।

১ প্রায় দশ মাস পরে (অক্টোবর ১৯৩৮) য়োন নোগুচিকে পত্রে লিখিতেছেন সমসাময়িক আর-একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া: "I saw in a recent issue of the Osaka Mainichi and the Tokyo Nichi Nichi (16 September 1938) a picture of a new colossal image of Buddha erected to bless the massacre of your neighbours."— Tagore and China, p 61।

২ লর্ড লোথিয়ান সে যুগের সেরা কূটনীতিজ্ঞ রাজপুরুষ; যুদ্ধের সময় ভারতের মনোভাব দেখিয়া গেলেন। ভারত হইতেই বোধ হয় মার্কিন দেশে যান। Lothian, (Philip Henry Kerr) 11th Marquess of, K. T., C. H. (1882-1940); Assistant Secretary of International Council of Transval and Orange River Colony (1905-08); editor of *The State*, South Africa (1908-09), and *The Round Table* (1910-16); Secretary to Lloyd George, when Prime Minister (1916-21); Secretary of Rhodes Trust (1925-29); Chancellor of the Duchy of Lancaster; Parliamentary Under-Secretary of the State for India (1931-32); Chairman of Indian Franchise Committee (1932); British ambassador to U. S. A. charged with obtaining supplies and support of Britain's war effort, 1939-40; died in office.

গান্ধীজির শিক্ষাপরিকল্পনা দেশের কী অবস্থায় পেশ হইয়াছিল তাহার পটভূমি সংক্ষেপে প্রথমেই বলা প্রয়োজন। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে গান্ধীজি বহু বৎসর হইতে ভাবিতেছেন। জীবনে স্বাবলম্বী হইবার শিক্ষাই যে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য, এ কথা গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা বাসকালে স্বীকার করিয়া লন এবং টলস্টয় ফার্ম স্থাপন করিয়া নিজ পুত্রদের ও বন্ধুপুত্রদের আপন আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার ছাত্ররা শারীরিক কঠিন শ্রমে অভ্যস্ত হইত; তাহারা নিজ বস্ত্র বয়ন করিত, আপনার সর্ববিধ কার্য করিত; এমন-কি নিজের জুতা পর্যন্ত নিজেরা প্রস্তুত করিত। এ বিষয়ে গান্ধীজিকে শিক্ষা দেন তাঁহার প্রধান শিষ্য, সঙ্গী ও বন্ধু Kallenbach। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে গান্ধীজির ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আসিয়া কয়েকমাস থাকিয়া যায়; সেই দলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সকলকেই কঠিন শ্রমসাপেক্ষ কার্যকলাপ করিতে হইত— বলা বাহুল্য, স্বাবলম্বন ছিল শিক্ষার মূল কথা।

ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া গান্ধীজিকে একের পর এক বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সমস্ত ব্যর্থতার মূলে দেখিলেন অশিক্ষা, কুশিক্ষা— অস্বাস্থ্য, অপরিচ্ছন্নতা— চিত্তদৈন্য, অর্থদৈন্য। ভারতের সেই মূক মূঢ় মুখে ভাষা বা শিক্ষা দান করিতে গেলে যে ব্যয়— তাহা তদানীন্তন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি মঞ্জুর করিতে পারেন না; কারণ সমর-বিভাগের ব্যয় সংকোচন তাঁহাদের স্বার্থের পরিপন্থী। অথচ শিক্ষা ব্যতীত যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার ভিত্তি কখনো দৃঢ় হইতে পারে না।

শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা গান্ধীজিকে দীর্ঘকাল পীড়িত করে সত্য, কিন্তু কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা তিনি দিতে পারেন নাই। দেশে প্রত্যাবর্তনের বিশ বৎসর পরে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ভারতের ছয়টি (পরে আটটি) প্রদেশে কন্‌গ্রেস-পক্ষীয়রা জয়ী হইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে পর গান্ধীজি ভাবিলেন, এই সুবর্ণ সুযোগে তিনি তাঁহার শিক্ষাপরিকল্পনা দেশবাসীর সমক্ষে পেশ করিবেন। *Harijan*এ লিখিত হইয়াছে (৩০ অক্টোবর ১৯৩৭), "But the thing in its present shape came to him under the changed circumstances of the country." দেশের এই নূতন অনুকূল পরিস্থিতিতে তাঁহার শিক্ষাদর্শ গৃহীত হওয়া সম্ভব হইল। *Harijan* পত্রিকায় (২ অক্টোবর ১৯৩৭, গান্ধীজির জন্মদিন) তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ওয়ার্ধায় অচিরে তিনি একটি শিক্ষাসম্মেলন আহ্বান করিবেন। ওয়ার্ধা মাড়োয়ারি হাইস্কুলের পঞ্চবিংশতি উৎসব উপলক্ষে এই সম্মেলন আহূত হইল। ২২-২৩ অক্টোবর ওয়ার্ধায় কন্‌গ্রেস-শাসিত প্রদেশের মন্ত্রীরা উপস্থিত হইলেন। সেখানে গান্ধীজি তাঁহার শিক্ষাদর্শ পেশ করিলেন। ওয়ার্ধায় শিক্ষাপরিকল্পনা রচনার জন্য যে সমিতি গঠিত হইল, তাহার সভাপতি ডক্টর জাকীর হোসেন এবং সম্পাদক ও আহ্বায়ক আর্যনায়কম্ (আরিয়াম)। আরিয়ামের কর্মের সঙ্গে যুক্ত তাঁহার পত্নী আশা দেবী।[১]

পাঠকদের স্মরণ আছে আরিয়াম ও আশা দেবী দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিক্ষায়তনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন। আরিয়াম ১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন ও ১৯৩৪ সালে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। আশা দেবী কিছুকাল পাঠভবনের অধ্যক্ষতা করেন। তিনি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া কবিকে জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে আরিয়াম অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই শান্তিনিকেতনের পঠনপাঠন-বিধি এবং শিক্ষা-সত্রের আদর্শ ও কর্মধারার সহিত সুপরিচিত হন। লক্ষ্মীশ্বর সিংহের স্লয়ড্ কর্মশালায় আরিয়াম ও আশা দেবী ছিলেন উৎসাহী ছাত্র। মোট কথা রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌ম্‌হার্স্টের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আরিয়াম ভালোরকমে

১ **Being a born teacher he [Vinoba] has been of the utmost assistance to Asha Devi in her development of the scheme of education through handicrafts.—Vinoba and Gandhi by Birendranath Guha, *The Hindusthan Standard*, Puja Issue, 1953, p 45.**

ওয়াকিবহাল থাকায় তাঁহার পক্ষে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম খসড়া প্রণয়ন করা সহজ হয়।

আরিয়াম ও আশা দেবী ১৯৩৪-এর জুন মাসে শান্তিনিকেতনের কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যান; আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সম্বন্ধ তাঁহাদের মতে সেখানে ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তাঁহারা বেনারস, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া অবশেষে ওয়ার্ধায় গিয়া যমুনালাল বাজাজের মাড়োয়ারি বিদ্যালয়ে (নবভারত বিদ্যালয়) যোগদান করেন। এই সময় হইতে আর্যনায়কম ও আশা দেবী গান্ধীজি, বিনোবা ভাবে প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হন, এবং শিক্ষাবিষয়ে উভয়ের উৎসাহ, আন্তরিকতা ও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা দেখিয়া গান্ধীজিও আকৃষ্ট হন। বুনিয়াদি শিক্ষার মূল খসড়া ইঁহাদেরই দ্বারা রচিত বলিতে পারি। আমাদের মতে জন্ ডিউই (Dewey)-উদ্‌ভাবিত project method, রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌ম্‌হার্স্ট-প্রবর্তিত শিক্ষাসত্রের পাঠক্রম ও পদ্ধতি এবং গান্ধীজির কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনার সমন্বয়ে বুনিয়াদি শিক্ষার খসড়া প্রস্তুত হয়।

Harijan পত্রিকায় Basic National Education-এর প্রথম খসড়া প্রকাশিত হইল (১১ ডিসেম্বর ১৯৩৭)। ইহা সমসাময়িক শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শনের সমালোচনা ও গান্ধীজির গঠনমূলক পরিকল্পনার বুনিয়াদ। উক্ত প্রতিবেদনে ইহাকে বলা হয় activity curriculum। বলা বাহুল্য, শিশুদের শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক[১] হইবে এই তত্ত্ব জগতের শিক্ষাভাবনায় নূতন নহে। গান্ধীজি তাঁহার নূতন শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন অর্থনীতির উপর, অর্থাৎ শিক্ষা স্বাবলম্বী হইবে, বাহিরের সাহায্যনিরপেক্ষ হইবে। ছাত্ররা আপনাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবে এবং উদ্‌বৃত্ত সামগ্রী বিক্রয় করিবে; তাহাদের বৃত্তি হইবে 'profit-yielding vocation'। সেই অর্থ দ্বারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনাদি চলিবে; তবে ঘরবাড়ি আসবাবপত্রের ব্যয় অন্যত্র হইতে আনিতে হইবে। গান্ধীজির মতে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান গভর্নমেণ্টের সাহায্যনিরপেক্ষ হওয়া উচিত, তাহারা self-supporting হইবে through the fees charged for examinations, অর্থাৎ পরীক্ষার ফীর উপর বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতম শিক্ষার নির্ভর হওয়া উচিত। ধনপতি ও শিল্পনায়কগণ এই শ্রেণীর বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উহার ব্যয় বহন করিবেন। তাঁহার মতে সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল শ্রেণীর বালকবালিকার শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক হওয়া বাঞ্ছনীয়; এ ছাড়া স্বাবলম্বী হইবার জন্য তাহাদের চেষ্টা থাকিবে শুরু হইতে। তিনি আরো বলেন যে, সকল শ্রেণীর শিক্ষিত নরনারীর পক্ষেই জনশিক্ষাদানে কিছু সময় অতিবাহন আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে সর্বশ্রেণীর শিক্ষা সরকারী অর্থসাহায্যনিরপেক্ষ হইতে পারিবে এবং বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতে নিরক্ষরতার সমস্যা ও বেকারসমস্যা দূরীভূত হইবে। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের নিরক্ষরতা ও জীবিকাসমস্যা দূর করিবার জন্য তাঁহার ভাবনা, এবং আশু প্রতিকারের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। সেজন্য তিনি তাঁহার পরিকল্পনাকে Basic National Education না বলিয়া Rural National Education বলিবারই পক্ষপাতী।[২] গান্ধীজি তাঁহার পরিকল্পিত শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে বলেন, "This education ought to be for them a kind of insurance against unemployment."[৩]

১ *Harijan*, 2 October 1937. Question before the educational conference।

২ Segaon, 28 May 1938, Foreword to the 2nd Ed. of the Basic National Education।

৩ *Mahatma* by D. G. Tendulkar, Vol IV, p 228। তুলনীয়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র। সেখানে ছাত্ররা স্বাবলম্বী হইবে, এ পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল; তবে বিদ্যালয়ের ব্যয় তাহাদের উপার্জিত অর্থে চলিবে এ কথা তিনি কখনো ভাবেন নাই। কিন্তু ছাত্ররা ৬ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাসত্রে থাকিয়া যে-সব কারুশিল্প শিখিবে তাহারই অনুশীলনে তাহাদের জীবিকা না হউক উপজীবিকা হিসাবে কিছু অর্থাগম হইতে পারে এ কথা বলেন। শিক্ষাসত্রের মূলকথা ছিল ভবিষ্যতে স্বাবলম্বন এবং ছাত্রাবস্থায় যতটা পারা যায় করা; তাহাদের আয়ের উপর বিদ্যালয়ের নির্ভর হইতে পারে না।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজি দেশবাসীকে চরকায় সুতা কাটিয়া দেশের বস্ত্রসমস্যা ও দারিদ্র্যদুঃখ শমিত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ ভাবিতেছেন দেশব্যাপী নিরক্ষরতা, মানসিক জড়তা, বেকারসমস্যা দূর করিবার একমাত্র উপায় কন্‌গ্রেস গভর্নমেণ্টের সহায়তায় দেশের মধ্যে বুনিয়াদিশিক্ষার পত্তন ও প্রচলন। গান্ধীজির বিশ্বাস কর্ম বা কারুকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মনোবিকাশও হইবে। তিনি বলিতেছেন, 'Let us cry a halt and concentrate on educating the child properly through manual work, not as a side activity, but as the prime means of intellectual training."[১] তিনি অন্যত্র বলিতেছেন যে, বুদ্ধিকে প্রখর করিবার জন্য কারুশিক্ষা অপরিহার্য। "I am afraid you have not sufficiently grasped the principle that spinning carding etc., should be means of intellectual training. What is being done there is that it is a supplementary course to the intellectual course... I must confess that all I have up to now said is that manual training must be given side by side with intellectual education. But now I say that the *principal means of stimulating the intellect should be manual training.*"[২]

হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজির শিক্ষাপরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে (১১ ডিসেম্বর ১৯৩৭), রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহা বৎসরের শেষভাগে কলিকাতার NEF-এর যে সম্মেলন হয় তাহাতে পঠিত হয় এবং বিশ্বভারতী নিউজে ও অন্যত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"Now that Mahatma Gandhi has taken up the cause of mass education in earnest we may be sure of great results in the near future. Already great interest has been roused in the country and controversy provoked over the question whether education can be made selfsupporting. Before you too are likewise provoked to violent agreement or disagreement with the proposal I would remind you that Gandhiji's genius is essentially practical, which means that his practice is immeasurably superior to his theory. As the scheme [Wardha] stands on paper, it seems to assume that material utility, rather than development of personality, is the end of education, that while education in the true sense of the word may be still available for a chosen few who can afford to pay for it, the utmost that the masses can have is to be trained to view the world they live in in the perspective of the particular craft they are to employ for their livelihood. It is true that as things are even that is much more than what the masses are actually getting but it is nevertheless unfortunate that even in our ideal scheme, education should be doled out in insufficient rations to the poor, while the feast remains reserved for the rich. I cannot congratulate a society or a nation that calmly excludes play from the curriculum of the majority of its children's education and gives in its stead a vested interest to the teachers in the market value of the pupil's labour But these defects seem such only on paper, for no

১ *Harijan*, 18 September 1937। ২ *Mahatma*, Vol IV, p 227-228।

man loves the children of the poor more than the Mahatma, and we may be sure that when the scheme is actually worked out by him we shall discover in it only one more testimony to the genius of this practical sage whose deeds surpass his words."[১]

অতঃপর দুই মাস পরে হরিপুরার কন্‌গ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে National Education সম্বন্ধে দীর্ঘ এক প্রস্তাব পেশ ও গৃহীত হয় (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮); ওয়ার্ধা শিক্ষাসম্মেলনে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেগুলিই কন্‌গ্রেস কর্তৃক এখন স্বীকৃত হইল। কন্‌ফারেন্সে গান্ধীজির self-supporting ও profit-yielding প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে গৃহীত না হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল—

(3) That the conference endorses the proposal made by Mahatma Gandhi that the process of education throughout this period [Ages 7-14] should centre around some form of manual and productive work, and that all the other abilities to be developed or training given should, as far as possible, be integrally related to the central handicraft chosen with due regard to the environment of the child.

(4) That this Conference expects that this system of education will be gradually able to cover the remuneration of the teachers.

কন্‌গ্রেস এই শেষ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। কন্‌গ্রেস অধিবেশনের মাস-খানেকের মধ্যেই (মার্চ ১৯৩৮)[২] Basic National Education-এর Syllabus ওয়ার্ধা হইতে প্রকাশিত হইল। এই পাঠক্রম রচনায় জাকীর হোসেন -কমিটির সদস্যগণ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ করেন; তাহার মধ্যে বিশ্বভারতীর লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কার্ডবোর্ড, কাঠের কাজ ও ধাতুশিল্প শিক্ষার পাঠক্রম প্রস্তুত করিয়া দেন। নন্দলাল বসু ড্রয়িং বা চিত্রবিদ্যার পাঠক্রম লিখিয়া দেন। লক্ষ্মীশ্বর যে খসড়া পেশ করেন তাহা স্লয়ড্ কারুশিক্ষাপদ্ধতির উপর রচিত পাঠ বা কার্যক্রম। আমরা পূর্বে স্লয়ড্ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

Basic Education সম্বন্ধে যে গ্রন্থ এইবার প্রকাশিত হইল তাহাতে রবীন্দ্রনাথের এতদ্‌সম্পর্কে মতামতের পরোক্ষ সমালোচনা ছিল। কবি বলিয়াছিলেন যে শিক্ষার মধ্যে ক্রীড়ার স্থান বড়ো, সেইটি এই শিক্ষাপরিকল্পনায় বাদ পড়িয়াছে। তাহার উত্তরে বলা হয় যে, ক্রীড়া curriculumএর বিষয় নহে, তাহা extra-curricular activity-র অন্তর্গত। মনে হয় NEF-এর অধিবেশনে কবির যে সমালোচনা পঠিত হয় ইহা তাহারই উত্তরে লিখিত।

গান্ধীজির স্বাবলম্বনমূলক শিক্ষার ভিত্তি অহিংসা। তাঁহার নবশিক্ষাপরিকল্পনায় 'অহিংসা'র অর্থ অন্যকে শোষণ ও পেষণ না করিয়া জীবিকা অর্জন; তাহাই মানবধর্ম। উপনিষদের বাণী উদ্‌ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বহু স্থলে তাঁহার ভাষণে এই মানবধর্ম উদ্রিক্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন, 'মা গৃধঃ', অর্থাৎ অন্যের ধনে লোভ করিবে না, অন্যকে

১ *Visva-Bharati News*, January 1938, p 51-53। তুলনীয়, An aspect of the Basic Education Scheme by Tanayendranath Ghose, *Visva-Bharati News*, May 1938, p 83-86।

২ *Harijan* (11 December 1937)-এ Basic Education-এর প্রথম খসড়া বাহির হয়। তৎপূর্বে ডিসেম্বর ১৯৩৭-এর *The Modern Review*-তে লক্ষ্মীশ্বর সিংহের 'Some practical and important aspects of mass education and vocational training' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুনিয়াদি শিক্ষার পক্ষ হইতে লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে কারুশিল্পের পাঠক্রম রচনার জন্য বলা হয়। লক্ষ্মীশ্বর সিংহ তখন শ্রীনিকেতনের কর্মী। অতঃপর ১৯৩৮ এপ্রিল মাসে তিনি ওয়ার্ধায় কাজ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। বর্তমানে তিনি শ্রীনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

পীড়ন করিয়া পুষ্ট হইবার সাধনা করিবে না। মানুষের মনে যে idyllic স্বপ্ন আছে এ ভাবনাও তাদৃশ। আদর্শবাদী মানুষ সর্বদেশে সর্বকালে সত্যযুগ বা রামরাজ্যের কথা কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। কেহ ভাবেন এই utopia মূর্ত হইবে আত্মিক দিক হইতে; আবার কেহ ভাবেন আর্থিক দিক হইতে সমস্যার সমাধান হইবে; কেহ বা উভয়কে মিশাইয়া শ্রেণীহীন সমাজে সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেন।

এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি কতদূর বিজ্ঞানসম্মত তাহার শেষ বিচার হয় নাই; আধুনিক বিজ্ঞানীরা ক্রমশই কর্মসর্বস্ব শিক্ষাপদ্ধতির ফল সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছেন। "Under the scrutiny of modern psychology such claims [that through the use of tools one would acquire not only some specific skills, but also a 'general skill' which would be useful in all circumstances in later life],—which rest largely on the theory of the transfer of training have been found substantially invalid. But these views were once quite fashionable and as such they contributed in no small way to the wide and rapid acceptance of manual training as an integrate part of general education."[১]

বুনিয়াদি শিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর 'শিক্ষাসত্র' প্রতিষ্ঠানের কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। যেখান হইতে শিক্ষা বিনাব্যয়ে পাওয়া যায় তাহাকে 'শিক্ষাসত্র' বলা হইয়াছে, যেমন অন্নসত্র। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা পেশ (ডিসেম্বর ১৯৩৭) হইবার প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় গ্রামের দরিদ্রদের শিক্ষাদানের জন্য শান্তিনিকেতনের এক প্রান্তে 'শিক্ষাসত্র' স্থাপিত হয় (জুলাই ১৯২৪)। বলিতে গেলে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম হাতেনাতে পরীক্ষার সূত্রপাত এখানেই হয়। প্রসঙ্গত বলিতে পারি, যে ১৯২৫-এ যখন গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে আসেন তখন তিনি এই গ্রাম-বিদ্যালয় দেখিয়াছিলেন এবং তথাকার কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন।[২]

যাহাই হউক, শিক্ষাসত্র স্থাপনের বহুপূর্ব হইতেই শিক্ষাকে activity বা কর্মভিত্তিমূলক করিবার জন্য কবির ইচ্ছা ও প্রয়াস দেখা যায়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের সময় হইতেই ছাত্ররা নিজ নিজ কর্ম করিতে অভ্যস্ত হয়; কবি যে কর্মভিত্তিক শিক্ষাবিধির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন তাহার এক ধারা প্রাচীন তপোবনের গুরুগৃহবাসের আদর্শ হইতে গৃহীত—আশ্রম শব্দের মধ্যে 'শ্রম' নিহিত, উহা বিশ্রামের স্থান নহে; আর-এক ধারা পাশ্চাত্য নূতন শিক্ষাদান বা প্রয়োগ-মূলক শিক্ষাপদ্ধতি হইতে গৃহীত। আধুনিক যুগে উইলিয়াম জেম্‌স্ শিক্ষাতত্ত্বে যে নূতন কথা বলেন তাহা তাঁহার *Talks to Teachers and Students* (1899) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থখানি কবি জগদীশচন্দ্র বসুর নিকট হইতে পান; জগদীশচন্দ্রকে সিস্‌টার নিবেদিতা উহা উপহার দেন। কবি সেই কপি পাঠ করেন এবং আমাদের নিকট বহুবার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন।[৩]

১ *Meyers*, p 29।

২ "Some years after I had left, Gandhi paid a visit to this school and was so impressed that he urged Tagore to loan him the service of the headmaster of Siksha-Satra to help him plan an all-India revolution in primary education. Tagore laughingly volunteered on the spot to be Gandhi's first Minister of Education." —Rabindranath Tagore, Pioneer in Education: Essays and Exchanges between Rabindranath and L. K. Elmhirst—John Murray (1961), p 13-14।

৩ বইখানি রবীন্দ্রসদনে আছে।

শিক্ষাব্রতীরা জানেন কিভাবে জেম্‌স্‌ (১৮৪২-১৯১৪) ও চার্ল্‌স্‌ পিয়ার্স্‌ (১৮৩৯-১৯১০)-এর pragmatic মতবাদ জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) প্রমুখ আধুনিক দার্শনিক ও শিক্ষাশাস্ত্রীদের প্রভাবান্বিত করে। জন ডিউই বিংশ শতকের সর্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠ শিক্ষাশাস্ত্রী; Findlay [1860] বলেন, আর-একজন শিক্ষাশাস্ত্রী জগতে আছেন—তিনি হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষার ইতিহাস লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট জেম্‌স ফিন্‌ড্‌লে-র নাম অজ্ঞাত নহে; তিনি ইংরেজ, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্হ অধ্যাপক, বহু গ্রন্থের লেখক। তাঁহার *The Foundation of Education* (1930) গ্রন্থে বলিতেছেন, "There are two great men in our epoch, John Dewey in the West and Rabindranath Tagore in the East, whose wisdom not only illumines the general mind, but has stooped to the level of the children. Both men are now passing into old age, but it was in the prime of life, during the closing years of the last century, that both of them resolved to keep school.

"With Tagore, the environment, the *Ashram*, the star and the sky, friends and neighbours, are the means whereby an inner happiness is fostered. Dewey seems to leave such influences to the subconscious; his 'means whereby' the American boy and girl are to solve the riddle of life spring from impulses of curiosity and intelligence: significance is found in relating the materials and tools of to-day with the unfurnished equipment of society in earlier epochs: pursuing the occupations presented in kitchen, garden and workshop, his children learned to enjoy the fellowship of their group, to be humane and considerate, without relating such sentiments either to the transcendental or to the sense of fellowship. You could not transplant the Shantiniketan school song, 'She is our own: the darling of our hearts' to Chicago, for the forms of art in which the Bengalee gives voice to his emotion are the outcome of ages of culture: American culture is by comparison rough and ready: the people, even of 'the best' families, are exiles of recent date from all quarters of Europe and life had to begin again, making over afresh the constituent values of livelihood and art. . . Yet the teachers in Chicago and the teachers in Bolpur were united both in their negations, in their rejection, e g., of the vulgar pursuit of wealth and ostentation, and in their positive sentiments towards the young. Both seek freedom from the sordid, fleeting desires of a materialistic age; but the one escapes from the entanglements of a jungle where ancient truths have rotted in decay; the other, dumped on a naked shore, has to refashion the arts of life from the materials that lie to hand. 'Here and now is my America' is the motto of the West, for the past has been severed by the wide seas: the boys of Bolpur chant a Sanskrit verse, *Om, Shanti, Shanti, Shanti*, on the soil their fathers trod. When Tagore delivered his lecture on *My School* to an American audience, we may be sure that it was felt and understood best by those who had grasped

the pedagogies of *School and Society* and of *Human Nature and Conduct* ।"[১]

Findlay তাঁহার গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন— "Dedicated to Rabindranath Tagore, poet, philosopher and teacher of school-boys in Bolpur."

জন ডিউইর পরেই শিক্ষাশাস্ত্রীদের মধ্যে নামজাদা অধ্যাপক হইতেছেন কিলপ্যাট্রিক। ইনি ডিউইর শিষ্য, ১৯২৬ সালে ভারতে আসেন; মোগা স্কুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ দিবার জন্য ইনি আমন্ত্রিত হন। সেই সময়ে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় দেখিয়া যান। চারি বৎসর পর ৪ নভেম্বর ১৯৩০ নিউইয়র্কের International House-এ তিনি Educational situation in India and Tagore's School সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেই সভায় আরিয়াম উইলিয়ামস [আর্যনায়কম্] শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কিলপ্যাট্রিক শান্তিনিকেতনের শিশুবিভাগের ছাত্রদের দ্বারা নির্মিত 'মুকুট' ঘরখানি দেখিয়া খুবই প্রীত হন। তিনি বক্তৃতায় বলেন যে শিশুবিভাগে যে আদর্শ তিনি দেখিয়াছিলেন তাহাই যথার্থভাবে শিক্ষার মূল কথা অর্থাৎ activity। স্কুলবিভাগে যে পাঠক্রম ও পদ্ধতি পরীক্ষায় পাসের জন্য শান্তিনিকেতনে অনুসরণ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে Kilpatrik দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "I regret myself that he has to do it. I hope the day will come when India can give up this type of education— which has split the soul of its youth. I hope that day may come, and I am sure the poet will be the first one, in his own school, to herald that day."[১]

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে যে-সব ভাষণ দেন তাহাতে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার যে কাঠামো খাড়া করেন তাহা শিক্ষার মূলগত সমস্যারই আলোচনা। ১৯১৯ সালে মাদ্রাজে জাতীয় শিক্ষা-উন্নয়ন-সমিতির উদ্যোগে তিনি যে ভাষণ দান করেন তাহা The Centre of Indian Culture নামে সুপরিচিত। এই ভাষণের মধ্যে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, ভাবীকালের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র কেবলমাত্র মানসিক বা পুঁথিগত বিদ্যার কেন্দ্র হইবে না— সেই কেন্দ্র হইবে অর্থনৈতিক জীবনেরও কেন্দ্র।

"Our centre of culture should not only be the centre of the intellectual life of India, but the centre of her economic life also. It must cultivate land, breed cattle, to feed itself and its students; it must produce all necessaries, devising the best means and using the best materials, calling science to its aid. Its very existence should depend upon the success of its industrial ventures carried out on the co-operative principle, which will unite the teachers and students in a living and active bond of necessity. This will give us also a practical industrial training, whose motive force is not the greed of profit (p 41)।" অতি স্পষ্ট

১ J. Findlay, *Foundation of Education*, Vol II, pp 239-40।

১ আরিয়াম যখন শান্তিনিকেতনে শিশুদের শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত সেই সময়ে শিক্ষাশাস্ত্রী কিলপ্যাট্রিক শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ লাল তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন, "Professor William H. Kilpatric of Columbia University, who visited the school [at Santiniketan], has spoken of the active life, particularly of the elementary school [Sisu-Vibhaga] with appreciation while Professor Findlay has ranked Tagore with John Dewey as an educator."—P. C. Lal, Reconstruction and Education in Rural India, 1932 p 117; also see page 23. কিলপ্যাট্রিকের বক্তৃতাটি আমি জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাই। তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ভাষায় কবি তাঁহার শিক্ষাদর্শ ব্যক্ত করিলেন। তবে ইহা হইল broad principle.

সমসাময়িক এক রচনায় আমরা পাই, "যাহাতে হাতের ও চোখের দক্ষতা ও বস্তুপরিচয় ঘটে আমাদের আশ্রমে ছেলেদের সেইরকম শিক্ষা দিবার জন্য বহুকাল হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেজন্য প্রায় মাঝে মাঝে অর্থসাধ্য আয়োজন করা গিয়াছে। সফলতা লাভ করিতে পারি নাই তাহার একমাত্র কারণ, পুঁথিগত বিদ্যায় আমাদিগকে কেবল যে অকর্মণ্য করিয়া দিয়াছে তাহা নহে, পুঁথির বাহিরে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য চলিয়া গেছে। বই পড়াইবার ক্লাস আমরা সহজে চালাইতে পারি কিন্তু কেজো শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কী করিয়া করা যায় আমরা ভাবিয়া পাই না এবং সে সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা যায় না।"[১] 'মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড' যোগ যে আছে এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন এবং বলেন যে "পরস্পরের সহযোগিতায় তারা বল লাভ করে।" তিনি বলেন, "দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তা হলে মনের শিক্ষারও প্রবাহ বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি তার কারণই এই যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবি কোনোই আমল পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে।

"দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছি নে। দেহের দ্বারা আমরা যে-সব কাজ করতে পারি সেই-সব কাজের চর্চা— সেই চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়। সেই-সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়— সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে।

"আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোনো-না-কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ ক'রে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা, এইরকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে।[২] . . দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ ক'রে নেয়। . . সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে। . . দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সচলতার সঙ্গে মনের সচলতার যোগ আছে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উভয়ের মধ্যে ভালো রকম মিল করতে না পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায়।"[৩]

শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ করিতে হইলে তাহা যে কর্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া উচিত এ ভাবনা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-জিজ্ঞাসায় বহুকালের। ১৯০৪ সালে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একপত্রে লিখিয়াছিলেন, "এন্ট্রেন্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়া রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা যাইবে।"[৪] কিন্তু দেশের পরিস্থিতিতে এই ভাবনা কার্যকরী করিবার সুযোগ পান নাই। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ ও ছাত্রদের অভিভাবকগণই ছিলেন ইহার বাধা; কারণ বাঁধা রাস্তায় চলিতে ও চালনা করিতে পারিলে শিক্ষকরা খুশি, মামুলিধারায় সন্তানদের শিক্ষিত করিতে পারিলে অভিভাবকগণ নিশ্চিন্ত। অভিভাবকগণের মধ্যে বেশির ভাগই শান্তিনিকেতনে ছেলে পাঠান তথাকার কতকগুলি সুবিধা-সুযোগের জন্য। বাহিরের এই-সব বাধা ও বাধ্যবাধকতা হইতে দূরে থাকিয়া কবি তাঁহার পরিকল্পনামতে শিক্ষাদানের পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য শিক্ষাসত্রের পত্তন করেন। এই শ্রেণীর special school কেন স্থাপন করেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় মোলাকাতে তৎসম্বন্ধে কবি বলেন যে, শান্তিনিকেতনে ছাত্ররা অধিকাংশই আসে ধনীঘর

১ উদ্যোগশিক্ষা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬, পৃ ৫।

২ তুলনীয়, মহাত্মাজির কথা— "the principal means of stimulating the intellect should be manual training" (1937)।

৩ আলোচনা, শিক্ষা (১৩৪২), পৃ ২৫৯-৬০। দ্র শান্তিনিকেতন পত্রিকা।

৪ স্মৃতি, পৃ ৪৩।

হইতে, সকলেই পরীক্ষা পাস ও ডিগ্রি লাভ করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে এই মাত্র আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্য সেখানে সর্বাঙ্গীণ আদর্শ শিক্ষাদান করা সম্ভব হয় না। "Therefore it is not possible to give them the ideal kind of education."[১] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "The tradition of the community which calls itself educated, the parent's expectations, the up-bringing of the teachers themselves, the claim and the constitution of the official University, were all overwhelmingly arrayed against the idea I had cherished."[২]

কবি আদর্শবাদী হইলেও প্রত্যক্ষবাদী; বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার কোনো অস্পষ্ট ধারণা ছিল না; তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "I had to submit to this because otherwise there would be no chance of having a single student in my school."[৩] এ কথা অতি সত্য; গভর্নমেণ্ট প্রথমদিকে এ বিদ্যালয়ের প্রতি আদৌ সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন না। তৎকালীন গভর্নমেণ্টের মন ও সমাজের মান রক্ষা করিয়া যতদূর চলা সম্ভব তাহাই কবি করিতেন। গভর্নমেণ্টের সহায়তা ও সহানুভূতি -নিরপেক্ষ সর্বব্যাপী শিক্ষাপরিকল্পনা কর্মে রূপায়িত করা অসম্ভব জানিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নিজ সামর্থ্য অনুসারে তাহা সীমায়িত রাখেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ প্রচার করিতে তিনি বিরত হন নাই— ১৯১৯ সালের উদ্‌ধৃতাংশ তাহার প্রমাণ। Special schools অর্থাৎ গ্রামের বালকদের জন্য বিদ্যালয় বা সত্র স্থাপনের কথা কেন উঠিয়াছিল, কেন তিনি 'such a distinction' বা পার্থক্য করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার উত্তর তো তিনি দিয়াছেন। তাঁহার ধারণা যে, class বা বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষভাবে ধনী ও মধ্যবিত্তর জন্য যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে তাহা ক্রমেই পিছাইয়া পড়িবে, ও classএর স্থলে massএর জন্য এই গ্রাম্য শিক্ষালয় দেশব্যাপী হইবে।

১৯২২ সালে এল্‌ম্‌হার্স্ট বিশ্বভারতীতে যোগদান করিলে কবির বহুকাল-ঈপ্সিত সাধারণের উপযোগী শিক্ষাদর্শকে প্রকাশ করিবার সুযোগ মিলিল। এল্‌ম্‌হার্স্ট আদর্শবাদী হইলেও বাস্তববাদী; তিনি অর্থ আনিলেন বিদেশ হইতে বিশ্বভারতীর জন্য, নিজে কর্মে ব্রতী হইলেন কবির আদর্শকে রূপদান করিবার জন্য। কবি লিখিতেছেন যে, এল্‌ম্‌হার্স্ট "believes, as I do, in an education which takes count of the organic wholeness of human individuality that needs for its health a general stimulation to all faculties, bodily and mental." পূর্বের আলোচনা ইহারই সমর্থক কথা।

বিশ বৎসর যাবৎ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের লইয়া তিনি তাঁহার সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শ রূপ দান করিতে পারেন নাই; তাই লিখিতেছেন, "I had to start *a parallel school* where the villagers who do not have ambitions for finding Government employment or employment in merchants' offices, come and join. There I am trying to introduce all my methods which I consider to be absolutely necessary for a perfect education. Before long, the village school will be the real school, the ideal school, and the other one will be neglected."[৪] কবি ভাবিতেছেন, এই গ্রামবিদ্যালয়ই

১ **Rabindranath Tagore in Russia, an account of the Poet's visit to Moscow, Ed. P. C. Mahalanobis, *Visva-Bharati Bulletin* No. 15, p 33.**

২ **A Poet's School, by Rabindranath Tagore, *Visva-Bharati Bulletin* No. 9, p 14।**

৩ ***Visva-Bharti Bulletin* No. 10, p 54।**

৪ **Rabindranath Tagore in Russia, Ed. P. C. Mahalanobis. *Visva-Bharati Bulletin* No. 15, p 34।**

একদিন আদর্শ বিদ্যালয় হইবে এবং শান্তিনিকেতনের অভিজাতশ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যালয় পিছাইয়া পড়িবে।

বলা বাহুল্য, এ উক্তিকে আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে কবির চরম মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি সত্যের দ্রষ্টা, কর্মের স্রষ্টা হইলেও মূলত তিনি কবি। তাই যখন যে বিষয়টির উপর মনের ঝোঁক গিয়া পড়ে তখন সেইটিই সাময়িকভাবে একান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সে ভাব হইতে মুক্ত হইয়া আসিতেও যে তাঁহার বিলম্ব হয় না,[১] এ তথ্য আমরা বহুবার তাঁহার জীবনে লক্ষ্য করিয়াছি। আসলে যেটি normal সেই স্থানেই ফিরিয়া আসেন। তাই সমস্ত শিক্ষাকেই এক ছাঁচে ঢালিবার ইচ্ছা সাময়িকভাবে মনে উদিত হইলেও, তাহাকে কখনো শিক্ষা সম্বন্ধে কবির শেষ কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 'বহুধাশক্তি যোগে'ই জাতীয় জীবন বিচিত্র হয়, সুন্দর হয়, বলিষ্ঠ হয়— এই তত্ত্বই কবি বিশ্বাস করিতেন। শিক্ষামাত্রকেই সর্বতোভাবে কর্মপ্রতিষ্ঠ ও গ্রামমুখীন করিবার ও সর্বশ্রেণীর পক্ষে একই ধরণের বিশেষ শিক্ষাকে অনিবার্য করিয়া তুলিবার কল্পনা যে স্বাভাবিক বা normal হইতে পারে না, তাহা কবি বুঝিতেন; নহিলে বিশ্বভারতীতে বিচিত্র জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত ও প্রসারিত না হইয়া উহা 'শিক্ষাসত্র' বা বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পর্যবসিত হইয়াই থাকিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা একটি কোনো বিশেষ মতের— তাহা যতই মনোরম হউক— মধ্যে সীমিত করিয়া দেখিতে চাহেন তাঁহারা কবির সমগ্র সত্তাটির সন্ধান পাইবেন না; আবার সেটিকে বাদ দিলে তাহা অসম্পূর্ণ হইবে। সুতরাং এই জটিল মনীষী ও কবিকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার ঐক্যমূর্তির সন্ধান করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা ছিল স্বাধীনতা ও সংযম— 'opportunity for continuous initiative' (Graham Wallas)। আপনা হইতে সর্বদা কিছু সৃষ্টি করিবার উন্মুখতার মধ্যে এই আপাতবিরুদ্ধ স্বাধীনতা ও সংযম রহিয়াছে। এই initiative গৃহীত হইতে পারে freedomএর মধ্যে— 'the keynote of modern education is freedom।' শান্তিনিকেতনের শিক্ষাবিধির মধ্যে ছিল এই স্বাধীনতা এবং তারই সঙ্গে ছিল সংযম; সংযম discipline নহে— সংযম আত্মপ্রতিষ্ঠ, discipline বহিরাগত। আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মস্বীকৃত সংযমকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণীয় মনে করিতেন। উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন স্বাধীনতা নহে, কৃচ্ছ্রসাধনও সংযম নহে, উভয়ই নেতিধর্মী। শিশু ও বালকের দেহে ও মনে যে উদ্দাম আনন্দ-আবেগ ক্ষণে ক্ষণে স্পষ্ট হয় তাহাকে কবি উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া অভিহিত করিয়া কঠোর শাসন প্রবর্তন করিতে চাহিতেন না। ছাত্রদের boisterousnessকে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন, তাঁহার অসহ্য হইত তাহাদের নীচতা, অশুচিতা। তাঁহার শিক্ষাদর্শে স্বাধীনতার মধ্যে সংযম, আনন্দের মধ্যেও সংযম, জীবনের প্রতি কর্মে ভাবনায় সংযম, অর্থাৎ কোনো বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান হারাইলে ছন্দ-ভঙ্গ হয়। কবির কাছে সৌষম্য বা সুষমাই সৌন্দর্য তথা পরিপূর্ণ জীবনবেদ।

এই সৌষম্য সংগীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ লাভ করে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে music বা সংগীতের স্থান এত বড়ো। Walter Pater যথার্থই বলিয়াছিলেন, Art struggles after the law of music। এই পূর্ণপ্রজ্ঞ শিক্ষা বা জীবনের সর্বোদয়ের জন্য সংগীত জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা হইতে

১ আমাদের এই মতের সমর্থনে রোদেনস্টাইনকে লিখিত একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিতেছি: "I know that during my contact with you I occasionally displayed moods that must have caused you pain, but I hope you realise that they never represented my deeper normality, that they were provoked by some jerks of time which for the moment was passing over a road badly out of repairs." The force of friendship (radio talk), by Francis Watson on Rabindranath Tagore and Sir William Rothenstein, *The Listner*, 12 July 1951, p 66।

সংস্কৃতিকে ও বিশেষভাবে সংগীতকে বাদ দিতে পারেন নাই।

কবি একস্থলে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ, তখন ধনলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না, কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। . . তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক পারমার্থিকে মিলিয়ে। . . কৃতিত্ব শিক্ষা [manual training] অত্যাবশ্যক হলেও এই যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে। . . চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে ?"

এক্ষণে দেখা যাক কবি কিভাবে তাঁহার শিক্ষাদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এল্‌ম্‌হার্স্ট শ্রীনিকেতনে তাঁহার কার্যকালের প্রথম দিকে পার্শ্বস্থ গ্রাম-অঞ্চলে home project বা গৃহশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থানীয় পাঠশালাসমূহের শিক্ষক ও ছাত্রদের মারফত পল্লীবাসীর উপযোগী গৃহশিক্ষার আদর্শ প্রচার করিয়া দুই বৎসর পর স্থির হইল যে, একটি স্থায়ী শিক্ষাসত্র দরিদ্র ও অনাথ বালকদের জন্য স্থাপন করিতে পারিলে সেখানে শিক্ষার নূতন পরীক্ষা হইতে পারে। এই নূতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে প্রথম খসড়া করিলেন এল্‌ম্‌হার্স্ট। দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস ও শিক্ষালাভ করিয়া এল্‌ম্‌হার্স্ট তদ্দেশীয় শিক্ষাশাস্ত্রীদের পদ্ধতি সম্বন্ধে ভালোরূপে ওয়াকিবহাল হইয়াছিলেন। তার পর রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয়ের পর হইতে তাঁহার শিক্ষাদর্শ ও গ্রামোন্নয়ন সম্বন্ধে তাঁহার ভাবনাগুলি ক্রমশই দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে। গত দুই বৎসর শ্রীনিকেতনের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া তিনি কবির পরিকল্পিত 'শিক্ষাসত্রে'র জন্য শিক্ষাবিধি লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় idealist ও practical লোকের অনুপ্রেরণায় ও এল্‌ম্‌হার্স্টের ন্যায় parctical-idealist-এর সংযোগে শিক্ষাসত্রের খসড়া প্রস্তুত হইল। এল্‌ম্‌হার্স্টের প্রবন্ধের নাম ছিল Siksa-Satra, a Home for orphans।[১]

এল্‌ম্‌হার্স্ট ১৯২৪-এর মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারিরূপে চীনযাত্রা করেন, তাহার পূর্বেই শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধটি লিখিয়া গিয়াছেন। এল্‌ম্‌হার্স্টের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়া ও গ্রামের শিক্ষাসমস্যার সম্মুখীন হইয়া কবি ভাবিতেছেন, সর্বসাধারণের শিক্ষাদানের যথোপযুক্ত পরিবেশ এই শ্রেণীর বিদ্যালয়েই সম্ভব। ইংরেজি স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় বিশিষ্টদের জন্য। কবির মন ক্রমশই বিশেষ হইতে সাধারণের মধ্যে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণের পর এই-সব ভাবনা আরও স্পষ্ট হয়। কিন্তু কোনো ভাবনাই দীর্ঘকাল তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না, এ ভাবনারাজিকেও অতিক্রম করিয়া তিনি চলিয়া যান।

যাহা হউক, এই পরীক্ষা-পাস-নিরপেক্ষ তথাকথিত সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানের জন্য ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠে 'শিক্ষাসত্র' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে এই শিক্ষাসত্রের আদর্শ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কবি ভালো করিয়া জানিতেন যে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যহীনতাজাত দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা, মনের অসাড়তা। ইহারই সহিত দারিদ্র্য ও অশিক্ষা জড়াইয়া আছে ; কবির মতে সকলগুলিকে যুগপৎ আক্রমণে নির্মূল না করিলে গ্রামকে ধ্বংস হইতে বাঁচানো যাইবে না। তাই গ্রামের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-কল্পনা লইয়া শ্রীনিকেতনের কর্মীরা গ্রামোদ্যোগ-কর্মে ব্রতী হন। কিন্তু পথ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা তখনো কাহারও ছিল না। শিক্ষাসত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এল্‌ম্‌হার্স্ট তাঁহার

১ *The Visva-Bharati Quarterly*, Vol II, July 1924. দ্রষ্টব্য *Visva-Bharati Bulletin* No. 9।

প্রবন্ধের একস্থানে লিখিতেছেন— "The aim of the Siksa-Satra is . . to provide the utmost liberty within surroundings that are filled with creative possibilities, with opportunities for the joy of play that is work,—the work of exploration, and of work that is play,— the reaching of a succession of novel experiences ; to give the child that freedom of growth which the young tree demands for its tender shoot, that field for self-expression in which all young life finds both training and happiness" (p 24)। এই উক্তি জন্ ডিউইর বাণী, রবীন্দ্রনাথেরই বাণী।

আমাদের মতে বুনিয়াদি শিক্ষার ইহাই সর্বপ্রথম খসড়া। ইহার মূল কথা "প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্প ও গৃহশিল্পে শিক্ষানবীসরূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত উৎপাদক ও সম্ভাব্য স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জন এবং নিজের হাত দুটির স্বাধীনতা লাভ করিবে ; আবার, যে বাসগৃহ ও তাহার আসবাব প্রস্তুত করিতে ও তাহার ঘরকন্না চালাইতে সে সাহায্য করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপ ক্ষুদ্র পুরীর পৌরজনের অধিকার অর্জন করিবে।"[১]

ডক্টর প্রেমচাঁদ লাল[২] তাঁহার *Reconstruction and Education in Rural India* (Allen 1932) গ্রন্থে শিক্ষাসত্রের গোড়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন (পৃ ৯৪-১০৯)। তিনি বলিতেছেন, "Besides the Poet the two people who were most directly responsible for the starting of this experiment in rural education were Mr. L. K. Elmhirst, the first Director of the Institute, and Mr. Santosh Chandra Mazumder." (p 94)। সন্তোষচন্দ্রকে এই কাজ গ্রহণের ভার দেন কবি। কারণ সন্তোষচন্দ্র ছিলেন 'not only a born teacher, he had love for children'। শিশুদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম দরদ তাঁহাকে এই কাজের উপযুক্ত করিয়াছিল।

ছয়টি মাত্র বালক লইয়া সন্তোষচন্দ্র শিক্ষাসত্র আরম্ভ করেন। বালকদের রন্ধনাদি গৃহস্থালি হইতে বাগান করা, তাঁত বোনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করিতে হইত। পড়াশুনা হইতে হাতের কাজ, সুকুমার কলা চর্চা হইতে ঘরদুয়ারের কাজ, নৃত্যগীতাদি হইতে শরীরকে কর্মঠ করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত।

সন্তোষচন্দ্র দুই বৎসরের মধ্যে যে-কাজ করিয়া গিয়াছিলেন (জুলাই ১৯২৪ - সেপ্টেম্বর ১৯২৬) তাহা রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌ম্‌হার্স্টের যুক্ত পরিকল্পনার আদর্শেই সম্পাদিত হয়। নিষ্ঠার সহিত সন্তোষচন্দ্র কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ের যে বিস্তারিত প্রতিবেদন (ইংরেজি) লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বুনিয়াদি-শিক্ষা-রত শিক্ষকদের কাজে লাগিবে, কারণ ভারতীয় সমাজের সমস্যা সর্বত্রই প্রায় সমান।

সন্তোষচন্দ্র শিক্ষাসত্রে দুই বৎসর পরীক্ষার পর লিখিয়াছিলেন, ছাত্রদের প্রাণশক্তি উজ্জীবিত করাই ছিল আমাদের প্রথম কাজ : "Physical vitality was our first concern. The gain of the boys in height, weight and strength has been very remarkable . . The boys have made considerable progress in gardening, weaving and construction; they cut and sew, and make their own garments,

১ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ ২১২।

২ প্রেমচাঁদ লাল ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনে যোগদান করেন। ১৯২৯-এ বিদেশে যান এবং ১৯৩২-এর অক্টোবর মাসে ডক্টরেট লইয়া ফিরিয়া আসেন। জুলাই ১৯৩৬ তিনি শ্রীনিকেতন ত্যাগ করেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর তাঁহার সহিত বিশ্বভারতীর যোগ ছিল।

their own tables and boxes, can cook well, as well as paint, write a neat hand in Bengali, recite poems, know addition, subtraction, multiplication and division, not mechanically but in relation to life situations. They have begun to feel in their own little way that the individual's effort is not purely individual but invariably has social reactions. They are realising the value of mutual aid and have acquired the social habits of kindliness and brotherliness.[১]

কবির আদর্শ ছিল, শিক্ষাসত্রে ছাত্ররা যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা পাইবে, তাহার দ্বারা তাহারা যে কেবল আপনাদের জীবিকা অর্জন করিবে তাহা নহে, তাহারা গ্রামে গিয়া গ্রামের উন্নতি করিতে পারিবে, তাহারা হইবে Village Leaders.[২]

১৯২৬ অক্টোবরে সন্তোষচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর পর শিক্ষাসত্রের ভার অর্পিত হয় আরিয়ামের উপর। আরিয়াম তখন শিশুবিভাগের অধ্যক্ষ। অতঃপর ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। শান্তিনিকেতন হইতে উহা কেন সরাইয়া লওয়া হইল— তাহা ভাবিবার বিষয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধনী বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে; তাহারা সকলেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, উদ্দেশ্য ম্যাট্রিকুলেশন পাস করা। তাহাদের পক্ষে রন্ধন করা, জল তোলা, বাগান করা, হাটবাজার করা সম্ভব নহে। শিক্ষাসত্রের ছাত্ররা দরিদ্র-ঘরের ছেলে— পরীক্ষা পাস করার কথা তাহাদের মনে আসে না। " 'Living by doing' had been more of a theory at Santiniketan; it was going to be an actuality with those children."[৩]

শ্রীনিকেতনে প্রেমচাঁদ লাল এই নূতন প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিলেন। নূতন পরিবেশে শিক্ষাসত্রে নূতন জীবন দেখা দিল। সৎপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জনের শিক্ষা লাভ করিতে হইলে হস্তশিল্প আয়ত্ত করার প্রয়োজন। সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি শুরু হইতেই দেওয়া হইল। ১৯২৭ সালের বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদনে আছে— "While great stress is laid upon manual work by which they *learn to earn an honest livelihood*; in fact, the children take as much interest in reading writing etc., as in other activities. Great care is taken to present everything before them in the form of concrete projects."

বয়নশিক্ষা, সবজি উৎপাদনের জন্য বাগান করা প্রভৃতি নানা প্রকার হাতের কাজের সঙ্গে পড়াশুনা চলিত। বাগান করার মধ্য দিয়া উদ্ভিদতত্ত্ব ও রসায়নশাস্ত্রের আলোচনা চলে। ছাত্রদের নিজের কাজ নিজেদের করিতে হয়; এমন-কি পালাক্রমে রন্ধনাদির কাজও। বাগানের জন্য জল তোলা প্রভৃতি পরিশ্রমের কাজ বাদ যায় না। মোটকথা সাধারণ ঘরের সাধারণ ছেলেকে সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী করিবার জন্য প্রথম হইতেই প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। আপনাদের ব্যয়ের কতখানি উঠাইতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টিও দেওয়া হয়; তবে সম্পূর্ণরূপে অর্থ উপার্জন দ্বারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পরিকল্পনা কোনো সময়ে ছিল না। বিদ্যালয়কে সকল প্রকার আর্থিক-সহায়-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান করা যে দুঃসাধ্য, দীর্ঘকাল বিদ্যায়তন চালাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার অসম্ভাব্যতা ভালো করিয়া জানিতেন ও সেজন্য শিক্ষাসত্রে সে চেষ্টা কখনো করেন নাই।

১ **Manuscript (typed) copy হইতে উদ্‌ধৃত।**

২ **'Our educational work at Sriniketan', Krishnaprasanna Mukherji, M.A. PH.D. *Visva-Bharati News*, February 1938, pp 60-62।**

৩ ***Reconstruction and Education in Rural India* by Dr. P. C. Lal. Allen, 1932, p 95।**

'শিক্ষাসত্র' প্রবন্ধ হইতে নিয়ে যে কয়টি পংক্তি উদ্‌ধৃত হইতেছে, তাহা গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শের সহিত বিশেষভাবে তুলনীয়। "It is only through the fullest development of all his capacities that man is likely to achieve his real freedom"— মানুষের সকল বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হইলে সে তাহার যথার্থ স্বাধীনতা পায়। সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইলেই জীবনযাত্রার সমস্যাজনিত উদ্বেগ থাকিবে না। "He must be so equipped as no longer to be anxious about his own self-preservation." গান্ধীজি বলিয়াছিলেন তাঁহার শিক্ষা 'insurance against unemployment'— উভয় আদর্শের মধ্যে পার্থক্য কমই।[১]

রবীন্দ্রনাথের ও এল্‌ম্‌হার্স্টের প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলে পাঠক দেখিবেন, দশ বৎসর পর মহাত্মাজি যে বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলেন তাহার অনেকখানিই শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে আরম্ভ হইয়াছিল। সমসাময়িক মাসিকপত্রে[২] ওয়ার্ধা শিক্ষাপ্রণালী বা বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন— "এই প্রণালীটির দুটি দিক আছে। একটি শিক্ষাতত্ত্বের, অন্যটি অর্থনীতির দিক। শিক্ষাতত্ত্বের সহিত যে দিকটির সম্বন্ধ তাহা মূলতঃ ও সারতঃ ষোলো বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত [এক্ষণে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত] 'শিক্ষাসত্র' নামক বিদ্যালয়ে অনুসৃত প্রণালীর মতো। . . যাঁহারা ওয়ার্ধা প্রণালীর আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের 'শিক্ষাসত্রে'র প্রণালীটিও দেখা উচিত।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মধ্যে মানুষের জীবনকে তাহার জীবিকার চেয়ে বড়ো করিয়া দেখা হয় নাই। তাই বলিয়া জীবিকার সমস্যাকেও শিক্ষাদর্শ থেকে বাদ দিয়া কোনো তুরীয় আদর্শবাদের দোহাই তিনি পাড়েন নাই। জীবনের আনন্দ, স্বজনপ্রীতি, ক্রীড়াকৌতুক, এমন-কি অপব্যয়কেও তিনি শিক্ষা হইতে নির্বাসিত করেন নাই। নীতি ব্যতীত জীবন আদর্শে পৌঁছাইতে পারে না, যদি পৌঁছানো বলিয়া কোনো কিছু থাকে ; কিন্তু নীতির থেকে বড়ো কথা ধর্ম ; রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম'কেই মানিয়াছিলেন। তাই তাঁহার শিক্ষাদর্শে জীবনের শাশ্বত ধর্ম এত বড়ো স্থান পাইয়াছে। বিচিত্র মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিবিধভাবে রূপায়িত হইবার সুযোগ দানই শিক্ষার উদ্দেশ্য ; বিশেষ-মতকেন্দ্রিক সাফল্যে উত্তীর্ণ হইবার আদর্শ শিক্ষিত ও শিক্ষকের পক্ষে গৌরবের নহে।

গান্ধীজি জীবনকে পবিত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন ; তবে দেশের পরিস্থিতিতে জীবন হইতে জীবিকার উপর অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। কোটি কোটি নিরক্ষর শিশুর শিক্ষাসমস্যা অচিরকালের মধ্যে তাহাদের জীবনে দেখা দিবে জীবিকার সমস্যারূপে। কিভাবে সেই সমস্যার আশু প্রতিকার করা যায়, তাহাই ছিল মহাত্মাজির শিক্ষা-জিজ্ঞাসা।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে জীবিকা হইতে জীবন, গান্ধীজির আদর্শে জীবন হইতে জীবিকা, প্রাধান্য পাইয়াছিল। দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য হয়তো দুরপনেয় নহে। ভবিষ্যতের শিক্ষাবিধি এই দুই ধারার যুক্তবন্ধনে নূতনরূপে দেখা দিতে পারে।

হিন্দীভবন

নবশিক্ষাসংঘের সদস্যগণ ও লর্ড লোথিয়ান প্রভৃতি অতিথিরা জানুয়ারি মাসের (১৯৩৮) গোড়াতেই চলিয়া গিয়াছেন। কবির বিচিত্র কাজ চলিতেছে যথাপূর্ব ; শরীরে ভাঙন ধরিয়াছে— তবুও মনের জোরে সব কিছু করিতে

১ শান্তিদেব ঘোষ -লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র ও মহাত্মাজির বুনিয়াদি শিক্ষা' প্রবন্ধ হইতে অনেক সহায়তা পাইয়াছি। দেশ পত্রিকা, ২৩ বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ ৩০-৩৫।

২ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৪, পৃ ১৬৬।

চান। জানুয়ারির মাঝামাঝি (১৩ই) সময়ে শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবনের ভিত্তিস্থাপন-অনুষ্ঠান ; কবি সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এনড্রুজ সাহেব তাঁহার স্থলে পৌরোহিত্য করিলেন। সভায় এনড্রুজ বলিলেন, "If our Gurudeva's health had been such as to enable him to perform such a duty, the place I now occupy would then have been filled by him."[১]

এই ভাষণে এনড্রুজ ভারতের ধনীদের নিকট একটি বিশেষ আবেদন করেন। তিনি বলেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন পারসিক, সংস্কৃত, ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় অধ্যাপনার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে (Chair), বিশ্বভারতীতে হিন্দির জন্য তদ্রূপ 'চেয়ার' হওয়া বাঞ্ছনীয়। "May there not be some generous hearted giver . . who can realise the necessity for a Chair of Hindi literature at Santiniketan." এনড্রুজের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বৎসর পর পণ্ডিত জবহরলাল নেহেরুর আবেদন প্রকাশিত হইলে বল্লভদাস আগরবাল হিন্দী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির জন্য অর্থ দান করিলেন (১৯৫৩)।

হিন্দীভবনের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বলিবার পূর্বে, শান্তিনিকেতনে দীর্ঘ-কাল ধরিয়া যে হিন্দীর চর্চা হইতেছে, তাহার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। রাজনৈতিক কারণ হেতু আজ ভারতে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে আবশ্যিক করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে ; কিন্তু এই-সব আন্দোলনের বহু বৎসর পূর্বে সাংস্কৃতিক দিক হইতে হিন্দীচর্চার যে সবিশেষ প্রয়োজন আছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছিলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষিতিমোহন সেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপকরূপে আসিয়াছিলেন।[২] ক্ষিতিমোহন কাশীতে মানুষ। সেখানকার সংস্কৃত কলেজের এম.এ. পাস। কিন্তু অল্প বয়স হইতে উত্তর-ভারতের সাধু ও সন্তদের বাণী সংগ্রহ ও সাধনতত্ত্ব বুঝিবার আগ্রহে তিনি বহু তীর্থস্থান ও সাধুদের আখড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান। শান্তিনিকেতনে আসিলে অল্পকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই বিদ্যার সন্ধান পান। এতদ্‌সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন লিখিতেছেন, "তখন তিনি [রবীন্দ্রনাথ] ক্রমাগত আমাকে এই-সব বিষয়ে লিখিবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন। . . রবীন্দ্রনাথের কাছে অশেষ উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছি। . . তিনি বিশ্বভারতীতে এই কাজের অবসরও রচনা করিয়া দিয়াছেন। [মধ্য] যুগের সাধকদের গম্ভীর বাণীর রসসম্ভোগে রসানুভব-নিপুণ তাঁহার যে সশ্রদ্ধ প্রতিভা দেখিয়াছি এমন আর কাহারও দেখি নাই।"[৩]

ভারতীয় সন্তদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "ভারতের এই আন্তরিক সাধনার ধারাবাহিক রূপ যদি আমরা স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেতুম তা হলে ভারতের প্রাণবান্ ইতিহাস যে কোন্‌খানে তা আমাদের গোচর হতে পারত। . . সুহৃদ্বর ক্ষিতিমোহন তাঁহার 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ কালের সেই চিত্তপ্রবাহের পথটিকে তার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রশাখায় অনুসরণ ক'রে এসেছেন।"[৪]

শান্তিনিকেতনে আসিবার কয়েক বৎসরের মধ্যে কবির আগ্রহে ক্ষিতিমোহন কবীরের দোহা প্রভৃতির মূল ও

১ C. F. Andrews, 'The Hindi-Bhavana at Santiniketan', *The Modern Review*, February 1938, pp. 127-29. এতদ্‌সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'The Bhavanas of Visva-Bharati' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেন যে প্রত্যেক অবাঙালি বিদ্যার্থীর পক্ষে বাংলা শিক্ষা আবশ্যিক হওয়া উচিত (পৃ ২২৯)।

২ দ্র বিশ্বভারতীর প্রথম কুল-স্থবির, যুগান্তর, ৮ জুন ১৯৫২। দ্র সুশীল রায়, মনীষীজীবনকথা, ১ম খণ্ড।

৩ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, পৌষপূর্ণিমা ১৩৩৬।

৪ ১২ পৌষ ১৩৩৬, শান্তিনিকেতন ; ভূমিকা, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের 'অধর মুখার্জি' লেকচর ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক প্রদত্ত হয়), ১৯৩০।

বঙ্গানুবাদ চারি খণ্ডে প্রকাশ করেন (ইণ্ডিয়ান প্রেস)। এই গ্রন্থ হইতে একশতটি দোহা *One Hundred Poems of Kabir* নামে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত হয় ; ইংরেজি হইতে য়ুরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই এই গ্রন্থের তর্জমা হইয়া যায়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

বাংলায় হিন্দীসাহিত্য-সম্পদ সরবরাহের কাজে আধুনিক যুগে ক্ষিতিমোহন পথিকৃৎ। তাঁহার যৌবনের এই প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সমালোচনার উর্ধ্বে হয় নাই সত্য, কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে বাঙালি পাঠক গভীর শ্রদ্ধার সহিত এই তর্জমা পাঠ করিয়াছে। তদবধি ক্ষিতিমোহন মধ্যযুগীয় সন্তদের সম্বন্ধে অসংখ্য প্রবন্ধ ও 'দাদূ' নামে বিরাট গ্রন্থ বাংলায় লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'দাদূ'র ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আরও কোনো কোনো সাধককবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হল। আজ আমার সন্দেহ নেই যে, হিন্দী ভাষায় একদা যে গীত-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার গলায় অমর সভার বরমাল্য। অনাদরের আড়ালে আজ তার অনেকটা আচ্ছন্ন; উদ্ধার করা চাই, আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দী ভাষা জানে না তারাও যেন এই চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার-গৌরব ভোগ করতে পারে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকটি রচনাতেই ক্ষিতিমোহনের নিকট তাঁহার ঋণ[১] স্বীকার করিয়াছেন। উত্তরাপথের সন্তদের[২] কথা ও বাংলাদেশের বাউল প্রভৃতি ব্রাত্যদের বাণীর সন্ধান তিনি পান ক্ষিতিমোহনের নিকট হইতে। কবির দাদূ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার তেরো বৎসর পর শান্তিনিকেতনে হিন্দীভাষা ও সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবন স্থাপনের প্রথম প্রয়াস হয় ১৯৩৪-৩৫ সালে ; পণ্ডিত বানারসী দাস চতুর্বেদী[৩] ও সীতারাম সাকসেরিয়া এ বিষয়ে উদ্যোক্তা হন। সীতারামজি কবিকে এই কার্য আরম্ভের জন্য ৫০০ টাকা দেন ও সেই হইতে দীনবন্ধু এনড্রুজও হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহে মন দিলেন ; কিন্তু প্রথম দিকে অর্থসংগ্রহ-ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য লাভ হয় নাই। অতঃপর তাঁহার চেষ্টায় রামদেব চোখানী প্রমুখ মারোয়াড়বাসীরা জোড়াসাঁকোয় কবির

১ পরশুরাম চতুর্বেদী হিন্দীর নামকরা লেখক ; তিনিও তাঁহার 'উত্তরী ভারত কী সংত-সম্প্রদায়' গ্রন্থে দাদূ-পংথ আলোচনাকালে ক্ষিতিমোহনের গ্রন্থের উল্লেখ বহুবার করিয়াছেন (পৃ ৪১১)। বহু সম্মেলনে ক্ষিতিমোহন সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা-প্রচার-সমিতি, ওয়ার্ধা হইতে ১৯৫১ সালে 'মহাত্মা গান্ধী' পুরস্কার লাভ করেন। মুরারকা পারিতোষিক— হিন্দীসাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ, জুলাই ১৯৫৩।

২ *Toward the Rising Sun* by William Gayley Simpson, with a biographical sketch by Jerome Davies ; The Vanguard Press. New York, 1935. [Bill Simpson] "had a long talk with the poet Tagore, and for four days at the feet of Kshiti Mohan Sen, one of those great souls who sometimes hide themselves in a mantle of obscurity, who opened to him the treasure of Kabir and the songs of the other Sufi-like mystics who succeeded him, as probably no one else in the world could have done. Contact with this man, whose spirit is all light, helped to precipitate in Bill a spiritual crisis the exaltation of which brought him to a heightened and deepened realization of that which, more than her rivers or mountains, more than her temples or greatmen, India is— the realization that every man's Guru is within himself . . And this, accordingly, after taking four days to make sure, he finally did, his soul singing the while, 'Thy Guru is within thee,' and his spirit dancing in joy to the music of it. And in making this decision he always has felt that he did right." (pp 22-23)

৩ বানারসী দাস শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল ছিলেন। প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যা আলোচনায় ইনি এনড্রুজের সহায়তা করিতেন। 'ভারতীয় হৃদয়' নাম লইয়া তিনি প্রবাসী ভারতবাসীদের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ হিন্দীতে লিখিয়াছিলেন। মিস্ মার্জোরি সাইকস্ এনড্রুজের যে জীবনী ইংরেজিতে লিখিয়াছেন তাহাও ইঁহার সহায়তায়।

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন। আপনাদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা বিশ্বভারতীকে অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বিশ্বেশ্বরলাল মতিলাল হলবাসিয়া ট্রাস্টের রিসিভার ভাগীরথ কানোড়িয়া উক্ত ট্রাস্ট হইতে ১৬,০০০ টাকা দিবার ব্যবস্থা করায় 'হিন্দীভবনে'র গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হইল।

বিশ্বেশ্বরলাল হলবাসিয়া ও তাঁহার ভ্রাতা মতিলাল হলবাসিয়া সুদূর পঞ্জাবের হিসার জিলা হইতে বাংলাদেশে আসেন ও আপনাদের প্রতিভাবলে কারবার করিয়া বিরাট ধনের অধীশ্বর হন। কিন্তু সে ধন তাঁহারা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বা পরিবারগত ব্যবহারে নিঃশেষিত করেন নাই, সৎকর্মের জন্য বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া গেলেন। কনিষ্ঠ মতিলালের মৃত্যু পূর্বেই হয়; ১৯২৫ সালে উইল করিবার পর বিশ্বেশ্বরলালেরও মৃত্যু হয়। তাহার পর দীর্ঘকাল সম্পত্তি লইয়া পোষ্যপুত্রদের সহিত ট্রাস্টিদের মামলা চলে। ১৯৩৪ সালে ভাগীরথ কানোড়িয়া ইহার রিসিভার নিযুক্ত হইলে তাঁহার মধ্যস্থতায় হলবাসিয়া ট্রাস্টের টাকা বিশ্বভারতী পাইয়াছিল— কেবল গৃহনির্মাণের জন্য নহে, এই ভবনের বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের অর্থ বহু বৎসর ঐ তহবিল হইতে আসে।[১]

হলবাসিয়া ট্রাস্ট ছাড়া বহু মারওয়াড়ী ধনিক বিশ্বভারতী হিন্দীভবনের জন্য অর্থদান করিয়াছিলেন। এই অর্থসংগ্রহ-ব্যাপারে এনড্রুজের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন শান্তিনিকেতনের হিন্দীসাহিত্যের অধ্যাপক হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী। প্রত্যক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বদিক হইতে গড়িয়া তুলিবার কৃতিত্ব তাঁহারই।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে হাজারিপ্রসাদ শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে সংস্কৃত ও হিন্দী শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হন। কাশী হইতে আশা দেবী সুপারিশ করিয়া ইঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হাজারিপ্রসাদ সংস্কৃতশাস্ত্রাদি ও বিশেষভাবে জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিয়া আই.এ. পাশ করেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শ ও বিশ্বভারতীর অনুকূল পরিবেশ তাঁহার সুপ্ত প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করিয়াও তিনি বহু গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; হিন্দীসমাজে আজ তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত; রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ ও গল্পের তিনি হিন্দী-অনুবাদক।[২]

কাব্যসঞ্চয়ন ও গীতবিতান

রবীন্দ্রনাথ হিন্দীভবন-প্রতিষ্ঠা সভায় আসিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ঘরে বসিয়া অনেকগুলি ফরমাশী কাজ করিতেছেন। হিন্দীভবন-প্রতিষ্ঠার দিনে (২ মাঘ ১৩৪৪) তাঁহাকে একটি কবিতা লিখিতে দেখি; সেইটি সম্পূর্ণ সামাজিক-কর্তব্য হিসাবে লিখিত বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মৃত্যু হইয়াছে; হেরম্বচন্দ্র ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম, রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার তেমন কোনো ঘনিষ্ঠতা

১ Rai Bahadur Bissessurlal Motilal Halwasiya Trust : Report and Accounts for the two years ended 31st March 1949 & 1950 and also for the year ended 31st March 1951 ; published 1953. হিন্দীভবন সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ীর নিকট হইতে পাই।

২ হিন্দীভাষা ও সাহিত্যে হাজারিপ্রসাদের পাণ্ডিত্যের জন্য লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫০ সালে তাঁহাকে সম্মানার্হ 'ডক্টর' উপাধি দান করেন। অতঃপর ১৯৫১ সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে হিন্দী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত করিলে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া যান। ১৯৬০ হইতে তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে (চণ্ডীগড়) হিন্দীর অধ্যাপক। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার 'বাণভট্টের আত্মচরিত' সাহিত্য অকাদেমি হইতে বাংলায় অনূদিত হইয়াছে।

ছিল না, মতানৈক্য ছিল বহু বিষয়ে। তাঁহার কন্যা রানী দেবী (নির্মলকুমারী মহলানবিশ) প্রশান্তচন্দ্রের স্ত্রী কবির বিশেষ স্নেহের পাত্রী; তাঁহারই সান্ত্বনার জন্য এইটি লিখিত হয় (১৮ জানুয়ারি ১৯৩৮)। ইতিপূর্বে হেরম্বচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পর (২৩ ডিসেম্বর ১৯২৬) রবীন্দ্রনাথ জীবনীলেখকের মারফতে একখানি পত্র লিখিয়া অধ্যাপককে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।[১] সেই পত্র অধ্যাপককে গভীর সান্ত্বনা দেয়। এই শ্রেণীর সামাজিক কর্তব্যপালনে রবীন্দ্রনাথের কোনোদিন শৈথিল্য দেখা যায় নাই।

আমাদের আলোচ্যপর্বে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় (২ মাঘ ১৩৪৪)। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৬২ বৎসর; দেশবাসী এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া চারিটি পঙ্‌ক্তিতে তাঁহার বেদনা প্রকাশ করিলেন—

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি',
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'।[২]

সামাজিক শিষ্টতা ও কর্তব্যপালনের জন্য যাহাই করুন না কেন, আসলে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস আছে অন্য লোকে। "আজ আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের জন্যে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড়। সেই মাতালটা বড়ো হাটের জন্যে ফসল-ফলানো কেয়ার করে না। কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি। খ্যাতির দিক থেকে এর দাম নেই বললেই হয়। . . অথচ দিনরাত্রি এত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মন যে, সমস্ত সামাজিক কর্তব্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ আছি আমি অজন্তা-গুহায়— তার বাইরের সংসারটা সম্পূর্ণ মুলতবি বিভাগে রয়ে গেছে।" পত্রখানি কবি লেখেন অমিয় চক্রবর্তীকে।[৩]

মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বোধ হয় নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার প্রথম খসড়া শেষ হয়। তার পর আরম্ভ হয় অভিনয়ের জন্য মহড়া, তখন রদবদল চলে নানা ভাবে। সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা পরে করিব।

আমাদের এই আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে একখানি বাংলা কাব্যসঞ্চয়ন সম্পাদিত ও তাঁহার নিজ গীতবিতানের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' সম্পাদন করিতে গিয়া কবিকে এইবার বহু কাব্য ও 'অনেক ইংরেজি কাব্যসংকলন' পড়িতে হইতেছে। কাব্যসঞ্চয়ন-সম্পাদনে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন কানন-বিহারী মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতনে ১৯৩৭ - জুলাই ১৯৩৮)। কাননবিহারী যে-সব কাব্য কবির গোচর করিতেন তাহা হইতেই প্রধানত বাছাই চলিত। কবি আজকাল বাংলাসাহিত্যের বিরাট গতির সর্বধারার সহিত সম্যক্‌ পরিচিত নহেন— বয়সের জন্যও বটে, সময়ের অভাবেও বটে। সেইজন্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে (শ্রাবণ ১৩৪৫) সমাদৃত হয় নাই। কবি 'নিবেদনে' নিজেই বলিয়াছিলেন, "অনেক কবিতা চোখে পড়ে নি। অনেক নির্বাচন যোগ্যতর হতে পারত। যে সংকলনে রচয়িতারা স্বয়ং তৃপ্ত হন নি তাঁদের নির্দেশ পালন করলে হয়তো তা সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা থাকত।" কাব্যসংকলন হিসাবে গ্রন্থখানি সন্তোষজনক না হইলেও বাংলাসাহিত্য সম্পদ্‌বান হইল ইহার

১ এই কন্যার সহিত স্যর নীলরতন সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকারের বিবাহ হয়। জ্যোতিঃপ্রকাশ বিশিষ্ট রবীন্দ্রভক্ত ও বিশ্বভারতীর সুহৃৎ। ইনি বসুবিজ্ঞানমন্দিরের সহিত যুক্ত। দ্র কবিকথা, পৃ ১২৬-২৮। মৃত্যু ১৯৬১।

২ শরৎপরিচয়, পৃ ৬৬। অবিস্মরণীয়, দেশ পত্রিকা, ২ পৌষ ১৩৬১।

৩ ২১ জানুয়ারি ১৯৩৮ [৭ মাঘ ১৩৪৪]; প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৪। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ ৪২৯।

ভূমিকা হইতে ; প্রত্যেক সাহিত্যিকের এইটি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া মনে করি। দীর্ঘ ভূমিকা হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত হইল— "যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহ একটা কথা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এ-সব জিনিস ন্যাশন্যাল নয়। তার মানে যদি এই হয় যে এ-সব কাব্য স্বভাবতই বাঙালি জাতির রুচিবিরুদ্ধ, তা হলে তো এ জমিতে স্বতই উঠত না এর অঙ্কুর, উঠলেও শিকড়-সুদ্ধ দুদিনে যেত শুকিয়ে। বলা বাহুল্য, তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।.. ন্যাশনাল কুলশীলের দোহাই দিয়ে সেকালের পাঁচালি কবিতার যতই গুণকীর্তন করি না কেন কোনো দেশাত্মবোধী সব ছাড়িয়ে বিশেষভাবে এই পাঁচালিই ন্যাশনাল বিদ্যালয়ে চালাবার হুকুম করেন না। নদীর স্রোত আপনার পথ আপনিই কেটে নেয়, রাজকীয় বিভাগের খাল-কাটা পথ তার পথ নয়। আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে নিচ্ছে।" ..

ইহার সঙ্গে চলিতেছে গীতবিতানের নূতন সংস্করণ প্রকাশনের কাজ। কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলনকর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি ; তাতে যে কেবল ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলো সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহ-যোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।" এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ও সম্পাদনকর্মের অন্যতম সহায়ক শ্রীসুধীরচন্দ্র কর তাঁহার 'কবিকথা' গ্রন্থে লিখিতেছেন, "গানগুলোর বিষয় ভাগ করা এবং বিষয়ানুসারে অনুবিভাগ করা নিয়ে বারবার দু-হাজার গানের খুঁটিনাটি বিচার করে কত রকম ঢালাই-সাজাই করে দেখা,— এতে যে কী পরিশ্রম! দিনের পর দিন সকালবেলায় বাঁধা সময় করে সব ঝক্কিটা একরকম তিনি নিজেই পুইয়ে গেলেন।" কবি এক পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "অন্য সকল বইয়ের মধ্যে 'গীতবিতানে'র দিকেই আমার মনটা সবচেয়ে বেশি তাড়া লাগাচ্ছে— নতুন ধারায় ও একটা নতুন সৃষ্টিরূপেই প্রকাশ পাবে।"[১]

কবি কিভাবে তাঁহার দেড় হাজার গান বিষয়ানুক্রমিক সাজাইয়াছিলেন তাহা গীতবিতান হইতে নিম্নে উদ্‌ধৃত করিতেছি। পূজা, পরিণয়, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক এইগুলি হইতেছে প্রথম বিভাগ। ইহার প্রত্যেকটি পুনরায় বিভক্ত হইয়াছে।[২]

গীতবিতানের এই নূতন সংস্করণ দুই খণ্ডে মুদ্রিত হইলে কবিকে মুদ্রিত গ্রন্থ একখণ্ড দেওয়া হয় ; কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের মাঘ মাসে, অর্থাৎ কবির মৃত্যুর ছয় মাস পরে।[৩]

১ কালিম্পং, ২৩ বৈশাখ ১৩৪৫। সুধীরচন্দ্র কর, কবিকথা, পৃ ৫৫।

২ পূজা [৬১৭]— গান (৩২), বন্ধু (৫৯), প্রার্থনা (৩৬), বিরহ (৪৭), সাধনা ও সংকল্প (১৭), দুঃখ (৪৯), আশ্বাস (১২), অন্তর্মুখে (৬), আত্মবোধন (৫), জাগরণ (২৬), নিঃসংশয় (১০), সাধক (২), উৎসব (৭), আনন্দ (২৫), বিশ্ব (৩৯), বিবিধ (১৪৩), সুন্দর (৩০), বাউল (১৩), পথ (২৫), শেষ (৩৪)। পরিণয় [৯] ; স্বদেশ [৪৬] ; প্রেম [৩৯৫]— গান (২৭), প্রেম-বৈচিত্র্য (৩৬৮) ; প্রকৃতি [২৮৩]— সাধারণ (৯), গ্রীষ্ম (১৬), বর্ষা (১১৫), শরৎ (৩০), হেমন্ত (৫), শীত (১২), বসন্ত (৯৬) ; বিচিত্র [১৩৮] ; আনুষ্ঠানিক [৯] ; পরিশিষ্ট [২]— মোট ১৫০০ গান কবি-কর্তৃক নির্বাচিত হয়।

৩ বর্তমানের চলিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ আরম্ভ হয় পৌষ ১৩৫২ হইতে। এই সংস্করণ সম্পাদন করেন বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের কর্মী শ্রীকানাই সামন্ত। উহা ৩ খণ্ডে বাহির হয়। ১ম খণ্ড, পৌষ ১৩৫২ ; ২য় খণ্ড, আশ্বিন ১৩৫৪ ; ৩য় খণ্ড, আশ্বিন ১৩৫৭। অখণ্ড সূচী, ফাল্গুন ১৩৫৭। গীতবিতান ১ম সংস্করণ ১ম ও ২য় ভাগ আশ্বিন ১৩৩৮ ও ৩য় খণ্ড শ্রাবণ ১৩৩৯-এ প্রকাশিত হয়। ১ম সংস্করণে গানের সংখ্যা ১ম ও ২য়— ১১২৮ ; ৩য়— ৩৫৭, মোট ১৪৮৫। পরে নূতন গীতবিতানে কবির যাবতীয় গান সংগৃহীত হইলে (নৃত্যনাট্যাদি সমেত) উহার সংখ্যা হয় দুই হাজারের উপর। সূচীতে অনেক গান একাধিকবার আছে— প্রথম শব্দের পাঠভেদ-হেতু।

কবি শান্তিনিকেতনে থাকিলে অতিথি অভ্যাগত প্রায়ই আসেন। এবার আসিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের গভর্নর লর্ড ব্রাবোর্ন ও তাঁহার পত্নী (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮)। এবার লাটসাহেবের আশ্রমপরিক্রমার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। তিনি সস্ত্রীক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করিলেন, পুলিস পাহারা থাকিলেও তাহা এমন প্রচ্ছন্ন ছিল যে কাহাকেও তাহা পীড়া দেয় নাই। ব্রাবোর্নের সৌজন্য সকলকে মুগ্ধ করে। অপরাহ্ণে তাঁহারা কবির সহিত চা-পান করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যান। সেদিন সকলেরই মনে আন্ডারসনের আশ্রম-পরিদর্শনের কথা মনে হইয়াছিল। এখন নূতন ভারতশাসনবিধি অনুসারে প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইয়াছে, প্রদেশের শাসনভার মন্ত্রীমণ্ডলের উপর। গভর্নররা এখন constitutional head— শাসনদায়িত্ব মন্ত্রীমণ্ডলের।

দেশেবিদেশে শত্রুমিত্র সকলেরই ঔৎসুক্য ভারতে এই নূতন শাসনবিধি কিভাবে চলিতেছে তাহা জানিবার। এই সময়ে কবির ইংরেজ বন্ধুরা এতদ্‌সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কবি ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের সম্পাদককে এই বিষয় একখানি পত্র লেখেন (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮)।[১] রবীন্দ্রনাথ পত্রের প্রথমেই বলিলেন, নিরস্ত্র জাতির পক্ষে আত্মকর্তৃত্ব বা autonomy নিরর্থক। ইংরেজের দূতরা ভারতের স্বাধীনতা দিবার পূর্বে দরকষাকষির সময়েও 'মিলিটারি' ও বৈদেশিক নীতির দপ্তর ভারতীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজি হন নাই। ১৯৩৫ সালের নূতন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ -কালে এই মনোভাব ছিল আরও স্পষ্ট। কবি লিখিতেছেন, ভারতকে যে-স্বরাজ দেওয়া হইয়াছে তজ্জাতীয় স্বাধীনতার ভ্যাঙ্‌চানি যদি কোনো কৃপণ দাতার নিকট হইতে বৃটিশকে নিজের দেশে বসিয়া পাইতে হইত, তবে "I am sure the British would despise themselves"। কবি নূতন শাসনবিধি সম্বন্ধে বলিলেন যে, এই আইন সম্বন্ধে মাথা ঘামানোই সময় নষ্ট মাত্র। ইহা ইংরেজ রাজনীতিক ও আমলাদের সৃষ্টি; সংকীর্ণ সতর্কতা ও কৃপণ অবিশ্বাসের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। সাম্রাজ্যলাভে ও সাম্রাজ্যলোভে ইংরেজের কী দশা হইয়াছে তাহা তিনি পত্রমধ্যে বিবৃত করেন। তিনি বলেন, যতদিন ইংরেজ ভারতকে তাহার মুষ্টির মধ্যে রাখিবে, ততদিন আমাদের শ্রদ্ধা বা বন্ধুত্বের আশা করা বৃথা। সাম্রাজ্যের অধিকারে মানুষ হীন হয়, আজ ইংরেজের সেই দশা।

কবির মত— "it is really not worth troubling about as it stands. It was made by politicians and bureaucrats. It therefore embodies all their narrow caution and miserly mistrust." আরও বলেন— "So long as you hold us in your grip, you can never have either our trust or our friendship . . Possession of empire always corrupts and it has corrupted you . . You have gained your imperial prestige at too heavy a price . . the burden of surfeited empire has dragged you down to that degree of weakness which makes you too timid to be ready adequately to deal with miscreants . ."

য়ুরোপের মহাযুদ্ধের তখনো কোনো কথা শোনা যায় নাই; রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে য়ুরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা ভবিষ্যৎবাণী—"If you ask my personal opinion, I hardly imagine that the catastrophe can now be avoided, since the only event in which all the powers of Europe are engaged with furious and frenzied zeal, seems to be that of paving the path for mutual annihilation."

১ *Manchester Guardian*, 10 March 1938, also *Visva-Bharati News*, April 1938, pp 75-76 [১ মার্চ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে তাঁহার অনুপস্থিতিতেই সম্মানার্থ D. Litt. উপাধি দান করেন]।

ভারতের ভবিষ্যৎ কী তৎসম্বন্ধে বলিলেন, "The future lies in our learning to ally ourselves with those humane forces in the world, wherever found, which are seeking to end altogether the exploitation of man by man, and of nation by nation." আমরা তাহাদের সঙ্গেই মিতালি করিব যাহারা শান্তিকামী, যাহারা মানুষের শোষণনীতির বিরোধী ও কোনো জাতির উপর কোনো জাতির আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধবাদী। পরভৃতিক মানুষ বা পরাশ্রয়ী জাতি পৃথিবীতে চিরদিন আধিপত্য করিতে পারিবে না, সে যুগের অবসানে মানবের নূতন সভ্যতা যে আসিতেছে সে বিষয়ে কবির মন আজ দ্বিধাশূন্য।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

১৩৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা' নাটিকা লেখেন; তখন সেটি অভিনয় হয় কলিকাতায়।[১] এবার সেই চণ্ডালিকাকে গানময় নৃত্যময় করিয়া নূতন রূপ দিলেন। স্থির হইয়াছে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে দোলপূর্ণিমার পর অভিনয় হইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া মহড়া চলিল; মূল আখ্যানের সঙ্গে এবারকার আখ্যানবস্তুর কিছু তফাত হইয়া গিয়াছে। প্রতিমা দেবীর মতে "নাটকীয় সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে এবং রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিকে উৎকর্ষ দেবার নিমিত্ত কবি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছেন।" অভিনয়ের সময় দীর্ঘ করিবার জন্য অবান্তর ঘটনা, বিবিধ নৃত্যকলা, পুরাতন গান সংযোজন করিতে হইল।

'চণ্ডালিকা'র দুইটি দিক— একটি তাহার সাহিত্যিক বা মনস্তাত্ত্বিক দিক, অপরটি আর্টের। কবি প্রথম যখন এইটি লেখেন তখন মনস্তত্ত্ব বা প্রকৃতি ও আনন্দের মানসিক সংগ্রাম ছিল রচনার মূলে। এখন সেই মনস্তত্ত্বমূলক কথোপকথনকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করিতে গিয়া অনেক কিছুই যোজনা করিতে হইল। দুইটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটকের গতি; আর 'একটি মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির উপর তার রচনা।'

সাহিত্যের দিক হইতে ইহার বিচার চলিবে অন্য পরিপ্রেক্ষণী হইতে। "মানুষের মধ্যে যা আদিম আকর্ষণ তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চণ্ডালিকার নৃত্যকলা। দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র যা শিবের তপস্যাকেও টলাতে পেরেছিল, প্রকৃতি-পুরুষের অন্তরের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব পৌঁছল চণ্ডালিকার প্রাণে। . .

"প্রথম দৃশ্যে চণ্ডালিকা সাধারণ মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের এবং পথের গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেখানে তার সখী আছে, মা আছে, কর্ম আছে, সেই পথের জীবনের মধ্যে একদিন তার প্রাণে এসে পৌঁছল কোন্ প্রেমের ডাক, প্রথম সাড়া দিয়ে উঠল তার দেহ, তার কামনা, তার পর অসীম ছন্দের মধ্যে দিয়ে টানা-হেঁড়ার অপরিমেয় অভিজ্ঞতার সাধনায় তার মন বিকশিত হল প্রেমের গভীর আনন্দে।

"মূল উপাখ্যানের মধ্যে যদিও আনন্দ স্বপ্রকাশ নয়, চণ্ডালিকার মুখের বাণী থেকেই তাঁর দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু নাটকীয় রসকে জমিয়ে তোলবার জন্যে এবং চণ্ডালিকার দুরূহ মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে দর্শকের চিত্তকে বিরাম দেবার জন্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের মনোজগতের দ্বন্দ্বকে ছায়ানৃত্যে দেখানো হয়েছে। চণ্ডালিকার মায়াদর্পণে সন্ন্যাসীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তারই ছায়া জেগে উঠল দর্শকের চোখে।

১ চণ্ডালিকা (নাটিকা), ভাদ্র ১৩৪০। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ কলিকাতা ম্যাডান থিয়েটারে কবি স্বয়ং পাঠ করেন। দ্র রবীন্দ্রজীবনী ৩ (১৩৬৮), পৃ ৪৮৬-৪৮৭।

"আনন্দের যে-দ্বন্দ্ব সে চণ্ডালিকার চেয়ে কিছু কম নয়। এক দিকে তার সুগভীর জ্ঞানের সাধনা, আর-এক দিকে তার দেহের কামনা— এই বস্তু-জগতের আকর্ষণ জ্ঞানীকেও টেনে আনলে মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু অবশেষে মানুষই জিতল। জীবধর্মের আদিমতাকে ছাপিয়ে উঠল তার আত্মার শক্তি। দিশাহারা উন্মাদনায় বাঁধা পড়ল না সে সংসারের মায়াজালে। . .

"এই-যে প্রকৃতি-পুরুষের স্বভাবের মধ্যে মূলগত বিরুদ্ধতা, চণ্ডালিকার সাহিত্য ও নৃত্যনাট্য সেই মানসিক জটিলতাকে, সুর ও তালের ছন্দে প্রকাশ করতে চেয়েছে।" [১]

চণ্ডালিকার মূল নাটিকা ছিল গদ্যে— নৃত্যনাট্যরূপে সবই হইল গান। এই গানের ভাষা গদ্যছন্দে কবিতার আকারে লেখা— কোনো কোনো স্থলে নিছক গদ্য— পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে ভাগ করা মাত্র। দুইখানি বইয়ের দুইটি অংশ নিয়ে তুলনার জন্য উদ্‌ধৃত হইল। 'চণ্ডালিকা'য় আছে[২]—

"সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন্ সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীতবসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। . . সমস্ত শ্রাবস্তীনগরে আর কি কোথাও জল ছিল না, মা? এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে? একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা।" এই অংশগুলিই 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায়'[৩] এইভাবে গানের মতো করিয়া লেখা—

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম
নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা,
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায়
মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, জল দাও।
শিউরে উঠল দেহ আমার,
চমকে উঠল প্রাণ।
বল্ দেখি মা,
সারা নগরে কি কোথাও নেই জল!
কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,
আমাকে দিলেন সহসা
মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান।

১ প্রতিমা দেবী -কর্তৃক লিখিত ও রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুমোদিত 'চণ্ডালিকা' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৫। নৃত্য, প্রতিমা দেবী, ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬, পৃ ২৯-৩০।

২ চণ্ডালিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ১৩৬।

৩ নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা, ফাল্গুন ১৩৪৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ ১৭০-৭১।

গদ্যকে গানে পরিণত করা যায় কি না এ প্রশ্ন বহুকালের। আট বৎসর পূর্বে রানী দেবী (মহলানবিশ)কে এক পত্রে লেখেন, "কখনো কখনো গদ্য রচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ।"[১] লিপিকার কোনো লেখায় সুর দেওয়া হয় বলিয়া জানা নাই; তবে 'শাপমোচনে'র বিভিন্ন অভিনয়ে একটি স্থলে সুর দেওয়া যে হয়, তাহার কথা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। এবার সমগ্র নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার "গদ্য এবং পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে।" সমগ্র নাটিকার গদ্য অংশে সুর দিয়া গানে পরিণত করিবার চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, তাহা চণ্ডালিকার অভিনয় দেখিলেই বুঝা যায়।[২]

দোলপূর্ণিমার দিন শান্তিনিকেতনে যথাবিধি বসন্তোৎসব উদ্‌যাপিত হইল।[৩] পরদিন চণ্ডালিকার অভিনয়কারীর দল কলিকাতায় চলিয়া গেল। 'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়।[৪]

রবীন্দ্রনাথের শরীর জীর্ণ, তিনি যে কলিকাতায় যান এ ইচ্ছা কাহারও নয়। ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "আমার পথ রোধ করেছে ডাক্তারের দল, যে কারণ দেখিয়ে সেটা সম্পূর্ণ আজগবি।..আসল কথা তারা কিছুই জানে না কি জন্যে আমার অকস্মাৎ এই ব্যাধির উপসর্গ— চিকিৎসা বিদ্যার মানরক্ষার জন্যে যা তা এমন একটা হেতু খাড়া করে দিলে যার স্বপক্ষে বিপক্ষে কোনো প্রমাণই নেই— একমাত্র প্রমাণ নামজাদা ডাক্তারদের নাম।..কিন্তু মূঢ়ের মতো বিশ্বাস করতে পারি নি। মোট কথা কলকাতায় যাব না।"[৫] এইটি লিখিলেন দোলপূর্ণিমার দিন— ১৬ মার্চ। আত্মীয় ও সেবকদের সন্দেহ— কবি তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন না।

অভিনয়ের প্রথম রজনীতে নবনির্বাচিত (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) কন্‌গ্রেস প্রেসিডেণ্ট সুভাষচন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন। ১৯ মার্চ সন্ধ্যায় কবি কলিকাতায় আসিলেন— শেষ পর্যন্ত কাহারও কথা শুনিলেন না, নিজের সাহিত্যসৃষ্টিকে চোখে দেখিতে চান। পরদিন সন্ধ্যায় 'ছায়া'য় উপস্থিত হইয়া অভিনয় দেখিলেন।

কলিকাতায় দিন-সাত থাকিলেন; মাঝে একদিন (২২ মার্চ ১৯৩৮) গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। গত বৎসর হইতে বাংলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য গান্ধীজি যে চেষ্টা করিতেছিলেন সেই সম্পর্কেই কবি তাঁহার সহিত দেখা করেন।[৬] কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ২৬ মার্চ। একমাস পরে ২৫ এপ্রিল কালিম্পং যাত্রা করেন। পূর্বেই বলিয়াছি কবি এই সময়ে গীতবিতান-সম্পাদনে ব্যস্ত। তবে মাঝে মাঝে বাহিরের ফরমাশে ভাষণ, বাণী,

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৩৯, ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬।

২ শ্রীকানাই সামন্ত গীতবিতানের (নূতন সং) গ্রন্থপরিচয়-অংশে কবির এই গদ্যগানের সুর-সংযোগের দীর্ঘকালের ইতিহাস দিয়াছেন (গীতবিতান, পৃ ১০১৬-১৮)। অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসুও 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য গান' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (গীতবিতান-বার্ষিকী ১৩৫০, পৃ ৭৪-৭৮)।

৩ "কয়েকদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে চণ্ডালিকার অভিনয় দেখে বোঝা গেল ওর নাটকীয় নিবিড়তা অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। বাহুল্য নাচ গান বর্জন করা দরকার বোধ হোলো। সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে যতই ভালো হোক সমগ্রভাবে বাধাজনক। এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলাপ করব।" চিঠিপত্র ৩, পত্র ৫৬, ৫ মার্চ ১৯৩৮।

৪ ১৮, ১৯, ২০ মার্চ ১৯৩৮॥ ৪, ৫, ৬ চৈত্র ১৩৪৪। ৫ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৭১।

৬ "In the middle of March [1938], Gandhi left for Calcutta to negotiate for further release of political prisoners—the task he had undertaken in November last. It proved very strenuous and on March 24, before leaving for Orissa, he made an appeal to workers and the public to be patient while negotiations were going on."—*Mahatma*, Vol. IV, p 282।

কবিতা লিখিতে হয়।[১] বিচিত্রের দূত, বিচিত্র বাণীর উৎস তিনি। আবার বিচিত্র মানুষের চাহিদাপূরণের আকর ক্লান্তিহীন তিনি।

কবিরা কবিতা লিখিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের আনন্দ এই প্রকাশেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি ও রূপদক্ষ; তিনি তাঁহার মানসসৃষ্টিকে চাক্ষুষ করিতে চান। এই স্বভাব আবাল্যের। নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য লিখিয়া নিবৃত্ত হইতে পারেন নাই, সেগুলিকে অভিনেয় করিয়াছেন, স্বয়ং বহুক্ষেত্রে অভিনয়ে অংশ লইয়াছেন।

শিল্পীর মন চায়, যে আনন্দ তিনি তাঁহার গানে ও নাটকে প্রকাশ করিয়াছেন, আর-সকলেও সেই আনন্দের অংশ গ্রহণ করুক। সৃষ্টির পূর্ণতা ইহাতেই। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের লইয়া এই প্রেরণা হইতে নৃত্যগীত, অভিনয় করিতেন ও দেশে দেশে তাহাদের লইয়া ঘুরিতেন। বৃদ্ধবয়সে যখন তাঁহার বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন সে সময়েও তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। এবারও অন্তরের সেই তাগিদেই কোনো বাধা না মানিয়া কলিকাতায় গিয়াছিলেন।[২]

কালিম্পং— মংপু

এবার গ্রীষ্মকালে কবি কালিম্পং যাইবেন। নববর্ষের উপাসনার পর আম্রকুঞ্জে তাঁহার জন্মোৎসব হইল। মন্দিরের ভাষণে, আমরা 'নববর্ষ' উৎসব কেন পালন করি সে সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত হইল—"আমাদের যে সংকল্প ব্যবহারের দ্বারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আমাদের যে-বিশ্বাসের ধারা কর্মকে বেগ জোগায়, তা যখন দৈনিক অন্ধ অভ্যাসের বাধায় স্রোত হারিয়ে ফেলে, তখন এই-সকল জরার তামসিকতা সরিয়ে দিয়ে সত্যের প্রথমতম নবীনতার সঙ্গে নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন হয়, নইলে জীবনের উপর কেবলি ম্লানতার স্তর বিস্তীর্ণ হতে থাকে। আমাদের কর্মসাধনার অন্তর্নিহিত সত্যের ধূলিমুক্ত উজ্জ্বল রূপ দেখবার জন্যে আমরা বৎসরে বৎসরে এই আশ্রমে নববর্ষের উৎসব করে থাকি। যে উৎসাহের উৎস আমাদের উদ্যমের মূলে তার গতিপথে কালের আবর্জনা যা-কিছু জমে ওঠে এই উপলক্ষে তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করি।"[৩]

নববর্ষের দিনে কবির মন আন্তর্জাতিক ঘনায়মান জটিলতার জন্য অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। সময়টা (এপ্রিল ১৯৩৮) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব; হিটলার ও মুসোলিনীর ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার শমিত করিবার জন্য চলিতেছে তোষণ-নীতি। সেইদিন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন, "আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর

১ ২৭ চৈত্র ১৩৪৪ (১০ এপ্রিল ১৯৩৮); সাময়িক, ১ম বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা, ৩১ বৈশাখ ১৩৪৫ (১৪ মে ১৯৩৮)। সম্পাদক শ্রীসুধাংশুমোহন চৌধুরী। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি লিখিয়া দেন—

সাময়িক কলরোলে আনো শান্তি শাশ্বত সুরের,
সময়ের সীমা ছাড়ি দৃষ্টি তব হোক সুদূরের।
বিশ্বের গভীর মর্মে উৎসারিত মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী—
সেথা হতে অভয়ের অক্লান্তের মন্ত্র দেহো আনি।

২ এ বিষয়ে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁহার 'রবীন্দ্রসংগীত' (১ম সং। পৃ ১৪-১৫) গ্রন্থে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। 'ছায়া'র অভিনয়ের পর শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা কালীমোহন ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ করের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের জন্য বাহির হন। খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও শিলঙে অভিনয় করিয়া প্রায় একমাসকাল পরে তাঁহারা ফেরেন।

৩ নববর্ষ, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ ১৭৬।

বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে, দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হল। এক দিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা, আর-এক দিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোনো বড়ো আদালত কোথাও দেখতে পাই নে।.. পৃথিবীর তিন মহাদেশে— এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিষ্ক্রিয়ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে— এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না— মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে।"[১]

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় বন্ধ হইবার (১০ এপ্রিল ১৯৩৮) কয়েক দিন পূর্বে কবি কালিম্পং যাত্রা করিলেন (২৪ এপ্রিল), সঙ্গে কবির সেক্রেটারি অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দ।[২] রথীন্দ্রনাথরা পূর্বদিন যাত্রা করিয়া যান। কালিম্পং নূতন জায়গা; পূর্বাহ্ণে সেখানে ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন। শিলিগুড়ি হইতে ৫০ মাইল মোটরের পথ। কবির থাকিবার জন্য ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁহার 'গৌরীপুর লজ' ছাড়িয়া দেন। বাড়িখানি প্রকাণ্ড, চারি দিকে বিস্তৃত বনভূমি, বারান্দা হইতে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ চোখে পড়ে। জায়গাটি কবির খুব পছন্দ হইয়াছে। দার্জিলিঙের মতো বৃষ্টি এখানে নাই, আলমোড়ার ন্যায় শুকনো স্থানও এটি নয়। সর্বোপরি লোকের ভিড় কম— পথ দুর্গম বলিয়া ভ্রমণবিলাসীদের যাতায়াত সহজ নহে। এই স্থানটি ডাক্তার গ্রেহামের অনাথাশ্রমের জন্য (St. Andrews' Colonial House) বিখ্যাত। গ্রেহাম বৃদ্ধ, কবির বয়সী; পাঁচ মাইল দূরে তাঁহার শিক্ষায়তন। সেখান হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি কবির সহিত দেখা করিতে আসিলেন।[৩] তত্ত্বদর্শী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এইখানে আসিয়াছিলেন, তিনি প্রায়ই কবির সহিত দেখা করিতে আসেন; তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিতে কবির খুব ভালো লাগে।

কালিম্পং ক্ষুদ্র শহর। অধিবাসীরা রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা করিবার জন্য ১ মে গৌরীপুর লজে সমবেত হয়। কয়েকদিন পরেই কবির জন্মদিন; সকলেই ভাবিয়াছিলেন আলমোড়ার গত বৎসরের ন্যায় এবারও শান্তভাবে দিনটি এখানে উদ্‌যাপিত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। অল্-ইণ্ডিয়া-রেডিয়োর কলিকাতা শাখা হইতে পঁচিশে বৈশাখ কবিকে কিছু আবৃত্তি করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। তদনুসারে যথানির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে 'জন্মদিন' কবিতাটি কালিম্পং হইতে টেলিফোনযোগে, কলিকাতার ব্রডকাস্টিং স্টেশনে প্রেরিত হইলে কবির কণ্ঠ সর্বত্র প্রচারিত হইল। 'জন্মদিন' কবিতাটি কাব্যের ও তত্ত্বের দিক হইতে অনবদ্য— সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা ও বেদনা হইতে উৎসারিত। নববর্ষের দিন মন্দিরে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহার ধ্বনি পাই এই কবিতার মধ্যে— মৃত্যুদূতের ইঙ্গিতে অন্তরে যে সাড়া পড়িয়াছিল, এ যেন তাহারই কথা। আর এই 'জন্মদিন' কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে বিশ্বমানবের দুঃখে উদ্‌গীত রুদ্ধকণ্ঠের বাণী :[৪]

১ দ্র কবিতা, আশ্বিন ১৩৫০। তুলনীয়, প্রান্তিক (১৭-সংখ্যক)।

২ জন্মোৎসব, ১৪ এপ্রিল ১৯৩৮। দ্র *Visva-Bharati News*, May 1938, p 42।

৩ A letter from Kalimpong by A. K. C., *Visva-Bharati News*, June 1938, pp 91-93।

৪ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ ৮৫-৮৮; কবিতাটি জন্মদিনের পূর্বেই রচিত। সেঁজুতি, ভাদ্র ১৩৪৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২। "এই কবিতাটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত ২৫শে বৈশাখ তাঁহার জন্মবাসর উপলক্ষ্যে রেডিয়োতে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা তাহার কিছুদিন পূর্বে প্রবাসীতে মুদ্রণের জন্য কবিতাটি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। রেডিয়োতে পঠিত হইবার পর কবিতাটি অসম্পূর্ণ ভাবে কোনো কোনো সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে কবিকর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া সম্পূর্ণ কবিতাটি প্রবাসীতে মুদ্রিত হইল।"—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ ১২৮। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী-সম্পাদককে এই পত্রখানি লেখেন (২৭ বৈশাখ ১৩৪৫): "সম্প্রতি আমার নববর্ষের বাচন ও জন্মদিনের কবিতা নিয়ে যে অন্যায় হয়ে গেছে সেটা আমার অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত। যখনি আমার নজরে পড়ল আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের—
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'[১]

যে মহাযুদ্ধ এখনো আরম্ভ হয় নাই, অথচ সকলেই জানেন অনিবার্য, সেই যুদ্ধের পরিণাম কী, তাহা কবি যেন দেখিতে পাইতেছেন।

আসলে জন্মদিনে যে কবিতাটি লেখেন (২৫ বৈশাখ ১৩৪৫) সেটি 'উদ্বোধন' নামে নবজাতকের অন্তর্গত হইয়াছে। এই কবিতাটির শেষ স্তবক বাদ দিয়া ও ভিতরের ভাষার সামান্য বদল করিয়া 'গীতবিতানের' নূতন সংস্করণে প্রয়োজিত হয় ভূমিকারূপে।[২]

প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশ-পিয়াসি ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে। ইত্যাদি

এই কবিতাটি তাঁহার গীতময় জীবনের গীতাবলীর ভূমিকা।

কিন্তু আকস্মিক দুর্যোগের ত্রুটি সংশোধনের সময় থাকে না। কবিতাটি অল্প পরিমাণে সংশোধিত হয়ে প্রবাসীতে গেছে— সেইটিকেই আমার অনুমোদিত পাঠ বলে গণ্য করবেন। এই-সকল কারণেই মাঝে মাঝে আমার খ্যাতি নিয়ে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গমালা দেখলে আমি নিরতিশয় কুণ্ঠা বোধ করি।" পত্রখানি প্রবাসী প্রাপ্ত হন ১২ মে বা ২৯ বৈশাখ। দ্র প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ ৩১৬।

১ "ক্যাণ্টন শহরে সম্প্রতি [জাপানীদের] পৈশাচিকতা আগেকার সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বহুবিলম্বিত ও মৌখিক এই প্রতিবাদে কি হইবে? যখন দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে জাপানকে নিবৃত্ত হইতে হইত, তখন কিছু না করিয়া এখন মৌখিক প্রতিবাদ বৃথা।"—বিবিধ প্রসঙ্গ ; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃ ৪৫৪। 'জাপানীদের দ্বারা চৈনিক নারীদের পৈশাচিক অপমান' শীর্ষক প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২ দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৬৬। "কবিতাটির আরম্ভের কুড়িটি ছত্র, রবীন্দ্রভবনে-রক্ষিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে, ১৯৩৮ সালের ১৩ অক্টোবর [২৬ আশ্বিন ১৩৪৫] তারিখে শান্তিনিকেতনে স্বতন্ত্র কবিতা-আকারে প্রথম লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেই আকারে উহা দ্বিতীয় সংস্করণ গীতবিতানে 'ভূমিকা' শিরোনামে মুদ্রিত হইয়াছিল।" উপরি-উক্ত তারিখে ভুল আছে মনে হইতেছে। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৫, কালিম্পঙে লিখিত বলিয়া নবজাতকে মুদ্রিত। সুতরাং এইটিই আদিরূপ।

কালিম্পঙে বাসকালে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়[১] লিখিত 'রবিরশ্মি' (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হইয়া বোধ হয় পঁচিশে বৈশাখ কবির হস্তগত হইল।[২] বইখানি উলটাইয়া পালটাইয়া স্থানে স্থানে পড়িয়া কবির মনে যে সমালোচনার উদয় হয়, তাহা ৩০ বৈশাখ (১৩৪৫) চারুবাবুকে এক পত্রে ব্যক্ত করেন।

কবি লিখিতেছেন, "নিজের অন্তরের জিনিসকে বাহিরের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দেখতে অদ্ভুত লাগে। তখন সেটাকে পরিচিতের দৃষ্টি থেকে দেখি নে, দেখি কৌতূহলের দৃষ্টিতে।" কবি পুরাতন রচনা সম্বন্ধে অত্যন্ত critical; তাই বলিতেছেন, "স্বয়ং বিধাতা তাঁর সেকালের সৃষ্টিতে লজ্জিত, নইলে আজ মানুষ জন্মাত না, সংকোচে তিনি আদি জীবসৃষ্টির চিহ্ন চাপা দিয়েছেন মাটির নীচে। আমার কাব্যেরও সেই দশা।"

কাব্য-সমালোচনা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, "তুমি আমার প্রত্যেক কবিতাটি নিয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছ, তাতে আমি গৌরব বোধ করি। কিন্তু একটা কথা এই মনে হয়, কাব্যরস আস্বাদনে পাঠকদের অত্যন্ত বেশি যত্নে পথ দেখিয়ে চলা স্বাস্থ্যকর নয়। নিজে নিজে সন্ধান করা ও আবিষ্কার করায় সত্যকার আনন্দ। তা ছাড়া কাব্যের কেবল একটা মাত্র বাঁধা মানে না থাকতে পারে— তার আসনে এতটা স্থিতিস্থাপকতা থাকে যাতে ভিন্ন আয়তনের মানুষকে সে তার আপন আপন বিশেষ স্থান দিতে পারে।..নিজের রুচি ও শিক্ষা অনুসারে কেউ যে কাব্য বিচার করবে না তা নয়। কিন্তু তাতে অনেকখানি ফাঁক থাকা চাই, নিরেট ঠাসা গাইড্‌বুক সাবালক ভ্রমণকারীর স্বাধীন চেষ্টাকে প্রতিহত করে। উত্তরে বলতে পারো, সংসারে নাবালকের সংখ্যা বিস্তর— আমি বলি ও পথে তাদের না চলতে দেওয়াই ভালো।"[৩]

কালিম্পঙে থাকিতে থাকিতে কবি মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বিনয়রঞ্জন সেনের প্রচেষ্টায় যে 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী' মুদ্রিত হইতেছে তাহার প্রথম খণ্ড পাইলেন। কবি (৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) বিনয়রঞ্জনকে লিখিতেছেন, 'বিদ্যাসাগরের বেদীমূলে নিবেদন করবার উপযুক্ত এই অর্ঘ্য রচনা।..আমরা সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি দ্বারাই তাঁর স্বদেশবাসীরূপে তাঁর গৌরবের অংশ পাবার অধিকার প্রমাণ করতে পারি। যদি না পারি তাতে নিজেদের শোচনীয় হীনতারই পরিচয় হবে।"[৪]

কালিম্পঙে প্রায় একমাস কাটিল। এখানে এবার 'বাংলাভাষা-পরিচয়' নামে নূতন বই লিখিতেছেন। অতঃপর ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ (২১ মে ১৯৩৮) মৈত্রেয়ী দেবীর আমন্ত্রণে কবি মংপুতে আসিলেন। মৈত্রেয়ী দেবী অধ্যাপক

১ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১০ অক্টোবর ১৮৭৭ - ১০ ডিসেম্বর ১৯৩৮)। ১৮৯৯-এ বি.এ. পাস করিয়া এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান প্রেসে চাকুরি লইয়া যান। বিধুশেখর ভট্টাচার্য ও ক্ষিতিমোহন সেনের সহিত সখ্যতা হয়। ১৯০৮-এ কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে (ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষের ব্যবস্থায় স্থাপিত) আসেন ও রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' সংকলন ও প্রকাশ করেন। ১৯১০-এ প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদনে সহকারী নিযুক্ত হন। ১৯১৯-২৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অন্যতম অধ্যাপক রূপে কার্য করেন। এই সময়ে 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' সম্পাদন ও তাহার বোধিনী প্রস্তুত করেন। ১৯২৪-১৯৩৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক। অবসর-গ্রহণান্তে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে কার্য করেন। ২৮ খানি উপন্যাসের রচয়িতা এবং ছোটগল্পও ১৬টি; শিশুপাঠ্য বিবিধ গ্রন্থ ৭টি। এ ছাড়া কবিতা-সঞ্চয়ন, সমালোচনা-গ্রন্থও আছে। 'রবিরশ্মি' তাঁহার জীবনকালে শেষ গ্রন্থ (১ম খণ্ড)। দ্র চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রন্থের ভূমিকা, গ্রন্থম্‌, ১৩৬৬।

২ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কবির পরিচয়ের ইতিহাস 'রবিরশ্মি' ২য় খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানির ভূমিকা ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৭-এ লিখিত হইলেও, উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুদ্রিত হইয়া ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮-এর পূর্বে রেজিস্টার্ড হয় নাই। আমাদের মনে হয় প্রকাশিত হয় এপ্রিল মাসে। জীবনীলেখক ৭ মে ১৯৩৮ তারিখে চারুবাবুর বইখানি উপহার পান।

৩ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃ ৪০৮-০৯।

৪ বিদ্যাসাগর ও তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ; বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃ ৪৪৮।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কন্যা; ইঁহার স্বামী ডক্টর মনোমোহন সেন গভর্নমেন্ট সিন্‌কোনা বিভাগের অধ্যক্ষ, মংপুতে থাকিতে হয় কার্যোপলক্ষে। মংপু কালিম্পং হইতে ২০ মাইল দূরে, পার্বত্য-পথে মোটরগাড়ি করিয়া যাতায়াত করিতে হয়। মৈত্রেয়ী দেবী স্বয়ং সাহিত্যিক ও রবীন্দ্রভক্ত; রবীন্দ্রনাথকে তিনি কী চোখে দেখিতেন 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা তার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কবির ভাষায় কবির ভাব প্রকাশের অসামান্য ক্ষমতা ইঁহার।

মংপুতে কবির এই প্রথম আগমন। কবির সঙ্গে আসিয়াছেন অনিলকুমার চন্দ ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, এ ছাড়া পুরাতন ভৃত্য বনমালী। কবির জন্য মৈত্রেয়ী দেবীদের নিজ বাটীর অদূরেই একটি বড়ো বাড়ির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; সেইখানেই দিন পনেরো ও শেষ কয়দিন (৬-৯ জুন) মৈত্রেয়ী দেবীদের বাসায় থাকিয়া তিনি ৯ জুন কালিম্পঙে ফিরিয়া যান।

মংপুতে 'বাংলাভাষা-পরিচয়' লেখা চলিতেছে; এখানকার ছোটো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মৈত্রেয়ী দেবী কবির লেখার সুবিধার জন্য আরামকেদারার সম্মুখে কাঠের একটা বোর্ড্ দিয়াছিলেন; কবি তাঁহাকে বলেন, "চেয়ারে ব'সে টেবিলের উপর ঝুঁকে না লিখলে আমার চিন্তার flow নষ্ট হয়ে যায়। আরামচৌকিতে হেলান দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে কখনো লেখা যায় না। এ একটা তপশ্চর্যা তো বটে, অতি-আরাম করলে কি হয়।"[১] যাঁহারা কবিকে কর্মরত দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন কবি কী পরিশ্রমী ছিলেন।

মংপুতে কবির দিন কিভাবে কাটিত সে সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "ভোর পাঁচটায় চা খেয়ে নিয়ে ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চিঠি লেখা ও 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইটা নিয়ে কাজ চলত।" কয়েকদিন পরে মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "উনি [কবি] দিবা রাত্রি লেখা নিয়ে রয়েছেন, বইটা প্রায় শেষ হয়ে এলো।" একদিন কবি বলিতেছেন, "আজ যে ভাষার খেয়াল নিয়ে মেতে উঠেছিলুম— অদ্ভুত সব ব্যাপার চলেছে ভাষার জগৎ জুড়ে, কী ক'রে যে ভাষাটা গড়ে উঠেছে সে এক রহস্যময় কারখানা।" মোটকথা মনটা এই সৃষ্টির মধ্যে ডুবিয়া আছে। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে দুই-চারিটা কবিতা দেখা যায়। গত বৎসর আলমোড়ায় লেখেন 'বিশ্বপরিচয়'; সৃষ্টির অতল রহস্যলোকে ছিল বিচরণ; এবার কালিম্পং-মংপুতে লিখিলেন 'বাংলাভাষা-পরিচয়'— ভাষার দুরধিগম্য রাজ্যে পরিভ্রমণ। কবি লিখিয়াছেন, "আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী। . . চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি বকে যাব। তাতে ক'রে মনে তোমরা সেই চলে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে। তোমাদের জন্যে বিশ্বপরিচয় বইটা লিখেছিলুম এই ভাবেই।"[২]

এই সময়ে কবি আর-একটি কাজ করিতেছেন, সেটি হইতেছে মহাভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা রচনার উদ্যোগ। শান্তিনিকেতনে বাসকালে মার্চ (১৯৩৮) মাসের গোড়ায় কবিকে মহাভারত লইয়া আলোচনা করিতে দেখি। তিনি প্রতিমা দেবীকে লিখিতেছেন (৫ মার্চ), "মহাভারত লেখার ভার স্বীকার করে নিয়েছি— অবিলম্বে শুরু করতে হবে।" শোনা যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য এই তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। কালিম্পঙে গিয়া এই কার্যে হাত দিয়াছেন। সুধীরচন্দ্র করকে গীতবিতান সম্বন্ধে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তাহাতে লিখিতেছেন, "চোখের দুর্বলতার জন্যে কোমর বেঁধে লিখতে বসতে পারছি নে— ছোটো অক্ষরের মহাভারত যেন কাঁকর বিছানো রাস্তা, তার উপর

১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী, (১ম সংস্করণ) পৃ ৯-৩৬।

২ ভূমিকা, বাংলাভাষা-পরিচয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৩৭১।

দিয়ে চোখ চালানো আরামের নয়।"[১]

মংপু-বাসকালে তারিখ-দেওয়া তিন-চারটি কবিতার খবর পাই। একটি 'সেঁজুতি' কাব্যখণ্ডে, দুইটি 'নবজাতকে' ও অপর একটি 'সানাই'-এর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সেঁজুতির কবিতাটি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের[২] 'পত্রোত্তর' (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫)। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে কবিতায় পত্র[৩] লেখেন ইহা তাহারই জবাব। এই কবিতাটির মধ্যে অনেক তত্ত্বকথা আছে; কয়টি পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত করিতেছি, উহার ব্যাখ্যা বহুব্যাপী হইতে পারে। তিনি বলিতেছেন—

কী আছে জানি না দিন-অবসানে মৃত্যুর অবশেষে;
এ প্রাণের কোনো ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রঙ অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোনো মায়া।

এ কি অজ্ঞেয়বাদের প্রশ্ন, না, চিররহস্যময় অজানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা? এই কবিতা পাঠের পর কবি যাহা বলিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী নিজ ভাষায় লিখিতেছেন, "যখন সমাপ্তি হবে তখন চরম সমাপ্তি কি না, যা অতীত তা শেষ হয়ে গেছে কি না, কী জানি। যা সমুখে আর যা পিছনে, আমার কাছে যে উভয়ই অস্তিত্বহীন। কেবল বর্তমানটুকুই সত্য, সত্য মানে প্রত্যক্ষ। কিন্তু যা প্রত্যক্ষ নয় সেও সত্য হতে পারে।"[৪] এই শ্রেণীর অনেক প্রশ্নই জাগে।

নবজাতকের 'রাজপুতানা' কবিতাটি লেখার ইতিহাস অনুরূপ। স্টেট্‌স্‌ম্যান হইতে প্রকাশিত 'সুন্দর ভারত' (Wonderful India) গ্রন্থে রাজপুতানার ছবি দেখিয়া মনে যে ধিক্কার লাগে তাহারই অভিঘাতে উহা লিখিত। কবি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলিতেছেন, "হায় হায় এই কি সেই রাজপুতানা? মৃত্যুর বোঝা বহন ক'রে তবু বেঁচে আছে।

১ পত্র, ২৩ বৈশাখ ১৩৪৫। কবিকথা, পৃ ৫৫। রবীন্দ্রসদনের শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নিম্নলিখিত নোট আমাকে পাঠাইয়াছেন—"রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ১৫৯ নং পাণ্ডুলিপিতে কবির হস্তাক্ষরে মহাভারত সম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য লিখিত আছে। পাণ্ডুলিপিটি ১৯৩৮ সালের একখানি ডায়ারি খাতা। অনুমান হয় ঐ সময় কবি মহাভারত সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ লিখিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। মন্তব্যগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি মহাভারতের সময়কার সমাজব্যবস্থা, লৌকিক আচারব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছেন। সম্ভবত এই সূত্রেই শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য কবিকর্তৃক "মহাভারতের সমাজ" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি রচনা করিবার প্রেরণা লাভ করেন। এই সময়ে কবি যে Winternitz ও Hopkins-এর গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।" —দ্র সুধীরচন্দ্র কর, কবিকথা, পৃ ৪২-৪৬। "কবি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে মহাভারতের বক্তৃতা লিখবেন বলে তৈরি হচ্ছেন।"—কবিকথা, পৃ ৮৯। দ্র 'মহাভারতের সমাজে'র ভূমিকা।

২ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের খ্যাতি দার্শনিক বলিয়াই; তবে তিনি কবিতাও লিখিতেন বাল্যকাল হইতে। 'ক্ষণলেখা' নামে একখানি কাব্যখণ্ড লিখিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন:

নিখিলমনুজ পূজাদীপ্তরশ্মিপ্রবাহে
জ্বলতু মম শিখেয়ং ম্লান শোভাবগাহে॥
অমর সলিলধারে মিশ্রণং যাতু ভৌমঃ।
কবিবতু রবীন্দ্রো বাক্‌পতি সার্বভৌমঃ॥

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকারকে পুস্তকখানি সম্বন্ধে পত্র দেন; তার মধ্যে আছে, "ক্ষণলেখা নামটি সঙ্গত হয় নি। সময়ের সীমার দ্বারা এর পরিচয় নয়।.. ইংরেজীতে যাকে Classic রীতি বলে, তোমার কবিতা সেই রীতির— এ বড়ো সভার জন্যে পরিচ্ছন্ন ও প্রস্তুত, এর মধ্যে অনবধানতা ও অপারিপাট্য নেই।" প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, পৃ ৩২০।

৩ 'কবিনারদ', সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৫। দ্র মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১২-১৫।

৪ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১৪।

এর চেয়ে তার ধ্বংস ছিল ভালো। কোনো একরকমের জীবনের চাইতে মরণই মঙ্গল, মরণই সম্মানের।"[১]

একি আত্মবিস্মরণমোহ,
বীর্যহীন ভিত্তি-'পরে কেন বচে শূন্য সমারোহ।...
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীরসাজে
তারস্বর আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন্ লাজে।[২]

কিছুকাল পূর্বে 'হিন্দুস্থান' (নবজাতক) কবিতায় এই তিরস্কারই ধ্বনিত হইয়াছিল। যে লোক স্বীয় বীর্য হইতে ভ্রষ্ট, তাহার পক্ষে অতীতকালের ইতিহাস লইয়া দম্ভ প্রকাশের মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নাই।

সানাই-এ 'অধীরা' কবিতা[৩] রচনার ইতিহাস 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথে'র মধ্যে বিবৃত আছে; একদিন ঝড়বৃষ্টির পর— বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে 'এক চঞ্চলা অধীরা ছুটে চলেছে', যে বন্ধন মানে না, যে দুর্বার— এ 'অধীরা'য় তাহারই কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

মংপু ত্যাগের দুই-একদিন আগে কবি 'মংপু পাহাড়ে'[৪] কবিতাটি লেখেন। এখানেও সেই জিজ্ঞাসা—

অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি
অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি
অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ।
তখনি অকস্মাৎ হবে কি বিদীর্ণ
এত রেখা এত রঙে গড়া এই সৃষ্টি,
এত মধু-অঞ্জনে রঞ্জিত দৃষ্টি।
বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য
নিজেরই তবিল-ভাঙা হয় তার কার্য,
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র
বেদনা না যদি তার লাগে কিছুমাত্র,
আমারই কি লোকসান যদি হই শূন্য—
শেষক্ষয় হলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ণ।
এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য,
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।
রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সদ্য,
তখনো তো হেথা এক অখণ্ড অদ্য
জাগ্রত রবে চির-দিবসের জন্যে

১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৩৭।

২ রাজপুতানা, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, মংপু। প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৫। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ১৭-১৯।

৩ সেইদিন সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ কবির সহিত দেখা করিতে আসেন; বিদেশে যাইবেন, কবিকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। দ্র মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৪৩। অধীরা, ৮ জুন ১৯৩৮ ॥ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫। বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৪৫। সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৯৪-৯৫।

৪ ১০ জুন ১৯৩৮। পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪৫। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৩৫-৩৭।

এই গিরিতটে, এই নীলিম অরণ্যে।
তখনো চলিবে খেলা নাই যার যুক্তি—
বার বার ঢাকা দেওয়া, বার বার মুক্তি।
তখনো এ বিধাতার সুন্দর ভ্রান্তি—
উদাসীন এ আকাশে এ মোহন কান্তি।

কবির মনের এত গভীর নিরাসক্তির উৎস কোথায় তাহা আমরা জানি। মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "মনে পড়ে সেই তাঁর [কবির] সেই ভোরবেলাকার শান্ত সমাহিত মূর্তি। দুটি হাত কোলের কাছে জড়ো করা, ভোরবেলার আলো গায়ে এসে পড়েছে। সামনের সমস্ত দৃশ্যপট ছাড়িয়ে অদৃশ্যে নিবদ্ধ দৃষ্টি। সেই সময় . . কত দূরের মানুষ তিনি। অথচ কিছুক্ষণ পরেই দেখেছি খুকুর সঙ্গে ছড়া বলছেন আনন্দে। কত গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন, কত লিখেছেন, অথচ সহজ সরলভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার হাস্যপরিহাস একটুও ব্যাহত হয় নি। সেই মহৎ অনন্যসাধারণ মন নিজেকে পৃথক ক'রে সরিয়ে নিয়ে যায় নি। সকলের মধ্যে যে সকলের উর্ধ্বে তিনি, সেই তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার আর একটি নিদর্শন।"[১] মংপু হইতে কালিম্পং ফিরিলেন ৯ জুন। সেখানে বিশ্বভারতী-সম্পর্কীয় কাজে রাজপুরুষেরা আসিতেছেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন।

কালিম্পঙে প্রায় আরও একমাস কাটে। সেখানে যথাবিধি লেখাপড়া চলিতেছে। এখানেও কয়েকটি কবিতা লেখেন। এই সময়ে রাধারানী দেবীর (পূর্বে দত্ত, অধুনা দেব) দৌত্যে রবীন্দ্রনাথ 'অপরাজিতা দেবী'র কবিতায়-লেখা[২] (১৬ জুন ১৯৩৮) একটি নাতিদীর্ঘ পত্র পান। পত্রটির শেষাংশে লেখিকা জানাইয়াছিলেন—

রবিরাগ জানি, কবি, বাদলেও ফিকা না—
তাই চাই উত্তর। (না জানিয়ে ঠিকানা)।

'অপরাজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বাক্ষরে 'গরঠিকানি' কবিতাটি (৫ আষাঢ় ১৩৪৫) উক্ত পত্রের জবাবে লিখিয়া 'পত্রদূতী' (৫ আষাঢ় ১৩৪৫) কবিতা-সহ রবীন্দ্রনাথ রাধারানী দেবীকে পাঠান।[৩]

১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৩২।

২ অপরাজিতা দেবী রাধারানীরই ছদ্মনাম। কবির কাছ হইতে এই ছদ্মনামে অনেক কবিতা ও পত্র তিনি প্রাপ্ত হন। শুনিয়াছি কবি এইটি জানিতে পারেন নাই শেষ পর্যন্ত। তবে এই কয়টি পংক্তি বিবেচ্য—

'রবি' নাম যদি বলি নাম নহে ওটা,
ললাটের 'পরে জয়তিলকের ফোঁটা,
তাহলে শোনাবে অহংকার সে কত,
'অপরাজিতা'ও নহে কি তাহারি মতো।
ঝগড়া বাধিয়ে এইখানে লিখি ইতি,
সন্দেহ করি, ভালো নহে এই রীতি—
শাস্তি ভঙ্গ করে দেবে এই ভাষা,
পুরো শাস্তির চেয়ে তারি 'পরে আশা।

— দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫৩২-৩৩।

৩ আশ্বিন ১৩৪৫ সালের প্রবাসীতে অপরাজিতা দেবীর 'নাৎনির পত্র', রবীন্দ্রনাথের 'পত্রদূতী' ও 'গরঠিকানি' একত্রে প্রকাশিত হয়। গরঠিকানি, প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ২০-২৫। পত্রদূতী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫৩১-৩২।

গর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার ছন্দে লিখেছে পত্র,
ছন্দেই তার ইনিয়ে-বিনিয়ে জবাব লিখেছি অত্র।
যন্ত্রের যুগে মেঘদূত তার পদ করিয়াছে নষ্ট,
তাই মাঝে প'ড়ে খামাখা অকাজে তোমারে দিলেম কষ্ট।
আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে মন যেন উড়ো পক্ষী,
বাদলা-হাওয়ায় কোথা উড়ে যায় অজানা কাদেরে লক্ষ্যি।
ঠিকানা তাদের রঙিন মেঘেতে লিখে দেয় দূর শূন্য,
খামে-ভরা চিঠি না যদি পাঠাই হয় না তাহারা ক্ষুণ্ন।

কালিম্পঙে লিখিত আরও তিনটি কবিতা আছে— অদেয় (৩ আষাঢ়), যক্ষ (৫ই), মায়া (৭ই)— সবগুলিই সানাই-এর অন্তর্গত। 'যক্ষ' কবিতায় কবি বিরহিণী যক্ষিণীর কথা বলিয়াছেন, যাহার বেদনাকে কোনো কবি ভাষা দেন নাই ; বিরহী যক্ষের দুঃখ কালিদাসের ভাষায় অমরতা লাভ করিয়াছে— নারীর বেদনা রূপ পায় নাই।

হোথা বিরহিণী ও যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়,
দণ্ড পল গনি গনি মন্থর দিবস তার যায়।
সম্মুখে চলার পথ নাই,
রুদ্ধ কক্ষে তাই
আগন্তক পান্থ-লাগি ক্লান্তিভারে ধূলিশায়ী আশা।
কবি তারে দেয় নাই বিরহের তীর্থগামী ভাষা।

'মায়া' কবিতাটি 'যক্ষে'র পরে পঠনীয়। 'অদেয়' কবিতাটির বিস্তারিত আলোচনা-ব্যাখ্যা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১]

রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন আটাত্তর বৎসর ; কিন্তু এখনো য়ুরোপের সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতিধারার সংবাদ রাখিবার জন্য মন সদাই উৎসুক। এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় অমিয় চক্রবর্তী। তিনি বিলাত হইতে আধুনিক বই প্রায়ই পাঠান। অলড্যুস হাক্সলির একখানি বই পড়িয়া কবি অমিয়চন্দ্রকে কালিম্পং হইতে লিখিয়াছিলেন (২ আষাঢ় ১৩৪৫) যে বইখানি[২] পড়িয়া তিনি খুবই তৃপ্ত ; কারণ "তার ভাষায় তার ইঙ্গিতে কোথাও বড়োকে বিদ্রূপ করা হয় নি। . . ভালোকে নিয়ে বেঁকিয়ে কথা[৩] বলতে আমাদের যে লজ্জা বোধ হয়।" কবির দুঃখ যে অধুনা সাহিত্যের উৎকর্ষতার বিচার হইতেছে রচনার মধ্যে বিশেষ মতের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের উপর। সাহিত্যের বিচার হইতেছে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ দিয়া ; এইটি কবির মতে সম্যক্ দৃষ্টি নহে।

আপন মনে লেখাপড়া করিতে পারিলে তো ভালোই হয় ; কিন্তু বাধা কোথায় সে সম্বন্ধে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে[৪] লিখিতেছেন (২৬ জুন ১৯৩৮): "প্রতিদিন অন্তবিহীন চিঠি লেখালেখি, আশীর্বাণীর দাবী, অভিমতের

১ পৃ ৮৫-৮৮। ২ খুব সম্ভব *Eyeless in Gaza*, 1936।

৩ তুলনীয়, **Criticising Joyce and Stein the *Saturday Review* (1 November 1952, p 38) writes: "Their methods have been . . deliberate confusion of thought which has been worse than their confusion of language; because their effect on the public mind has been likewise identical, the creation of the sorry cult where incoherence passes for greatness."** অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, কবিতা, কার্তিক ১৩৫০।

৪ জুলাই ১৯২৭ বিজয়লাল শান্তিনিকেতনে বাংলার অধ্যাপক হইয়া আসেন। সেই বৎসরের শেষে চলিয়া যান।

অনুরোধ, বাংলাদেশের নবজাতদের নামকরণ, আসন্নবিবাহের সরকারী রসুনচৌকিগিরি আমার শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের শান্তির পক্ষে অসহ্য হয়েছে। দাবি অসংগত হলেও আমি সহজে অস্বীকার করতে পারি নে বলেই আমার কাঁধ থেকে বোঝা নামল না।..জনসাধারণের কাছে নিষ্কৃতি চেয়ে সংবাদপত্রে চিঠি দিয়েছি। এতদিনে হয়তো ছাপা হয়ে থাকবে। এই মৌনব্রত আরম্ভ করার পূর্বে তোমাকে এই চিঠিতে আশীর্বাদ না করে থাকতে পারলুম না। আমার পল্লীচিত্র সম্বন্ধে তোমার বইখানি পড়ে বিশেষ খুশি হয়েছি..ডাকযোগে তোমার প্রতি এই আমার শেষ অভিনন্দন।"[১]

বিজয়লাল গ্রামসেবী, কংগ্রেসকর্মী; বাংলাদেশের গ্রামকে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ তিনি যথার্থই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীচিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রত্যেক রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের অবশ্য পঠনীয় বলিয়া আমরা মনে করি।[২]

কবি যখন কালিম্পঙে সেই সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে বঙ্কিম-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; তদুপলক্ষে কবি পূর্বাহ্নে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ১০ আষাঢ় (১৩৪৫ ॥ ২৫ জুন ১৯৩৮) সভায় পঠিত হয়। সুতরাং কবিতাটি নিশ্চয়ই কয়েকদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল।[৩]

প্রত্যাবর্তনের পর

দুই মাসের উপর (২৫ এপ্রিল - ৫ জুলাই ১৯৩৮) কালিম্পং ও মংপুতে থাকিয়া কবি ২০ আষাঢ় (১৩৪৫) শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন; কয়েকদিন পূর্বেই গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিয়াছে। আশ্রমে ফিরিয়া সংবাদ পাইলেন লাহোরে গ্রীষ্মের ছুটির সময় মৌলানা জিয়াউদ্দিনের মৃত্যু হইয়াছে। জিয়াউদ্দিন বিশ্বভারতীর ইসলামিক বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন; ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বিশ্বভারতীর উত্তরবিভাগের ছাত্ররূপে আসেন। তার পর নিজ চেষ্টায় আপনার স্থান করিয়া লন। অধ্যাপক পুরে দাউদের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা পারসিক ভাষায় তর্জমা করেন; উর্দুভাষাতেও কবির একটি কাব্যসঞ্চয়ন প্রকাশ করেন। এ ছাড়া গবেষণা করেন নানা বিষয়ে। তাঁহার এই অকালমৃত্যুর সংবাদে কবি খুবই মর্মাহত হন। শোকসভায় তিনি মৌলানা সম্বন্ধে একটি ভাষণ দান করেন; অন্তরের বেদনা প্রকাশিত হয় একটি কবিতায়।[৪]

এই ভাষণ দানের পূর্বদিন 'ইস্‌টেশন' নামে একটি কবিতা লিখিত হয় (৭ জুলাই ১৯৩৮)। আসলে আলমোড়ায় লেখা (২৯ মে ১৯৩৭) ছোটো একটি কবিতার এটি ব্যাপকরূপ। মৃত্যুর দূত অকস্মাৎ প্রথমে মৌলানার কন্যাকে ও পরে তাঁহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া গেল। চলমান যাত্রীর দিকে তাকাইয়া কি এই ভাবনাটিই কবির মনে হইয়াছিল—

১ প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৮, পৃ ৩৮৬।

২ রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীচিত্র, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। দ্র প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৫, পৃ ৫৮৪।

৩ বঙ্কিমচন্দ্র ("যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে") প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৫, পৃ ৫৫৫। দ্র বিমলচন্দ্র সিংহ -সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রতিভা'। অপিচ, অবিস্মরণীয়, দেশ পত্রিকা, ২ পৌষ ১৩৬১।

৪ ভাষণ, ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অনুলিখিত। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৫, পৃ ৫৭৯-৮০। কবিতা, ৮ জুলাই ১৯৩৮, নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ২৮-২৯।

'গেল গেল' ব'লে যারা
ফুকরে কেঁদে ওঠে
ক্ষণেক পরে কান্না-সমেত
তারাই পিছু ছোটে।..
এক তুলি ছবিখানি এঁকে দেয়,
আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়।
আসে কারা এক দিক হতে ঐ,
ভাসে কারা বিপরীত স্রোতে ঐ।

এবার পাহাড় হইতে ফিরিয়া কবি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন— দুই-একবার কলিকাতায় যাইতে হয় বটে— তবে বেশিদিনের জন্য থাকেন নাই। খুচরা কবিতা অনেকগুলি জমিয়াছে; সেগুলি একত্র করিয়া 'সেঁজুতি' নামে কাব্যখণ্ড প্রকাশিত হইল (ভাদ্র ১৩৪৫)।[১] কাব্যখানি উৎসর্গ করেন, 'ডাক্তার সার্ নীলরতন সরকার বন্ধুবরেষু' (১ শ্রাবণ ১৩৪৫)। গত বৎসর ভাদ্রমাসে কবি হঠাৎ হতচৈতন্য হইয়া পীড়িত হন, স্যর নীলরতন তাঁহাকে নিরাময় করেন। সেই স্মৃতি কবিতা-মধ্যে রূপ লইল—

অন্ধতামসগহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।..
আলো-আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
ঝিমিঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা।
সে ভাষার আমি চরম অর্থ
জানি কিবা নাহি জানি—
ছন্দের ডালি সাজানু তা দিয়ে,
তোমারে দিলাম আনি।

আপন মনে কবিতা লেখা ছাড়া দেশবিদেশের বহু সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাকে মতামত দিতে হয়। পৃথিবীব্যাপী অশান্তির দিকে তিনি চোখ মুদিয়া থাকিতে পারেন না। চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে; কবি জাপানের এই ব্যবহারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া চীনে এক পত্র পাঠাইলেন। উহা প্রকাশিত হইলে জাপানে যে প্রতিক্রিয়া হইল তাহার কথা একটু পরেই আলোচনা করিব।

চীনা-ভবনের অধ্যক্ষ তান য়ুন-শান যখন দেশে যান সেই সময়ে কবি তাঁহার মারফত পত্রখানি মার্শাল চিয়াং কাই-

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২। 'সেঁজুতি' সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন, "সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ হিসাবে ওর মানেটা ভালো।" কবিকথা, পৃ ৫৫। কালিম্পং হইতে লিখিত পত্র, ২৩ বৈশাখ ১৩৪৫।

শেককে পাঠাইয়াছিলেন। পত্র চিয়াংকে লিখিত হইলেও, উহা আসলে চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচারের প্রতিবাদ ও চীনের জয়লাভের জন্য তাঁহার অন্তরের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন।

"Your neighbouring nation [Japan] which is largely indebted to you for the gift of your cultural wealth and therefore should naturally cultivate your comradeship for its own ultimate benefit, has suddenly developed a virulent infection of imperialistic rapacity imported from the West and turned the great chance of building the bulwark of a noble destiny in the East into a dismal disaster. . . Japan has cynically refused its own great possibility, its noble heritage of 'bushido' and has offered a most painful disillusionment to us in an unholy adventure through which even some apparent success of hers is sure to bend down to the dust, loaded with a fatal burden of failure।"[১]

বিদ্যালয় খোলার সঙ্গে সঙ্গে কবিকে ছোটো বড়ো নানা কাজের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে হয়। নূতন ছাত্রদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া কবি একদিন আশ্রমের আদর্শ ও ইতিহাস বিবৃত করেন।[২] দুই দিন পরে (৬ই) আশ্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী সভায় কবিকে সভাপতিত্ব করিতে হয়। সেদিন কবি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক ব্যক্তিগত কথা বলেন। তিনি বলেন, বন্দেমাতরম্ সুরসংযোগে তিনি বঙ্কিমকে শোনান এবং সেই সুরই এখন চলিতেছে। গানটির প্রথম দুইটি কলি শ্রোতাদের গাহিয়া শুনাইলেন; নবীন শ্রোতাদের পক্ষে এইটি অভাবনীয় ঘটনা। এই উপলক্ষে একটি কবিতাও[৩] রচনা করেন।

কবির বহুমুখী কর্মসৃষ্টি যুগপৎ চলিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি 'বাংলাভাষা সম্বন্ধে একখানা বই মৃদুমন্দ গতিতে' লিখিয়া চলিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও নানা কর্মে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী উভয়কে লোকশিক্ষা-সংসদের উপযোগী দুইখানি বই লিখিবার জন্য তাগিদ দিতেছেন। কবির বিশেষ ইচ্ছায় প্রমথ চৌধুরী 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' লিখিতেছেন এবং ইন্দিরা দেবী ফরাসী ঐতিহাসিক রেনে গ্রুসের (Rene Grousset, মৃত্যু ১৯৫২) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি বইয়ের তর্জমা করিতেছেন।[৪]

কয়েকদিন পরে কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ এই ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের আবাল্যের সম্বন্ধ। ইঁহাদের মধ্যে কী গভীর প্রণয় ছিল তাহা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রথম শ্রোতা ইঁহারা; গগনেন্দ্রনাথদের চিত্রাবলীর প্রথম দর্শক রবীন্দ্রনাথ। কবির বহু নাটক-অভিনয়ে গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয় প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেন। শেষজীবনে গগনেন্দ্রনাথ মুখপক্ষাঘাতে মূক হইয়া যান। ইঁহার মৃত্যুসংবাদে আমরা কবিকে একটি মাত্র কবিতা[৫] লিখিতে দেখি; এখন তাঁহার যে বয়স তাহাতে কোনো আঘাত তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

১ *Visva-Bharati News*, Vol VII, No 1, July 1938, p. 3।

২ An address, ৪ অগস্ট ১৯৩৮। *The Visva-Bharati Quarterly*, 1938, pp. 132-36।

৩ বঙ্কিমচন্দ্র। অবিস্মরণীয়, দেশ পত্রিকা, ২ পৌষ ১৩৬১। দ্র বর্তমান গ্রন্থ, পাদটীকা ৩, পৃ ১৪৯।

৪ প্রথমখানি প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানি পুস্তকাকারে ছাপা হয় নাই।

৫ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ অগস্ট ১৯৩৮; সেঁজুতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৬১। *The Visva-Bharati Quarterly*, New Series, Vol. IV Part I, May 1938: Memoirs of Gaganendranath Tagore—The Marquess of Zetland [Lord Ronaldshay], pp 1-4; Gaganendranath Tagore—Sir William Rothenstein, p 4; Cousin Gaganendranath—

আপনার সাহিত্যসৃষ্টি ও বিশ্বভারতীর বিচিত্র কার্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও, বাহিরের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন থাকিতে পারেন না, এটি বহু ক্ষেত্রে দেখিয়াছি। সেইরূপ একটি ঘটনার উদ্ভব হইল।

সম্পূর্ণ অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে কবিকে জাপান তথা প্রাচ্য-এসিয়ার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও মনীষী নোগুচির সহিত পত্রবিতর্কে নামিতে হইল। পাঠকের স্মরণ আছে, কয়েক মাস পূর্বে বর্তমান চীন সম্বন্ধে অধ্যাপক তান য়ুন-শান মারফত তিনি যে পত্র মার্শাল চিয়াং কাই-শেককে পাঠাইয়াছিলেন তাহা প্রাচ্য-এসিয়ার সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়। সেই পত্রে কবি চীনের প্রতি জাপানের অন্যায় যুদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কবির এই পত্র পাঠ করিয়া অধ্যাপক নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে এক খোলা পত্র[১] প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি এই যুদ্ধের জন্য চিয়াং কাই-শেককে দায়ী করেন। জাপানী কবি লিখিয়াছেন, "But if you take the present war in China for the criminal outcome of Japan's surrender to the West, you are wrong, because not being a slaughtering madness, it is, I believe, the inevitable means, terrible it is though, for establishing a new great world in the Asiatic continent, where the 'principle of live-and-let live' has to be realized. Believe me, it is war of 'Asia for Asia' With a crusader's determination and with a sense of sacrifice that belongs to a martyr, our young soldiers go to the front . . I do not know why we cannot be praised by your countrymen. But we are terribly blamed by them, as it seems, for our heroism and aim." এ ছাড়াও জাপানের Asia for Asia মতবাদ তিনি সমর্থন করেন এবং বলেন সেই আদর্শ রূপায়িত করিবার জন্য জাপান আজ বদ্ধপরিকর। জাপান এসিয়ায় 'মনরো ডকট্রাইন' কায়েম করিবে এবং সমগ্র প্রাচ্যে Welfare State স্থাপন করিবে। তাহারা চাহে co-prosperity।

রবীন্দ্রনাথ ১ সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) শান্তিনিকেতন হইতে নোগুচির এই পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কবির মতে Asia for Asia এই বুলি 'an instrument of political blackmail'। তিনি চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "You are building your conception of an Asia which would be raised on a tower of skulls।" জাপানের রণকামীদিগকে তৈমুরলঙ্গের সহিত তুলনা করেন। কয়েকদিন পূর্বে জাপানের একজন রাজনৈতিক নেতা ঘোষণা করেন যে, জাপানের সহিত ইতালিও জারমেনির মিতালি (axis) 'highly spiritual and moral reasons' এর জন্য করিতে হইয়াছে; এবং ইহার পশ্চাতে জাপানের 'had no materialistic considerations'। কবি লিখিতেছেন, "I speak with utter sorrow for your people. I know that one day the disillusionment of your people will be complete and through laborious centuries they will have to clear the debris of their civilization wrought to ruin by their own warlords run amok" . . কবি স্পষ্টই বলিলেন, "China is unconquerable, her civilization is displaying marvellous resources" . . কবির বিশ্বাস "Japanese and Chinese people will join hands together in no distant future in wiping off memories of a bitter past. True Asian humanity will be reborn." নোগুচি কবির এই দীর্ঘ পত্রের দীর্ঘ উত্তরই দান করেন। কবি সেই পত্রের উত্তরে

Rathindranath Tagore, pp. 11-16। The art of Gaganendranath— Nirad C. Chaudhuri, *The Modern Review*, March 1938, pp 330-34.

১ নোগুচির পত্র, 41 Sakurayama, Nakano, Tokyo (Japan), 23 July 1938।

(২৯ অক্টোবর) একস্থানে লিখিলেন, "I am quite conscious of the honour you do me in asking me to act as a peacemaker. Were it in any way possible for me to bring you two peoples together and see you freed from this death-struggle and pledged to the great common 'work of reconstructing the new world of Asia', I would regard the sacrifice of my life in the cause a proud privilege. But I have no power save that moral persuation, which you have so eloquently ridiculed."

কয়েক দিন পূর্বে জাপান হইতে কোনো বন্ধু কবিকে লেখেন যে তিনি যদি এই সময়ে জাপানে আসিতে পারেন তবে উপকার হইতে পারে। কবি সেই কথা উল্লেখ করিয়া নোগুচিকে লিখিতেছেন, "I actually thought for a moment, foolish idealist as I am, that your people may really need my services to minister to the bleeding heart of Asia." কবি জাপানকে অন্তর হইতে ভালোবাসেন, কিন্তু তাহার এই হিংস্র রাজ্যপিপাসাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না ; তিনি পত্র শেষ করিলেন এই লিখিয়া— "Wishing your people whom I love, not success, but remorse." এত বড়ো অভিশাপ কখনো কোথাও এমনভাবে সত্য হয় নাই। জাপানের মহাযুদ্ধোত্তর ইতিহাস এই remorse-এর ইতিহাস— জাপান আমেরিকার অঙ্গুলিসংকেতে চলিতে বাধ্য হয়।

নোগুচির এই পত্রে কতখানি তাঁহার নিজের মত ও কতখানি সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্তাদের মত ব্যক্ত হইয়াছিল বলিতে পারি না ; তবে আশ্চর্য লাগে যখন জাপানপ্রবাসী রাসবিহারী বসু[১] জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ লইয়া চীনের প্রতি হানা সমর্থন করিলেন এবং কন্‌গ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিদের নিন্দা করিলেন। জানি না ইহাও যুদ্ধের প্রচারকার্যের আবশ্যিক ঘটনা কি না। আশ্রয়প্রাপ্ত বিদেশীকে দিয়া দেশের নিন্দাঘোষণা যুদ্ধকালীন প্রচার-অস্ত্রের অন্যতম শায়করূপে ব্যবহৃত হইত।

আবার আমরা কবিকে অন্য জগতে পাইতেছি। এবার বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত হইতেছে।[২] এই উৎসবক্ষেত্রে কবি যে ভাষণ দান করিলেন, তাহা 'অরণ্যদেবতা' নামে লিখিত হয়। ভাষণটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মানুষ অরণ্যসম্পদকে কিভাবে ধ্বংস করিয়া পৃথিবীর সর্বনাশ করিতেছে তাহারই আভাস ছিল এই ভাষণে। আজ সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিকদের নিকট বনোচ্ছেদ-সমস্যা উৎকটভাবে স্পষ্ট। কবি লিখিতেছেন, "এ সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। . . মানুষ অমিতাচারী। . . মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে ; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে— এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য— সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে— আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন্ তাঁর ফল, দিন্ তাঁর ছায়া।"[৩]

১ *The Modern Review*, December 1938, p 644।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৭৫, পৃ ১১৯, ২৪ অগস্ট ১৯৩৮ : "৩রা সেপ্টেম্বর [১৯৩৮] নাগাদ এখানে বর্ষামঙ্গল হবে—"।

৩ অরণ্যদেবতা, ১৭ ভাদ্র ১৩৪৫। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৫। এই প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-অধিকর্তার দ্বারা প্রকাশিত সচিত্র

বৃক্ষরোপণ প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা আসিয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ কবির ন্যায় বৃক্ষবন্দনা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে উৎসবের প্রেরণা দিয়াছেন ; কিন্তু এই বৃক্ষরোপণের ব্যাবহারিক দিকের প্রতি যে তাঁহার দৃষ্টি ছিল তাহা শ্রীনিকেতনের সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ইতিহাস অনুধাবন করিলেই জানা যায়। শ্রীনিকেতনের কাজ ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যে সীমিত ; বিশাল মহাদেশতুল্য ভারতের কতটুকু স্থান সে জুড়িয়া আছে! কিন্তু সেখান হইতে 'বনমহোৎসবে'র যে কার্যকরী রূপ চারি দিকের পল্লীমধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার যথাযথ মূল্য নিশ্চয়ই দিতে হইবে।

এই 'অরণ্যদেবতা'র কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় শ্রীনিকেতনে এই ভাবধারা বাস্তবপথে কী রূপ লইয়াছিল তাহাও জানা দরকার। কবির বাণী আকাশের শূন্যমাঝে বিলীন হয় নাই। কালীমোহন ঘোষ ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বহুবিধ গাছ গ্রামে বিতরিত হয়।[১] রন্ধনোপযোগী জ্বালানির সমস্যা ক্রমশই তীব্র হইয়া উঠিতেছে ; গোবর সারকুড়ে না গিয়া রন্ধনশালায় যায়— তার একমাত্র কারণ জ্বালানি কাঠের অভাব। খাদ্যের জন্য শ্রীনিকেতন হইতে ফল মূল শাক সবজির বীজ ও চারা যেমন সরবরাহ করা হইত, তেমনি জ্বালানি কাঠের চারাও বিতরণ করা হইত। অনুসন্ধিৎসু পাঠক শ্রীনিকেতনের এই-সব পুস্তিকা, প্রচারপত্র প্রভৃতি দেখিলেই বুঝিবেন, বাংলাদেশ ও ভারত-সরকার যাহা ১৯৫০ সালে প্রবর্তিত করিলেন তাহার বিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের চারি পার্শ্বের গ্রামের মধ্যে সেই-সকল ভাব প্রচার করেন, কর্মের মধ্য দিয়া তাহাদের রূপও দান করেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কেজো বা practical জিনিসের সঙ্গে উৎসব কেন? এ লঘুতা তো কর্মনিষ্ঠার অন্তরায়! ইহার উত্তরে কবি শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে একবার বলেন— "আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করি নি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা ব'লে মনে করি নি। . . গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চ চূড়ায় উঠেছিল, তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ্য কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। . . যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো ক'রে যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি।" শ্রদ্ধয়া দেয়ম্— এই কথাটি আমাদেরই পূর্বসূরিদের বাণী।

বৃক্ষরোপণোৎসবের দিন সন্ধ্যায় সিংহসদনে 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্য অভিনীত হয় ; কবি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন মধ্যাহ্নে স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আসিয়াছিলেন, কবির বিশেষ আমন্ত্রণে তিনিও এই অভিনয় দেখিতে আসেন।

পরদিন রাধাকৃষ্ণন ছাত্র-অধ্যাপকগণের নিকট যে ভাষণ দান করেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। কবির সহিত রাধাকৃষ্ণনের দীর্ঘদিনের পরিচয়, ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 'রবীন্দ্রনাথের দর্শন' সম্বন্ধে ইংরেজি গ্রন্থ লিখিয়া

বন-মহোৎসবে মুদ্রিত হইয়াছে। ১-৭ জুলাই ১৯৫০, ১৬-২২ আষাঢ় ১৩৫৭। পল্লীপ্রকৃতি, শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত, ২৩ মাঘ ১৩৬৮, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী, পৃ ৮৬-৮৮।

১ "About two hundred plants of a large variety of flowers and fruits were distributed free to representatives of different villages. Tree-planting ceremonies were also organised in several different villages by the villagers themselves on the 4th" [September 1938]. *Visva-Bharati News*, September 1938, p 23। তুলনীয়, সরকারী বন-মহোৎসবে বৃক্ষরোপণের সংখ্যা।

যশস্বী হন। এই ভাষণে স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌ নোগুচিকে লিখিত কবির পত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "the Poet was the voice of the whole civilization even as Gandhi was the conscience of the whole country." তিনি বলেন, এই উভয় মহাপুরুষই বলিতেছেন যে, "the state is only a convenience for providing citizens with economic well-being, cultural opportunity and spiritual life." তাঁহার মতে "modern civilization is a scandal."

রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতা-অন্তে রবীন্দ্রনাথ অতিথিকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, "My only claim is that of an artist who is amply rewarded if he is assured by a visitor like yourself, whose praise is precious, that he has been able to please you."[১]

দিন যায়, বাহিরের কাজকর্ম যাহা পারেন আপন-মনে করেন; সাধ্যমত পড়াশুনাও চলে, যদিও চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হইতেছে। মাঝে মাঝে কবিতাও লিখিতেছেন। 'সেঁজুতি' ছাপা হইয়া গিয়াছে (ভাদ্র ১৩৪৫)। নূতন কবিতা জমিতেছে; এই ধারার প্রথম কবিতা 'আকাশপ্রদীপ' (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ ॥ ৭ আশ্বিন ১৩৪৫)। এই কবিতাটি 'আকাশপ্রদীপে' ভূমিকারও পূর্বে সন্নিবেশিত হইলেও ইহাকে সেঁজুতিরই অনুক্রমণ বলিব: সেঁজুতির আলো দিবার পর আকাশপ্রদীপ জ্বালাইবার পূর্বক্ষণের ভাবনা রূপে মূর্ত হইয়াছে।

ঘরের মাঝে সাঙ্গ হল
চেনা মুখের মেলা।
দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
গোধূলিতে নামল আঁধার,
ফুরিয়ে গেল বেলা,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।[২]

কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে কবিতা লিখিতে হইল; ইতিমধ্যে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিসংরক্ষণ সমিতির পক্ষ হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের উপর কবিতা লিখিয়া পাঠাইবার আবেদন আসিয়াছিল; সেটি লিখিয়া দিলেন (২৪ ভাদ্র ১৩৪৫)।

প্রান্তিক ও সানাইয়ের নিবিড় অনুভূতি ও মনস্বিতার পর হঠাৎ মনটা যেন হালকা হইয়া আসিল। সানাই-এর অন্তে আসিল 'খাপছাড়া' কবিতা[৩]; এবং তার পরেই দুইটি হাস্যোজ্জ্বল নাটিকা— একটি ব্যঙ্গকৌতুক, অপরটি প্রহসন।

তবে দুইটি রচনাই পুরাতন লেখার রূপান্তর। 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক' নামে যে ব্যঙ্গকৌতুকটি লিখিলেন সেইটি 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ'-এর নূতন রূপ মাত্র। সেটি প্রকাশিত হয় সাধনায় (আষাঢ় ১৩০০। ব্যঙ্গকৌতুক)। প্রাচীন দেবতাদের নূতন বিপদ ঘনায়মান, বিজ্ঞানের গবেষণায় দেবতাদের অস্তিত্বলোপের সম্ভাবনায় স্বর্গে সকলেই উৎকণ্ঠিত। 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র লেখাটি ও 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠকে'র[৪] ভাষাটি তুলনীয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি।

১ *Visva-Bharati News*, September 1938, p 21।

২ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৫, পৃ ৪। অবিস্মরণীয়, দেশ পত্রিকা, ২ পৌষ ১৩৬১।

৩ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, ২৯ ভাদ্র ১৩৪৫। প্রহাসিনী, ১ম সংস্করণে খাপছাড়া নামে তিনটি কবিতা ছিল। প্রথম কবিতা, ৫ বৈশাখ ১৩৪৪। পরে ,খাপছাড়া ,গ্রন্থের সংযোজনে এই তিনটি ভুক্ত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, পৃ ৫৭-৫৮।

৪ স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক; প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৫। ব্যঙ্গকৌতুক ২য় সং (কার্তিক ১৩৪৫)।

'ব্যঙ্গকৌতুকে' আছে— "দেবতাগণ বহুল চিন্তা ও তর্কের পর স্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌ দেখিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, এখনো সময় হয় নাই।"[১] এই নাটকে আছে, চিত্রগুপ্ত বলিলেন— "সুরগুরু কখনো সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি।..মর্তে দেবগণের অধিকারে কী পরিমাণে খর্বতা ঘটেছে তার নির্ভুল সীমা নির্ণয়ের জন্য স্বপ্নাদেশ দেওয়া হোক কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাংখ্যিক প্রমাণবিশারদের মাথায়; এ কাজে বৈজ্ঞানিক প্রশান্তি[২] আবশ্যক।" আশা করি, পাঠক এই শেষ বাক্যের দ্ব্যর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন।

'মুক্তির উপায়'[৩] মূল গল্পের সঙ্গে নাটিকার মূলগত ঐক্য আছে। তবে পুষ্পমালা নামে এক মেয়েকে নাটিকার প্রধান নায়িকারূপে সৃষ্টি করিয়া কাহিনীটিকে দীর্ঘ ও হাস্যোজ্জ্বল করিয়াছেন। কবি ভূমিকায় লিখিতেছেন, "পুষ্পমালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দূরসম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতুকে জিনিসকে নানা রকমে পরখ করে দেখছে কখনো নেপথ্যে, কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে।"

সে বলিতেছে, "আমি মজা দেখতে বেরিয়েছি— ছুটি পেয়েছি বই পড়ার গারদ থেকে। দেখতে এলুম কেমন ক'রে নিজের পায়ে বেড়ি আর নিজের গলায় ফাঁস পরাতে নিস্‌পিস্‌ করতে থাকে মানুষের হাত দুটো। এ না হলে ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রসিক লোক, হাসতে ভালোবাসেন।"

পুষ্পমালার ন্যায় মেয়ে সমাজে দেখা যায় কি না জানি না, এক হিসাবে কন্যাটি অতিপ্রগল্‌ভা— high-brow বা নাক-উঁচু অপবাদও দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন মূলগল্পটি লেখেন সাতচল্লিশ বৎসর পূর্বে তখন এই শ্রেণীর নায়িকার কল্পনা তাঁহার সাহিত্যে দেখা যায় কম। সবুজপত্র-উত্তর পর্ব হইতে এই শ্রেণীর নায়িকা তাঁহার গল্প-মধ্যে প্রায়ই দেখা যাইতেছে। পুষ্পমালা হইতেছে লাবণ্য, কেতকী, সরলাদের সমগোষ্ঠীগত নব্যশিক্ষিতা নারী— এমন-কি ইহারা 'গোরা'র নারীও নহে। কবিজীবনের পরিবেশের পরিবর্তন হইয়াছে— এখনকার নায়িকাদের অনেকেই ধনীকন্যা, ড্রয়িংরুমবিহারিণী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণী, এমন-কি বিলাতফেরত রমণী।

যাহাই হউক, এই প্রহসনটির সবটাই হাস্য নহে, কঠোর বিদ্রূপ আছে— সামাজিক কুসংস্কারের উপর কশাঘাতও আছে যুগপৎ। তবে এই শ্রেণীর কশাঘাত তাঁহার রচনায় নূতন নহে। কিন্তু একটা কথা কবির সপক্ষে বলিবার আছে; ধর্মের বহিরবয়বে যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহারই নিন্দা তিনি করিয়াছেন, ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিকতাকে কখনো বিদ্রূপিত করেন নাই।

'মুক্তির উপায়ে' গুরুর ও তাঁহার লাঞ্ছনার কাহিনীর সহিত রাজশেখর বসুর 'বিরিঞ্চিবাবা'র কিছু মিল পাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই গুরু শেষকালে পুলিসের ভয়ে পলায়ন করিতেছেন। গল্পগুচ্ছের মূল আখ্যায়িকা ক্ষুদ্র, নাটকে সেইটি বহুপল্লবিত ও হাস্যোজ্জ্বল করার চেষ্টা হইয়াছে।

এবার পূজার ছুটি পড়িয়াছে সেপ্টেম্বরের শেষভাগে (২৫ সেপ্টেম্বর - ২৯ অক্টোবর ১৯৩৮)। গান্ধীজির জন্মদিনের

১ প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ, সাধনা, আষাঢ় ১৩০০। ব্যঙ্গকৌতুক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ ৫২৪।

২ বৈশাখ ১৩৪৭। "প্রশান্তচন্দ্র [মহলানবিশ] দীর্ঘদিনের সাধনায় স্ট্যাটিস্টিক্‌সের [সাংখ্যিক] কাজে যে দক্ষতা অর্জন করেছেন, তারই জোরে প্রতিদিন অজস্র সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন। তিনি বাঙালী বলে অবাঙালীরা তাঁর প্রাপ্য দিতে কার্পণ্য করছেন না। নিঃসংকোচে সকলে তাঁর সাহায্য গ্রহণ করছেন।"— সজনীকান্ত দাসকে সাক্ষাতে বলেন। দ্র ভারত, ১৭ বৈশাখ ১৩৪৭।

৩ মুক্তির উপায়; অলকা, আশ্বিন ১৩৪৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫৫-৮৮। দ্র *Visva-Bharati News*, **September 1938, p 18.**

উৎসব হয় ২ অক্টোবর ; কিন্তু বিদ্যালয় সে সময়ে বন্ধ থাকিবে বলিয়া ২১ সেপ্টেম্বর মন্দিরে জন্মদিন স্মরণ করিয়া কবি ভাষণ দান করিলেন।[১]

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে কবি বাহিরে কোথাও গেলেন না। আপন-মনে আপন কাজ করিয়া চলেন। অন্তরের ও বাহিরের বিচিত্র ভাবনা ও ঘটনা মনকে নাড়া দেয়— তাহার প্রকাশ হয় কবিতায়, পত্রে বা প্রবন্ধে। আমাদের আলোচ্যপর্বে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৩৮) য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহার ঘনায়মান আয়োজন সুস্পষ্ট। হিটলার মধ্য-য়ুরোপকে গ্রাস করিতে উদ্যত ; চেকোশ্লোভাকিয়া আজ রাহুগ্রস্ত। এই প্রাচীন জাতি বহু শতাব্দী অস্ট্রিয়ার পাদপীঠতলে পিষ্ট হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাহাদের স্বকীয় সত্তা স্বীকৃত হয়, চেক্‌রা আপন রাজ্য স্থাপন করিতে পারে। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে চেকোশ্লোভাকিয়া রিপাবলিক মাসারিকের (Masaryk) সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর বিশ বৎসরে ঐ দেশের অনেক উন্নতি হয়। ইতিমধ্যে নাৎসিদের প্ররোচনায় চেকোশ্লোভাকিয়ার জারমান অধিবাসীরা সুদেটান (Sudetan) অংশে আত্মকর্তৃত্বের দাবি করে। ডক্টর এডুআর্ড বেনেস (Benes) তখন সভাপতি। ১৯৩৫ সালে পঁচাশি বৎসর বয়সে মাসারিক সভাপতিত্ব ত্যাগ করেন ; বেনেস তাঁহার স্থলে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জারমানদের তোষণ করিবার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স ম্যুনিকের কন্‌ফারেন্সে ঘোষণা করিলেন যে সুদেটান অঞ্চল নাৎসি জারমেনির অন্তর্গত হইতে পারে। এইটি ঘোষিত হয় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ১৫ অক্টোবর চেকোশ্লোভাকিয়ার অধ্যাপক লেস্‌নিকে (Lesney) একপত্র মধ্যে লেখেন—"My words have no power to stay the onslaught of the maniacs, nor even the power to arrest the desertion of those who erstwhile pretended to be the saviours of humanity." এই maniac হইতেছে হিটলার, ও মনুষ্যত্বের ত্রাণকর্তা হইতেছে ইংরেজ প্রভৃতি জাতি, যাহারা হিটলারের হুমকি শুনিয়া ত্রস্তব্যস্ত হইয়া তোষণনীতি অবলম্বন করিতেছেন। কবি অতি দুঃখে লিখিতেছেন, "I feel so humiliated . . so helpless . . "[২]

ম্যুনিক প্যাক্ট হইবার চারিদিন পরে কবি 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটি লেখেন। (৪ অক্টোবর ১৯৩৮)।[৩] য়ুরোপের, চীনের, ইথিওপিয়ার ঘটনাবলীর আলোকে কবিতাটি পঠনীয়। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মাত্র উদ্‌ধৃত করিতেছি—

পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়। . .
প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,

১ *Visva-Bharati News*, October 1938, p 27। লিখিত ভাষণ বা অনুলিখিত ভাষণ পাই নাই।

২ *Visva-Bharati News*, November 1938, p 38।

৩ প্রায়শ্চিত্ত, বিজয়াদশমী [১৭ আশ্বিন] ১৩৪৫ ; প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৯ ; গ্রন্থপরিচয় অংশে ইহার আর-একটি রূপ আছে (পৃ ৪৬৬-৬৮)। এই কবিতাটির অনুবাদ কবি অধ্যাপক লেস্‌নিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন— *The Hindusthan Standard*, 10 November 1938। ইংরেজি অনুবাদ, *The Visva-Bharati Quarterly*, November 1938 ; also *Poems*, p 105।

ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।. .
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

এই কবিতাটি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে কী দাঁড়ায় তাহার বিচারের ভার পাঠকদের উপর ছাড়িয়া দিলাম। কোন্ দেশের নূতন জীবন নূতন আলোকে দেখা দিয়াছে? এ কি সেই দেশেরই ইঙ্গিত! বিপুলবীর্য শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা কোথায়?

কবির মনে উত্তেজনা আসে— পত্রে প্রবন্ধে বা কবিতায় ব্যক্ত করেন রুদ্ধ ভাবনা; মন শমিত হয়— অন্যলোকে প্রয়াণে সময় লাগে না। যেদিন 'প্রায়শ্চিত্ত' লেখেন সেইদিনই লেখেন 'বেজি' (৪ অক্টোবর ১৯৩৮)।[১]

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে কবি শান্তিনিকেতনে আছেন, আপনার কাব্যলোকে থাকিতে চান। বৃদ্ধবয়সে মানুষের মন স্বভাবতই ধাবিত হয় অতীতের কল্পলোকে। 'সেঁজুতি' প্রকাশিত হইয়া যাইবার পরে যে কবিতা লিখিতেছেন তাহার অনেকগুলিই 'স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা'।

'আকাশপ্রদীপ' কবিতাটির মধ্যে পুরাতনের হারানো ছবি জাগিতেছে (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)।

পাণ্ডু-আঁধার বিদায়-রাতের শেষে
যে তাকাত শিশিরসজল শূন্যতা-উদ্দেশে
সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে
অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে।
অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ-পানে—
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

১ আকাশপ্রদীপ. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ১০৩-০৪।

এই কবিতাটি পূরবীর 'তারা' কবিতাটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়— 'ওই কি আমার হবে আপন তারা।' আজ জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া প্রথম জীবন-প্রত্যুষের ধ্রুবতারার কথা কি মনে হইতেছে? আবার আপনার দেহের মধ্যে ও মনের মধ্যে এবং পৃথিবীর চারদিকে যে-সব ভাঙাগড়া ও ওঠাপড়া চলিতেছে সেই দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন জাগিতেছে 'কেন'। 'আকাশপ্রদীপ' কবিতাটি যেদিন লিখিত হয় সেইদিনই 'কেন'র প্রথম খসড়া করেন।[১]

আবার কি সূত্র তার ছিন্ন হয়ে যাবে,
রূপহারা গতিবেগ
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্যযাত্রাপথে
ভেঙে ফেলে দিয়ে তার
স্বল্প-আয়ু বেদনার কমণ্ডলু?
কিন্তু কেন।

সম্মুখের দিনগুলি ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে; তাই অতীত জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে মন বিচরণ করিতেছে—

. . পুরানো স্মৃতিরে দীর্ণ করি
সৃষ্টির আরম্ভবীজ লয় ভরি ভরি
আপনার পক্ষপুটে ফিরে-চলা যত প্রতিধ্বনি।

এই শ্রেণীর কবিতা হইতেছে—স্কুল-পালানে (১৪ অক্টোবর ১৯৩৮), ধ্বনি (২১ অক্টোবর), গানের স্মৃতি (২২ অক্টোবর), বঁধু (২৫ অক্টোবর), জল (২৬ অক্টোবর), শ্যামা (৩১ অক্টোবর)। সানাই-এর অন্তর্ভুক্ত গানের স্মৃতি ব্যতীত আর সবগুলিই নূতন কাব্য 'আকাশপ্রদীপে'র অন্তর্গত। এগুলি জীবনস্মৃতির ঘটনাপূর্ণ কবিতা।— ছয় মাস পরে লিখিত 'কাঁচা আম' 'শ্যামা'র সঙ্গে পঠনীয়। এই সময় হইতে অনেক রচনাই 'স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা'। যথাসময়ে সেগুলির আলোচনা করিব।

এই কাব্যধারা রচনার পর্বে[২] কবি তাঁহার 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থের জন্য[৩] একটি ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে কবির মনের ব্যাপ্তি ও গভীর অধ্যয়নশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ Bopp, Beams, Hoernle, MaxMuller, Sayce, Whitney, Bailey, Brugmann, Grierson ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সুপরিচিত গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রনাথ কী নিষ্ঠা ও মনোনিবেশের সহিত

১ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮; দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৬৮-৭০। এইটি পুনরায় লেখেন ১২ অক্টোবর ১৯৩৮। সেই পাঠটি 'নবজাতকে' গৃহীত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ১৩-১৫।

২ ২৭ অক্টোবর (১৯৩৮) কবি 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত লিখিয়া দেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়া অমরকীর্তি অর্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে লিখিলেন, " 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' প্রকাশের আয়োজন যাঁরা করচেন তাঁদের প্রতি সাধুবাদ সাহিত্যিক সৌজন্যের প্রচলিত অলস রীতিরূপে প্রয়োগ করলে উদ্যোগীদের বঞ্চনা করা হবে।"— প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, পৃ ২৫০।

৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয় (২৪ অক্টোবর ১৯৩৮, ৭ কার্তিক ১৩৪৫)। গ্রন্থখানি বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ কর্তৃক পাঠ্যরূপে মনোনীত হইয়াছে। 'ভূমিকা'টি গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (১৩৪৫) প্রথম মুদ্রিত হয়। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬।

পাঠ করেন তাহার প্রমাণ ঐ-সকল গ্রন্থ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বহন করিতেছে। অধিকাংশ গ্রন্থেই তাঁহার স্বহস্তলিখিত মন্তব্য রহিয়াছে।

এ ছাড়া গ্রামের ও শহরের নানাশ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসায় বাংলাভাষার শব্দপ্রয়োগ ও উচ্চারণবিধির প্রভেদ সূক্ষ্মভাবে তিনি বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। এই অধ্যয়ন, শ্রবণ ও চিন্তনের ফলে তিনি যে-সব প্রবন্ধ লেখেন তাহার কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি; 'শব্দতত্ত্ব' বাংলাভাষার রহস্য উদ্‌ঘাটনের অন্যতম প্রথম প্রচেষ্টা।

'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে ভাষার উৎপত্তি ও ভাষার সহিত ভাবের সম্বন্ধ, ভাবের সহিত শব্দসৃষ্টির প্রয়াস প্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। মানুষের মনোভাব-প্রকাশে ভাষাজগতের অদ্ভুত রহস্য কবিকে অভিভূত করিয়াছে। ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধান বর্তমানযুগে আর ভাষার রাজ্যে আবদ্ধ নাই; জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বের মধ্যে ভাষার অভিব্যক্তি কিভাবে হইতেছে, তাহা আজ পণ্ডিতের আলোচনার বিষয়। কবি বাংলাভাষার পরিচয় দিতে গিয়া ভাষার মূলতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন; ভূমিকায় বলিতেছেন, "মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তারই ব্যাখ্যা করে এই বইটি আরম্ভ করেছি।"

"সমাজ ও সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত। . .

"জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই-যে ভাষা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে, এ আমাদের বিস্মিত করে না, যেমন বিস্মিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি— যে চোখের দ্বার দিয়ে নিত্যনিয়ত পরিচয় চলেছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে।"[১]

'বাংলাভাষা-পরিচয়ে'র ভাষা হইতেছে চলতি বাংলা। চলতি বাংলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখাইবার জন্য আমাদের মনে হয় কবি রীতিমত মেহনত করিয়া একটা মান খাড়া করেন। কবি এই ভাষাকে বলিয়াছেন প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও স্থানভেদে রূপভেদ আছে। কবির মতে এই-সব প্রাকৃতের মধ্যে বিশেষ একটি প্রাকৃত আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বাহন হইয়াছে। এই প্রাকৃত বা "চলতি বাংলা চলতি বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়।" সেইজন্য কবির মত যে "এই বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই।" লেখার ভাষা ও বলার ভাষার মধ্যে ভেদ যদি ক্রমেই বিস্তৃত ও গভীর হইয়া যায় তবে কালে লেখার সাহিত্য অচল হইয়া পড়ে; সেইজন্য ভাষার রাজ্যে সমাজ ও সাহিত্যিকের শাসন থাকার প্রয়োজন, ব্যাকরণশিক্ষা সেই কার্য করিতে পারে। বলা বাহুল্য ভাষার basic রূপের বদল হয় সামান্যই, বদল হয় তাহার superstructureএর বা বহিরবয়বের। বাংলার basic রূপ 'প্রাকৃত'— তাহা চৈতন্য-মহাপ্রভুর যুগেও যা এখনো তাহাই; বদল হইয়াছে শব্দসম্পদে ও শৈলীতে।

১ বাংলাভাষা-পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৩৭৪-৭৫।

পূজার ছুটির পরে

পূজার ছুটির পর বিদ্যালয় খুলিল ৩০ অক্টোবর; সেই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্কাউট-নায়কদের শিক্ষাশিবির (Training Camp) স্থাপিত হয় শান্তিনিকেতনে। ৩০ অক্টোবর ক্রীড়াদি প্রদর্শনীর পর কবি ভাবী নায়কদের উদ্দেশে উপদেশ দান করেন। কবি বলিলেন, "Never grow old . . I have been able to preserve my spirit of youth, despite the misleading exterior of my grey hair, simply because I have never ceased to love this earth and this life. It is a gift so great and so within the reach of us all that I cannot wish you better."[১]

বিদ্যালয় খুলিলেই বিচিত্র কাজের চাপ আসে; নানা ফরমাশ নানা সমস্যা মিটাইতে হয়। ভাবেন বয়স হইয়াছে চুপ করিয়া থাকিবেন, সম্ভব হয় না। বিদ্যালয় খুলিবার দিন-বারো পরে ডকটর মেঘনাদ সাহা আশ্রমে আসেন। তিনি যে সভায় বক্তৃতা দেন তথায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়াছিলেন (১৩ নভেম্বর ১৯৩৮)।

অনুরোধ আসিয়াছে ১৭ নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার অভিমত পাঠাইতে হইবে। তিনি যাহা লিখিয়া দেন তাহা ইতিপূর্বে উদ্‌ধৃত হইয়াছে।[২]

পরদিন কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুসংবাদ আসিলে বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ করা হয় (১৮ নভেম্বর); সেদিন রবীন্দ্রনাথ সভায় যে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন তাহাতে তিনি বলেন, "শতাব্দীর অধিক কাল হল আমরা শক্তিশালী পাশ্চাত্য জাতির শাসন-শৃঙ্খলে বাঁধা আছি। কিন্তু যন্ত্রশক্তির এই চরম বিকাশের দিনেও এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা উপবাসী, আমরা রোগজীর্ণ, দারিদ্র্যে আমরা সর্বতোভাবে পঙ্গু। যে বিদ্যা অপমান ও দুর্গতি থেকে মানুষকে রক্ষা করে, তার স্পর্শ আমরা পাই নে বললেই হয়। এই শিক্ষা জাপানের হয়েছে। . .

"এসিয়ার পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে দেখলুম তুর্কী যাকে য়ুরোপ sickman of Europe বলে অবজ্ঞা করত, সে কিরকম প্রবল শক্তিতেই অসম্মানের বাঁধন ছিন্ন করে ফেলল। য়ুরোপের প্রতিকূল মনোবৃত্তির সামনে সে আপনার জয়ধ্বজা তুলে ধরলে। এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই আত্মগৌরব লাভের দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের দুর্গতিগ্রস্ত ইতিহাসের আওতার আবছায়ার ভিতরে একটা আশ্বাসের আলো প্রবেশ করল। মনে হচ্ছে অসাধ্যও সাধ্য হয়। স্বাধীনতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত নয়— যা চাই তা পাব। মূল্য দিতে হবে, সে মূল্য দেবার লোক উঠবে।"

কামাল আতাতুর্ক সম্বন্ধে কবি বলিলেন, "তিনি তুর্কীকে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন সেইটেই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়, তিনি তুর্কীকে তার আত্মনিহিত বিপন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন। মুসলমান ধর্মের প্রচণ্ড আবেগের আবর্ত-মধ্যে দাঁড়িয়ে, ধর্মের অন্ধতাকে প্রবলভাবে তিনি অস্বীকার করেছেন। যে অন্ধতা ধর্মেরই সবচেয়ে বড়ো শত্রু, তাকে পরাভূত করে তিনি কী করে অক্ষত ছিলেন, আমরা আশ্চর্য হয়ে তাই ভাবি। তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, সে বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্লভ— বুদ্ধির গৌরবে অন্ধতাকে দমন করা তাঁর

১ *Visva-Bharati News*, November 1938, p 39। কবির ক্ষুদ্র ভাষণের ইংরেজিটি আমরা পাই। মূল বক্তব্য বাংলায় বলেন। ভাষণটি শ্রীসুধীর কর ও শ্রীক্ষিতীশ রায় -কর্তৃক অনুলিখিত ও রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত হইয়া আনন্দবাজার পত্রিকা (২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৮) প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে কিয়দংশ *Visva-Bharati News*, December 1938 -এ বাহির হয়।

২ রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ ২১, পাদটীকা।

সব চাইতে বড়ো মহত্ত্ব, বড়ো দৃষ্টান্ত। . . তুর্কীকে স্বাধীন করেছেন বলে নয়, মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র দিয়েছেন বলেই কামালের অভাবে আজ সমগ্র এসিয়ার শোক।" . .

এই ভাষণে কবি তুর্কী ও পারস্যের ধর্মবিষয়ক যে উদারতার কথা বলিলেন তাহা তুর্কীর ক্ষেত্রে সত্য হইতেও পারে— পারস্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সত্য নহে। পারস্যের শিয়া মুসলমান মোল্লাদের গোঁড়ামির কথা কবি ভালোরূপে জানিতে পারেন নাই; তাহাদের ধর্মান্ধতার ফলে বাহাইরা কিভাবে নির্যাতিত হইয়াছিল তাহা কবি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন; কবি বাহাইদের সম্বন্ধে ভালো করিয়াই জানিতেন এবং আবদুল বাহা সম্বন্ধে নিউইয়র্কে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভাষণও দান করেন। এইটি প্রসঙ্গত আমরা পাঠকদের জন্য পেশ করিলাম।[১]

দেশের দিকে তাকাইয়াও আজ কোনো ভরসা পাইতেছেন না; সেখানে দেখিতেছেন— রাজনীতির মধ্যে না আছে শৌর্য, না আছে বীর্য, না আছে বৃহৎ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ। কবি হতাশভাবে একখানি পত্রে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন, "আমার মন সরে যেতে চাচ্ছে সুদূরে— সেই দূরকে নিজের ভিতরেই সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি।"[২] তাঁহার ইচ্ছা সায়ান্স চর্চা করেন— নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশকালের মধ্যে তীর্থযাত্রা করিয়া ভূমাকে ভোগ করেন। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে আত্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া অসীমকে উপলব্ধির একান্ত ইচ্ছা। তাই বলিতেছেন, "যে বিশ্বজালে অচিন্তনীয় দূর নীহারিকার সঙ্গে একই আলোকসূত্রে বোনা আমার অস্তিত্ব, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধরা দিয়েছে তার টানে, সে আমাকে নিয়ে চলেছে সেই অপরিসীম রহস্যের দিকে যার মধ্যে জীবন-মরণের তাৎপর্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন, সেই তাৎপর্যের মধ্যে রয়েছে কোনো-একটা চিরন্তন অর্থ— যে অর্থ বহন ক'রে চলেছে অসীমের অভিমুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।" নবজাতকের 'প্রশ্ন'[৩] কবিতাটি এই পত্রের সঙ্গে পঠনীয়—

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহুদূরে,
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।
কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
পণ্ডিতেরা, লক্ষকোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে।
আপনার পানে চাই,
লেশমাত্র পরিচয় নাই।
এ কি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি।
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি।
বহুযুগে বহুদূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি-বিস্তার,
যেন বাষ্পপরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে রূপান্তরে।
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে। . .
এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি।

১ The first and the last prophet of Persia, *The Visva-Bharati Quarterly*, Vol VIII, No. IV, 1931।

২ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮ [১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫]।

৩ প্রশ্ন, নবজাতক। শান্তিনিকেতন, ৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৫-৪৬।

এই অজানার কথা কবির কাব্যে ও রচনায় বারে বারে আসিয়া পড়িলেও এই অজানা অনিশ্চিত নহে।

পত্র ও কবিতা লিখিয়া নক্ষত্রলোকে বিচরণের সুখ অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু বাস্তব জগৎ— বিশেষভাবে বিশ্বভারতী— সকালে চোখ মেলিলেই শত প্রশ্ন সহস্র সমস্যা লইয়া দ্বারে উপনীত হয়। তাহাকে এড়াইতে পারেন না, 'রাহুর প্রেম'-পাশে পিষ্ট হইলেও মুক্তি নাই; আর মুক্তি তিনি চাহিতেনও না— সবার সাথে চলার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে চাহিতেন না।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যায়তনের মধ্যে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন চলেই। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯৩২ সাল হইতে শিক্ষাভবন (কলেজ) ও পাঠভবন (স্কুল) একই পরিচালকের অধীনে আনীত হয় ও ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ অক্টোবরে ধীরেন্দ্রমোহন বিলাত গেলে প্রমোদারঞ্জন ঘোষ প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কর্তৃক উভয় বিভাগের অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছিলেন। এইবার পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে পুনরায় দুই বিভাগ পৃথক্ করা হইল (১৫ নভেম্বর ১৯৩৮)। প্রমোদারঞ্জন স্কুলবিভাগের রেকটর ও অনিলকুমার চন্দ কলেজবিভাগের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন; অনিলকুমার কবির সেক্রেটারির কাজ পূর্বের ন্যায় করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত একটি ঘরোয়া উৎসবের সংবাদ আছে— রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইলে কবি পুত্রের আয়ু ও মঙ্গল কামনা করিয়া একটি কবিতা লিখিয়া দেন (২৭ নভেম্বর ১৯৩৮ ॥ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫)। পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ স্বাভাবিক। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার কর্মের সহায়মাত্র ছিলেন না, তাঁহার আদর্শকে মূর্তি দান করিবার জন্য তিনি যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাই আজ কবি প্রকাশ করিলেন কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অদ্ভুত খেয়ালী প্রতিভাকে লইয়া চলা যে কী কঠিন, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে জানা সহজ নহে। যাহাই হউক রথীন্দ্রনাথের এই জন্মদিন পারিবারিক ঘটনা হিসাবে স্মরণীয় হইলেও শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের দিক হইতেও এইটি উপেক্ষণীয় হয় নাই; আশ্রমে ছাত্র-অধ্যাপকগণের সম্মিলিত শুভ-ইচ্ছা স্বতঃস্ফূর্ত হয়। উক্ত কবিতাটি ("মধ্যপথে জীবনের মধ্যপথে উত্তরিলে আজি") এখনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।[1]

রবীন্দ্রনাথের বয়স আটাত্তর বৎসর হইলেও বিশ্বভারতীর সর্ববিভাগের কাজের সঙ্গে যোগ এখনো রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। স্থির হইয়াছে শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার[2] কলিকাতায় খোলা হইবে (৮ ডিসেম্বর ১৯৩৮) এবং সেটি কন্‌গ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসু উদ্‌ঘাটন করিবেন। সুভাষচন্দ্র তখন পঞ্জাবে; কবির প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তিনি পঞ্জাব হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন, দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ শরীরের জন্য উৎসবে যোগদান করিতে পারিলেন না; তিনি যে ভাষণ লিখিয়াছিলেন তাহা রথীন্দ্রনাথ পাঠ করিলেন।[3]

এই ভাষণ হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মাত্র উদ্‌ধৃত করিতেছি— "সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক্ এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভুরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে, কলুষিত

১ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্ম ২৭ নভেম্বর ১৮৮৮; মৃত্যু, দেরাদুন, ৩ জুন ১৯৬১।

২ কলিকাতায় ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে বিশ্বভারতী বুকশপের সংলগ্ন কক্ষে শ্রীনিকেতনের গৃহশিল্পজাত সামগ্রীর ভাণ্ডার খোলা হইয়াছিল। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা ধর্মতলা স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে কোনো ভাণ্ডার নাই।

৩ বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্বোধন; অভিভাষণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ [৮ ডিসেম্বর ১৯৩৮]। ৮ পৃষ্ঠা। প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৫, পৃ ৪৮২-৮৪। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির-প্রাঙ্গণে সভা হইয়াছিল। পল্লীপ্রকৃতি, শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত, বিশ্বভারতী, শতবর্ষপূর্তিগ্রন্থমালা, ২৩ মাঘ ১৩৬৮, পৃ ৮৯-৯৩।

হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ-উৎসেরও সেই দশা। সেইজন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না, একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। .. শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়— তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

"সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ— জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। .. আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।"

এই ভাষণের শেষাংশে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবি আশঙ্কা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই ব'লে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। এ কথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কি না।" রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের পর সুভাষচন্দ্র বলেন যে, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের পর বর্তমান থাকিবে না, ইহা মিথ্যা কথা। ইহাতে শাশ্বত সত্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা অবিনশ্বর। হয়তো ইহার বর্তমান আকার (শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন) স্থায়ী না হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার সত্য অংশ ভিন্ন আকারে চিরস্থায়ী হইবে।[১]

বর্তমানে দেশে পল্লীসংস্কারের যে উদ্যোগ চলিতেছে, চিন্তায় ও কর্মে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্যতম প্রধান ও প্রথম পথ-প্রবর্তক। সুভাষচন্দ্র তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত একটি স্মৃতিকথার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্বে তিনি ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশসেবার বিষয়ে উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন। নানারূপ ভাবধারার সংঘাত তখন দেশে চলিতেছিল। কবির নিকট হইতেও কবিজনোচিত উদ্দীপনাময়ী বাণীই তাঁহারা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিলেন শুধু গ্রামসংগঠনের কথা— এই নীরস কথা শুনিয়া সেই তরুণ বয়সে তাঁহারা মোটেই প্রীত হন নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে রবীন্দ্রনাথের সেই উপদেশের মর্ম তিনি ভালো করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন।

কলিকাতায় শিল্পভাণ্ডার স্থাপনের প্রায় সমসাময়িক ঘটনা শান্তিনিকেতনে কলাভবনে হ্যাভেল[২]-স্মৃতি-মন্দির

১ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৫, পৃ ৪৮৪।

২ Havell, E. B. (1861-1934): A. R. C. A., Indian Educational Service; Superintendent of the Madras School of Arts (1884-92); as Reporter to Government on Arts and Industries conducted an official investigation into the indigenous handicrafts; Principal, Calcutta School of Art and Keeper of the Government Art Gallery (1896-1906); reorganized Art Education on Indian lines and helped to form the New School of Indian Painting; Fellow of the Calcutta University. Publications: *Indian Sculpture and Painting, The Ideals of Indian Arts, Indian Architecture, The Himalayas in Indian Art*, etc.; articles on Indian history art, economics and politics in Harmsworth's Universal History and in English, American and Indian reviews,

প্রতিষ্ঠা। ঈ. বি. হ্যাভেলের নিকট ভারতীয় কলা যে কী পরিমাণ ঋণী তাহা অনেকের নিকট আজ অস্পষ্ট। আধুনিক ভারতের আত্মমর্যাদা তথা তাহার কলা-চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে কয়জন বিদেশী মনীষী ও মনস্বিনী সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হ্যাভেল, ওকাকুরা ও নিবেদিতার (মিস্ নোব্‌ল্) নাম অমর স্থান লাভ করিবে। এই ভাবুকত্রয়ের সুষ্ঠু আলোচনা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই দিন রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেন তাহাও স্মরণীয়।[১]

কবি বলিলেন, "চিত্রকলায় রূপসাধনার পরিচয় আমাদের বাড়িতেই পাই। অবন [অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর] যখন প্রথম তুলি ধরলেন তিনিও বিদেশী পথেই শিক্ষাযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, ইস্কুলমাস্টারের স্বাক্ষরের মকৃশো ক'রে।.. সেই চির-ছাত্রগিরির দুর্দিন আজও হয়তো চলত যদি হ্যাভেল এসে দৃষ্টি না ফিরিয়ে দিতেন। তিনি ফিরিয়ে দিলেন সেই দিকে ভারতীয় রূপকলার যেখানে প্রাণপুরুষের আসন।. সেজন্যে হ্যাভেলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।"[২]

হ্যাভেল দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারত-শিল্পধারাকে পুনঃপ্রবর্তিত করিবার জন্য যে-সব প্রবন্ধ ও পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, ও তৎসংক্রান্ত যে-সব আলোচনা সমসাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কাটিং (cuttings) তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইসব কাগজপত্র হ্যাভেল-সংগ্রহে আছে; ভারতশিল্পের পুনরুত্থানের ইতিহাস রচনায় একদিন এই-সবের প্রয়োজন হইবে।

সাতই পৌষের উৎসবদিনে কবি যথারীতি উপাসনা করিলেন। তিনি ভাষণে বলেন, বুদ্ধির পথে মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা বিস্ময়কর। মানুষ "স্থূলকে দেখেছে অস্থূলরূপে তেজোময় সর্বব্যাপকত্বে— জ্ঞানের অভিব্যক্তিতে এ তত্ত্ব অত্যাশ্চর্য।" অথচ আত্মার দিক হইতে সে মানুষ কী মূঢ়, কী নিষ্ঠুর। "বুদ্ধির অন্তর্গত এত বড়ো বিরাট বিকাশের সঙ্গে শ্রেয়োবুদ্ধির এমন হীনতার সমাবেশ মনকে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।" কবির মতে মানুষ তাহার 'অভিব্যক্তির আরো উপরের ভূমিকায়' উঠিবে— এখনো সে আত্মার বিকাশে অপরিণত। এই শ্রেণীর মতবাদ বহু আদর্শবাদী বিশ্বাস করেন।[৩]

পরদিন বিশ্বভারতী-বার্ষিক-পরিষদেও প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রূপে অভিভাষণ দান করিলেন।[৪] কবি এই ভাষণে বিশ্বভারতী স্থাপনের প্রেরণা সম্বন্ধে বলিয়া বক্তৃতাশেষে যে কথাটি বলিলেন, তাহা প্রত্যেকের স্মরণ করা দরকার— "যাঁরা.. এখানে আসেন তাঁদের জানিয়ে রাখি, আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বুদ্ধি নেই। এখানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করি নি, এবং সেই কারণে যদি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। আমরা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেয়কে বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্ব-সাধনার সঙ্গে এক ব'লে জানি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা রয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের দেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানা বসেছে।.. ব্যাপকভাবে.. সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে দেব, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল— সকল

১ এই সভার সভাপতিত্ব করেন পাটনার ব্যারিস্টার শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন দাস (P. R. Das)। শ্রীযুক্ত দাস ভারতশিল্পের বিশেষ অনুরক্ত; তিনি বহুশত টাকা দিয়া নন্দলালের চিত্র 'উমার তপস্যা' ও অবনীন্দ্রনাথের 'আওরঙজেব' এবং 'দারাসিকোর ছিন্নমস্তক' চিত্র ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা এই সময়ে কলাভবনে দান করেন।

২ ঈ. বি. হ্যাভেল [শান্তিনিকেতনে হ্যাভেল-স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কবির ভাষণ, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -কৃত অনুলিপি অবলম্বনে বক্তা-কর্তৃক পুনর্লিখিত]। ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৮, প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৫, পৃ ৪৯৩-৯৫।

৩ ৭ই পৌষ [শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আচার্যের উদ্বোধন ও উপদেশ, শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত] প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৫, পৃ ৫৬৭-৬৯।

৪ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত; প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৫, পৃ ৫৯৬-৯৯।

রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত-সাধনের জন্যে যে-সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করব।"

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সাংস্কৃতিক শিক্ষার সঙ্গে কবি পল্লীহিতকর কার্য যুক্ত করিতেছেন। এই রচনার বহু বৎসর পর স্বাধীন ভারতের শিক্ষাপরিকল্পনায় ছাত্রদের এই পল্লীমঙ্গল-কর্মকে উপাধি লাভের পক্ষে আবশ্যিক করা যায় কি না, সে বিষয়ে আলোচনা শোনা গিয়াছিল। Society and education, community and education প্রভৃতি লইয়া বহু আলোচনা দেশেবিদেশে হইতেছে; শিক্ষাকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলাইবার প্রশ্ন কবির ভাবনার মধ্যে আসিয়াছিল বহুকাল পূর্বে।

এবার সাতই পৌষ-উৎসবের প্রথম দিনে এল্‌ম্‌হার্স্ট বিলাত হইতে আসেন; তিনি ষোলো বৎসর পূর্বে কয়েকজন কর্মী লইয়া শ্রীনিকেতনের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া গিয়া ১৯২৫ সালে ডিভনশায়ারে টটনেসে ডার্টিংটন হল নামে যে বিদ্যানিকেতন স্থাপন করেন তাহা শ্রীনিকেতনের আদর্শেই গঠিত। এল্‌ম্‌হার্স্ট লিখিয়াছেন—"It is some of these same principles that we learnt from the Poet that we have been trying out in Devonshire at Dartington Hall since 1925."[১] সেখানে কিভাবে কাজ চলিতেছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাই ধীরেন্দ্রমোহন সেনের বিদেশভ্রমণ-অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন হইতে।[২]

এনড্রুজ সাহেবও বহুদিন পরে উৎসবের শেষভাগে আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন; তবে একদিন মাত্র থাকিয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন; সেখানে অল্ ইণ্ডিয়া ফিলজোফিক্যাল কন্‌গ্রেসের সভাপতিত্ব করিবেন। পুনরায় ১৩ জানুয়ারি আশ্রমে ফিরিয়া কবির নানা কাজে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পৌষ-উৎসবের প্রায় সপ্তাহব্যাপী আনন্দ-কোলাহল, উত্তেজনা ও সভাসমিতির অন্তে কবির মন আত্মজিজ্ঞাসু হইয়াছে। কবির বয়স হইয়াছে, নূতন ভাবুকদলের সহিত যোগসূত্র ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এ অভিযোগ আজকাল শোনেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে 'আকাশপ্রদীপে'র উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছিলেন, "তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি।" বোধ হয় মনের এই পরিবেশে লিখিত হয় 'মাল্যতত্ত্ব' (৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৮) ও 'সময়হারা' (১ জানুয়ারি ১৯৩৯)।[৩] হালকাসুরে লঘুভাবে গভীর কথারই প্রকাশ-

খবর এল, সময় আমার গেছে,
আমার গড়া পুতুল যারা বেচে
বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই
সাবেক কালের দালানঘরের পিছন কোণেই
ক্রমে ক্রমে
উঠছে জমে জমে

১ *Visva-Bharati News*, January 1939, p 52।

২ Impressions Abroad, *Visva-Bharati News*, July 1938, pp 4-7। ডার্টিংটন হলের হেডমাস্টার Carry-র বই পড়িতে পড়িতে মনে হইতেছিল কবির শিক্ষাদর্শের কথাই যেন পড়িতেছি। অবশ্য Carry সাহেব জানেন না যে তাঁহার বিদ্যায়তনের স্রষ্টা এল্‌ম্‌হার্স্ট কবির নিকট হইতে প্রেরণা পান, সেই প্রেরণা তাঁহাকে এই নববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্‌বোধিত করে। দ্র Dartington Hall, by Bonham-Carter and Carry।

৩ ১৬ পৌষ ১৩৪৫, ১ জানুয়ারি ১৯৩৯। শান্তিনিকেতন। আকাশপ্রদীপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ১০৬-১১।

আমার হাতের খেলনাগুলো,
টানছে ধুলো। . .
এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপমাত্র—
নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র ;
পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে-সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।

'সময়হারা'র পূর্বদিন লেখেন 'মাল্যতত্ত্ব'[১] ; সেখানেও হালকাভাবে সবটা বলিয়া শেষকালে বলিলেন—

আমি বললেম, 'ওগো কন্যে, গলদ আছে মূলেই,
এতক্ষণ যা তর্ক করছি সেই কথাটা ভুলেই।
মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে
আর কি ওটা চলে।
রিয়ালিস্টিক প্রসাধন যা নব্যশাস্ত্রে পড়ি—
সেটা গলায় দড়ি।'

কবিতা দুইটি পৃথক দুইটি কাব্য-ভুক্ত হওয়ায় ইহাদের সুরের ও রূপের নৈকট্য অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শীতের সময় শান্তিনিকেতনে অভ্যাগতের ভিড় হয়; অনেকেই আসেন কৌতূহলবশত, কেহ আসেন সত্যকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি লইয়া ; কেহ আসেন বিশ্বভারতী দেখিতে, অধিকাংশই আসেন সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দর্শনপ্রার্থী হইয়া।

সাধারণ অতিথি ছাড়া বিশিষ্ট অতিথি-সমাগমও হয়। এবার শান্তিনিকেতনে আসেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য ও কন্‌গ্রেস রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু। মহারাজার সহিত আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ত্রিপুরারাষ্ট্রের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব সোমেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্মণ ও অন্যান্য পার্ষদগণ আসিয়াছিলেন (৯ জানুয়ারি ১৯৩৯)। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সহিত কবির দীর্ঘদিনের সম্বন্ধ ; কিন্তু ইতিপূর্বে এই বংশের কোনো মহারাজা আশ্রমে আসেন নাই— সেদিক হইতে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের এখানে আসা বিশেষভাবে স্মরণীয় ; তাঁহার প্রীত্যর্থে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা অভিনীত হয়। মহারাজ ঐ দিন সংগীতভবনের জন্য বিশ হাজার টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন।[২]

পক্ষকাল পরে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কবিসন্দর্শনে শান্তিনিকেতনে আসেন (২১ জানুয়ারি ১৯৩৯)। শান্তিনিকেতন ও বোলপুরবাসীরা কন্‌গ্রেসের সভাপতির যথোপযুক্ত সম্মান দান করিয়াছিলেন।[৩]

১ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৮, শান্তিনিকেতন। প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৩৪-৩৮।

২ কবির মানপত্র, প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৫, পৃ ৬২৬।

৩ "January 21 [1939], we had the honour of a visit from the Congress President Subhas Chandra Bose. This has practically been the first visit from a Congress President in office to our Institution (Pandit Jawaharlal Nehru had come as President in 1936, but that was during the Pujah vacation), and we naturally made the most of the great event. Rastrapati Bose was accorded a cordial reception in the Amra-Kunja soon after his arrival where Gurudeva received him and gave him his blessings. The Rastrapati went through a crowded programme during the two days that he stayed here which included several informal meetings with the students."—*Visva-Bharati News*, February 1939, p 62।

সুভাষচন্দ্র চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে হিন্দীভবনের উদ্‌বোধন উপলক্ষে জবহরলাল নেহরু শান্তিনিকেতনে আসিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে এক বৎসর পূর্বে (১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮) এনড্রুজ সাহেব এই গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ; এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ৩১ জানুয়ারি (১৯৩৯ ॥ ১৭ মাঘ ১৩৪৫) জবহরলাল হিন্দীভবনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। এবার জবহরলাল শান্তিনিকেতনে তিন দিন ছিলেন (৩১ জানুয়ারি-২ ফেব্রুয়ারি) ; তিনি রবীন্দ্রনাথের অতিথি— উত্তরায়ণেই ছিলেন। শেষদিন সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসেন। কবির আশ্রমে ভারতের এই দুই অসাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ স্মরণীয় ঘটনা।

আমাদের আলোচ্যপর্বে কন্‌গ্রেসের সভাপতি নির্বাচন লইয়া কন্‌গ্রেসীদলের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। ২৯ জানুয়ারি নিখিলভারত কন্‌গ্রেস কমিটিতে সুভাষচন্দ্র আগামী বৎসরের জন্য প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। গান্ধীজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পট্টভি সীতারামিয়াকে প্রেসিডেণ্ট হইবার জন্য মনোনীত করেন ; পট্টভি পরাভূত হইলেন। আমাদের মনে হয় কন্‌গ্রেসের এই পরিস্থিতি আলোচনার জন্য সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে আসিয়া জবহরলালের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

জবহরলালের সহিত কী কথাবার্তা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ তথায় ছিলেন কি না আমরা জানি না। তবে এই সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ওয়ার্ধা যাত্রা করেন (১৫ ফেব্রুয়ারি)। মহাত্মাজি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তিনি শুরু হইতেই সুভাষের পুনর্নির্বাচনের বিরোধী। তিনি বলিলেন— সীতারামিয়ার পরাজয় তাঁহারই পরাজয় ("the defeat is more mine than his")। তিনি নূতন সভাপতির সহিত অসহযোগ ঘোষণা করিলেন ("They must abstain when cannot co-operate. I must remind all Congressmen that those who being Congress-minded remain outside the Congress by design, represent it most")। তৎসত্ত্বেও সুভাষ গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন— বোধ হয় জবহরলালের পরামর্শে। জবহরলালকে সুভাষচন্দ্র শ্রদ্ধা করিতেন, তবে গান্ধীজি সম্বন্ধে তাঁহার অন্ধ অনুরক্তিকে তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করিতেন না। জবহরলালের সম্বন্ধে সুভাষ লিখিয়াছিলেন, "The position of Pandit Jawaharlal Nehru in this connection is an interesting one. His ideas and views are of a radical nature and he calls himself a fullblooded socialist but in practice he is a loyal follower of the Mahatma. It would probably be correct to say that while his brain is with the left wingers, his heart is with Mahatma Gandhi."[১]

জবহরলাল ও সুভাষ— উভয়েই ২ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৯) শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিলেন ; একমাস পরে ত্রিপুরীতে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন। যথাস্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

ইহার কয়েকদিন পরেই শ্রীনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আসিলেন বিহার-কন্‌গ্রেস নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আর আসিলেন কলিকাতার লর্ড বিশপ ও ভারতের মেট্রোপলিটান। মেট্রোপলিটান ব্রতীবালকদের পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এখানে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন বলিয়া ৮ই পাটনায় ফিরিয়া যান। মেট্রোপলিটান ফশ কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া কবিকে যে পত্র দেন তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল ; এই পত্রে আশ্রমের অন্তরের রূপটি তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির গোচরীভূত হয়।

তিনি লিখিতেছেন, "It had long been my ambition to visit you there, and my one regret

১ *The Rebel President* by Durlab Singh, Lahore, (5th Ed.), 1944.

now is that I had not done so long ago. I feel rather like the queen of Sheba who, after visiting the court of King Solomon, admitted that the half had not been told her. That is certainly true of Santiniketan and I feel that the half cannot be told; for you cannot describe the 'spirit' of a place save in wholly inadequate terms; and it is this spirit pervading the work, .. which is so impressive... It seemed to me that certain principles ran through the whole, which I summed up in my mind by such words as 'growth'; for the whole had sprung naturally from the development of the original school; and each department as it reached maturity had separated, as a unit, in the complex structure.[১]

'শ্রী'-রঙ্গমঞ্চে তিনটি নাটিকা

কলিকাতায় শ্যামা, চণ্ডালিকা ও তাসের দেশের অভিনয় করার প্রস্তাব আসিয়াছে। পৌষ-উৎসবের (১৩৪৫) পর কবি এই তিনটি নাটিকা সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন; অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন (১২ জানুয়ারি ১৯৩৯), "তিনটে নাটকের রিহার্সল আমার ঘাড়ে চেপেছে।" নাটকের মহড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার সম্মুখেই হইত; অভিনয়গুলিকে সকল প্রকারে সুন্দর করিবার জন্য কী যে মেহনত করিতেন তাহা সমসাময়িক কর্মীরাই জানেন। তাঁহার নিজের পক্ষে এই সৃষ্টির পর্ব ছিল আনন্দলোকে বাস। একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত। আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ, কেননা সে নির্বস্তুক (abstract)।.. গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দুরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা।" নিজের সাম্প্রতিক মনোভাব সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, "এখনকার মতো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের— গান আর ছবি। যখন বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়ালা আমাকে তাড়া করে তখন আমার পালাবার জায়গা আছে আমার গান।.. আর আছে আমার ছবি; কোথা থেকে দেখা দিতে এসেছে এই শেষ বেলায়, যখন রোদ্দুর পড়ে এল।"[২]

কলিকাতায় 'শ্রী'-রঙ্গমঞ্চে অভিনয়— ছাত্রছাত্রীর দল কলিকাতায় চলিয়া গেল। কবি ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৯) শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া ৭ই কলিকাতায় গেলেন। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ 'শ্রী'-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইল। কয়েকদিন পরে (১২ ফেব্রুয়ারি) রবিবার সন্ধ্যায় কবি ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটস্থ বিশ্বভারতী অফিসের দ্বিতলে 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' সভা উদ্বোধন করিলেন। সেই সময় স্থির হয়, এখানে একটি ছোটো পাঠাগার স্থাপিত হইবে, সদস্যসংখ্যা দুই শতের অধিক করা হইবে না। প্রশান্তচন্দ্রই ইহার উদ্যোক্তা; বোধ হয় পূর্বতন 'বিচিত্রা' ক্লাবের আদর্শের কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল। 'শ্রী'তে 'তাসের দেশ' অভিনয় দেখিয়া কবি ১৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্নে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। কবির এত তাড়াহুড়া করিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিবার কারণ, ঐদিন আওয়াগড়ের রাজা সূর্যপাল সিংহ শান্তিনিকেতনে আসিতেছেন, তাঁহার সংবর্ধনা হইবে। ঘটনাটি বিশেষভাবে বলিবার মতো; কারণ রবীন্দ্রনাথের যে কয়জন ভক্ত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কবি ও বিশ্বভারতীর প্রতি শেষ পর্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম সূর্যপাল সিংহ। বিশ্বভারতীর উদ্দেশে তিনি বহু সহস্র

১ *Visva-Bharati News*, March 1939, p 67।

২ পত্রালাপ; শান্তিনিকেতন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯। প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৫, পৃ ৭৮২-৮৫।

টাকা কয়েকবারই দান করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের উত্তরে তিনি এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেন— সেই অট্টালিকা তিনি বিনাশর্তে বিশ্বভারতীকে দান করিয়া গিয়াছেন।[১] এই অকৃত্রিম নীরব সুহৃদ্‌টির প্রতি কবি তাঁহার অন্তরের প্রীতি জ্ঞাপনার্থে কলিকাতা হইতে আসিয়া পড়িলেন।

পাঠকের স্মরণ আছে ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে কবি 'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' কবিতাটিকে অবলম্বন করিয়া একটি গীতিনাট্য রচনা করেন এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা কলিকাতার আশুতোষ কলেজ-হলে (১০ ও ১১ অক্টোবর ১৯৩৬) তাহা অভিনয় করেন।[২] সেই পরিশোধের রূপান্তর 'শ্যামা'। 'শ্যামা' অনেকবারই শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছে এবং রূপান্তরিত হইয়াছেও বহুবার। দ্বিতীয়বারের অভিনয়ের সময় 'উত্তীয়ের' অবতারণা ও ঘাতকহস্তে তাহার হত্যা নূতন সংযোজন। হত্যার দৃশ্যটি সম্বন্ধে সমালোচকরা মনে করেন যে এইটি নাটকের একটি দুর্বল অংশ। কবি সেটি জানিতেন; পারিপার্শ্বিকের অনুরোধে-উপরোধে এই অবান্তর অংশটি যোগ করিয়া দেন ও ঘাতকের নৃত্যাদির দ্বারা অভিনয়ের মধ্যে নূতন রস আনয়ন করেন।[৩]

নাট্যমঞ্চে হত্যা বা মৃত্যুর চিত্র দেখানো সম্বন্ধে প্রাচীন নাট্যকারদের বিশেষ মত ছিল না; প্রাচীন নাট্যে এই শ্রেণীর ঘটনা প্রদর্শিত হইত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুরাতন নাটকে মৃত্যু বা হত্যার দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু সংশোধিত নাটকগুলি হইতে ঐ-সব দৃশ্য পরিত্যাগ করেন, যেমন— তপতী ও পরিত্রাণে। শ্যামার এই নূতন সংস্করণে এই শ্রেণীর হত্যা-দৃশ্যের সংযোজন তাঁহার শেষকালের সংশোধিত নাটকগুলির বিপরীত পথে গিয়াছিল।

পরিশোধ কবিতাটির মূল মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবস্তু-অবদানের' অন্তর্গত শ্যামা-জাতক। কবি গল্পাংশ সংগ্রহ করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882) হইতে। অতঃপর ফরাসী পণ্ডিত Emile Senart ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহাবস্তু গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ নেপালে সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যগ্রন্থ-মধ্যে শ্যামা-জাতকের যে সারমর্ম পান তাহাই অবলম্বন করিয়া 'পরিশোধ' কবিতাটি লিখিয়াছিলেন (৯ অক্টোবর ১৮৯৯)। নিম্নে শ্যামা-জাতকের গল্পাংশ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। রবীন্দ্রনাথ পরিশোধ ও শ্যামায় উহার কতটুকু গ্রহণ করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

বজ্রসেন তক্ষশিলার শ্রেষ্ঠিপুত্র; সে 'অশ্ববাণিজক'। বারাণসী অভিমুখে অশ্ববিক্রয়ের জন্য সে আসিতেছিল। তাহার সঙ্গে ছিল বারাণসীগামী অন্য সার্থবাহ। পথমধ্যে বণিকসার্থ তস্কর-কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়, বণিকগণও হতাহত হয়। বজ্রসেন কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হয়। রাত্রিকালে নগরীর এক 'শূন্যাগারে' সে আশ্রয় লইল। সেই রাত্রিতেই রাজকুলে চৌরকর্তৃক বহুধন অপহৃত হয়। রাজার আজ্ঞায় প্রভাতকালে রক্ষিগণ শূন্যাগারে নিদ্রিত শ্রান্তক্লান্ত বজ্রসেনকে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই চোর মনে করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল। রাজাদেশে তাহার প্রাণদণ্ড হইল।

রাজপুরুষগণ-কর্তৃক বজ্রসেন যখন গণিকাবীথির মধ্য দিয়া শ্মশানে নীত হইতেছিল তখন শ্যামা নাম্নী অগ্রগণিকা দর্শনমাত্রই বজ্রসেনের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া পড়ে। শ্যামা ভাবিল— এই পুরুষকে যদি না লাভ করিতে পারি তবে মরিব। চেটীকে ডাকিয়া রাজপুরুষদের নিকট পাঠাইয়া বলিল— তোমাদের বহু হিরণ্য দান করিব। অন্য এক পুরুষকে পাঠাইতেছি, তাহার পরিবর্তে বজ্রসেনকে ছাড়িয়া দিয়ো। রাজপুরুষেরা স্বীকৃত হইল। শ্যামার গৃহে উত্তীয়

১ এই অট্টালিকা বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

২ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৩, পৃ ১-১১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ ২০৯-১৮।

৩ রবীন্দ্রসংগীত, পৃ ২৬৯।

নামে এক শ্রেষ্ঠিপুত্র বাস করিত। শ্যামা ছলপূর্বক তাহাকে ভোজনপাত্রসহ শ্মশানস্থিত বন্দী বজ্রসেনের নিকট পাঠাইল। রক্ষিগণ শ্যামার ইঙ্গিত অনুসারে উত্তীয়কে হত্যা করিয়া বজ্রসেনকে মুক্তি দিল।

শ্যামা বজ্রসেনকে লইয়া বিলাসলীলায় কালাতিপাত করে। কিন্তু বজ্রসেনের মনে শান্তি নাই; সে ভাবে বোধ হয় শ্রেষ্ঠিপুত্রের মতো তাহাকেও শ্যামা একদিন হত্যা করিবে। শ্যামা বজ্রসেনের মনোভাব দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত। তাহাকে সুখী করিবার জন্য উদ্যানসমন্বিত দীর্ঘিকা নির্মাণ করিল; পুষ্করিণীর চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত হইল। সেই জলাশয়ে 'অতৃতীয়' অবস্থায় তাহারা জলক্রীড়ায় রত হইল।' প্রণয়ের ভাণ করিয়া পানপাত্র হইতে শ্যামাকে প্রচুর মদ্য পান করাইল, অতঃপর জলমধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া শ্বাসরোধ করিয়া মৃতকল্প করিয়া ফেলিল। বজ্রসেন ভাবিল, শ্যামা মরিয়াছে। তখন সে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল ও তক্ষশিলায় ফিরিয়া গেল।

প্রাচীরের বাহিরের প্রতীক্ষমাণ চেটীগণ ক্রীড়ায় বিলম্ব দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে সেখানে আসিয়া দেখিল শ্যামা মৃতবৎ পড়িয়া আছে, বজ্রসেন পলাতক। বহু শুশ্রূষায় শ্যামার প্রাণসঞ্চার হইলে তাহারা নগরে ফিরিয়া আসিল।

বজ্রসেন পলায়ন করিলে শ্যামা ভীতা হইল; ভাবিল, উত্তীয়ের মৃত্যুসংবাদ শ্রেষ্ঠী জানিতে পারিবে। তখন সে নানা ভাবে প্রমাণ করিল যে, সে শ্রেষ্ঠিপুত্রের জন্য বিধবার ন্যায় বাস করিতেছে। রাজার অনুমতি অনুসারে শ্যামা গৃহবধূরূপে শ্রেষ্ঠিগৃহে প্রবেশলাভ করিল। মুক্তাভরণা শুক্লবসনা শ্যামা সেখানে আকুল হৃদয়ে অশ্ববাণিজক বজ্রসেনের কথাই ধ্যান করে; শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠিপত্নী ভাবে, শ্যামা তাহাদের পরলোকগত পুত্রের জন্য শোকমগ্না!

অনন্তর কিছুকাল পরে তক্ষশিলা হইতে একদল নট বারাণসীতে আসে। একদিন তাহারা শ্রেষ্ঠিগৃহে ভিক্ষার্থ আসিলে শ্যামা বজ্রসেনের সংবাদ লয় এবং তাহাদের মারফত বজ্রসেনকে সংবাদ প্রেরণ করে। তক্ষশিলায় বজ্রসেন এই বার্তা পাইয়া ভাবিল, শ্যামা তো মরে নাই; পূর্বতন শ্রেষ্ঠিপুত্রের ন্যায় তাহাকে বধ করিতে পারে। এই ভাবিয়া দূরতর দেশে পলায়ন করিল; উভয়ের সাক্ষাৎ আর হইল না।[১]

মূল গল্প অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে আখ্যায়িকা সৃষ্টি করিয়া কবিতায় এবং পরে নাট্যে রূপ দান করেন তাহা সুবিদিত। ১৯৩৯ সালের অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামা'র যে একটি সংক্ষিপ্ত নাট্যপরিচয় লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্‌ধৃত করিলাম—

প্রথম দৃশ্য॥ রাজপথে। বজ্রসেন বণিক। সে অনেক সন্ধানে ইন্দ্রমণির হার সংগ্রহ করেছে। তার ইচ্ছা, এই হার সে কাউকে বেচবে না। বিনামূল্যে যাকে পরাতে চায় তাকেই খুঁজে বের করবে। বন্ধু বললে, 'এই হারের প্রতি রাজার চরের লক্ষ্য আছে।' বজ্রসেন বললে, 'সেই ভয়ে যাচ্ছি বিদেশে পালিয়ে।' বলতে বলতে কোটালের চর এসে বললে, 'তোমার পেটিকায় কী আছে, দেখাও।' বজ্রসেন বললে, 'এ তুমি ছুঁয়ো না, এ আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়।' বলে সে ছুটে গেল। কোটালের চর বললে, 'দেখব তুমি কোথায় পালাও'।

দ্বিতীয় দৃশ্য॥ শ্যামার সভা। শ্যামা রাজনটী, বিখ্যাত সুন্দরী। তার প্রেমে পাগল বালক উত্তীয়। সে শ্যামার পূজা করে দূরের থেকে। সখীদের করুণা তার 'পরে। শ্যামা নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত, এমন সময়ে চোর অপবাদ দিয়ে প্রহরী শ্যামার সভার মধ্য দিয়ে বজ্রসেনের পিছন পিছন ছুটে গেল। শ্যামা বজ্রসেনের দেবকান্ত মূর্তি দেখে মুগ্ধ। সখীকে পাঠিয়ে বজ্রসেনের সঙ্গে প্রহরীকে ডেকে পাঠালে। বজ্রসেনকে বাঁচাবার জন্যে দুদিন সময় চাইলে। প্রহরী রাজি হল। শ্যামা সভাস্থদের উদ্দেশ করে বললে, 'তোমাদের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে এই নিরপরাধ বিদেশীকে অন্যায়

১ 'শ্যামা-জাতক' ও রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতা, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯; রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, পৃ ১৫০-৫৭। গল্পাংশ এই প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

অপবাদ থেকে রক্ষা করবে।' উত্তীয় এসে বললে, 'ন্যায় অন্যায় বুঝি নে, ঐ বিদেশীর নামের অভিযোগ আমি নিজে স্বীকার করে প্রাণ দেব— সেই মৃত্যুর বন্ধনেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে।' প্রহরীর কাছে সে আত্মসমর্পণ করলে। কারাগারে তার মৃত্যু হল।

তৃতীয় দৃশ্য ॥ পথে। বজ্রসেনের সঙ্গে শ্যামার মিলনের আনন্দ। দেশত্যাগ করে বজ্রসেন ও শ্যামার পলায়ন। পলাতকা রাজনটীর সন্ধানে প্রহরীর অনুসরণ। সখীরা তাকে ছলনা করে ভুলিয়ে দিলে। শ্যামাকে বার বার বজ্রসেনের প্রশ্ন, কী উপায়ে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অবশেষে শ্যামার কাছে শুনলে তার জন্যে প্রাণ দিয়েছে উত্তীয়। বজ্রসেন তাকে ধিক্কার দিলে, ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বর্জন করে চলে যাবার সময়ে শ্যামা তাকে ছাড়তে চাইলে না। বজ্রসেন তাকে সাংঘাতিক আঘাত করে চলে গেল; শ্যামার প্রতি প্রেম ভুলতে পারলে না, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, শ্যামাকে ডাকতে লাগল মৃত্যুলোক থেকে। সেই আহ্বানে শ্যামার হঠাৎ আবির্ভাব। বললে, 'তোমার নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্যেও করুণা ছিল, আমি মরণের দ্বার থেকে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।' আবার বজ্রসেনের মনে ধিক্কার জাগল। বললে, 'চলে যাও।' শ্যামা প্রণাম করে চলে গেল।

পরিতপ্ত বজ্রসেনের গান:

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
    ক্ষমো হে মম দীনতা,
        পাপীজনশরণ প্রভু।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
    প্রেমের বলহীনতা—
        ক্ষমো হে মম দীনতা,
            পাপীজনশরণ প্রভু।
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে,
    প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
    পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
    যে অভাগিনী পাপের ভারে
        চরণে তব বিনতা—
            ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
        আমার ক্ষমাহীনতা,
            পাপীজনশরণ প্রভু॥

শ্যামা ক্ষুদ্র নৃত্যনাটিকা, তিনটি মাত্র দৃশ্য-সংবলিত; শ্যামা উত্তীয় ও বজ্রসেন, এই তিনটি মাত্র চরিত্র— ইহার মধ্যে উত্তীয় বুদ্‌বুদের ন্যায় মিলাইয়া গেল; কিন্তু সমস্ত নাটিকার মধ্যে সে'ই আছে সবার অন্তরালে, সকলের অন্তরে। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মূল শ্যামা-জাতক, কথা ও কাহিনীর পরিশোধ কবিতা, পরিশোধের নাট্যীয় রূপ এবং সর্বশেষে 'শ্যামা'য় তাহার রূপান্তর— এই চারিটি পাঠ লইয়া সুবিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এই নৃত্যনাট্যের সূক্ষ্ম আলোচনা

করিয়াছেন হরিপদ কেরানি [কানাই সামন্ত] 'উত্তীয়' প্রবন্ধে।[১]

তিনি বলেন, বৈষ্ণবদের মতে 'বয়সের মধ্যে কৈশোর ধ্যেয়, কৈশোরই শ্রেষ্ঠ।' "বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর উন্মত্ত অধীর।" 'এরূপ ভাবোন্মত্ত কিশোর, এরূপ কবি .. এরূপ বাতুল, জাগতিক জীবনে এবং জীবনদর্পণ কাব্যে কাহিনীতে বারংবার দেখা দিয়াছে সন্দেহ নাই।' 'উত্তীয় আপনার কামগন্ধহীন প্রণয় নিবেদনের পাত্রীকে শুধু জীবনই দেয় নাই, আপন হৃদয়শোণিতে এই কাহিনীর শীর্ষভাগে সেই চির-প্রিয়ারই নাম লিখাইয়া লইয়াছে কবিকে দিয়া।' .. 'এই ভাবোন্মত্ত কিশোর যে করুণহৃদয় কবি-কর্তৃক উপেক্ষিত নয়,..লক্ষ্যভ্রষ্ট বাসনাবেদনার আবেগে শ্যামা যদি বা তাহাকে ভুলিয়া যায় কবি যে তাহাকে ভোলেন নাই, ..প্রায় চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে সে কথা প্রথম জানা গেল শ্যামা নৃত্যনাট্যে।' কিশোরের প্রেম নিরাসক্ত অর্থাৎ 'ভোগের ক্ষুধা, অহংসাৎ করিবার আকাঙ্ক্ষা আপনার কলঙ্কিত হাতের ছাপ বিশ্বের সকল সৌন্দর্যে আঁকিয়া দিবার দুরাগ্রহ— এ-সব কিছুই তাহার নাই।' তাহার কাছে শ্যামা— "মায়াবনবিহারিণী হরিণী" ; তাহার অন্তরের প্রশ্ন "কেন তারে ধরিবারে করি পণ"— উত্তরেই সে বলে 'অকারণ' ; "পরশ করিব ওর প্রাণমন অকারণ," . ."বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন-অকারণ।" ইহাকেই আমাদের দেশের কাব্যে বলা হইয়াছে 'কামগন্ধহীন প্রেম'— দুর্লভ হইলেও অসম্ভাব্য নহে। 'কামগন্ধহীন প্রেম কৈশোরেই স্বাভাবিক।' এই প্রেম উত্তীয়ের নিকট অতিসত্য পদার্থ, অতিবাস্তব অনুভূতি। Fancy বা কল্পনা বলিয়া তাহাকে আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি না ; 'কারণ, নিছক কল্পনার জন্য মানুষ কি প্রাণ দিতে পারে ?' সে বলে, "ন্যায় অন্যায় জানি নে, .. শুধু তোমারে জানি।" এই কথা প্রাণ মন দেহ দিয়া, সকল জীবন দিয়া বলিতে পারে— এক উত্তীয়। সে বলে,

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই . . মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।
যারে জান নাই, .. তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান।

এই মর্মন্তুদ ঘটনার পর শ্যামা ও বজ্রসেনের মিলনের মধ্যে উত্তীয় রহিয়া গেল তৃণাঙ্কুশের ন্যায় চিরকালের মতো। শ্যামা ও বজ্রসেনের জন্য থাকিল—

কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে
যাও চিরবিরহের সাধনায়।

এই চিরবিরহের সাধনায় বোধ হয় শ্যামা ও বজ্রসেনের প্রেমসাধনার আহুতি হইয়াছিল।[২]

দ্বিতীয় নাটিকা 'চণ্ডালিকা',[৩] তাহারও মধ্যে কিছু কিছু যোগবিয়োগ হয়। ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ 'শ্রী'-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। অভিনয়কালে প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা'র সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় লিখিয়া দেন। আমরা নিম্নে সেইটি উদ্‌ধৃত করিলাম—

প্রথম দৃশ্য ॥ ফুলওয়ালির দল ফুল বিক্রি করতে এসেছে। চণ্ডালিকাও আনলে তার ফুলের ডালি। সবাই ঘৃণায় তার পাশ কাটিয়ে গেল। দইওয়ালা এল দই বেচতে, চণ্ডালিকা প্রকৃতি কেনবার জন্যে হাত বাড়াতেই

১ শা-জাহান, শ্রীহরিপদ কেরানি, পৃ ২৭-৪৩। এই পুস্তিকাটি রবীন্দ্রসাহিত্যরসিকরা উপভোগ করিবেন। 'উত্তীয়', রবীন্দ্র-প্রতিভা, শ্রীকানাই সামন্ত, পৃ ৩৫-৫৬।

২ শ্রীহরিপদ কেরানির লেখা হইতে সংকলিত। দ্র শ্রীকানাই সামন্ত, রবীন্দ্র-প্রতিভা (১৩৬১) পৃ ৩৫-৫৪।

৩ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ৩, পৃ ৪৮৬।

দইওয়ালাকে সবাই নিষেধ করলে। চুড়িওয়ালা এল চুড়ি বিক্রি করতে, প্রকৃতি চুড়ি কিনতে চাইতেই চুড়িওয়ালাকে সবাই সতর্ক করে দিলে। চণ্ডালিকা মনের দুঃখে তার সৃষ্টিকর্তাকে ধিক্কার দিলে। প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ। ঘরের কাজে চণ্ডালিকার ঔদাসীন্য নিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করতেই, মা তাকে অপমানের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বলে তাকে তিরস্কার করলে। মা বিস্মিত হয়ে চলে গেল। বুদ্ধদেবের শিষ্য আনন্দ এসে জল চাইলেন। তার হাতের জল অশুচি বলে চণ্ডালিকা সংকোচ প্রকাশ করলে। আনন্দ বললেন, "যে জল তৃষিতের তৃষ্ণা দূর করে, তাপিতের তাপ শান্ত করে, সেই জলই শুচি।" তিনি জল খেয়ে চলে গেলেন। তাঁর করুণা ও তাঁর রূপে প্রকৃতির মন মুগ্ধ হয়ে গেল। পাড়ার মেয়েরা ধানকাটার কাজে ওকে ডাকতে এল। ও বললে,

ওগো ডেকো না, মোরে ডেকো না—
আমার কাজভোলা মন, আছে দূরে কোন্
করে স্বপনের সাধনা ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ বুদ্ধের পূজার অর্ঘ্য নিয়ে পথ দিয়ে চলে গেল পূজারিনীরা। প্রকৃতি এসে গাইলে,

ফুল বলে ধন্য আমি, ধন্য আমি মাটির 'পরে—
দেবতা ওগো, তোমার পূজা আমার ঘরে ॥

মা এসে বললে, "তুই অবাক করলি যে, উমার মতো তুই তপস্যা করছিস নাকি। তোর সাধনা কার জন্যে।" চণ্ডালিকা বললে, "যে আমাকে আহ্বান করলে, তার জন্যে। আমি ছিলুম বাণীহারা, যে আমাকে বাণী দিয়েছে, আমার মনের মধ্যে যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও', তার জন্যে।" মা বললে, "তোর কাছে কে আবার জল চাইলে, সে কি তোর আপন লোক নাকি।" প্রকৃতি বললে, "তিনি বলেছেন, তিনি আমার আপন লোকই বটেন। তিনি আমাকে নব জন্ম দিয়েছেন। মন্ত্র পড়ে তুই নিয়ে আয় ভিক্ষুকে এই অমানিতার পাশে, আমি তাঁকে আত্মনিবেদনের সম্মান দেব।" এত বড়ো স্পর্ধার কথা শুনে মা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন সময় ভিক্ষুর দল নিয়ে আনন্দ পথ দিয়ে চলে গেলেন। তার দিকে তাকালেন না দেখে চণ্ডালিকার অসহ্য ক্ষোভ হল। মা বললে, "মন্ত্র পড়ে আমি ওঁকে আনবই।" তার শিষ্যাদের সঙ্গে সম্মোহন নৃত্য করে কন্যার হাতে একটা মায়াদর্পণ দিলে। বললে, "এই দর্পণ নিয়ে যখন তুই নাচবি দেখতে পাবি তার কী দশা হচ্ছে।"

তৃতীয় দৃশ্য ॥ এ দৃশ্যে মন্ত্রের কাজ চলেছে। মায়াদর্পণে আনন্দের অভিভব-দৃশ্য দেখে মাঝে মাঝে প্রকৃতি অনুতপ্ত হচ্ছে, মাকে নিষেধ করছে, আবার তাকে উৎসাহিত করছে। অবশেষে মহাকালনাগিনীমন্ত্র-প্রভাবে টান ধরল। পরাভূত আনন্দের অসম্মানে দুঃখার্ত হয়ে আনন্দকে প্রকৃতি প্রণাম করে বললে, "আমাকে ক্ষমা করো, তোমাকে মাটিতে টেনেছি, তুমি আমাকে ধূলি হতে তুলে নাও তোমার পুণ্যলোকে।"[১]

শ্যামা যেমন প্রায় নূতন করিয়া লিখিত হইল, তাসের দেশের তেমনই বহুল পরিমাণে পরিবর্তন হইল (১৪ জানুয়ারি ১৯৩৯ ॥ ২৯ পৌষ ১৩৪৫)। পূর্ববর্তী সংস্করণে কয়েকটি গান ছিল ; এবার আরও কয়েকটি নূতন গান যোজনা করিলেন : ১. খর বায়ু বয় বেগে ২. গোপন কথাটি রবে না গোপনে ৩. তোলন নামন (তাসের কাওয়াজ) ৪. বলো সখী বলো তার নাম ৫. অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে ৬. কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় ৭. গগনে গগনে ধায় হাঁকি ৮. বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।[২]

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ ৪২৭-২৯।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫৪৪। দ্র গীতবিতান ; যথাক্রমে ১. পৃ ৫৬৫, ২. পৃ ৩৫৬, ৩. পৃ ৭৯৯, ৪. পৃ ৩৫৭, ৫. পৃ ৩৫৭, ৬. পৃ ৩৫৯, ৭. পৃ ৫৬৬, ৮. পৃ ৫৬৭।

এই নাটিকার দ্বিতীয় সংস্করণ সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করিলেন (মাঘ ১৩৪৫)। সুভাষচন্দ্র তখন কন্‌গ্রেসের সভাপতি। তাঁহাকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ[১] করিবার বিশেষ কারণ ছিল। পাঠকের স্মরণ আছে, কয়েক মাস পূর্বে কলিকাতায় শিল্পনিকেতন উন্মোচনকালে কবি সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাষণের শেষভাগে বিশ্বভারতীর প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। আজ তরুণ বাংলা তথা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সুভাষচন্দ্র; তিনি আজ নির্জীব প্রাণে সংগ্রামের মন্ত্র দিতেছেন; কবির 'তাসের দেশে'র মর্মকথা 'আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা'; সুভাষচন্দ্র সেই বাণীর বাহক বলিয়া কবির ভরসা— তাঁহার নেতৃত্বে কন্‌গ্রেসের মাধ্যমে দেশের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হইবে।

এবার শান্তিনিকেতনে দোলপূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীত সংযোগে 'মায়ার খেলা'র অংশবিশেষ অভিনীত হইল। এই বৎসরের অগ্রহায়ণে মায়ার খেলা নৃত্যনাট্যের কল্পনা ও রচনা শুরু হয়।[২] মায়ার খেলা গীতিনাট্যরূপে লিখিত হয় বহুবৎসর পূর্বে, অভিনয়ও হয়। আধুনিক যুগে ১৯৩৩ মার্চে কলিকাতায় মায়ার খেলা একবার অভিনীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্রের বাটীতে ছিলেন। প্রতিমা দেবীকে লখনৌতে লিখিয়াছিলেন, "মায়ার খেলায় প্রথম দিন অনেক ত্রুটি ছিল, দ্বিতীয় দিন নিখুঁৎ হয়েছিল— লোকের ভালো লেগেছে। তোমরা যেবার করেছিলে সেবারকার মতো অত ভালো হয় নি।"[৩] এবার দোলোৎসবে নৃত্যনাট্য অংশবিশেষ অভিনীত হয়— সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যের অভিনয় শান্তিনিকেতনে কখনো হয় নাই। কবির নানা কাজের মধ্যে এই সময়টার অনেকখানি মায়ার খেলাকে নৃত্যরূপ দিবার জন্য অতিবাহিত হয়। পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন কিছুকাল হইতে কবি তাঁহার কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য প্রভৃতিকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মায়ার খেলা গীতিনাট্য ছিল, এবার তাহাকে নৃত্যনাট্যে রূপদান করিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদের সহিত সংগীত সম্বন্ধে যে পত্র-আলোচনা চলে তাহার একস্থলে লিখিয়াছিলেন যে, প্রথম বয়সে হৃদয়ভাব প্রকাশ করিবার জন্য গান রচিত হয়, পরিণত বয়সের গান ভাব প্রকাশের জন্য নয়, রূপ দিবার জন্য। নৃত্যনাট্য সেই রূপের বাহন।[৪]

নানা কথা

শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উৎসব; উৎসবের জন্য কবি নূতন গান রচনা করিতেছেন, পুরাতন কবিতায় সুর দিতেছেন। এই সময়ে শান্তিনিকেতনে অমিতা সেন সংগীতভবনের অন্যতম শিক্ষিকারূপে আসেন। অমিতা (খুকু) শিশুকাল হইতে আশ্রমে লালিতা। রবীন্দ্রসংগীতে অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাঁহার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা শেষ করিয়া তিনি পুনরায় আসিয়াছেন আশ্রমে। তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া রবীন্দ্রনাথের সুরের উৎস যেন খুলিয়া গেল।[৫]

কিন্তু 'হোলি'র আনন্দ-উৎসবের দিনে ভারতবর্ষময় মহাত্মাজির অনশনের জন্য সকলেরই উদ্বেগ; সেদিনকার কবির ভাষণেও এই উদ্বেগের কথাই প্রকাশ পাইতেছে। কবি বলিলেন, "আজ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শোচনীয়তার উপক্রমণিকা দ্বারের নিকট সমাগত। কঠোর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মহাত্মাজি অনশনব্রত গ্রহণ করেছেন। . .

১ "কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণসঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।" মাঘ ১৩৪৫। দ্র উৎসর্গ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩।

২ নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা। গীতবিতান, পৃ ৯০৫-২৪।

৩ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৪৮।

৪ সুর ও সঙ্গতি। দ্র পত্র, ১৩ জুলাই ১৯৩৫।

৫ কবিকথা, পৃ ১৭০।

অন্যায়কে অত্যাচারকে আমরা মানব না, এই কথা বলবার জন্যে মহাপুরুষরা জীবন উৎসর্গ করেছেন।"[১]

মহাত্মাজি কেন অনশন-পণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ইতিহাস এখানে বলা দরকার মনে করি। আমাদের আলোচ্যপর্বে (১৯৩৯) দেখা যাইতেছে যে, ভারত-শাসনের নূতন বিধান অনুসারে প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধ একপ্রকার সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু দেশীয় রাজ্যে প্রজার অধিকার-অনধিকারের কোনো প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই, সেখানে মধ্যযুগীয় শাসনপ্রথা অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে এবং তাহার মীমাংসার কোনো প্রস্তাব ভারতশাসনবিধিতে নাই। বৃটিশ ভারতে স্বরাজলাভের আন্দোলনের দৃষ্টান্তে দেশীয়রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর মধ্যে রাজ্যশাসন-বিষয়ে আত্মকর্তৃত্বলাভের আন্দোলন দেখা দিয়াছে। গুজরাটের অন্তর্গত রাজকোট রাজ্যের প্রজারা কতকগুলি অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করিয়া অবশেষে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করে। সর্দার বল্লভভাই পাটেলের মধ্যস্থতায় রাজকোটের রাজা বা ঠাকুরসাহেব শাসনসংস্কারে সম্মত হন, সত্যাগ্রহ বন্ধ হয়। কিন্তু অচিরেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে, প্রজাবৃন্দ পুনরায় সত্যাগ্রহ অবলম্বন করে। মহাত্মাজির জন্মভূমি রাজকোট; তিনি ঠাকুরসাহেবের এই ব্যবহারের প্রতিবাদে রাজকোটে গিয়া অনশন সত্যাগ্রহ করিলেন। মহাত্মাজির অনশন যখন চলিতেছে তখন ত্রিপুরীতে ৫২ বাৎসরিক কন্‌গ্রেসের অধিবেশন বসিয়াছে। সেখানেও গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যা বৃটিশ ও ভারতীয়ের সম্বন্ধ -বিষয়ক নহে, তাহা হইতেছে প্রবীণ ও নবীনের চিরন্তন সংগ্রাম— সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কন্‌গ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের মতবিরোধ।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার, কারণ সুভাষচন্দ্রের নানা কর্ম ও মতবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি যে ছিল তাহা নানা পত্রে প্রবন্ধে ও সাক্ষাতে প্রকাশ পায়। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস-অভিজ্ঞেরা জানেন কন্‌গ্রেসী নেতারা স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অসহযোগনীতি সাময়িকভাবে মুলতবি রাখিয়া, দেশের সংগঠন-কার্য যতটা-করা-যায়-ততটাই-লাভ— এই মনোভাব লইয়া বৃটিশ শাসকদের সহিত প্রদেশ-শাসন বিষয়ে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা ও অধিকার যে কী পরিমাণ সীমিত তাহা তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, অথবা জানিয়া-শুনিয়াই ইংরেজকে সহযোগিতাদানের শেষ সুযোগ দিয়াছিলেন। অচিরকালের মধ্যেই প্রমাণিত হইল প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলী ইংরেজ গভর্নরের ও কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন কর্মচারী মাত্র। নূতন শাসনবিধিতে প্রাদেশিক সরকারের আত্মকর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে ভারতীয়দের উপর সত্যকার কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয় নাই— ফেডারেশনের কোনো প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই।

সমাজতন্ত্রী তথা বিদ্রোহী যুবশক্তি কন্‌গ্রেসে নিজেদের মত প্রচার ও তথায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। ইহারা কন্‌গ্রেসের তরফ হইতে ভারতশাসন ব্যাপারে সহযোগিতা করিবার বিরোধী এবং আইনসভা বর্জন করিয়া নূতন ভারতশাসন আইন ধ্বংস করিতেই কৃতসংকল্প। এই সমাজতন্ত্রী দল কন্‌গ্রেস-পরিচালকদের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও ভারতের নয়া-শক্তির উদ্‌বোধক সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বারের জন্য (ত্রিপুরী) কন্‌গ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছিল।[২] গান্ধীজি কিভাবে সুভাষচন্দ্রের সহিত অসহযোগিতা করিয়াছিলেন তাহার কথা বলা হইয়াছে।[৩] এই-সব গণ্ডগোলের একমাসের মধ্যেই ত্রিপুরীতে কন্‌গ্রেসের (৭ মার্চ ১৯৩৯) অধিবেশন হয়। গান্ধীজি ত্রিপুরীতে

১ বসন্ত-উৎসব, ২১ ফাল্গুন ১৩৪৫, শ্রীসাগরময় ঘোষ -কৃত অনুলিপি হইতে মুদ্রিত। প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৯১১-১২।

২ দ্র প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২, পৃ ৭৫৩-৫৮, 'বিবিধ প্রসঙ্গ'।

৩ দ্র শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসের পথনির্বাচন; প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৫, পৃ ৯১৩-১৬। শ্রীগোপাল হালদার, ত্রিপুরীর মন্ত্র; প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬, পৃ ১০৩-০৮। দ্র শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -লিখিত ভারতে জাতীয় আন্দোলন (১৯৫৯)।

আসেন নাই, পূর্বেই বলিয়াছি তিনি রাজকোটে অনশন করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কন্‌গ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এই মনোভাবকে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছেন না; ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসের সপ্তাহ পরে অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন (১৭ মার্চ ১৯৩৯)— "অবশেষে আজ, এমন-কি কন্‌গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল।.. স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।"[১] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন, "মহাত্মা গান্ধীর সহিত হিটলারের কোনো আধ্যাত্মিক সাদৃশ্য নাই। অথচ ত্রিপুরীতে কন্‌গ্রেসের গত অধিবেশনের সময় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস হিটলারের প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং পরে যুক্তপ্রদেশদ্বয়ের প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থও তাঁহার এক বক্তৃতায় হিটলারের প্রশংসা করিয়াছিলেন।"[২] পঞ্জাব প্রতিনিধিদের বিদায়ধ্বনি— "মহাত্মাজি কী জয়। হিন্দুস্থানকী হিটলার কী জয়"[৩] শোনা যায়।

মহাত্মাজির অনশনের জন্য কবি উদ্বিগ্ন হইলেও নীতিহিসাবে অনশন-অস্ত্র প্রয়োগ করাকে তিনি আদৌ সমর্থন করিতে পারিতেন না। কয়েকদিন পরে (২০ চৈত্র) অমিয় চক্রবর্তীকে যে পত্র দেন তাহাতে এই পদ্ধতির নিন্দা করিয়া তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক সাধনা ও কর্মসাধনাকে একাসনে বসানো বিপজ্জনক।.. মহাত্মাজি মাঝে মাঝে যদি চিত্তশোধনের জন্য এই কৃচ্ছ্রসাধনা করতেন তা হলে সেটা ভারতীয় প্রথার সঙ্গে মিলত।.. মহাত্মাজি যখন রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে মাঝে মাঝে অনশনব্রত গ্রহণ করেন তখন সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, এতে তাঁর আত্মার কী উৎকর্ষ সাধন হয় আমি বুঝতেই পারি নে— বরঞ্চ ফল উল্‌টো হবারই কথা।" এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন যে পুনা প্যাক্টের সময় তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা মহাত্মাজির জীবন-সংশয়ের দিক হইতে, ফলে বাংলার প্রতি রাজনৈতিক অবিচারকে তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন। কবির মতে "লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশে মানুষের করুণাবৃত্তির উপর এই যে পীড়ন অন্তত ভারতবর্ষ কোনোদিন একে কর্তব্য বলে স্বীকার করে নি।.. গান্ধীজির এই অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মপীড়নমূলক ছেলেমানুষি আব্দার দেশে ছড়িয়ে গেছে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের এই কঠোর বিশ্লেষণ যে কত সত্য তাহা পরবর্তীযুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। মতভেদ হইলেই লোকে কত সহজে এই অনশন-ব্রত গ্রহণ করিয়া সকলপ্রকার বিধিবিধানকে অচল করিয়া দিয়াছে, সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বসন্ত-উৎসবের দুইদিন পরে (৭ মার্চ ১৯৩৯) লিখিত 'নামকরণ' নামে প্রহাসিনী কবিতার প্রথম স্তবকটি উদ্‌ধৃত করিলাম— ইহার মধ্যে কোনো অর্থ রসিক-ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-রসিক অনুসন্ধান করিতে পারেন—

দেয়ালের ঘেরে যারা গৃহকে করেছে কারা,
ঘরহতে আঙিনা বিদেশ,
গুরুভজা বাঁধা বুলি যাদের পরায় ঠুলি,
মেনে চলে ব্যর্থ নিদেশ,
যাহা কিছু আজগুবি বিশ্বাস করে খুবই,

১ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬, পৃ ৮।
২ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬, পৃ ১২৬।
৩ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬, পৃ ১০৮।
৪ পত্র, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত। ২৩ চৈত্র ১৩৪৫, ৩ এপ্রিল ১৯৩৯। কলিকাতা।

সত্য যাদের কাছে হেঁয়ালি,
সামান্য ছুতোনাতা সকলই পাথরে গাঁথা,
তাহাদেরই বলা চলে দেয়ালি।[১]

এই দিনে ত্রিপুরীর কন্‌গ্রেস বসিয়াছে এবং রাজকোটে গান্ধীজি অনশনে আছেন। অনশন গ্রহণ করিবার পটভূমি পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।

কবি শান্তিনিকেতনে থাকিলে বহু লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দক্ষিণ-ভারতের বিখ্যাত মালয়ালামী কবি বল্লথোল (১৩ মার্চ ১৯৩৯) কলামণ্ডলের কয়েকটি ছাত্র-সহ কবিদর্শনে আসেন। তিনি জীবনীলেখককে লিখিয়াছেন যে তাঁহার সেই দিনটি চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। বল্লথোল মালাবারের বিশিষ্ট কবি বলিয়া খ্যাতিমান; লোকে তাঁহাকে বলে মালয়ালামের 'টাগোর'। তিনি কথাকলির নৃত্য দেখান, কবি সে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।[২] কয়েকদিন পরে (১৭ মার্চ) আসেন ভারতের শিক্ষা-কমিশনর মিঃ জন সার্জেণ্ট[৩]।

সাহিত্যসৃষ্টিতে এখন ভাঁটার টান। কবিতা আছে, গদ্যপ্রবন্ধাদি খুবই কম। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন,[৪] "প্রবন্ধ লেখবার বয়স গেছে।" তাই এবার মন গিয়াছে পত্রালাপে। তার কারণ, "প্রবন্ধ আপন ভার এবং আয়তন নিয়ে অধিকাংশ রাস্তাতেই চলতে পারে না; চিঠি চলে যায় পিচ-বাঁধানো রাস্তায় বাইসিক্লের মতো। চিঠির সেই হালকা রাস্তায় আমার মন আজকাল চলতে উৎসুক।

"বয়স যখন অল্প ছিল তখন প্রাত্যহিক দেখাশুনোর ফসল সংগ্রহ ক'রে চিঠিতে চালান করতে ভালোবাসতুম। তার প্রধান কারণ মনটা তখন পথে ঘাটে পলাতকা হয়ে বেড়াত, যা দেখত যা শুনত তাতেই তার ছিল ঔৎসুক্য। এই ঘোরাফেরা আর চিঠির বকুনি এক জাতের। . . ছিন্নপত্রে তার পরিচয় পেয়েছ।

"তার পরে এল প্রবন্ধের পালা . . বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় পর্যায়ের যুগে। . . কিছুকাল তার আধিপত্য ছিল। একেবারে তার দিন যায় না, . . তার জোর কমেছে। বাহুল্যে তার আর রুচি নেই।"[৫] 'ছিন্নপত্র' যুগের পত্র ছিল চোখের দেখায় মনের রসে রঙিন-করা, তার ছবি জীবন্ত হয় পাঠকের মনের মধ্যে। তার পর পাই এক ধরনের পত্র যাহা 'পত্রধারা'

১ প্রবাসী, ১৩৪৬ পৌষ। প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫০-৫২।

২ বল্লথোল লিখিয়াছেন (31st December 1952): "I had the rare fortune of meeting Gurudeva Tagore once. It was about two years before his death. A Kathakali performance had been arranged for him on that occasion, which was appreciated and greeted by Gurudeva. Before our meeting Tagore had heard about me from Deenabandhu Andrews. At the remembrance of his close and sincere embrace and the most gentle reception my eyes become wet even to-day! Oh! How wonderful was the deep affection of the Great Poet!" K. M. Panikkar লিখিতেছেন, "The unique example of this influence of Tagore in a southern language is the case of the great Malayalam poet Vallathol . . Vallathol was till 1914 a blind votary of the classical tradition who wrote verses as acrobatic feats in words . . In 1913 the new light of Tagore dawned on him . . Vallathol's poetry also underwent a fundamental transformation; . . the Malayalam language to-day is being directed by unseen hand of Tagore and the forces he has set in motion."

—Tagore and the Literature of the South, *The Golden Book of Tagore* (1932), p 194। দ্র কে. এম, পানিক্কর, রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য (অনুবাদক, আনন্দ দে)— মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৬১, পৃ ৩৯৯-৪০০।

৩ জন্ সার্জেণ্ট ১৯৬১ ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসেন, এবং ২৪ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে 'ডক্টর' উপাধি প্রদান করেন।

৪ ১৭ মার্চ ১৯৩৯, ৩ চৈত্র ১৩৪৫। দ্র প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬, পৃ ৬-১০।

৫ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, পৃ ১৬১; পত্রালাপ, ১১ এপ্রিল ১৯৩৯, ২৮ চৈত্র ১৩৪৫।

নামে পরিচিত। সেগুলি মতামত লইয়া তর্ক ও কথা-কাটাকাটি, সেখানে মনের সঙ্গে মতের বোঝাপড়া। এখনকার পত্রালাপ "পায়ে চলার পথে আলাপ জমিয়ে যাবার ঝোঁকে। .. যাকে ভালো ক'রে চিনি তার সামনে ব'সে বকে যাওয়া সহজ, কেননা সেও ভিতর থেকে বকিয়ে নেয়। লেখাটার পরিমাণ থাকে দুটি মনের মাপে।"[১]

অমিয়চন্দ্রের সহিত কবির দীর্ঘ দিনের বিচিত্র বিষয়ের আলোচনারাজি একটি সাহিত্যবিশেষ— এগুলি যেন কবির মনের ডায়েরি। বাহিরের আধুনিক সাহিত্যের নূতন খবর অনেক কিছুই পান এই অসাধারণ সাহিত্যজহুরীর কাছ হইতে। অমিয়চন্দ্র নিজে ভাবিতে পারেন, সেইজন্য কবিকে তিনি যে-সব পত্র দিতেন তাহাতে কবিকে ভাবাইয়া তুলিতেন। এই ভাবনার উদ্‌বোধনে তাঁহার লেখনী হইত সচল। রবীন্দ্রনাথের বিরাট পত্রগুচ্ছ সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইলে[২] কবির আর-একটি মূর্তি রবীন্দ্র-পাঠকদের সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইবে। এই পত্রালাপের মধ্যে সমসাময়িক রাজনীতি ও সাহিত্য-বিচারের কথা আসিয়া পড়ে। সমসাময়িক য়ুরোপ ও ভারতের বিচিত্র রাজনৈতিক ঘটনা কবিকে যে কী পীড়িত করিতেছে— তার প্রমাণ পাই পত্রগুলি হইতে। তিনি এক পত্রে লিখিতেছেন, "মানুষের মনে একটা প্রবল জোয়ার-ভাঁটার পর্যায় আছে। মানুষ বলছি যাকে, সে ব্যক্তিগত মানুষ নয়, নেশনগত মানুষ; প্রথম বয়সে যে নেশনের সংস্রবে আমাদের মনে প্রথম উদ্‌বোধন জেগেছিল, তার চিত্তসমুদ্রে তখন ভরা জোয়ার, তার উদার মনের প্রসারণ সকল দিকেই, মনুষ্যত্বের সকল প্রদেশেই। মনে স্থির করেছিলুম . . মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যই তার নিরন্তর প্রয়াস।" তার পর একদিন "ভাঁটার সময় এল পৃথিবী জুড়ে। . . প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা অচলায়তনের প্রাকার— শ্রেণী-আভিজাত্যের গর্বে উদ্ধত হয়ে উঠল। . . বুদ্ধিপ্রভাবের বিরুদ্ধে একটা গভীর প্রতিক্রিয়া কাজ করতে লেগে গেছে। . . ভালোমন্দের আদর্শের চেয়ে বড়ো হল চোখ বুজে মেনে চলার আদর্শ। . .

"এই তামসিক মনোবৃত্তিরই সাংঘাতিক চেহারা দেখা দিল য়ুরোপে। . . তাদের অনেকেই আজ কেউ বা স্বেচ্ছায় কেউ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিক্টেটরি মুঠোর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে নিজেদের নিষ্পিষ্ট করে দিয়ে এক একটা বড়ো বড়ো জড়পিণ্ড পাকিয়ে তুলতে লাগল। . . দলে দলে পোলিটিক্যাল গুরুদের ধনুর্ধর চেলারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধিতার তপস্যায় আজ প্রবৃত্ত। . . অবশেষে আজ . . কন্‌গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারি নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল।"

এই ডিক্টেটরি মনোভাব কিভাবে য়ুরোপের শিল্প ও সাহিত্যকে, এমন-কি বিজ্ঞানকেও, আচ্ছন্ন করিতেছে তাহার সংবাদ কবিকে বেশি করিয়া বাজিতেছে। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে, সাহিত্যের মধ্যে কতখানি হিন্দুয়ানি, কতখানি মুসলমানি, ইহা লইয়া তর্ক শুরু ও বাছবিচার আরম্ভ হইয়াছিল; এখন আসিয়াছে সাহিত্যের মধ্যে কোন্‌টা বুর্জোয়া, কোন্‌টা প্রোলেটারিয়েট— রচনার ভালোমন্দ বিচার হইবে এই মার্কা দিয়া। কবির আপসোস "শেষকালে কি জাত-মানা মত্তহস্তী সাহিত্যেরও পদ্মবনে ঢুকে পড়বে!"[৩]

কবি এই পত্রগুচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' নামে যে গদ্য সমালোচনাগ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে পাঠ করিলে তবেই, কবির মনের মধ্যে কত যে প্রশ্ন, কত যে সমস্যা জাগিতেছে তাহার সন্ধান পাঠক

১ "বাক্যালাপের বৈঠকেও তাঁকে [কবিকে] কোনো কোনো অংশে পাওয়া যায়। কিন্তু সে আলাপ এমন কারো সঙ্গে হওয়া চাই যাঁর মনের সংঘাতে তাঁর মন সক্রিয় হয়ে ওঠে— যেমন ছিলেন তাঁর সহচর অমিয়চন্দ্র।" 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ', তেজেশচন্দ্র সেন (?) -কৃত সমালোচনা, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, পৃ ১৯৫।

২ 'চিঠিপত্র' নামে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এ পর্যন্ত আটটি খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। নবম খণ্ড বর্তমানে মুদ্রিত হইতেছে।

৩ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬, পৃ ৯।

পাইবেন। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত জানা যায়।[১] কবি নিজের রচনা সম্বন্ধে বলেন যে তাঁহার "লেখায় প্রধানত কল্পনা আর শ্রেয়োবুদ্ধি এই দুটোরই চালনা। সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য আনন্দ মননে, শিক্ষা দেওয়া উপদেশ দেওয়ার আভাস যদি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় সেটা নেহাৎ গৌণ, এমন-কি মনে তার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা আছে। মননে যার প্রয়োজনাতীত আনন্দ তার কাছে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের পাকা দাম নেই।" কবি বলিয়াছেন, "সুধীন্দ্রের লেখা পাঠকদের কাছ থেকে ভাবনার দাবি করে, কেননা মননশীল তাঁর মন।"

মার্চ মাসে খুচরা লেখার মধ্যে পত্রধারা ছাড়া দুই-চারিটি কবিতা চোখে পড়ে। কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'প্রজাপতি'[২] (১০ মার্চ) ও 'ঢাকিরা ঢাক বাজায়'[৩] (২৮ মার্চ)। দিনের ব্যবধানও যেমন, ভাবের ব্যবধানও তেমনই। প্রজাপতিকে ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কবিচিত্তে 'বিচিত্রবোধের এ ভুবন' সম্বন্ধে নূতন ভাবনা জাগিয়াছে। 'প্রজাপতি' কবিতাটি লিখিবার সময়ে ও পরে কবির মনে যে ভাবনারাজির উদ্‌ভব হয়, তাহা সুধীরচন্দ্র কর এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন— "মনের কী রকম একটা অবস্থা হয়েছে, সব কিছুই জানতে ইচ্ছে হয়, জানতে পাই নে। এত যে পড়ি, যতই জানি— হঠাৎ এক এক সময় একটা সামান্য ঘটনায় মনে হয়, কিছুই জানি নে, কোনো দিন যে জানতেও পারব না, এইটেই আরো অসহ্য। এই যে পিঁপড়েটা মাটিতে চলে যাচ্ছে, এর জানা তো আমার জানা হয়ে ওঠে নি। দেশকালের ধারণা ওর কী রকম, কে জানে।. . আমরা ওদের কাছে আছি কি ভাবে ? . . বাঘকে দেখে আমি ভয় পাব, একটা প্রজাপতি তো পাবে না। মধুর মধ্যে প্রজাপতি লুটে আছে। কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য ওর কাছে নেই। ওর জগৎ যত ক্ষুদ্রই হোক, ওর অনুভূতির কাছে তার যা রূপ রস, ভোগের যা নিবিড়তা, সে আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। সেইজন্যেই চিরকাল রইল আমার কাছে একদিক দিয়ে ওর বিশিষ্টতা, তা মূল্যের অতীত। কাল রাত্রে স্নানের ঘরে মুখ ধুতে গিয়ে টেবিলের উপর লক্ষ্য করছিলেম একটা প্রজাপতি। আজ সকালেও দেখি সেটা সেইখানেই ; বুঝলাম ওটা মৃত।. . কিসে থেকে ওর মৃত্যু ঘটল। আমি থাকি আমার কবিতা নিয়ে ; ওর বোধের কাছে তার অস্তিত্ব নেই। তেমনি ওর বোধ আমি পাই নে বলে ওর যেটা সত্য, আমার কাছে সেটা হয়তো মিথ্যা।. . ঐ প্রজাপতি আর আমি— আমরা আলাদা বোধের জগৎসীমায় যার যার কোঠায় বাঁধা।"[৪]

সম্পূর্ণ নূতন অভিঘাতে 'ঢাকিরা ঢাক বাজায়' কবিতাটি লিখিত হয়। কবিতাটির (আকাশপ্রদীপ) মধ্যে গভীর একটি বেদনা প্রচ্ছন্ন। আমাদের আলোচ্যপর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের মন্ত্রী-পরিষদ্‌ কর্তৃক শাসিত। সেই যুগে বাংলাদেশে নারীহরণ ও নারী-উৎপীড়ন ব্যাপারটা দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল।[৫] রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় অপমানিতা নারীর বেদনা পরিস্ফুট। চারি দিকে এক কাতর ধ্বনি—

শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।

সেদিন অসহায়ভাবে বাঙালি মেয়েরা এই অপমান সহ্য করিয়াছিল, সংঘবদ্ধভাবে সমাজ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হয় নাই—

১ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, পৃ ১৬০-৬৪। পত্র ২৮, চৈত্র ১৩৪৫। এই পত্রের অধিকাংশই সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা।

২ প্রজাপতি, ১০ মার্চ ১৯৩৯। শ্যামলী, শান্তিনিকেতন। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৫০-৫৭।

৩ ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে, ২৮ মার্চ ১৯৩৯। শান্তিনিকেতন। আকাশপ্রদীপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ১১৫-১৭।

৪ রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-জীবন। শারদীয় যুগান্তর, ১৩৫৫, পৃ ৯২-৯৩।

৫ "তবে নারী-উৎপীড়কদের মধ্যে হিন্দুও আছে এবং অপমানিতাদের মধ্যে মুসলমান নারীও আছে। সুতরাং দুর্বৃত্তদের ধর্ম একই। তবে সাধারণভাবে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের উৎপাত বেশি হইত।" প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৬, পৃ ৯০৫-০৮। পুনশ্চ, বৈশাখ ১৩৪৬, পৃ ১২৩-২৫।

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্ ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

মার্চের শেষ দিন (১৭ চৈত্র ১৩৪৬) কবি গেলেন কলিকাতায়, বিশ্বভারতী সম্মিলনীর পক্ষ হইতে বসন্ত-উৎসবের অনুষ্ঠান। তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আছেন, ইতিপূর্বে তাঁহার কাছে কানাডা হইতে অনুরোধ আসিয়াছিল অটোয়া হইতে Empire Day[১] Programmeএ কবির একটি কবিতা রেডিয়ো হইতে ব্রডকাস্ট করা হইবে। তজ্জন্য ১ এপ্রিল (১৮ চৈত্র) তিনি লিখিলেন 'আহ্বান'[২]; ইহার অনুবাদও করিয়া দেন, সেটি ২৯ মে (১৯৩৯) অটোয়া রেডিয়ো স্টেশন হইতে মুক্ত হয়।[৩]

তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে,
মুক্তিরণঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে,
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।
রক্তে-রাঙা ভাঙন-ধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।
ত্রাসের পদাঘাতের তাড়নায়
অসম্মান নিয়ো না শিরে, ভুলো না আপনায়।
মিথ্যা দিয়ে, চাতুরী দিয়ে, রচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে কোরো না পরিহাস।
বাঁচাতে নিজ প্রাণ
বলীর পদে দুর্বলেরে কোরো না বলিদান।

নববর্ষের শুভ দিনটিতে (১৫ এপ্রিল ১৩৪৬) কবির মন চিরদিনই উদ্‌বুদ্ধ হয়; যেমন হয় সাতই পৌষে মহর্ষির দীক্ষাদিনে। নববর্ষে ভাষণ-দান-কালে কবি বলেন— "এই প্রশ্নটাই আমার মনে কিছুদিন থেকে জাগছে, কী পেয়েছ জীবনে, সব চেয়ে কী বড়ো কথা তোমার অভিজ্ঞতায়। সব চেয়ে যা আমার চোখে পড়ে সে হচ্ছে পরম বিস্ময়। আরম্ভ থেকে পদে পদে বিস্ময়ের অন্ত নেই। অন্য জীবজন্তুরা শুধু তাদের খাদ্যাহরণে তাদের বাঁধা জীবনযাত্রায় সন্তুষ্ট, তাদের তো বিস্ময় নেই।[৪] কবি জীবনে ছন্দ সুর ও প্রেমের মধ্যে যে বিস্ময়ের আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার

১ Empire Day, a celebration of the unity of the British empire was inaugurated in 1902, officially recognized since 1904; it is held on the anniversary of Queen Victoria's birthday, May 24. Canada was in revolt in the thirties of the last century; after order was restored the British parliament sent Lord Durham in 1837 to study the situation and propose reforms. The Report has been the most valuable document in the English language on the subject of colonial policy. By 1839 Canada was united and granted a constitution. Durham Report was published in 1839. May 1939 was the centenary of Durham Report. [Durham, John George Lambton, Earl of, 1792-1840]।

২ আহ্বান। কানাডার প্রতি। ১ এপ্রিল ১৯৩৯। জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ২৬।

৩ *Visva-Bharati News*, October 1939। কবির কণ্ঠস্বর record করিয়া পাঠানো হয়। সেটি রবীন্দ্রভবনে আছে।

৪ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, পৃ ২৭২।

কথাই এই ভাষণে বলিয়াছেন। আর মনকে আলোড়িত করিতেছে মানুষের প্রচণ্ড দুঃখ, চারি দিকে অমানুষিকতার বার্তা।

নববর্ষের দিন (১৩৪৬) অপরাহ্ণে কবির জন্মোৎসব ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণে 'দিনান্তিকা' নামে চা-চক্রের নূতন গৃহের উদ্‌বোধন হইল। দিনান্তিকা শান্তিনিকেতনের মধ্যে দর্শনীয় স্থান। গৃহের মধ্যে নন্দলাল-পরিকল্পিত ও কলাভবনের ছাত্রদের দ্বারা অঙ্কিত প্রাচীরচিত্র আছে। এইখানে প্রতিদিন বৈকালে পদ-মান-বেতন-নিরপেক্ষ সকল শ্রেণীর কর্মী চা-পান উপলক্ষে জমায়েত হন।

বহু বৎসর পূর্বে চা-এর সভা বসিত রান্নাঘরের বারান্দায় (তাহার চিহ্ন নাই), শরৎকুমার রায় ছিলেন ইহার উৎসকেন্দ্র ; চা পান করিতে, পরিবেশন করিতে, তাঁহার অকৃত্রিম আনন্দ ছিল। তিনি চলিয়া যাইবার পর দিনেন্দ্রনাথের বাসায় সকলে চা-পানের জন্য সমবেত হইতেন। দিনেন্দ্রনাথ প্রথমে বেণুকুঞ্জে ও পরে দেহলির একতলায় বাস করেন ; তাঁহার গৃহেই সভা বসিত। দিনেন্দ্রনাথ সুরপুরীর বাড়িতে চলিয়া গেলে কর্মীরা নিজেদের ব্যয়ে চা-চক্র স্থাপন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই চায়ের মজলিসে মাঝেমাঝে আসিতেন। তখন সভা বসিত গ্রন্থাগারের উপরতলায়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ চীন হইতে ফিরিয়া আসিলে সুসীম চা-চক্রের উৎসব ও উদ্‌বোধন এইখানে হইয়াছিল। তজ্জন্য কবি যে গান রচনা করেন তাহার কথা বলিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কবির বিশেষ আকর্ষণের কারণ ছিল। মনে আছে, একবার বিদেশে যাইবার পূর্বে লেখককে (লেখক তখন চা-চক্রের সম্পাদক) বলেন যে, চা-চক্রকে যেন বাঁচাইয়া রাখা হয়। তিনি জানিতেন, এই ভেদহীন কাঞ্চনকৌলীন্যহীন ক্লাব আশ্রমের একটি বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। এইটি নষ্ট হইয়া গেলে শান্তিনিকেতনের সমাজজীবনের মূলে আঘাত করা হইবে।[১]

দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার সুহৃৎ ও গুণগ্রাহীগণের চেষ্টায় অর্থ সংগৃহীত হয় এবং তদ্দ্বারা এই তোরণগৃহটি নির্মিত হয়। স্থাপত্য-পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথ করের, বিভূষণ-প্রযোজক নন্দলাল বসু।

এই সময়ে দুইখানি বই কবির হস্তগত হয়— বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-লিখিত 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ'[২] ও কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ'। উভয়েই অল্পকালের জন্য শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন। 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' বইখানি কবির ভালো লাগিয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা সরকার বইখানি বিপ্লবাত্মক মনে করিয়া বাজেয়াপ্ত (proscribe) করেন। কাননবিহারীর সে সৌভাগ্য হয় নাই। প্রবাসীতে ইহার যে সমালোচনা বাহির হয় (চৈত্র ১৩৪৫, পৃ ৯০৯) তাহাতে প্রবাসীর সমালোচক লেখেন যে, কাননবিহারীর "চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হইলেও অনেকটা সফল হইয়াছে। তাঁহার পর্যবেক্ষণের ও বিশ্লেষণের শক্তি, এবং নূতন ধরনের এরূপ একটি বহি লেখার কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপের সাহস প্রশংসনীয়। তিনি অল্পকাল মাত্র কবির নিকটে থাকিবার

১ একবার বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে 'চা-স্পৃহ-চঞ্চলে'র দল কিছু টাকা আদায় করিয়া ভোজের আয়োজন করেন। কবি এই সংবাদ পাইয়া 'চাতক' নামে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। প্রথম স্তবকটি উদ্‌ধৃত হইল—

কী রসসুধা-বরষাদানে মাতিল সুধাকর
তিব্বতীর শান্ত শিরিশিরে।
তিয়াবিদল সহসা এত সাহসে করি ভর
কী আশা নিয়ে বিধুরে আজি ঘিরে।

— বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০। প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৪৩।

২ বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (ভূমিকা, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩১), বইখানি আট বৎসর পরে তাঁহার হস্তগত হয় ; তখনো উহা 'নিষিদ্ধ' পুস্তক ছিল। তাই বোধ হয় কোনো লিখিত মন্তব্য করিতে পারেন নাই। তবে বইখানি পড়িয়া তাঁহার ভালো লাগে তাহা আমরা জানি।

সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে যতটা বুঝিয়াছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য তিনি যে সবই ঠিক বুঝিয়াছেন এমন বলা যায় না। শান্তিনিকেতনের কর্মপ্রণালী তাঁহার মতে যথেষ্ট সুফলদায়ক হয় নাই। ইহার জন্য তিনি অধিকাংশ কর্মীকে যতটা দায়ী করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় ততটা দায়ী তাঁহারা নহেন। এই কর্মপ্রণালী যে পরিমাণে সফল হইয়াছে তাহার এবং শান্তিনিকেতনের আদর্শের প্রশংসা তিনি অবশ্য করিয়াছেন।" পরিশেষে সমালোচকের বক্তব্য এই যে, "কিছু অনভিপ্রেত দোষত্রুটি সত্ত্বেও বহিখানি ভালো এবং বাংলাসাহিত্যে এরূপ বহির প্রয়োজন আছে।"

কিন্তু লেখকের এই মন্তব্য শান্তিনিকেতনবাসীরা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। অচিরকাল-মধ্যেই প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৩৪৬) 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম রহিয়াছে শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন। ইনি শান্তিনিকেতনের বহুদিনের অধ্যাপক। লেখাটির মধ্যে বলা হইয়াছে—"গ্রন্থকার যাকে মানুষ রবীন্দ্রনাথ আখ্যা দিয়েছেন— তাকে চিনতে গেলে প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষণী, বিচক্ষণ দৃষ্টিশক্তি, বহুবিস্তৃত প্রভূত তথ্য-সংগ্রহে ও তার বিশ্লেষণে সময় ও সুযোগের প্রয়োজন। অতি অল্প কয়েকদিন মাত্র কাননবিহারী শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁর এই অল্পকালের কটাক্ষপাতে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্র সম্বন্ধে লেখকের যে অনায়াসে লিখিত মত ব্যক্ত হয়েছে সে তাঁর চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও দুঃসাহসের বিষয় হত।"

'মনের মানুষ যেখানে, বলো কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে'— বাউলের এই পদটি উদ্‌ধৃত করিয়া সমালোচক লিখিতেছেন, "হয়তো যাওয়া ঘটবে না, কিন্তু যথোচিত অধ্যবসায় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সন্ধান করা হয়েছে তার প্রমাণ আবশ্যক। এই কারণেই বন্ধু প্রভাতকুমারকে নমস্কার করি, তিনি ফাঁকি দেন নি— তাড়াতাড়ি বাজারে চলনসই একখানা বই বের করেন নি। হয়তো কোথাও কোথাও ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু চেষ্টার অগভীরতা বা শৈথিল্য দেখি নি।"

সমালোচকের মতে "জীবনীলেখা অতি দুরূহ সাহিত্যিক ক্ষমতাসাধ্য। .. মানুষরূপে ও কর্মীরূপে তিনি [কাননবিহারী] রবীন্দ্রনাথকে যথোচিত চেনেন এ কথা মেনে নেওয়া শক্ত। কবিকে যাঁরা তাঁর সুখে দুঃখে উৎসবে শোকে কর্মসাধনার নানা কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতে নানা বাধার সঙ্গে সংগ্রামে এবং বিদেশী সমাজের সঙ্গে তাঁর বহুব্যাপী ঘনিষ্ঠ যোগের পর্বে পর্বে তাঁকে কাছে থেকে দেখেছেন এবং দূরে থেকে সংবাদলাভের অবকাশ পেয়েছেন তাঁদের অনেকে বর্তমান আছেন। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বাঙালির কাছে পরিচিত করিয়ে দেবার ভার নিতে তাঁরা সাহস করেন নি। আমার বন্ধু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু যত্ন ও অধ্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনীর ছোটো-বড়ো দলিলগুলি প্রায় নিঃশেষে সংগ্রহ করেছেন, যাঁদের প্রতিভা আছে তাঁরা এর থেকে জীবনী লেখবার সুযোগ পাবেন।" মোটকথা কাননবিহারীর গ্রন্থ কবিকে যে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই সেই কথাই এই রচনার মারফতে প্রকাশ পায়।

আর-একটি আধা-রাজনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে এই সময় কবির নাম জড়িত হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে তখন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব— শিক্ষামন্ত্রীও তিনি। কিছুকাল হইতে সরকারী, আধা-সরকারী চাকরি-রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান-সংঘাত দেখা যাইতেছে। মুসলমানের অভিযোগ তাহারা কাজ পায় না, হিন্দুর অভিযোগ অযোগ্য মুসলমানের উপর দায়িত্বপূর্ণ কর্মের ভার অর্পিত হওয়ায় যোগ্য হিন্দু সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। গভর্নমেন্টের নীতি, efficiency বা কর্মকুশলতার মাপকাঠি হইতে যদি মুসলমানপ্রার্থীর যোগ্যতায় ঘাটতি হয়, তথাচ তাহাকে নিযুক্ত করা উচিত। তাঁহাদের যুক্তি, দায়িত্ব না পাইলে কোনো কালেই কেহ যোগ্যতা লাভ করিবে না। বাংলাদেশের অর্ধেকের উপর মুসলমানকে পিছাইয়া রাখিলেও চলিতে পারে না। যাহা হউক, এই ব্যাপার লইয়া হিন্দু বঙ্গবাসীদের

মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ মংপু হইতে অমিয়চন্দ্রকে এক পত্রে লিখিতেছেন (২০ জুন ১৯৩৯), হিন্দু-মুসলমানের চাকরির হার বাঁটোয়ারা নিয়ে অবিচার হয়েছে। এই নিয়ে হিন্দুরা ভারতশাসন-দরবারে নালিশ জানিয়েছেন। সেই পত্রে নাম স্বাক্ষর করতে আমার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল।.. অনিচ্ছাসত্ত্বেও নালিশের পত্রে আমি সই দিয়েছি।"

বলা বাহুল্য, এ শ্রেণীর কাজ কবিকে বহুবার করিতে হইয়াছে। বিশেষভাবে জীবনের শেষ দিকে পাঁচজনের অনুরোধ-উপরোধ তিনি আর এড়াইতে পারিতেন না। অনেক সময় 'সুখের থেকে সোয়াস্তি ভালো' মনে করিয়া পারিপার্শ্বিকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহু জিনিসে সহি দিতেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর অপ্রিয় কার্যকলাপে, পারিবারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে এই ধরনের 'অনিচ্ছাসত্ত্বের সহি' দিয়া আপাত-উৎপাত হইতে 'সোয়াস্তি' পাইতেন। কিন্তু এ-সবের প্রতিক্রিয়ায় যাহা ঘটিত তাহার দায় তাঁহাকে একাই শেষকালে সামলাইতে হইয়াছে।

যাহা হউক, কবি মেমোরিয়ালে সহি দিয়াও হিন্দুদের পক্ষে বিষয়টাকে মহাসর্বনাশ বলিয়া মনে করিতেছেন না; তাহার কারণ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "দীর্ঘকাল চাকরির অন্নে বাঙালির নাড়ী দুর্বল হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করতে রুচি হয় না। হিন্দুর ভাগ্যে পরাধীন জীবিকার অসম্মানের দ্বারগুলো যদি বন্ধ হয় তো হোক— তা হলেই বুদ্ধি খাটাতে হবে শক্তি খাটাতে হবে আত্মনির্ভরের বড়ো রাস্তা খুঁজে বের করতে।"[১]

পুরীতে

নববর্ষের পরদিন (১৬ এপ্রিল ১৯৩৯) রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় গেলেন, সেখান হইতে পুরী যাইবেন। কলিকাতায় দুই-একদিনের জন্য আসিলেও সভাসমিতি তাঁহাকে টানিয়া সেখানে লইয়া যায়; উদ্যোক্তারা উৎসাহের আতিশয্যে ভুলিয়া যান কবির বয়স আটাত্তর বৎসর। স্থানিক বিশ্বভারতী-সম্মেলনের উদ্যোগে নববর্ষের উৎসব (১৭ই)— সভার স্থান পাইকপাড়ার প্রাসাদ— কবিকে সেখানে যাইতে হইল।[২] তরুণ সাহিত্যিক কুমার বিমলচন্দ্র সিংহের[৩] আগ্রহে উৎসব পাইকপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

দুই দিন পরে (১৯ এপ্রিল) কবি পুরী যাত্রা করেন। উড়িষ্যার নবগঠিত প্রদেশে নূতন শাসনব্যবস্থায় কন্‌গ্রেসের শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে; কবি কন্‌গ্রেস-গভর্নমেণ্টের অতিথি। তখনকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিশ্বনাথ দাস।

রবীন্দ্রনাথের সহিত উড়িষ্যার সম্বন্ধ বহুকালের। উড়িষ্যায় এককালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারি ছিল। মহর্ষির জীবিতকালে বহুবৎসর সমস্ত জমিদারি একত্র ছিল— এমন-কি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এস্টেট তখনো পৃথক হয় নাই।

১ কন্‌গ্রেস; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৩১৮, দ্র কালান্তর, পৃ ৩৭৪।

২ *Visva-Bharati News*, May 1939, p 87।

৩ বিমলচন্দ্র সিংহ (১০ ডিসেম্বর, ১৯১৮ - ১৭ এপ্রিল ১৯৬১)— সুবিখ্যাত লালাবাবুর বংশধর, পাইকপাড়ার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের পুত্র। বি.এ. (১৯৩৭) ও এম. এ. (১৯৩৯) পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সভ্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ (১৯৪৫), পশ্চিমবঙ্গ কন্‌গ্রেস কমিটি, এ. আই. সি. সি। মন্ত্রী— পূর্ত বিভাগ (১৯৫৭), ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব বিভাগ। দীর্ঘকাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা করেন কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী সভাপতি রূপে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রভারতীর সাধারণ সম্পাদক। রচনাবলী— বাংলার চাষী, বিশ্বপথিক বাঙ্গালী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, খাতার পাতা, দেশের কথা, পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস, বঙ্কিমপ্রতিভা, সমাজ ও সাহিত্য, আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা, প্রভৃতি।

সেই অখণ্ড জমিদারি তদারক করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে যৌবনে কয়েকবারই উড়িষ্যায় আসিতে হয়।[১] উড়িষ্যা-ভ্রমণ-কালে লিখিত কয়েকখানি পত্রের অংশ 'ছিন্নপত্রে' দেখা যায়; 'সোনার তরী'র কয়েকটি কবিতা উড়িষ্যায় রচিত। 'চিত্রাঙ্গদা'র খসড়া এখানেই করেন (২৮ ভাদ্র ১২৯৮)।[২]

পুরীতে পৌঁছিবার তিন দিন পরে কবিকে 'প্রবাসী' নামে একটি কবিতা লিখিতে দেখি। লাহোরে কবির জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্যোগীরা অমিয় চক্রবর্তীর (তখন লাহোর-প্রবাসী) মারফত নূতন কবিতার জন্য কবিকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তদুপলক্ষে কবি 'প্রবাসী' কবিতাটি লিখিয়া পাঠান।[৩] এই কবিতাটির মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাত-জনিত বেদনা জ্বলিতেছে। পঞ্জাবে ১৯৩৯ সালে হিন্দু-মুসলমান-শিখদের বিরোধ প্রচ্ছন্ন ছিল না। কবি মর্মান্তিক দুঃখে লেখেন—

হে বিষয়ী, হে সংসারী, তোমরা যাহারা
আত্মহারা,
যাঁরা ভালোবাসিবার বিশ্বপথ
হারায়েছ, হারায়েছ আপন জগৎ,
রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোণে,
বিরহের ব্যথা নেই মনে . .
লক্ষ্মীর মন্দিরে
আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ ;
জানায়েছি সেথাকার তোমার আসন
অন্যমনে তুমি আছ ভুলি।
জড় অভ্যাসের ধূলি
আজি নববর্ষে পুণ্যক্ষণে
যাক উড়ে, তোমার নয়নে
দেখা দিক— এ ভুবনে সর্বত্রই কাছে আসিবার
তোমার আপন অধিকার।[৪]

পুরীতে কবি আছেন সার্কিট হাউসে; এইখানে বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে তিনি আসেন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে। কবি এখানে আসিয়া অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন,[৫]— "মনে পড়ছে এইখানেই এই বাড়িতেই লিখেছিলুম—

১ পুরীতে কবির একখানি বাড়ি ছিল; 'পোড়াবাড়ি' নামে সেটি পরিচিত। কবি তৈয়ারি বাড়ি কেনেন ও গগনেন্দ্রনাথরা জমি কিনিয়া 'পাথারপুরী' নামে অট্টালিকা নির্মাণ করেন। পরে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য কবিকে ঐ বাড়ি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়; কলিকাতার মল্লিকরা সেটি কেনেন। এখন সেটি উড়িষ্যা সরকার requisition করিয়া লইয়া সরকারী কর্মচারীদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন (মে ১৯৫২)। 'পাথার-পুরী'ও বিক্রীত হইয়া গিয়াছে; এখন সেটি কলেজ হোস্টেল।

২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ ২৮৪।

৩ [পুরী], ১০ বৈশাখ ১৩৪৬, ২৩ এপ্রিল ১৯৩৯। নবজাতক; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪২-৪৩।

৪ তুলনীয়, 'মন যে দিল না সাড়া তাই তুমি গৃহছাড়া' কবিতাটি 'প্রবাসী' নামে প্রবাসী মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়।

৫ পত্র, পুরী, ১০ বৈশাখ ১৩৪৬, ২৩ এপ্রিল ১৯৩৯। দ্র কবিতা, আষাঢ় ১৩৫০।

'হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।'[১]— সমুদ্রে তখন বোধ হয় যৌবনের উদ্দামতা ছিল। তার সঙ্গে ছন্দের পাল্লা দেবার স্পর্ধাতেই আমার সেই লেখা।" আজ কবির বয়স আশির কাছাকাছি, আজ তিনি অনুভব করিতেছেন, "এখনকার লেখায় সেদিনকার মতো উদ্‌বেল প্রাণের অচিন্তিত গতিমত্ততা থাকতেই পারে না, আছে হয়তো আত্মসমাহিত মনের ফল ফলানোর নিগূঢ় আবেগ।"

পুরীতে কবি তিন সপ্তাহ ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার জন্মদিন পড়ে। সেদিন (৮ মে ১৯৩৯) সার্কিট হাউসে উড়িষ্যার কয়েকটি মহিলাসমিতি সমবেতভাবে কবিসংবর্ধনা করেন। পরদিন গভর্নমেণ্ট পার্কে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে কবির জন্মোৎসব মহা আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইল। বহু সহস্র লোক উদ্যানে জমায়েত হয়। জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিতগণ কবির আয়ুর্বৃদ্ধি কামনা করিয়া সংস্কৃত মন্ত্র ও কবির গুণগান করিয়া প্রশস্তি পাঠ করেন। এ ছাড়া উড়িষ্যার আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মানপত্র পঠিত হয়। কতকগুলি সময়াভাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। এইদিন এনড্রুজ সাহেব পুরীতে ছিলেন। তিনি কবির জন্মদিন উপলক্ষে একটি কবিতা পাঠ করেন।[২] রবীন্দ্রনাথ সর্বশেষে তাঁহার ভাষণ দেন। এই দিনে 'জন্মদিন' নামে কবিতা লিখিত হয়।[৩]

তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনি নে আমি,
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।
বিধাতার সৃষ্টিসীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে।

কবি ভালো করিয়া জানেন মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে—

বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে, কেহ দেখে আর।
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া,
আর কল্পনার মায়া,
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।

পুরী-বাস-কালে জন্মদিন সম্বন্ধে কবিতা ছাড়াও কবিকে আরও কয়েকটি কবিতা লিখিতে দেখি। যেমন— 'এপারে ওপারে' (নবজাতক, ২০ বৈশাখ ১৩৪৬), 'অত্যুক্তি'[৪] (সানাই, ২৪ বৈশাখ)। 'এপারে ওপারে' কবিতায় তুচ্ছ কথা তুচ্ছ কাজে নিযুক্ত মানুষের ছবি; কবির মন "ক্ষণে ক্ষণে ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি, সর্বব্যাপী সামান্যের সচল

১ 'সমুদ্রের প্রতি' লিখিত হয় ১৭ চৈত্র ১২৯৯, রাজসাহীতে। দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ ৩৪০। পুরীতে কবিতাটির খসড়া করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু লিখিত হয় লোকেন পালিতের বাড়িতে, রাজসাহীতে।

২ *Visva-Bharati News*, June 1939, p 89।

৩ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৬। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৪।

৪ অত্যুক্তি কবিতাটি প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত 'অদেয়' (১৮ জুন ১৯৩৮, সানাই) কবিতার সহিত তুলনীয়। কবির মুখে 'অদেয়'র ব্যাখ্যা দিয়াছেন মৈত্রেয়ী দেবী তাঁহার 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (পৃ ৭৭)।

স্পর্শের লাগি ;" কবির আপসোস—"আপনার উচ্চতট হতে নামিতে পারে না সে-যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।" এই সর্বব্যাপী সামান্তের সহিত মিলিতে না পারিবার বেদনা অভিজাত কবিচিত্তে মাঝে মাঝে দেখা দেয় ; 'এবার ফিরাও মোরে' হইতে 'ঐকতান' (জন্মদিনে) পর্যন্ত এই ভাবনা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে।

পুরীতে কবি ভালোই আছেন। লিখিতেছেন, "আমার কোনো কর্ম নেই, এখানে আমাকে কারো কোনোই প্রয়োজন নেই, যাঁরা আমাকে যত্ন করে রেখেছেন তাঁরা আমার কাছ থেকে কোনো ব্যবসায়িক পরামর্শ দাবি করেন নি। আমার শরীর-মনে সমুদ্রের হাওয়া যে শুশ্রূষাশীতল হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেটা নূতন দায়িত্বপ্রাপ্ত উড়িষ্যাপ্রদেশের আতিথ্যের প্রতীক।"

পূর্বেই বলিয়াছি উড়িষ্যার যাঁহারা নূতন রাষ্ট্রনায়ক, কবি তাঁহাদের অতিথি। এই ব্যাপারটার মধ্যে নূতনত্ব আছে। পুরাকালে রাজা বা রাজন্যরা গুণীদের সমাদর করিতেন, তাঁহারা স্বীকার করিতেন 'মানবচিত্তোৎকর্ষের সর্বজনীন উত্তরাধিকার।' ইংরেজ-রাষ্ট্রব্যবহারে গুণীদের কোনো স্থান ছিল না। 'প্রাচ্য-রাষ্ট্রব্যবহারে নম্রভাবে আপন গুণজ্ঞতার গৌরব প্রকাশ উপেক্ষিত হয় নাই' বলিয়া কবি সন্তুষ্ট।

উড়িষ্যার নয়া রাষ্ট্রশাসনের ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রজাবাৎসল্য এবং বিচক্ষণতা কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। দেশের রাষ্ট্রনীতির মধ্যে গৌরবের যাহা তাহার কথা ভাবিয়া যেমন তৃপ্ত, তাহার বিরুদ্ধে ভাঙনের ধ্বনি শুনিয়াও তিনি তেমনি উদ্‌বিগ্ন। কবি বুঝিতে পারিতেছেন যে উড়িষ্যার এই সৌভাগ্যের গৌরব সকল দলকে অন্তরে অন্তরে একত্র করিতে পারে নাই। দলগত মতভেদ রাজনীতিতে চিরদিন আছে ও থাকিবে এ কথা রবীন্দ্রনাথ জানিতেন। সকল শ্রেণীর লোক একই মত পোষণ করিবে, রাষ্ট্রিক ব্যাপারে এই প্রকারের সর্বনাশা মতবাদ কবি সমর্থন করিতেন না। তিনি লিখিতেছেন, "রাষ্ট্রসম্পদ যাদের অনেক কালের সাধনার জিনিস এবং যাদের কাছে পরম মূল্যবান তারা দলগত পরস্পর তীব্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এর সম্মান বিস্মৃত হয় না। প্রয়োজন বোধ করলে তারা আঘাত লাগায় বাইরের দিকে, গোড়ার দিকে নয়।" কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে "পোলিটিশিয়ানেরা আপন দলাদলির স্বার্থসিদ্ধির জন্যে . . ছাত্রদের বুদ্ধিস্থৈর্য ও আত্মসংযম রক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে শেখালেন, এমন-কি তাদের অন্যায় আবদারকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন।" কবি পুরীতে আসিয়া সেখানকার ছাত্রমহলের এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া অতি দুঃখে লিখিতেছেন, "এখানকার একদল ছাত্র আপন নবলব্ধ রাষ্ট্রসম্পদের মর্যাদা নষ্ট ক'রে তাকে সর্বজনের কাছে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে সংকোচ করলে না।" কবি এই ব্যাপারকে 'কৌতুকাবহ শোচনীয় কাণ্ড' বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলিতেছেন, "আজ আমরা স্বারাজ্যের আংশিক অধিকার পেয়েছি, এই অধিকারকে ক্রমশ প্রশস্ত ক'রে পরিপূর্ণতায় হয়তো নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না। কিন্তু সেজন্যে আবশ্যক সৃষ্টি করবার শক্তি চালনা, যে-শক্তিতে আছে ধৈর্য, আছে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য, এবং অবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য বিষয়ের সম্মান রক্ষার প্রতি গভীর দরদ।" দেখা যাইতেছে একদল লোক "সকল বিষয়েই আপন শক্তি প্রকাশ করতে চায় ভেঙে ফেলবার আস্ফালনে। . . অতি তুচ্ছ বিষয়েও অদ্ভুত জেদের সঙ্গে তারা আপোস করতে নারাজ।" কবির মতে 'স্বভাবত অকর্মণ্যরাই অসহিষ্ণু।' রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ভয় এই অসহিষ্ণুতাকে। "যারা এক লাফে সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে সদ্যফল পেতে চায় তারা ভুলে যায় প্রতিকূলতার মাঝখানে আড্ডা ক'রে বারে বারে প্রতিহত হয়েও অক্ষুণ্ণ ধীরবুদ্ধি দিয়ে ভিতর থেকে বাধাকে আক্রমণ করতে থাকাই বীরোচিত। . . অব্যবস্থিত-চিত্তদের কে মনে করিয়ে রাখতে পারবে যে, মহৎ কাজে চাই তপস্যার চিত্তবৃত্তি শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা।" কবি মনঃক্ষোভে বলিতেছেন, "যখন দূরের থেকে আমরা রাষ্ট্রিক মুক্তির কামনা করেছিলুম স্বপ্নাবেশে তার মহার্ঘতা দীর্ঘকাল কল্পনা করেছি। কিন্তু শুভাদৃষ্টের দান যখন হাতে এল তখন তার মূল্য সম্পূর্ণ

উপলব্ধি করবার যোগ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি নে।"[১] কবি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যে কথা বলিয়াছিলেন, যথার্থ স্বাধীনতা লাভের পরও সর্বশ্রেণীর লোকে যে সে-কথা স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছে তাহা তো মনে হয় না।

দেশের বাহিরে প্রলয়ের হুংকার চলিতেছে, য়ুরোপীয় মহাসমরের আয়োজন সর্বত্র; কোথায় কখন কিভাবে প্রথম অস্ত্রাঘাত পড়িবে তাহারই প্রতীক্ষামাত্র। কবি লিখিতেছেন, "ইতিহাসের ঝোড়ো মাতুনি চলেছে জগৎ জুড়ে, লুটোপুটি করছে ওষধি বনস্পতি, দোহাই পাড়ছে শাখাপ্রশাখারা বধির আকাশের দিকে। এই ধাক্কাটা তাদের ভাঙবেই যাদের মজ্জা দুর্বল, কাঁচাফল অনেক পড়ে যাবে পাক ধরবার পূর্বেই, একটা সংকটের পর্ব চুকিয়ে দিয়ে যারা টি'কে থাকবে তারা নতুন জীবনের পালা আরম্ভ করবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন অতীতের মাঝখানে— যা অনিবার্য তা সব নিষেধকে ঠেলেঠুলে কাজ করবে ভিতরের থেকে।"

মংপুতে এক মাস

পুরী হইতে ফিরিয়া কবি মংপু যাত্রা করেন। মংপুর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। গত বৎসর কালিম্পং হইতে সপ্তাহ-তিনের জন্য মংপুতে যান। এবার কালিম্পং না গিয়া মংপুতে ডক্টর মনোমোহন সেন ও মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেখানে এক মাস থাকিয়া (১৭ মে - ১৭ জুন ১৯৩৯) কলিকাতায় নামিয়া আসেন। এই এক মাসের বিস্তৃত কাহিনী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁহার 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন।

মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর যত্নে কবি বেশ আরামে ও আনন্দে আছেন। মাঝে মাঝে কবিতা লেখেন, সন্ধ্যায় সকলকে লইয়া সাহিত্য-আলোচনা করেন। কবিতাগুলি সানাই ও নবজাতকের মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে; কয়েকটি কবিতার ইতিহাস পাই মৈত্রেয়ী দেবীর বইতে।[২] 'কর্ণধার' নামে যে কবিতাটি 'সানাই'এ পাই তাহা মংপুতে লিখিত মূল রচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; মংপুতেই ইহার কয়েকবার রদবদল করেন; তার পর প্রবাসীতে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৬) যে একটি রূপ দেখা গেল (লীলা, ১৪ অক্টোবর ১৯৩৯) সেটিও শেষ রূপ নহে, সানাই কাব্যখণ্ডে আবার পরিবর্তিত রূপে বাহির হইল (২৮ জানুয়ারি ১৯৪০)। রবীন্দ্রনাথ কাব্যকে কেবল মাত্র আত্মপ্রকাশ রূপে দেখেন না, তিনি কলা রূপেও তাহার বিচার করেন; সেইজন্য তাঁহার কাছে কাব্যপ্রসাধন কাব্য-সাধনারই সমতুল্য।[৩] নবজাতকের 'সাড়ে ন'টা' (৮ জুন ১৯৩৯) ও সানাই-এর 'মানসী' (৯ জুন) কবিতাদ্বয়ের ইতিহাস পাওয়া যায় ঐ গ্রন্থেই।[৪]

রেডিওর মধ্য দিয়া দূরদূরান্তের যে বিচিত্র সুরতরঙ্গ ভাসিয়া আসে তাহার রহস্য কবিকে মুগ্ধ করে।

দেহহীন পরিবেশহীন
গীতস্পর্শ হতেছে বিলীন
সমস্ত চেতনা ছেয়ে।. . .

১ উড়িষ্যার অতিথি; প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, পৃ ২৯৮-৩০০।

২ কর্ণধার (খসড়া ২৩ মে ১৯৩৯, সানাই), উদ্‌বৃত্ত (৩০ মে, সানাই), স্মৃতির ভূমিকা (৮ জুন, সানাই), সাড়ে ন'টা (৮ জুন, নবজাতক), মানসী (৯ জুন, সানাই), পরিচয় (১৩ জুন, সানাই)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪।

৩ দ্র মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (১ম সং), পৃ ১৭৭-৭৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৭৬-৭৭।

৪ মানসী [মংপু], ৯ জুন ১৯৩৯। সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৮৭-৮৮। এই কবিতা রচনার ইতিহাস 'নবজাতক' কাব্যখণ্ডের 'সাড়ে ন'টা' (৮ জুন ১৯৩৯) কবিতার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। দ্র মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (১ম সং), পৃ ৯১-৯৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৮২।

একাকিনী, বহি
রাগিণীর দীপশিখা,
আসিছে অভিসারিকা
সর্বভারহীনা ;
অরূপা সে, অলক্ষিত আলোকে আসীনা।

সকল গিরিসাগর ঝড়-ঝঞ্ঝার বাধা অতিক্রম করিয়া যেমন সুরতরঙ্গ ভাসিয়া আসিতেছে, তেমনি দূরকালের ছন্দ ধ্বনিত হইয়া রূপ লইয়া আছে কাব্যে।

যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি অদ্ভুত।
বাণীমূর্তি সেও একা।. .
যুগ যুগ হয়ে এল পার
কালের বিপ্লব বেয়ে, কোনো চিহ্ন আনে নাই তার।[১]

মৈত্রেয়ী দেবীর সহিত রেডিও-যন্ত্রটা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে, পদ্মাতীরে কী শান্ত পরিবেশের মধ্যে 'মানসী' (মানসসুন্দরী, সোনার তরী) কবিতা লেখেন, তাহারই কথা গল্পচ্ছলে বলেন। সেই ভাবনা হইতেই মানসী ও পরিচয় কবিতা দুইটির উদ্ভব। মানসী লিখিবার কয়েকদিন পরে 'পরিচয়' (১৩ জুন ১৯৩৯) নামে আখ্যায়িকার আভাস-যুক্ত একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিত হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে শান্তিনিকেতনে কবি 'বাসাবদল' (সানাই) নামে যে একটি কবিতা লেখেন ও মংপুতে বাস-কালে 'পরিচয়' (১৩ জুন) নামে যে কবিতাটি লিখিলেন উভয়ের উৎস একটি সাধারণ গদ্যছন্দের অপ্রকাশিত কথিকা। 'বাসাবদলে'র ঘটনাংশ যথার্থ পাওয়া যাইবে 'পরিচয়ে'র শেষাংশে— মূল কথিকার রূপটি সেখানে আছে। শিল্পী বা সাহিত্যিককে তাহার রচনা-রহস্য দ্বারা বিচার করিয়া মনে করি সে বুঝি অতিমানব বা মহামানব। কিন্তু পরিচয়ের সীমার মধ্যে আসিলে দেখা যায় যে, সে সাধারণ বা প্রাকৃত জনের ন্যায়ই ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জর্জরিত ; তখন ভক্তের বিহ্বলতা ভাঙিয়া যায়, সে বলে—

যে-তুমি নও প্রতিদিনের সেই তোমারে দিলাম যে-অঞ্জলি,
তোমার দেবীর প্রসাদ রবে তাহে।

প্রেমাস্পদকে কেহ প্রাকৃতজনের স্বভাব-দুর্বল অবস্থায় দেখিতে চাহে না ; 'চণ্ডালিকা'তে আনন্দের পতনসম্ভাবনায় প্রকৃতি যে নিদারুণ কষ্ট পাইয়াছিল তাহার কারণ 'চাই না তোমায় ধরতে আমি মোর বাসনায় ঢেকে।' ইহার সঙ্গে তুলনীয় ছোটোগল্প 'শেষকথা'য় অচিরার উক্তি ও ব্যবহার।

কবি সাময়িক পত্রিকা হাতে আসিলেই পড়েন ; থিওজফিক্যাল জার্নালের কয়েকটি সংখ্যা মংপুতে পান ; এই পত্রিকায় আধিভৌতিক অনেক কথা থাকে। কবি সেগুলি পড়িয়া মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তাঁহাকে বলেন। দশ বৎসর পূর্বে (১৯২৯) বুলা বা উমা দেবীর (গুপ্ত) মাধ্যমে যে-সব অদ্ভুত কথা জানিতে পারেন তাহারই বিস্তারিত আলোচনা এখানে পাই।[২] এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্বেই বলিয়াছি।

কিন্তু কবিচিত্তের আর-একটি দিক অত্যন্ত উদ্‌বেগপূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌গ্রেসের জয়জয়কার আটটি

১ সাড়ে ন'টা। মংপু, ৮ জুন ১৯৩৯। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪১-৪২।
২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (১ম সং), পৃ ৬৪-৬৯।

প্রদেশে; কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সমস্যা দেখা দিয়াছে কন্‌গ্রেসের কর্তৃত্ব লইয়া। সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কন্‌গ্রেস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে হইতে কন্‌গ্রেসে ভাঙন ধরিয়াছে; তার পর রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দ্বারাও তাহা শমিত হয় নাই। উড়িষ্যায় বাস-কালে বিরোধীদলের যে মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা কবির মতে আশাপ্রদ নহে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষণীতে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'উড়িষ্যার অতিথি'[১] ও 'কন্‌গ্রেস'[২] শীর্ষক পত্র-প্রবন্ধ দুইটি বিচার্য। মংপু হইতে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন, "পৃথিবীতে যে-দেশেই যে-কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্‌ভাবিত করে। ইম্‌পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ বলো, ফাসিজ্‌ম্‌ বলো, অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি ক'রে চলেছে। কন্‌গ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে ব'লে সন্দেহ করি।.. মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস্যা সাত্ত্বিক এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত ক'রে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারে নেই যে-উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত? ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গ'ড়ে উঠছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাই নি যখন মহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনি ও হিট্‌লারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন।..

"আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহারলালকে, যেখানে ধন বা অন্ধ ধর্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সংকীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত করে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, কন্‌গ্রেসের দুর্গ-দ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে নি? এতদিন পরে অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। কিন্তু আমি পোলিটিশিয়ান নই, এই প্রসঙ্গে সে কথা কবুল করব।" এই দীর্ঘ প্রবন্ধে কবি ত্রিপুরী-উত্তর কন্‌গ্রেসের মনোভাবের যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন তাহা আজও গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। কবি বলিতেছেন, "দেশে মিলনকেন্দ্ররূপে কন্‌গ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে আর-এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের অনৈক্য শোচনীয় এবং ভয়াবহ সে কথা বলা বাহুল্য।.. এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে আচার ও ধর্ম এক সিংহাসনের শরিক হয়ে মানুষের বুদ্ধিকে আবিল করে রেখেছে।" ভারতের প্রত্যেক 'পাঁচ-দশ ক্রোশ অন্তর অতলস্পর্শ গর্ত' 'এবং সেই গর্তগুলোকে দিনরাত আগলে রয়েছে ধর্মনামধারী রক্ষকদল।' নানা কারণে 'প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি।'

ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসের (মার্চ) কথা উল্লেখ করিয়া কবি লিখিতেছেন যে, "সেখানকার অধিবেশনের ব্যবহারে বাঙালি জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে, এই অভিযোগ বাংলাদেশে ব্যাপ্ত। এই নালিশটাকে বিশ্বাস ক'রে নেওয়ার মধ্যে দুর্বলতা আছে।" মহাত্মাজির নেতৃত্বে ভারতের যে অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়াছে তাহার কথা বারে বারে স্বীকার করিয়াও বলিলেন, "তবু তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোনো কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে".. এবং "যদি কোনো কৃতী নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞ, তাঁর সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তাঁর কামনার অভিব্যক্তি— কিন্তু দূরের থেকে।"

কবি সুভাষচন্দ্রকে এই কর্মবীর রূপে ভাবিতেছেন। তিনি লিখিলেন, "আজ আমি জানি, বাংলাদেশের

১ উড়িষ্যার অতিথি; প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, পৃ ২৯৮-৩০০। পুরী হইতে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র।

২ কন্‌গ্রেস, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৩১৬-১৮। মংপু হইতে ২০ মে বা ১১ জ্যৈষ্ঠ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র।

.ননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা ক'রে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে। .. আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধ'রে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো ক'রে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি হয়তো প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতির রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।"[১]

দেশের সমস্যা সম্বন্ধেও যেমন মন উদ্‌বিগ্ন, চীনের সংবাদেও মন তেমনি ক্ষুব্ধ। রংপুতে একদিন বলিতেছেন, 'চীনদেশের কাহিনী আর শুনতে পারি নে। ইচ্ছে করে না খবরের কাগজ খুলি, ইচ্ছে করে না রেডিওর খবর শুনি। কিন্তু না শুনেও তো পারি নে। চোখ বুজে তো বেদনার অন্ত করা যায় না। এ অত্যাচারের ইতিহাস অসহ্য হয়ে উঠল। .. বাঁচতে ইচ্ছে করে না আর। এ পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। .. এ নৃশংসতা আর কত দেখব।"[২]

কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে আপসোস ও আশা পোষণ করাই তো রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিত্তের রূপ নহে। সাময়িক-ভাবে সমসাময়িক রাজনীতির বেদনাদায়ক সংবাদাদি তাঁহার স্পর্শচেতন চিত্তকে বেদনায় কাতর করে— তাহা প্রকাশ করেন পত্রে প্রবন্ধে কবিতায়; তার পর মন চলে নিজের পথে— লিখিতেছেন আর্ট সম্বন্ধে প্রবন্ধ (২৫ মে ১৯৩৯)। অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি -রচিত 'রূপশিল্প'[৩] নামে গ্রন্থখানি পড়িয়া মনের মধ্যে যে ভাবনাগুলির উদয় হয় তাহাই প্রকাশ পায় ঐ প্রবন্ধে। পূর্বেই বলিয়াছি, কবিতা আছে সবার মাঝে মাঝে। এই প্রবন্ধে কবি কেবল চিত্রাদি চাক্ষুষ-কলার আলোচনা করেন নাই, সংগীতাদি শ্রাবণ-কলারও সূক্ষ্ম আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রংপু হইতে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (১৯ জুন ১৯৩৯)। গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় এখনো খোলে নাই। কয়েকদিনের জন্য শ্রীনিকেতনের ত্রিতলে বাস করিবার জন্য গেলেন (২৫ জুন)। শ্রীনিকেতনে থাকেন সপ্তাহ-তিন। ১৭ জুলাই (১ শ্রাবণ ১৩৪৪) শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন।

আমাদের এই আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশনের ব্যবস্থা চলিতেছে। বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সহকারী কর্মসচিব কিশোরীমোহন সাঁতরা এ বিষয়ে অগ্রণী হন। পাঠকের স্মরণ আছে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা বহুকাল গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশিত হয় নাই, তাঁহার কাব্যগ্রন্থের শেষ প্রকাশ হয় ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে, গদ্যগ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ১৯০৭-০৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাহার পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থাদি বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন। এতকাল পরে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ কবির সমুদয় রচনা মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলেন।[৪]

শ্রীনিকেতনে বাস-কালে কবি এই 'রচনাবলী'র জন্য তাঁহার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন (৩০ জুন ১৯৩৯)। কবির

১ কন্‌গ্রেস, রংপু, ২০ মে ১৯৩৯। দ্র কালান্তর (২য় সং), পৃ ৩৬৩-৭৫।

২ রংপুতে রবীন্দ্রনাথ (১ম সং), পৃ ৫৪।

৩ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৩৮৭-৯০।

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রায় ২৫ খণ্ডে সমাপ্য... দ্র কবিতা, পৌষ ১৩৪৬, পৃ ৪৯-৫৬— বুদ্ধদেব বসু -লিখিত সমালোচনা। আসলে সাধারণ ২৬ খণ্ড; অচলিত ২ খণ্ড।

মহা সংকোচ তাঁহার পুরাতন রচনা সম্বন্ধে, ঘোর আপত্তি সে-সবের পুনঃপ্রকাশের। কিন্তু তাঁহার আপত্তিতে কেহই সায় দেন নাই। কবি এই ভূমিকায় লিখিতেছেন, "আমার আশি বছর বয়সের সাহিত্যিক প্রয়াসকে সম্পূর্ণ আকারে পুঞ্জিত করবার এই যে চেষ্টা আজ দেখছি, এর মধ্যে নিশ্চিত অনুমান করছি অনেক গাঁথুনি আছে, যার উপরে আগামী কালের বিস্মরণের দূত প্রত্যহ অদৃশ্য কালিতে লুপ্তির চিহ্ন অঙ্কিত করে চলেছে। এ সম্বন্ধে আমার কোনো মোহ নেই, এবং ক্ষোভ করাও বৃথা বলে মনে করি। . .

"কালের পরিবর্তিত গতির সঙ্গে অনেক জীব তাল রেখে চলতে পারে নি, প্রাণরঙ্গশালা থেকে সেই বেতালাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবাই তো সরে নি। অনেক আছে কালের সঙ্গে তাদের মিল ভাঙে নি। আজ নূতনও তাদের দাবি করে, পুরাতনও তাদের ত্যাগ করে নি। কি শিল্পকলায়, কি সাহিত্যে যদি তার যথেষ্ট প্রমাণ না থাকত তা হলে বলতে হত, সৃষ্টিকর্তা মানুষের মন আপন পিছনের রাস্তা ক্রমাগত পুড়িয়ে ফেলতে ফেলতেই চলেছে। কথাটা তো সত্য নয়। মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের, নইলে তার চলাই হয় না। পিছনহারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক।"

এই প্রসঙ্গে কবি যে পত্র চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দেন তাহা তিনি নিবেদনে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছিলেন, "ভূরিপরিমাণ যে-সকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলে গণ্য করি আপনাদের সম্মিলিত নির্বন্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম-স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবী কালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারব না। আপনারা তর্ক করে থাকেন ইতিহাসের আবর্জনা দিয়ে যে গাধার টুপিটা বানানো হয় ইতিহাসের খাতিরে সেটা মহাকালের আসরে প'রে আসতেই হবে। কবির তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ইতিহাসও বহু অবাস্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মানুষের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের দেহে যে একটা লম্বমান প্রত্যঙ্গ ছিল সেটাকে সর্বদা পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয় না, এ কথা মানবসন্তান মাত্রেই স্বীকার করে থাকে।" অবশেষে একটা আপস-নিষ্পত্তি হইল যে, কবির বর্জিত রচনাসমূহ পরিশিষ্ট খণ্ডে স্থান পাইবে।

শ্রীনিকেতনে কবি যে তিন সপ্তাহ বাস করেন সে প্রায় নির্জনবাসের তুল্য; বাহিরের লোকজন অতিথি-অভ্যাগতের ভিড় এখানে কম। কিন্তু পত্রাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা কোথায়ও সম্ভব নহে। একখানি পত্র ও তাহার ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক অলীক কথা মুখে মুখে সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক সমাজে চালু ছিল বরাবরই। নরেন্দ্র দেব 'সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে প্রবাসীর সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ সরবরাহ করেন। এতদ্‌সম্পর্কে শ্রীনিকেতনে থাকিতে কবি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এক পত্র পান। তদুত্তরে তিনি (৯ জুলাই ১৯৩৯) লিখিতেছেন, "গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্যে মরতে আমার সংকোচ হয়। তখন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে— আটকাবে কে?"[২]

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক আর-একটি পত্র পাই। ২০ চৈত্র ১৩৪৪ 'যুগান্তরে' প্রবোধচন্দ্র সান্যালকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানির শেষ অনুচ্ছেদে আছে, "কোনো কোনো

১ ২য় সংস্করণ, পৃ ৭৯-৮০। ২ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃ ৫৭১-৭২।

মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না। তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছে পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয় নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারলে না। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনা-শোনা হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয় নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজবৌ, রামের সুমতি, বড়োদিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালোবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।"[১]

শ্রীনিকেতনে থাকিবার সময় একদিন (২৪ জুলাই ১৯৩৯) কবি তথাকার সর্বশ্রেণীর কর্মীদের সহিত মিলিত হন ও তাহাদের নিকট শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও কিভাবে এখানে কর্মে প্রবৃত্ত হন তাহার ইতিহাস অত্যন্ত সরলভাবে বলেন। এই ভাষণের মধ্যে জমিদারিতে তাঁহার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা[২] বলেন—"তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক্-বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল।" এই ভাষণের মধ্যে পুরাতন কথা সবই, তবে যাহাদের জন্য বলা তাহাদের উপযুক্ত হইয়াছিল।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীনিকেতনের কর্মব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন হইয়াছে; সুকুমার চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন; ইনি বাংলা সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; কর্মকাল শেষ হইবার পূর্বেই জনসেবার উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে যোগদান করেন। তাঁহার চেষ্টায় 'দেশবিদেশে' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। ধীরেন্দ্রমোহন সেন এখন শ্রীনিকেতনের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা। ১৯৩৭ জানুয়ারি মাসে বোলপুর হইতে গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়[৩] শ্রীনিকেতনে উঠিয়া আসে। বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট ইহার ব্যয়ভার বহন করেন। তবে বিদ্যালয় পরিচালনার ভার বিশ্বভারতীর উপর অর্পিত হয়। কবি প্রতিষ্ঠানের নাম দেন 'শিক্ষাচর্চা'। ধীরেন্দ্রমোহন এখন শিক্ষাসত্র ও শিক্ষাচর্চার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (জুলাই ১৯৩৮)। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-পাঠভবনের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন প্রমদারঞ্জন ঘোষ। তিনি সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ হইতে জুলাই ১৯৩৯ পর্যন্ত এই কার্য করেন। ১৯৩৯-এর জুলাই হইতে শিক্ষা ও পাঠ -ভবন পুনরায় পৃথক করিয়া দেওয়া হইল। শিক্ষাভবন বা কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন অনিলকুমার চন্দ[৪]; তিনি এতদিন ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক ছিলেন এবং কবির সেক্রেটারির কাজ করিতেন।

পয়লা শ্রাবণ (১৭ জুলাই ১৯৩৯) কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন— বিদ্যালয় খুলিয়া গিয়াছে। নূতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা ক্ষীণ; তবে অন্যকে উদ্‌বোধিত করিতেছেন লিখিবার জন্য। এই অভ্যাস কবির আযৌবনের; বলেন্দ্রনাথ তাঁহার হাতে-গড়া। কত নগণ্যের রচনা শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহার হিসাব নাই। সামান্য লেখক-লেখিকাকে লিখিবার জন্য কী উৎসাহ দিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য দিবার লোক এখনো আছেন।

আমাদের আলোচ্যপর্বে কবি প্রমথ চৌধুরীর 'প্রাচীন হিন্দুস্থান'[৫] ও ইন্দিরা দেবী -কৃত 'ভারতবর্ষ' সম্বন্ধে রেনে

১ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, পৃ ২৮২, 'বিবিধ প্রসঙ্গ', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসাদির সমালোচনা।

২ *Visva-Bharati News*, August 1939, pp 12-13। সুকুমার চট্টোপাধ্যায় -কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত; প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৬, পৃ ৬৬১-৬৬, শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ। পল্লীপ্রকৃতি (১৩৬৮), পৃ ৯৮।

৩ বোলপুর গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় যেখানে ছিল সেখানে এখন বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়।

৪ অনিলকুমার চন্দ জুলাই ১৯৩৯ হইতে জুলাই ১৯৫২ পর্যন্ত শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতের পার্লামেণ্টে বা লোকসভায় তিনি সদস্য নির্বাচিত ও পরে পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী নিযুক্ত হইলে তিনি বিশ্বভারতীর কার্য ছাড়িয়া দেন। বিশ্বভারতী বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানার্হ অধ্যাপকের পদ দান করিয়াছেন।

৫ প্রাচীন হিন্দুস্থান, সমালোচনা, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৬, পৃ ৬৩৩।

গ্রুসের ফরাসীগ্রন্থের তর্জমা প্রকাশনের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রমথ চৌধুরী 'ইতিহাসে ভূগোলে মিলিয়ে' 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' নামে 'বই লেখবার সংকল্প' গ্রহণ করেন, সেটা কবির ভালোই লাগে।[১] কবির ভরসা ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বইখানির প্রকাশনভার গ্রহণ করিবেন; কিন্তু তাঁহাদের পছন্দ না হওয়ায়, বিশ্বভারতী হইতেই উহা প্রকাশনের ব্যবস্থা করা হইল। কবি প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "ওর মধ্যে আমার হাত চালিয়েছি অনেকখানি। তার কারণ, ওটাকে আমাদের লোকশিক্ষা সংসদের আদর্শে তৈরি করতে হোলো। ভয় আছে পাছে জিনিষটাকে না চিনতে পেরে উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠ। যাই হোক, ওটা এইবার প্রেসে চড়বে— পুজোর পূর্বেই আট-আনা সংস্করণের মাপে বেরবে।"[২]

রেনে গ্রুসে বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক; প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া সমাদৃত। তাঁহার ফরাসী গ্রন্থ l' histoire de Extreme orient-এর ভারতবর্ষ অংশ অনুবাদ করেন ইন্দিরা দেবী। কবি তাহা আনাইয়া শান্তিনিকেতনে অনুলিপি করান, ভাষার প্রয়োজনমত সংস্কার করেন এবং 'পরিচয়' পত্রিকায় পাঠাইয়া দেন (৪ অগস্ট ১৯৩৯)।[৩]

সেইদিন শান্তিনিকেতনে আসিলেন আওয়াগড়ের মহারাজা সূর্যপাল সিংহ; তিনি এবার পক্ষকাল আশ্রমে কবির অতিথিরূপে থাকেন। তিনি বিশ্বভারতীর জন্য বহু টাকা দান করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে দিয়াছিলেন কবির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ।[৪]

আওয়াগড়ের মহারাজা থাকিতে থাকিতে বৃক্ষরোপণ-উৎসব সম্পন্ন হয়। এবার উৎসব হয় চীনাভবনের দক্ষিণ-প্রাঙ্গণে। হাঙ্গেরিয়ান শিল্পী মিসেস ব্রুনার (Brunner) বুদ্ধগয়া হইতে বোধিদ্রুমের একটি চারা আনিয়াছিলেন, এইবার সেইটি রোপিত হয় (১৩ অগস্ট)[৫]।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, এ সময়ে কবির রচনা খুব কমই চোখে পড়ে। তবে এই সময়ের রচিত একটি মাত্র কবিতার উল্লেখ আমরা করিব; কবিতাটির নাম 'রাত্রি'।[৬] মংপু হইতে অমিয় চক্রবর্তীকে কবি যে এক পত্র লেখেন (১৬ জুন)

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১২৫, ২০ নভেম্বর ১৯৩৮, পৃ ৩০৭। পত্র ১২৯, ২৪ জুলাই ১৯৩৯ [৮ শ্রাবণ ১৩৪৬], পৃ ৩১০। পত্র ১৩২, ১০ জানুয়ারি ১৯৪০ পৃ ৩১১-১২।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১২৯। ২৪ জুলাই ১৯৩৯, পৃ ৩১০।

৩ পরিচয়-এর প্রবন্ধের নিম্নে লেখা ছিল—"শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী কর্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত রেনে গ্রুসে 'ভারতবর্ষ' সম্পূর্ণ আকারে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ প্রকাশ করিবেন।" দুঃখের বিষয় সে-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

পরিচয় ৯ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ভাদ্র ১৩৪৬ পৃ ১৭৩-৮২; আশ্বিন পৃ ২৬২-৭৬; কার্তিক পৃ ৩৫৯-৬৭; অগ্রহায়ণ পৃ ৪১৭-২৫; পৌষ পৃ ৫৫৪-৬১, ৯ম বর্ষ ২য় খণ্ড, বৈশাখ ১৩৪৭ পৃ ৩২০-৩০; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ পৃ ৪১৪-২৭।

৪ এইবার আসিয়া তিনি বিশ্বভারতীর জন্য ১, ২৭, ৫০১ টাকা দান করিলেন; ইহার পূর্বে ও পরেও তিনি দান করিয়াছিলেন। According to the desire of the Founder-President the Samsad earmarked out of the fund Rs 60,000/- for endowment of Sangit-Bhavana and Library fund and Rs 67,501 for capital expenditure at Santiniketan."—Annual Report Visva-Bharati, 1939, p 1.

৫ *Visva-Bharati News*, September 1939 p 22। মিসেস ব্রুনার ও তাঁহার কন্যা বহুকাল শান্তিনিকেতনে বাস করেন; ইঁহারা শিল্পী ছিলেন। জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ছিল। পরে ইঁহারা ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া দিল্লী যান। মাতা ব্রুনারের মৃত্যু হইয়াছে; মিস ব্রুনার বহুকাল পরে কয়েক বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতন দেখিতে আসেন।

৬ রাত্রি। পুনশ্চ, শান্তিনিকেতন। ২৬ জুলাই ১৯৩৯। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৫৯-৬০। নবজাতকের এই কবিতাটির প্রসঙ্গে কবির শান্তিনিকেতনের শেষ দিনের একটি ঘটনা তুলনীয়। দ্র কবিকথা, পৃ ৫২-৫৩।

তাহার শেষাংশের সহিত এই কবিতাটি পঠনীয়। বার্ধক্যে মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। তাহার ছায়া ঘনাইয়া আসিলে মন শাশ্বত সত্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়; তখন সেই বিহ্বলতা দূর করিবার জন্য আপনার উর্ধ্বে আপনি উঠিবার জন্য, আপনার জরা-পীড়াজনিত স্বাভাবিক দুর্বলতাকে অস্বীকার করিবার জন্য যেন ঘোষণা করিতেছেন—

নিজেরে ধিক্কার দিয়ে মন ব'লে ওঠে,
'নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর
অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত,
কঠিন মাটির 'পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় করে চলা।

আমাদের এই আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' নাটকের জন্য নূতন কতকগুলি গান লেখেন, সংলাপে কিছু নূতন পাঠ সংযোগ এবং কিছু পাঠ পরিবর্তন করেন। জুলাই মাসে শ্রীনিকেতন হইতে ফিরিয়া শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের লইয়া মহড়াও আরম্ভ করেন[১]; তিন চার মাস ধরিয়া রিহর্শাল চলে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিনয় হয় নাই। কবির ভগ্নস্বাস্থ্যের উপর অধিক পীড়নের শঙ্কায় শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়।

ডাকঘরের জন্য নূতন এই কয়টি গান এই সময়ে লিখিত : ১. আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল ঘরভোলা সব যত ২. বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে ৩. শুনি ওই রুনুঝুনু পায়ে পায়ে নূপুরধ্বনি ৪. এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে ফুলের ডালা ৫. সুরের জালে কে জড়ালে আমার মন ৬. কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা ৭. সমুখে শান্তিপারাবার। শান্তিদেব লিখিতেছেন, এই মহড়ার পর্বে কবি "একদিন বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর তো আর বেশি দেরি নেই, এটি যদিও অমলের মৃত্যুর গান কিন্তু এ গানটি তাঁরও মৃত্যুতে আমরা কাজে লাগাতে পারব।"[২] আমাদের মনে হয় এ কথা কবি রহস্য করিয়াই বলিয়াছিলেন। কবিকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, তিনি এই প্রকার স্থূলতার পক্ষপাতী হইতে পারেন না।[৩] শান্তিদেব বলেন যে, তিনি জাভা হইতে ফিরিয়া অর্থাৎ পূজাবকাশের পর এই গানটি শুনিতে পান ও শেখেন।[৪]

১ "Gurudeva .. returned to Santiniketan on Monday, July 17 [1939]. He is at present engaged in directing the rehearsals of 'Dak-Ghar' (Post-Office) which is expected to be produced sometime during this term."—*Visva-Bharati News*, Vol VIII, August 1939, p 10.

২ রবীন্দ্রসংগীত, (১৩৬৫ সংস্করণ), পৃ ২০৮। দ্র 'শেষলেখা'র ভূমিকা।

৩ "রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।" রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রিক মত, কালান্তর। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৩৭।

৪ ডাকঘরের ছয়টি গান গীতবিতানে একস্থানেই আছে (পৃ ৮০৭-০৮); ৬ নং গানটি সানাই-এ আছে, তারিখ ১০ জানুয়ারি ১৯৪০ (রূপকথায়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৯২-৯৩)। 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানটি (৭নং) এই সময়ে লেখেন বলিয়া শোনা যায়; গীতবিতানে (পৃ ৮৬৪) তারিখ আছে ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯। শেষ লেখা (৭নং) দৃষ্টে তারিখগুলি বসানোর মধ্যে অথবা সংবাদের মধ্যে কোথাও ভুল আছে বলিয়া সন্দেহ হয়।

মহাজাতি-সদন

কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে কবির কাছে অনুরোধ আসিল, তাঁহার পরিকল্পিত মহাজাতি-সদনের ভিত্তিপ্রস্তর কবিকে স্থাপন করিতে হইবে। 'মহাজাতি-সদন' কী সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

সুভাষচন্দ্র কন্‌গ্রেস-প্রেসিডেণ্ট হইয়া কলিকাতায় একটি স্থায়ী কন্‌গ্রেস-ভবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন; তখনও এলাহাবাদের 'আনন্দভবন' কন্‌গ্রেসের জন্য পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই পরিকল্পনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল। এই গৃহনির্মাণের জন্য ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল 'সুভাষ কন্‌গ্রেস ফাণ্ড' নামে একটি তহবিল খোলা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া (২৭ মে) সুভাষচন্দ্রকে এক পত্রে লিখিয়া পাঠান, "তোমাদের সংকল্পিত কন্‌গ্রেস-ভবনের পরিকল্পনাটি যথোচিত হয়েছে বলে মনে করি। এই ভবনের প্রয়োজনীয়তা বিচিত্র এবং ব্যাপক। সর্বজনের আনুকূল্যে এর প্রতিষ্ঠা উপযুক্তরূপে সম্পন্ন হবে আশা করে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি। এই গৃহের সম্পূর্ণতার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যের এবং গৌরবের রূপ দেখতে পাব।"

পাঠকের স্মরণ আছে প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন হয়। সেদিনের সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাহার উপর ইমারত আর উঠে নাই। সেখানে এখন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও কর্পোরেশনের পার্ক। এবারকার কন্‌গ্রেস-ভবন নির্মাণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন সেণ্ট্রাল (চিত্তরঞ্জন) অ্যাভিন্যুর উপর একখণ্ড জমি দান করেন (২৪ অগস্ট ১৯৩৮)।[১]

এই ঘটনার অনতিকাল-মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সহিত কন্‌গ্রেসের বিরোধের সূত্রপাত হয়। কলিকাতায় নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটির সভায় সুভাষ প্রেসিডেণ্ট-পদ ত্যাগ করিলেন (এপ্রিল ১৯৩৯)। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে কন্‌গ্রেস-বিরোধী মনোভাবের উদয় হয়। রবীন্দ্রনাথ দূর হইতে দেশের সমস্ত সংবাদ রাখিতেন।

রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠাইলেন, এইটি ৪ মে ১৯৩৯ তারিখের Statesmanএ প্রকাশিত হয়। "The dignity and forbearance which you have shown in the midst of a most aggravating situation has won my admiration and confidence in your leadership.

The same decorum has still to be maintained by Bengal for the sake of her own self-respect and thereby to help to turn your apparent defeat into a permanent victory."[২]

রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেছেন, দেশের মধ্যে প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্বের সময় সুভাষচন্দ্রই দেশনায়কত্ব করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি-পদ ত্যাগের পরই (মে ১৯৩৯) কবি 'দেশনায়ক' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতে চাহিলেন।[৩] এই অকথিত ভাষণে কবি যাহা সুভাষচন্দ্রের ও দেশবাসীর উদ্দেশে বলিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—

"বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের

১ মহাজাতি-সদন, ২৩ জানুয়ারি ১৯৫০, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চতুষ্পঞ্চাশৎ জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

২ শ্রীভবেশচন্দ্র মাইতি আমাকে এই উদ্‌ধৃতি পাঠাইয়া দেন; তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। পত্র, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪।

৩ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা এই অপ্রকাশিত ভাষণ ১৯৩৯ সালের মে মাসে লিখিত ও মুদ্রিত হয়, কিন্তু তখন উহা প্রচার করা হয় নাই। আনন্দবাজার পত্রিকা। দ্র সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়-কৃত সুভাষচন্দ্র, পরিশিষ্ট।

রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই। . .

"এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন। . .

• "বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তা থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে,[১] নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে; কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য ব'লে মানো নি। তোমার এই চারিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

"বাংলাদেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালি সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভব কি না এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মতো তর্ক করে নি, বিচার করে নি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।

"তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল, ভুল ক'রে আগুন লাগাল, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে ক'রে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণনিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে, কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ ক'রে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসী লেপন করুক তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয়তাকে?

"আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে; বাঙালির স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই-সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর ক'রে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে নববসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ করো তুমি।

১ সাড়ে-পাঁচ বৎসর বন্দী থাকিবার পর সুভাষচন্দ্র মুক্তি লাভ করায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট জনসভায় তাঁহার সংবর্ধনা হয়। শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার অর্থ, "সমগ্র জাতির কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমি সুভাষকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।" (৬ এপ্রিল ১৯৩৭) প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৪, পৃ ১৪৯। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

"বলতে পারো, এত বড়ো কাজ কোনো একজনের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। সে কথা সত্য। বহু লোকের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হতে পারলে তবেই হবে অসাধ্যসাধন। যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তাঁরা কখনোই একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন, সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তাঁরা বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘদান করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।

"এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্‌বোধন করেছেন, ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন-যজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলাদেশের সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক— তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

"বহুকাল পূর্বে একদিন আর-এক সভায় আমি বাঙালি সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলাম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর-এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্য রূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তার পরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।"

আমাদের প্রশ্ন, এই ভাষণ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াও প্রকাশিত হইল না কেন? কন্‌গ্রেস ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া আপনাদের সাফল্য সম্বন্ধে এতই নিশ্চিন্ত যে, তাঁহাদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা তাঁহাদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ কন্‌গ্রেস-পক্ষীয়দেরই সমালোচনা। আমাদের মনে হয় কবির সুহৃৎ ও বিশ্বভারতীর হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে এই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব কবি গোপন করিতে পারিলেন না; অমিয়চন্দ্রকে লিখিত 'কন্‌গ্রেস' নামে পত্র-প্রবন্ধ তাহার সাক্ষ্য; কিন্তু অচিরেই সুভাষের অন্য এক কর্মোপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সর্বসাধারণ-সমক্ষে অভিনন্দিত করিলেন; সেইটি হইতেছে 'মহাজাতি-সদনে'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

'মহাজাতি-সদন' এই নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। সুভাষচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথকে বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপপরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন— বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে-সমস্ত কথা, যে-সমস্ত চিন্তা, যে-সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে— তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি-সদনে'র

ভিত্তিস্থাপনা করুন। যে-সমস্ত কল্যাণপ্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে— এই গৃহ তারই জীবন-কেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি-সদন' নাম সার্থক ক'রে তুলুক— এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এই আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরামগতিতে আমাদের সংগ্রামপথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সব রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত ক'রে তুলি।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্‌ধৃত করিতেছি— কবির মন কিভাবে কাজ করিতেছে তাহার আভাস পাইব—

"আজ এই মহাজাতি-সদনে আমরা বাঙালিজাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সংশয়কণ্টকিত। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা, এবং জনসেবার আত্মনিবেদন, এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক, বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি-সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তরূপ গ্রহণ করে বাঙালিকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক।.. আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক্ না করুক— এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার ঊর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা উড্ডীন রাখে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের সহিত সুভাষচন্দ্রের এই প্রচেষ্টার কী গভীর যোগ ছিল তাহা, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি 'মহাজাতি-সদন বিল' উপস্থাপিত করিবার সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন আইনমন্ত্রী নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার যে ভাষণ দেন, তাহাতে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মহাজাতি-সদনের ভিত্তিস্থাপনের পরদিন (১৯ অগস্ট ১৯৩৯) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিশ্বভারতী-সম্মেলনের উদ্যোগে গীত-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই উৎসবে জবহরলাল আসেন। জবহরলাল চীনে যাইতেছেন, কলিকাতা হইতে এরোপ্লেন ধরিবেন। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়াই তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।[২] ইতিপূর্বে নেহরুর চীনযাত্রার পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়া কবি তাঁহাকে একখানি পত্রে লেখেন, "I feel proud that the new spirit of Asia will be represented through you and our best traditions of Indian humanity find their voice during your contacts with the people of China. My tours in the Far East have convinced me that in the main our peoples have maintained an *Asiatic tradition of cultural interchange.*" কবির একান্ত ইচ্ছা ছিল নেহরু জাপানেও যান। জাপান তখন চীনের সর্বনাশসাধনে উন্মত্ত। কবি নেহরুকে লিখিতেছেন, "Let Japan take warning not to betray the basis of her civilisation which she shares with China and with

১ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৬, পৃ ৭৪৬-৪৭।

২ নেহরু তাঁহার *A Diary of a Travel* গ্রন্থে (পৃ ১৮) লিখিতেছেন— "I learnt that poet Rabindranath Tagore was in Calcutta. That was too good an opportunity to miss as it is always a delight to meet Gurudeva. I hastened to his house from my hotel and for all too brief a time he spoke to me of the intermingling of the great Asiatic cultures and why it was necessary that India should develop contacts with Eastern Countries."

us in India ; far greater than the fearful hurt she is inflicting on China would be the inevitable wrecking of her own humanity which her militarists seem determined to achieve." কবি এই পত্রে আর-একটি কথা নেহরুকে বলেন— "I cannot help hoping that as a messenger from India's youth you would give strength to the historic forces of *Asiatic unity*, bringing new urge of neighbourly understanding to our Eastern peoples."[১] কবির এই স্বপ্ন বহু বৎসর পরে নেহরু Asiatic Conference আহ্বান করিয়া সফল করেন। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথের নাম কেহই উল্লেখ মাত্র করেন নাই।

মংপুতে দুই মাস

কলিকাতার কর্তব্য শেষ করিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (১৩৪৬) ভাদ্রমাসের গোড়ার দিকে (২১ অগস্ট)। দিন কাটে নানা ভাবে। নিজের দিন কিভাবে যায় নিজেই লিখিতেছেন—

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ।
ভিজিটর্‌কে এগিয়ে আনে ; অটোগ্রাফের বহি
দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি।
আনে অটোগ্রাফের দাবি, রেজিস্টারি চিঠি,
বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি।
পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা,
এমন দৌড় মারেন তখন মিথ্যে তাঁরে ডাকা।
ভাঙা ধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি ;
অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূন্যে ছড়াছড়ি।[২]

ইতিপূর্বেই বর্ষামঙ্গলের জন্য গানের মহড়া অধ্যাপক শৈলজারঞ্জন মজুমদারের তত্ত্বাবধানে শুরু হইয়াছিল। এই সময়ে শান্তিদেব ঘোষ জাভা দ্বীপে ; তথাকার নৃত্যকলা ও গীতবাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য ভারতীয় দ্বীপগুলিতে ঘুরিতেছেন। বর্ষামঙ্গলের জন্য নূতন গানের দাবি অনেকেই পেশ করিতেছেন। কবি পদ্মাসনার সাধনাতে বসিয়া একটির পর একটি গান লিখিয়া দেন ; সেই গানগুলি এই—১. ওগো সাঁওতালি ছেলে ২. বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান (তুলনীয় সানাই, 'দেওয়া-নেওয়া') ৩. আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে

১ *Visva-Bharati News*, Vol. VII, No 3, September 1939, pp 20-21। ইটালিক্‌স্‌ গ্রন্থকার-কৃত।

২ ধ্যানভঙ্গ, বঙ্গলক্ষ্মী, ভাদ্র ১৩৪৬। প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫২-৫৩। "The number of his [Rabindranath] engagements in December [1939] last was so alarmingly out of proportion that our Upacharya C. F. Andrews thought fit to issue a statement requesting the public to allow Gurudeva his well-earned rest."—*Visva-Bharati News*, February 1940। Autogrph-hunterদের নিকট হইতে Poor Students' Fund -এর জন্য একটি করিয়া টাকার দাবি জানানো হয়।

৪. এসো গো, জেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি (তুলনীয় সানাই, 'আহ্বান') ৫. আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর-দিনে ৬. আজ শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায় ৭. স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে (তুলনীয় সানাই, 'আধোজাগা') ৮. শেষ গানেরি রেশ নিয়ে যাও চলে ৯. এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে (তুলনীয় সানাই, 'দ্বিধা') ১০. এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে (তুলনীয় সানাই, 'কৃপণা') ১১. নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে ১২. আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে ১৩. পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে ১৪. আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায় (তুলনীয় সানাই, 'মরিয়া') ১৫. সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণধারা ১৫. ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে (তুলনীয় সানাই, 'পূর্ণা')।[১]

বর্ষামঙ্গলের পরেও কবি আরও দুইটি গান রচেন— 'বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে', 'যবে রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা'।[২] কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় আর-একটি বর্ষা-উৎসব হয়।[৩]

সুধীরচন্দ্র কর 'কবিকথা'য় বলেন যে এই গানগুলি বর্ষার জন্য রচিত হয় এবং কবি পরে কয়েকটি গানকে কবিতায় রূপান্তরিত করেন।[৪] ইহা ঘটে ১৯৪০-এর জানুয়ারি মাসে, অর্থাৎ গান রচিবার চারি মাস পরে। এতকাল আমরা দেখিয়া আসিয়াছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করিয়াছেন, এখন তাহার বিপরীত পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। তথ্য ও তত্ত্ব হিসাবে বিষয়টি গভীরভাবে বিচারণীয়।[৫]

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসবের দুই দিন পরে শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ[৬] উৎসব। সেই উৎসবের ভাষণে (১২ ভাদ্র ১৩৪৬) বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কবির ভাষায় মানুষের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। আদি অরণ্যচর মানুষ কিভাবে ধীরে ধীরে কৃষিজীবী হইয়া উঠিল, কিভাবে সভ্যতার নানা শাখা সমাজে দেখা দিল, তাহার আলোচনা করিয়া কবি বলিলেন যে, তার পর মানুষের এমন এক যুগ আসিল যখন সে অরণ্যধ্বংসে ব্যাপৃত হইল : "অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হঠিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন ক'রে। তাতে তার বাতাস করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব ক'রে। অরণ্যের-আশ্রয়-হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ। . .

"কৃষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা। . . আজ যন্ত্রবিদ্যা মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়েছে বহুশত শতঘ্নী। . . আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংসবন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ ; মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা চিতা— সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ, তার ললিত কলা।

"যন্ত্রযুগের বহুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহস্তে সন্তানকে পরিমিত অন্ন পরিবেষণ করেছেন, যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট— যা এত বীভৎসরকমে উদ্‌বৃত্ত ছিল না।"

'হলকর্ষণ' উৎসব-সন্ধ্যায় কবি শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের নিকট 'গদ্যকাব্যে'র অর্থ সম্বন্ধে এক ভাষণ দান করেন

১ ১-সংখ্যক গান, গীতবিতান, পৃ ৪০৫ ; ২-১৬ সংখ্যক গান, গীতবিতান, পৃ ৪৭৫-৮১।

২ গীতবিতান, প্রেম ও প্রকৃতি, পৃ ৯০৬-০৭।

৩ দ্র কবিকথা, পৃ ১৮১।

৪ কবিকথা, পৃ ১৭৬-৮২।

৫ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৯১-৯২।

৬ হলকর্ষণ, সুকুমার চট্টোপাধ্যায় -কর্তৃক অনুলিখিত ও কবি-কর্তৃক সংশোধিত ; প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৬। পল্লীপ্রকৃতি (১৯৬২), পৃ ১০৭-০৯।

(২৯ অগস্ট ১৯৩৯)।[১] আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সমালোচনার মূল কথা রুচির কথা তুলিয়াছেন। বিজ্ঞানের নানা কোঠা আয়ত্ত করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন হয় ; কিন্তু রুচি এমন একটা জিনিস যাহাকে কবি বলিলেন 'সাধন-দুর্লভ' ; সেইটি আয়ত্ত করিবার বাঁধা পথ নাই। কবি বলিতেছেন, "রুচির সঙ্গে যোগ দেয় নিজের স্বভাব, চিন্তার অভ্যাস, সমাজের পরিবেষ্টন ও শিক্ষা। এগুলি যদি ভদ্র, ব্যাপক ও সূক্ষ্ম বোধশক্তিমান হয় তা হলে সেই রুচিকে সাহিত্যপথের আলোক ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রুচির শুভ সম্মিলন কোথাও সত্য পরিণামে পৌঁচেছে কি না তাও মেনে নিতে অন্য পক্ষে রুচিচর্চার সত্য আদর্শ থাকা চাই। সুতরাং রুচিগত বিচারের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে যুগে যুগে তার প্রমাণ পেয়ে আসছি। বিজ্ঞান দর্শন সম্বন্ধে যে মানুষ যথোচিত চর্চা করে নি সে বেশ নম্রভাবেই বলে, মতের অধিকার নেই আমার। সাহিত্যে ও শিল্পে রসসৃষ্টির সভায় মতবিরোধের কোলাহল দেখে অবশেষে হতাশ হয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। সেখানে সাধনার বালাই নেই ব'লে স্পর্ধা আছে অবারিত, আর সেই জন্যেই রুচিভেদের তর্ক নিয়ে হাতাহাতিও হয়ে থাকে।"

এই ভাষণে কবি গদ্যকাব্য কী এবং কেন লিখিতে প্রবৃত্ত হন তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, "এতদিন যে রূপেতে কাব্যকে দেখা গেছে, এবং সে-দেখার সঙ্গে আনন্দের যে অনুষঙ্গ, তার ব্যতিক্রম হয়েছে গদ্য-কাব্যে। কেবল প্রসাধনের ব্যত্যয় নয়, স্বরূপেতে তার ব্যাঘাত ঘটেছে।" কবির বিশ্বাস যে, "অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত ক'রে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের জবালা উপাখ্যান ও ইংরেজি বাইবেলের কথা তোলেন। ইংরেজি বাইবেল সম্বন্ধে বলিতেছেন, "এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্ত পদক্ষেপ আছে তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হ'ত তবে সর্বনাশই হ'ত।" ভাষণের শেষ দিকে বলিতেছেন, "আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে ; হয়তো সজ্জা নেই, কিন্তু রূপ আছে এবং এই জন্যই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে করি।"

ইতিমধ্যে মহাত্মাজির সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী (২ অক্টোবর ১৯৩৯) উপলক্ষে একটি গ্রন্থ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন -কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকট পত্র আসে বাণীর জন্য। কবি মংপু যাইবার পূর্বে সেটি লিখিয়া পাঠাইয়া দেন ; কারণ স্থির হইয়াছে ২ অক্টোবর মহাত্মাজির জন্মদিনে ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।[২] কবি লিখিলেন—"Occasionally there appear in the arena of politics, makers of history, whose mental height is above the common level of humanity. They wield an instrument of power, which is almost physical in its compelling force and often relentless, exploiting the weakness in human nature— its greed, fear or vanity. When Mahatma Gandhi came and opened up the path of freedom for India, he had no obvious medium of power in his hand, no overwhelming authority of coercion. The influence which emanated from his personality was ineffable like music, like beauty. Its claim upon others was great because of its revelation of a spontaneous self-giving. This is the reason why our people have hardly

১ ক্ষিতীশ রায় -কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত ; প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬।

২ *Visva-Bharati News*, October 1939, p 31 ।

ever laid emphasis upon his natural cleverness in manipulating recalcitrant facts. They have rather dwelt upon the truth which shines through his character in lucid simplicity. This is why, though his realm of activity lies in practical politics, peoples' minds have been struck by the analogy of his character with that of the great masters, whose spiritual inspiration comprehends and yet transcends all varied manifestations of humanity and makes the face of worldliness turn to the light that comes from the eternal source of wisdom."[১]

ভারতে বিশ্বশান্তি ও অহিংসার প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন হইতেছে, আর ওদিকে য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইতেছে। ৩ সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়ে জারমেনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কারণ জারমেনি পয়লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছে। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন দেখিয়া আজ ইংরেজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। এই মহাযুদ্ধ কেন বাধিল সে সম্বন্ধে আলোচনা অবান্তর।[২]

ব্রিটেন এই যুদ্ধ ঘোষণা করায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ব্রিটেনের দাবি ভারত গবর্নমেণ্ট এই মহাযুদ্ধকে তাহারই যুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লয় এবং সর্বতোভাবে সাহায্য দান করে। ভারতীয় নেতা ও ভাবুকদের নিকট এই দাবি অত্যন্ত অস্পষ্ট। গান্ধীজি এই সময় স্পষ্টভাবে ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডকে জানাইলেন, 'কেবল স্বাধীন ভারতের সাহায্যই মূল্যবান।' তিনি বলিলেন, "কন্‌গ্রেসের ইহা জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে যুদ্ধের শেষে স্বাধীন দেশ বলিয়া ভারতবর্ষের দাবি ও মর্যাদার নিশ্চয়তা— ব্রিটেনের স্বাধীন দেশ বলিয়া পদবী ও মর্যাদার নিশ্চয়তার সমান হইবে।"[৩]

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিকতা হইতে দূরে যে-সব ভদ্রেরা ছিলেন তাঁহারা মহাযুদ্ধের উদ্দেশ্য কি তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া যে এক বিবৃতি প্রকাশ করিলেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথের সহি ছিল সর্বপ্রথমে। ৮ সেপ্টেম্বর উহা প্রকাশিত হইল।[৪] কবি মংপু যাইতেছেন, ৬ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় আসিয়াছেন। নিম্নে বিবৃতির বঙ্গানুবাদ অংশতঃ উদ্‌ধৃত হইতেছে—

"এই মহাসংকটের সময়ে যখন কেবলমাত্র কয়েকটি দেশ নহে, পরন্তু সমগ্র সভ্যতাসৌধ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন ভারতবর্ষের কর্তব্য সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের সমবেদনা পোল্যাণ্ডের সপক্ষে। ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই ব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বলপ্রয়োগ দ্বারা আধিপত্য বিস্তারের যে সর্বনাশী নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহার প্রতিরোধ করিবে। নিজের দেশের স্বার্থের জন্যও কোন ভারতীয় এইরূপ কামনা করিবে না যে, ইংলণ্ড পরাজিত হউক। ইংলণ্ড যদি যুদ্ধে হারিয়া যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পথে বাধা পড়িবে। তখন নূতন বৈদেশিক শাসনের

১ From the Commemoration volume, edited by Dr. S. Radhakrishnan in celebration of Mahatma Gandhiji's 70th Birthday.

২ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু যেমন তাহাদের নখদন্ত ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকতা লাভ করে নাই, মানুষ তাহার লোভ বা গৃধ্নুতা রিপুকে সংযত করিতে পারে নাই। মানুষ শক্তিসাধক— দুর্বলকে সে বলি দিবেই। তাই বারে বারে যুদ্ধ হইয়াছে এবং হয়তো এই কারণেই ভবিষ্যতেও হইবে।

৩ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৬, পৃ ১০৫।

৪ স্বাক্ষরকারীদের নাম— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যর নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রকুমার বসু, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দ্র প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৬, পৃ ৮৬৩-৬৪।

অধীনে ভারতবর্ষের দাসত্বের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে।

"ভারতবর্ষকে যদি অন্যান্য দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে হয় তাহা হইলে সর্বাগ্রে তাহাকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে হইবে।

"ভারতবর্ষ একান্ত অসহায়ভাবে নিরস্ত্র এবং সামরিক শিক্ষাবিহীন হইয়া পড়িয়াছে— ইহাই আজ ভারতীয় জীবনের অন্যতম সাতিশয় দুঃখকর অবস্থা। সুতরাং জাতি ধর্ম ও প্রদেশ নির্বিশেষে দেশের যুবকগণকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করাই এখন প্রথম কর্তব্য। বাংলার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বাংলার জন্য একটি নিজস্ব পৌরসেনা বিভাগ (militia) গঠন করিতে হইবে। সকলকেই, কথায় নহে, কার্যে ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হইতে হইবে যে তাহারা, যেমন অন্যদের, সেইরূপ তাহাদের নিজের দেশ রক্ষার জন্য এবং নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে।

"এই সংকটকালে ব্রিটেনের প্রতি ভারতবর্ষের কর্তব্য যদি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের যে কর্তব্য আছে তাহাও কম সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। . . ব্রিটেনের পক্ষে নূতন দিক হইতে নূতন ভাবে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। . . গণতন্ত্ররক্ষাকল্পে স্বাধীন ভারত যাহাতে স্বাধীনভাবে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য করিতে পারে, তজ্জন্য ব্রিটেন জগতের শান্তির খাতিরে ভারতবর্ষে স্বশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের এই মহা সুযোগ যেন না হারান।"

ভারতীয়দের প্রশ্নের ও দাবির উত্তরে বৃটিশ সরকার কোনোপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকৃত হইলেন না। ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অধীন দেশ— ব্রিটেনের যুদ্ধই তাহার যুদ্ধ। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সকলপ্রকার সহায়তা সে ভারত হইতে দাবি করে, তাহার প্রতিবন্ধকতা বা সে-সম্বন্ধে সংশয়প্রকাশ করা চলিবে না। কন্‌গ্রেস-শাসিত প্রদেশের মন্ত্রীরা বুঝিলেন ব্রিটিশ সরকারের সহিত সংগ্রাম অনিবার্য, তাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। আর তাঁহারা যদি পদত্যাগ না করেন তবে ইংরেজ গভর্নর তাঁহার পদাধিকার-বলে মন্ত্রীদের কর্মচ্যুত করিবেন ও শাসনভার স্বয়ং, অথবা যে তাঁবেদার মন্ত্রিপরিষদ্‌ বৃটিশের সহিত সহযোগিতা করিবে তাহাদের মারফত্‌ প্রদেশ শাসন করিবেন। ফলে যুদ্ধ ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই কন্‌গ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলেন— না সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, না বরখাস্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কলিকাতায় দিন-পাঁচেক থাকিয়া কবি চলিলেন মংপু; এবার মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি।[১] সেখানে কবি ছিলেন প্রায় দুই মাস— ১২ সেপ্টেম্বর হইতে ৯ নভেম্বর (১৯৩৯) পর্যন্ত। কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন ১১ নভেম্বর; পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিল ১৮ই।

এই দুই মাস কবির কিভাবে মংপুতে অতিবাহিত হয় তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমরা মৈত্রেয়ী দেবীর বইতে পাই; কিন্তু দেশের ও বিদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী কবিকে যে দুঃখ দিতেছিল তাহার সংবাদ আমরা ঐ গ্রন্থে পাই না, তাহা পাই অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত সমসাময়িক 'পত্রধারা'য়।

য়ুরোপের মহাযুদ্ধ শুরু হইয়া গেলে কবি লিখিতেছেন (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯), "মানুষের জগৎ দেখতে দেখতে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে— ভুলে গিয়েছিলুম সভ্যতার অর্থ ক্রমশই দাঁড়িয়েছে বস্তু ব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্যে। তার পিছনে অনেকদিন ধরে যে মারাত্মক রিপু বীভৎস হয়ে উঠেছিল

১ চিঠিপত্র ৫, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র; ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, ১৫ ভাদ্র ১৩৪৬; পৃ ৩১০। শান্তিনিকেতন হইতে লিখিতেছেন, "মংপু পাহাড়ের পথে আগামী বুধবার রওনা হব কলকাতায়।" অর্থাৎ, ৬ সেপ্টেম্বর।

তার সম্বন্ধে লজ্জাভয় হয়েছে অনভ্যস্ত। এই রক্তপিপাসু বসে আছে পুলপিটের পিছনেই, কলেজক্লাসের আঙিনায়; ধর্মতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অর্থনৈতিক তত্ত্ব এর চারি দিকেই বিচিত্র বাক্যপ্রবাহ বইয়ে দিয়ে চলেছে, কিন্তু একে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারবে না, এ বসে বসে ভিৎ খুঁড়ে চলেছে— আজ Babel এর স্তম্ভ পড়ছে ভেঙে চুরে। এর কোনো প্রতিকার আছে বলে ভেবে পাই নে— মারের পর মার আবর্তিত হল, থামবে কোথায়।"[১]

আর-একখানি পত্রে লিখিতেছেন— "দেখলুম দ্বারে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া। . . দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকার চিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালির হাঁ-করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মনির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন্‌-ইনটরভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে ক'রে দিতে, দেখলুম মুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ ক'রে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনফা তো কিছুই হল না— পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হল দারুণ যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না।"[২]

পত্রান্তরে 'আমাদের অবস্থা' আলোচনাকালেও কবি য়ুরোপের এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহার কথা বলিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধান্তে কবি জারমেনিতে যান ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "জেতা যে নিশ্চিত জিতেছে এই কথাটাকে সে নানা রকমে দেগে দিচ্ছিল বিজিতের মনে। . . ক্ষমাহীন প্রতিহিংসুক নীতি তার সুবিচার এবং শ্রেয়োবুদ্ধিকে অন্ধ করে দেয়। দেখা গেল, জয়ের দ্বারা হিংস্রতার উষ্মা শান্ত হয় না। উত্তরোত্তর তার উদগ্রতা রাঙিয়ে উঠতে থাকে। . . সেই তো খোঁচা দিয়ে দিয়ে তরুণ জর্মনিকে অবশেষে হিংস্র করে তুললে, তাকে বর্বরতার পথে টেনে নিল। য়ুরোপের মাঝখানে হিংস্র শক্তির প্রকাণ্ড একটা অনাদৃষ্টি দেখা দিল। যে নির্মম শাসনশক্তি আমাদের দেশে ব্যেপে দিয়েচে নির্জীব তামসিকতা, সেই শক্তিই য়ুরোপে জাগিয়ে তুলেছে উগ্রকঠোর তামসিকতা। . . দেখলুম একবারকার যুদ্ধের ফসল যখন সে ঘরে তোলে তখন আর-একবারকার যুদ্ধের বীজ বপন করতে সে ভোলে না।"[৩]

ভারতবর্ষের এই যুদ্ধে কী কর্তব্য সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু না বলিলেও তিনি যে ফ্যাসিজম প্রভৃতি totalitarian মতবাদের বিরোধী, তাহা তাঁহার পত্র হইতে জানা যায়।

য়ুরোপের ঘনায়মান মরণযজ্ঞে কূটনীতিজ্ঞরা যে ধর্মবুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন তাহাতে কবি অত্যন্ত আতঙ্কিত। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স[৪] এই সময়ে ঘোষণা করিলেন যে, "যে-সকল দেশ তাহাদের রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্য আশুবিপদ্‌গ্রস্ত বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে, তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরেজ যে প্রস্তুত, এ তাহারা কাজে ও কথায় সুস্পষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণেই তাহারা পোল্যাণ্ডের পক্ষ লইতে প্রতিশ্রুত।" কবি বলিতেছেন, রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্যনীতি যেমন আক্রান্ত হইয়াছে পোল্যাণ্ডে, তেমনি তো হইয়াছিল মাঞ্চুরিয়া, আবিসিনিয়া, চীন, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়াতে।

১ পত্র, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে, মংপু, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। দ্র কবিতা, পৌষ ১৩৪৯।

২ পত্রালাপ, মংপু, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৬, পৃ ৮৭-৮৮।

৩ নয় বৎসর পূর্বে 'পক্ষীমানব' (২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮, নবজাতক) কবিতায় কবি এবারকার নিষ্ঠুর যুদ্ধনীতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলেন।

৪ ভারতের ভূতপূর্ব ভাইসরয় লর্ড আরবিন এখন লর্ড হ্যালিফ্যাক্স।

কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে ব্রিটেন অত্যাচারিতকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব কাজে ও কথায় স্বীকার করেন নাই। কবির সহানুভূতি সকল অত্যাচারিত দেশের জন্য; তবে চীনের জন্য তাঁহার বেদনা কেবল চীনাদের দুর্দশার জন্য নহে, জাপানের দুর্বুদ্ধিতার জন্য, তাঁহার আশঙ্কা জাপানের ভবিষ্যৎ লইয়া।[১]

কবি যে পোলিটিশান নহেন তাহা কবুল করিয়া বলিলেন, "যাঁরা আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতা তাঁরা কল্পনা করছেন, যুদ্ধে যদি রাজশক্তির সহায়তা করি তা হলে বরলাভ করব। এই যে সহায়তার সম্বন্ধ এটা দর-কষাকষির হাটে; এটা আন্তরিক মৈত্রীয় নয়..।" কবি চিরদিনই উদ্দেশ্যমূলক ভাবনা লইয়া সৎকর্মে প্রবৃত্ত হইবার বিরোধী। ধর্ম ধর্মের জন্যই অনুসরণীয়— তাহার সঙ্গে কোনো শর্ত জোড়া দেওয়া যায় না। তাই নেতাদের শর্তসাপেক্ষ সহযোগিতা-প্রস্তাব কবি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তবে ভারতের গতি কি সে সম্বন্ধে কবির মত স্পষ্ট; তিনি বলিতেছেন, "যে পথে বড়ো বড়ো দেশ আজ উন্মত্তের মতো ধাবমান..সে পথে" উহারা "যে কোথায় পৌঁছবেন সেটা সন্দেহজনক। এইটুকু বলিতে পারি ইতিহাসের গতি রহস্যময়। দুর্বলের দুঃখও প্রবলের জাহাজে ছিদ্র ক'রে দিয়েছে তার প্রমাণ আছে। ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহই একমাত্র সুযোগ নয়, বঞ্চিতের নৈরাশ্যও কোথা থেকে সুযোগ আকর্ষণ ক'রে আনে এখনি তা বলতে পারি নে। বলতে পারি নে ব'লেই তার আকস্মিক আবির্ভাব বলশালীকে একদিন অভিভূত করবে।"[২] আজ দুনিয়ার সর্বত্র দুর্বল সর্বহারার দল মিলিত হইতেছে, বঞ্চিতের দল সংঘবদ্ধ হইয়া সঞ্চয়ীর দলে আতঙ্ক সৃষ্টি করিতেছে; এক বৎসর পূর্বের 'প্রায়শ্চিত্ত' (নবজাতক) কবিতাটি স্মরণীয়।

কিন্তু রবীন্দ্রমানসে এই রাজনীতির আলোচনা সামান্য অংশে ব্যাপ্ত। সাময়িক পত্রিকা ও রেডিও হইতে সংবাদ আহরণ করিয়া মনে যেটুকু উদ্‌বেগ ও উত্তেজনা সৃষ্ট হয়, তাহাকে শমিত করেন পত্রালাপের মধ্য দিয়া, বক্তব্যটুকু বলা হইয়া গেলেই ভারটা নামিয়া যায়— মন আপনার স্বাভাবিকতায় ফিরিয়া আসে। কবিতা লিখিয়াও এইভাবের মুক্তি পান।

মংপু-বাস-কালে কবিতা-লেখা ছবি-আঁকা চলিতেছে; সেপ্টেম্বরের শেষভাগে 'শেষ কথা' নামে একটি বড়ো রকমের 'ছোটো গল্প' আরম্ভ করেন; সেটি শেষ করেন ৪ অক্টোবর।[৩]

'শেষ কথা' সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "কি আশ্চর্য পরিশ্রম করতে পারতেন এখন পর্যন্তও, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ভোর পাঁচটায় বাইরে এসে বসতেন, ছ'টার মধ্যে চা খাওয়া খবর শোনা শেষ ক'রে চিঠির উত্তর লিখতে বসতেন।..তারপর থেকে শুরু হোলো লেখা। মাঝে ঘণ্টা দেড়েক স্নানাহারের জন্য বাদ দিয়ে তারপর একেবারে আলোজ্বালা পর্যন্ত কাজ চলেছে তো চলেছেই।..'শেষ কথা' লেখা হলে বললেন এখনকার গল্পগুলো গল্পগুচ্ছের মত নয়— এগুলো বড় বেশি সাইকোলজিক্যাল হ'য়ে পড়ে। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো যেমন মানুষের প্রত্যহের ঘরোয়া জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে আজকাল আর সেরকম হয় না। আশ্চর্য লাগে আমার, কি ক'রে অত details মনে হোতো, লিখতুম কি ক'রে।"[৪]

১ দ্রষ্টব্য, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, মংপু, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, ১১ আশ্বিন ১৩৪৬। কবিতা, আশ্বিন ১৩৫০।

২ পত্রালাপ, আমাদের অবস্থা, মংপু, ৫ নভেম্বর ১৯৩৯। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, পৃ ১৬৪-৬৭।

৩ অমিয় চক্রবর্তীকে পত্র, ৬ অক্টোবর ১৯২৯। কবিতা, আশ্বিন ১৩৫০। 'ছোটো গল্প' নামে 'দেশ' পত্রিকায় ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ প্রকাশিত হয়। পরে বহুসংস্কৃত হইয়া 'শনিবারের চিঠি'তে (ফাল্গুন ১৩৪৬) প্রকাশিত হয়; তখন সেটির নাম দেন 'শেষ কথা'। তিন সঙ্গী, রবীন্দ্র রচনাবলী ২৫, পৃ ৩১৫-৪১।

৪ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, ১ম সং, পৃ ১৯২।

'শেষ কথা' গল্পটির অপূর্ব রচনাকুশলতা। তিনটি মাত্র চরিত্র— অচিরা, বৃদ্ধ অধ্যাপক ও নবীনমাধব। সকল চরিত্রই অনির্বচনীয় মহিমা লাভ করিয়াছে গল্পের মধ্যে। এত বড়ো ট্রাজেডি, অথচ গোড়া থেকে সবটাই প্রায় প্রচ্ছন্ন। সরল কথাবার্তা আর ঘটনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ গল্পের চরম মুহূর্তটি কখন যে আসিয়া পড়িল, তাহার জন্য পাঠকের মন আদৌ প্রস্তুত ছিল না। মনের উপর অকস্মাৎ বেদনার তীব্র আঘাত রাখিয়া গল্পের শেষ; অথচ ট্রাজেডির জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না— মনে হয় যেন এইটিই হওয়া উচিত ছিল। "বাংলা ভাষার এ-রকম উঁচুসুরে বাঁধা নরনারীর চরিত্রসৃষ্টি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব। এত অল্প আয়োজনে, এমন অনায়াস ভঙ্গিতে একটা বিরাট দুঃখের ইতিহাস, অথচ কোথায়ও কোনো অভাব বোধ হইল না, না ঘটনায়, না ঘটনা-মধ্যবর্তী অংশের।"[১]

গল্পটির মধ্যে 'কচ ও দেবযানী'র উত্তর আছে অচিরার চরিত্রে। নবীনমাধবকে যখনই সে দুর্বল হইতে দেখিল তখনই সে আপনার মোহজাল কঠিন হস্তে ভাঙিয়া নবীনমাধবকে মুক্তি দিল; তাহাকে যেন জোর করিয়া ঠেলিয়া দিল আপনার কঠোর ব্রতের মধ্যে। অচিরা ভবতোষকে ভালোবাসিয়াছিল সত্য; কিন্তু এখন ভবতোষ ভাসিয়া গিয়াছে, আছে ভালোবাসা— যে ভালোবাসা ইম্‌পার্সোনাল। এখন অচিরার আধারের দরকার নাই। গল্পটির সঙ্গে তুলনীয় কয়েকমাস আগে মংপুতে লেখা 'পরিচয়' কবিতাটি (সানাই)।

এই সময়ের লেখা কবিতার মধ্যে গুরু লঘু দুইই আছে, 'সানাই'-এ যে কবিতাটি 'কর্ণধার' নামে দেখা যায়, প্রবাসীর অগ্রহায়ণ (১৩৪৬) সংখ্যায় 'লীলা' (মংপু, ১৪ অক্টোবর ১৯৩৯) নামে সেইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তার পূর্বে ও পরে ইহার রূপের ও রসের কত যে বদল হইয়াছিল তার ইতিহাস আছে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, 'কয়েকমাস পরে তার যে সংস্করণ 'সানাই'তে প্রকাশ হ'ল তাকে আর চেনবার জো নেই।'[২] সম্পূর্ণ পৃথক্ সুরের কবিতা 'নারীর কর্তব্য' আন্নাকালী পাকড়াশীর ছদ্ম স্বাক্ষরে অলকা[৩] পত্রিকায় বাহির হয়।[৪] অর্ধমৃত হিন্দুসমাজের মূঢ়সংস্কারের বিদ্রূপ তীব্রভাবে ফুটিয়াছে এই হাসির কবিতায়—

মেয়েরাও বই যদি নিতান্তই পড়ে
　　মন যেন একটু না নড়ে।. .
দুর্গতি দিয়েছে দেখা; বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,
বি.এ এম.এ পাস করে ছড়াইছে বীজ
　　যুক্তি-মানা ঘোর ম্লেচ্ছতার।. .
তবু আজও রক্ষা আছে; পবিত্র এ দেশে
　　অসংখ্য জন্মেছে মেয়ে পুরুষের বেশে।
মন্দির রাঙায় তারা জীবরক্তপাতে,
　　সে-রক্তের ফোঁটা দেয় সন্তানের মাথে।
　　কিন্তু যবে ছাড়ে নাড়ী
ভিড় ক'রে আসে দ্বারে ডাক্তারের গাড়ি।

১ পরিমল গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথের তিন সঙ্গী। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮। ২ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৭৬-৭৯।
৩ 'অলকা' পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ সরকার। ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ১৩৪৬।
৪ রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত নির্দেশ অনুসারে মনে হয়, উহা ৫ কার্তিক ১৩৪৬ (২২ অক্টোবর ১৯৩৯) বিজয়াদশমীর দিন কলিকাতা উল্টোডিঙির শ্রীমতী নবরানী হালদারকে প্রেরিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫৩৭। বলা বাহুল্য, এই নাম ও ঠিকানা কবির সৃষ্টি।

অঞ্জলি ভরিয়া পূজা নেন সরস্বতী,
পরীক্ষা দেবার বেলা নোটবুক ছাড়া নেই গতি।
বুঝি নে একটা কথা ভয়ের তাড়ায়—
দিন দেখে তবে যেথা ঘরের বাহিরে পা বাড়ায়
সেই দেশে দেবতার কুপ্রথা অদ্ভুত,
সবচেয়ে অনাচারী সেথা যমদূত।
ভালো লগ্নে বাধা নেই, পাড়ায় পাড়ায় দেয় ডঙ্কা
সব দেশ হতে সেথা বেড়ে চলে মরণের সংখ্যা।[১]

মেদিনীপুরে ও পরে

মংপুতে প্রায় দুই মাস বাস করিয়া কবি ৯ই নভেম্বর (১৯৩৯) কলিকাতা এবং ১১ই শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। অল্পকাল কলিকাতা থাকার সময়ে (১০ নভেম্বর) নগেন্দ্রভূষণ বিদের নেপিয়ার পেণ্ট ওয়ার্কস দেখিতে যান ও তথাকার কাজকর্ম দেখিয়া প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিয়া আসেন। বিদ্যালয় খুলিয়াছে; সেখানে ভাঙাগড়া, অদলবদল চলিতেছে। মনে হইতেছে ঠিক মনের মতো রূপ লইতেছে না, ভাবিতেছেন লোক বদল করিলেই তাঁহার মনের মতো জিনিসটি গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু বাধা যে কত এবং কী জটিল (subtle) তাহার ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিচার সময়সাপেক্ষ।

যাহাই হউক, এবার পাঠভবনের অধ্যক্ষতা প্রমদারঞ্জন ঘোষের নিকট হইতে লইয়া কৃষ্ণ কৃপালনীর উপর ন্যস্ত হইল (১৫ নভেম্বর); এ সময়টা না স্কুলের শেষ, না কলেজের আরম্ভ। কবির ইচ্ছা আগামী বৎসরের শুরু হইতেই যেন কার্য সুচারুরূপে নূতনভাবে চলে। কৃষ্ণ কৃপালনী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন নিয়মাবলী সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিবহাল ছিলেন না; তবে প্রখর বুদ্ধিবলে অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন।

প্রমদারঞ্জন দীর্ঘকাল শিক্ষা ও পাঠ-ভবনের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। প্রমদারঞ্জনের ন্যায় নিষ্ঠাবান, নির্ভীক অথচ রবীন্দ্রনাথের ও আশ্রমের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কর্মী দুর্লভ। বিধিবহির্ভূত কোনো কাজ তাঁহাকে দিয়া করানো সহজ ছিল না বলিয়া কর্তৃপক্ষের ক্ষণে ক্ষণে অসুবিধা হইত। তিনি ধর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কর্ম করিতেন, তাই সুবিধা-অন্বেষী প্রাকৃতধর্মবুদ্ধিসম্পন্নদের বড়োই অসুবিধা হইত।

কবির আটাত্তর বৎসর বয়স; এখনো কাজের ফরমাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছেন না। তাই খানিকটা লোকের মনোরঞ্জনার্থে, খানিকটা বহির্জগৎকে দেখিবার কৌতূহল-নিবারণার্থে এই বয়সেও বাহিরের আহ্বানে সাড়া দিলেন।

১ 'নারীর কর্তব্য', প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৫৪-৫৮। কবিতাটি লিখিত হয় ৫ কার্তিক ১৩৪৬ (বিজয়াদশমী), ২২ অক্টোবর ১৯৩৯। সেদিন রবিবার। তবে কবি লেখেন শেষ পংক্তিতে

বেস্পতিবারের বারবেলা

এ কাব্য হয়েছে লেখা, সামলাতে পারব কি ঠেলা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত গান—

পার তো জ'ন্মো নাকো বিস্যুতবারের বারবেলা,
জন্মালে পারবে নাকো সামলাতে তার ঠেলা।

এবার আহ্বান আসিয়াছে মেদিনীপুর হইতে। তৎকালীন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বিনয়রঞ্জন সেনের[১] চেষ্টায় সেখানে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দির নির্মিত হইয়াছে— সেইটির দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য কবির নিমন্ত্রণ। বিনয়রঞ্জনের চেষ্টায় বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিবার জন্য যে তহবিল সংগৃহীত হয় তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে সমর্পিত হয়; সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথের যুগ্মসাধনায় বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্বে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতির উদ্দেশে কবি একটি বাণী পাঠাইয়াছিলেন (১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)। এবার দ্বারোদ্‌ঘাটন-উৎসবের জন্য একটি ভাষণ লিখিলেন (২৮ নভেম্বর ১৯৩৯)।[২]

কবি মেদিনীপুর যাত্রা করেন (১৫ ডিসেম্বর), সঙ্গে কৃষ্ণ কৃপালনী, অনিলকুমার চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও শচী রায়। হাওড়ায় তাঁহাকে স্বাগত করিবার জন্য বি. আর. সেনের দূতরূপে আসেন রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন যুবক ম্যাজিস্ট্রেট। সেইদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনী (Food and Nutrition Exhibition)। রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রদর্শনী উন্মোচন করিবেন, তাঁহাকে স্টেশনে স্বাগত করিতে আসিলেন মেয়র নিশীথ সেন, কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার।

কবি উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া 'খাদ্য ও পুষ্টি' সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি ভাষণ পাঠ করেন।[৩] কবি এই ভাষণে বলেন, "আহার্যের অপূর্ণতাবশত দীর্ঘকাল হ'তে আমাদের প্রাণসম্বলের ক্ষয় হয়েছে এবং নিরন্তর হ'তে চলেছে সে-কথা এতদিন ভুলে ছিলুম, কিন্তু আর ভুললে চলবে না। যে-সকল জাতি প্রবল শক্তিমান তাদের সঙ্গে সকল বিষয়েই আমাদের প্রতিযোগিতার সময় এসেছে। জীবিকার ক্ষেত্রেও আমরা ছোটোবড়ো সকল দিক থেকে হটে যাচ্ছি।"

কবি অত্যন্ত আপসোস করিয়া বলেন যে, ভারতের সকল জাতির খাদ্যবিশ্লেষণ-তালিকায় দেখা যায় বাঙালির খাদ্য পুষ্টিকরতার গুণে প্রায় সকলের নীচের কোঠায়। বাঙালির কলে-ছাটা সাদা চাউল ও ফেন বা কাঞ্জি-ফেলা ভাত খাওয়ার সমালোচনা করিয়া কবি বলেন, "স্বজাতির আয়ুক্ষয় নিবারণ লক্ষ্য করে নিজেদের অভ্যাসের সঙ্গে রুচির সঙ্গে লড়াই করতে যারা না পারে তারা নিজের বিদেশী শত্রুভাগ্য নিয়ে বিলাপ পরিতাপ করতে যেন লজ্জাবোধ করে।" বলা বাহুল্য কবির এই উপদেশ কবি-প্রলাপ বলিয়া দেশবাসী শুনিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। এমন-কি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বহু চেষ্টা করিয়াও আহারের অভ্যাস বদলাইতে পারেন নাই।

কবি এই উৎসব সম্পন্ন করিয়া হাওড়ায় ফিরিয়া আসিলেন; বি. এন্. রেলওয়ে কবির জন্য বিশেষ সেলুনের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু স্টেশনেই কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কন্‌গ্রেস হাই কমান্‌ডের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় সুভাষ কন্‌গ্রেস হইতে চার মাস পূর্বে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন (অগস্ট ১৯৩৯)। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে দেশের সমসাময়িক অবস্থা ও লোকের মনোভাবের একটা চিত্র পাইয়াছিলেন; কবির সহিত একান্তে সুভাষের কথাবার্তা যাহাতে না হয় তজ্জন্য একটু চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু কবি সুভাষের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করেন। এই সাক্ষাতের কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই। ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না।

১৫ ডিসেম্বর (২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬) রাত্রি দশটার সময় রবীন্দ্রনাথ মেদিনীপুর পৌঁছিলেন। স্টেশনে এই

১ বি. আর. সেন, আই. সি. এস.

২ ২৭ নভেম্বর ১৯৩৯ অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন, "বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভার জন্য লিখতে বসেছি।"

৩ খাদ্য ও পুষ্টি। কলিকাতা পৌর পরিষদের অনুষ্ঠিত খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কীয় প্রদর্শনীতে পঠিত। প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬, পৃ ৪১৮-১৯।

শীতের রাত্রে কবিকে দেখিবার জন্য বহু সহস্র লোকের সমাগম হয়। জনতার মধ্যে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকেও দেখা যায়। সংবর্ধনাকারীদের মধ্যে মহিষাদলের রাজকুমার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিনয়রঞ্জন সেন, জেলা জজ এস. এন. গুহরায়, রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, মহকুমা-শাসক বি. কে. আচার্য, মনীষীনাথ বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও চিত্তরঞ্জন রায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই ট্রেনে যাঁহারা মেদিনীপুরে আসিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্যর যদুনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রঘুবীর সিং, ক্ষিতিমোহন সেন, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় -এর নাম উল্লেখযোগ্য।

১৬ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ৮ ঘটিকায় শোভাযাত্রাসহকারে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরে উপনীত হইলেন। স্মৃতিরক্ষা-সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে স্বাগতসম্ভাষণ জানাইবার পর তিনি স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলাভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। সেই কর্তব্যপালনের সুযোগ ঘটাবার জন্যে বিদ্যাসাগরের জন্মপ্রদেশে এই-যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে আমি তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করি। পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করা হয়েছে তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এইসঙ্গে আমার স্মরণ করবার এই উপলক্ষ ঘটল যে, বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"

১৭ ডিসেম্বর স্মৃতিমন্দির-প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করিলেন মেদিনীপুর পৌরসভা, মেদিনীপুর জেলাবোর্ড ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সদস্যবৃন্দ।

প্রারম্ভে 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' সংগীত গীত হইবার পর পৌরসভার পক্ষ হইতে দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য একখানি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং অর্ঘ্যস্বরূপ উহা সুদৃশ্য আধারে স্থাপন করিয়া কবিগুরুকে প্রদান করিলেন। তাহার পর জেলাবোর্ডের পক্ষ হইতে এবং সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে আরও দুইখানি মানপত্র পঠিত হয়। মানপত্রদ্বয় কবিগুরুকে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইল।[১]

মেদিনীপুর হইতে কবি ফিরিলেন— দেশের রাজনৈতিক ও বিশেষভাবে কন্‌গ্রেসের মধ্যে ভাঙনের ব্যাপার লইয়া মন অত্যন্ত চিন্তাকুল। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াই কবি গান্ধীজিকে টেলিগ্রাম-যোগে অনুরোধ করিলেন যে, দেশের ও বিশেষভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সুভাষকে কন্‌গ্রেসে ফিরাইয়া লইলে দেশের মঙ্গল হইবে। গান্ধীজি কবিকে তদুত্তরে জানান যে, কন্‌গ্রেস হাইকমান্‌ড সমস্ত বুঝিয়া সুঝিয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সুভাষের উপর হইতে নিষেধ (ban) উঠাইয়া লওয়া হইবে যদি তিনি কন্‌গ্রেসের শাসন (discipline) মানেন। কয়েকদিন পরে মহাত্মাজি মিঃ এনড্‌রুজকেও এই বিষয়ে পত্র দিয়া বলেন যে, সুভাষ পরিবারের 'আব্দারে ছেলে'র

১ দ্র দৈনিক ভারত, সোমবার, ২ পৌষ ১৩৪৬, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৩৯। বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতির নিবেদন, পুস্তিকা, বাংলা ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬; বিদ্যাসাগরস্মৃতিমন্দির প্রবেশ-উৎসব, কার্যসূচী। বিদ্যাসাগরস্মৃতিমন্দির প্রবেশ-উৎসব, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী, ৩০ পৌষ [অগ্রহায়ণ] ১৩৪৬। দ্র বিদ্যাসাগরচরিত (বিশ্বভারতী), ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃ ৮১-৮৫।

(spoilt child) ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন ; গুরুদেবের পক্ষে এই-সব জটিল ব্যাপার সমাধান করা কঠিন।[১]

মেদিনীপুর হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই পৌষ-উৎসব। এই উৎসবের জন্য 'অন্তর্দেবতা'শীর্ষক[২] ভাষণ লিখিত হয়। এই ভাষণে কবির মনে আজ এই কথাই জাগিতেছে— What man has made of man— আজ জগতে কী প্রলয়ংকর যুদ্ধের সূচনা হইয়াছে। স্থানিক যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিল— এ বেদনা কবিকে বড়োই পীড়িত করিতেছে। কবির মনের প্রশ্ন— 'কে জাগালে সেই লড়াইকে'। নিজেই উত্তরে বলিতেছেন, "বিশ্বের অপমানিত কল্যাণশক্তি। এই অপমান বহুকাল ধ'রে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল দূরপ্রসারিত প্রতাপের আশ্রয়ে, স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্যের অন্তরালে। রিপুর থেকে রিপুকে জাগাল, লোভের থেকে ঈর্ষাকে। . . মানুষের পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের সহজ পথ আজ উত্তরোত্তর দুর্গম ক'রে তোলা হচ্ছে, এবং মানবসমাজে এই কাঁটার বেড়া দেওয়া অনাতিথ্যের অনাত্মীয়তা যে ক্রমশ প্রবর্ধমান অসভ্যতার প্রমাণরূপে কুশ্রী হয়ে উঠল, অসংকোচে সে-কথা মানুষ ভুলে যাচ্ছে। এই-সব মৃত্যুভারবাহক দুর্লক্ষণ আর গোপন থাকছে না, তার কারণ এই যে ইতিহাসের প্রহরীশালায় কল্যাণধর্মের দণ্ডনীতি উদ্যত। . . পৃথিবীতে অনেক জাতি মরেছে, হয় দুর্বলতার অপরাধে, নয় বলদৃপ্ত প্রবলতার পাপে। . ."

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে, 'রুদ্র বলহীনকে ক্ষমা করেন না।' দুর্বলের অভিমান কবির কাছে অসহ্য। মানুষ চিরদিন দুঃখকে বরণ করিয়াছে স্বেচ্ছায়। "সে কোন্ মহাশক্তির সাধনায়? সে শক্তি প্রাকৃতিক নয়, মানসিক নয় সে আত্মিক। আপনার মধ্যে যখন সেই মহত্ত্বের উপলব্ধি করে তখন সে কোনো ত্যাগে ক্লেশে দীনাত্মার মতো শোক করে না।" ইহাই হইতেছে এই জগদ্ব্যাপী অশান্তির দিনে কবির অন্তর্দেবতার বাণী।

কবির এই অন্তর্বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে 'বড়দিন' কবিতায় খ্রীষ্ট-স্মরণে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধায়োজনে সকলেই দেবতার দোহাই পাড়িতেছে— তাহারা দেবতার নামে নরহত্যা করিয়া দেবতার আশীর্বাদ মাগিতেছে। কবি নিরতিশয় কাতর হইয়া লিখিতেছেন—

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে,

১ গান্ধীজিকে কবির টেলিগ্রাম (২ ডিসেম্বর ১৯৩৯) : "Owing gravely critical situation all over India and especially in Bengal would urge Congress Working Committee immediately remove ban against Subhas and invite his cordial co-operation in supreme interest national unity."

ওয়ার্ধা হইতে গান্ধীজির উত্তর (২২ ডিসেম্বর ১৯৩৯): "Your wire was considered by Working Committee. With knowledge they have they are unable lift ban. My personal opinion is you should advise Subhasbabu submit discipline if ban is to be removed. Hope you are well."

এনড্রুজকে লিখিত গান্ধীজির পত্র (১৫ জানুয়ারি ১৯৪০)—"If you think it proper tell Gurudev that I have never ceased to think of his wire and anxiety about Bengal. I feel that Subhas is behaving like a spoilt child of the family. The only way to make up with him is to open his eyes. And then his politics show sharp differences. They seem to be unbridgeable. I am quite clear the matter is too complicated for Gurudev to handle. Let him trust that no one in the committee has anything personal against Subhas. For me, he is as my son. I hope you are well. Love." এই-সব টেলিগ্রাম পত্রাদি রবীন্দ্র-সদনে আছে।

২ "For the first time Gurudeva had written out his message and had it printed beforehand though the inspiration of the moment carried him much beyond the limitations of the written word."—*Visva-Bharati News*, Janury 1940। প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬।

এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
ঘাতক সৈন্যে ডাকি'
'মারো মারো' উঠে হাঁকি।
গর্জনে মিশে স্তবমন্ত্রের স্বর—
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, 'হে ঈশ্বর,
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা,
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।'[১]

এবারকার খ্রীষ্ট-উৎসবের দিন এন্‌ড্রুজ মন্দিরে উপাসনা করিলেন, এইটি আশ্রমে তাঁহার শেষ ভাষণ। এই দিন কবির রচিত গানটিও গীত হয়।[২]

চারি দিকের যুদ্ধায়োজন এবং দেশের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির মধ্যে মনের শান্তভাব ও মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারানো কবির পক্ষে সম্ভব নহে যখন দেখেন মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় মহতের দল আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া বিদ্রূপ ও বিপদকে বরণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না। এল্‌ম্‌হার্স্টের নিকট হইতে European Order and World Order (Publisher P. E. P) নামে একখানি পুস্তিকা পাইয়া লিখিতেছেন, "I can realise. . that the best minds of Europe are being put to a severe test, that they have the sanction of the peoples of Europe in trying to formulate a Federal Union which will unite the peoples in spite of the ringleaders of blind Nationalism, who, sitting safely in the citadels of power, send the youth of the land to destroy each other on the battlefield."

জগদ্‌ব্যাপী সমস্যা সম্বন্ধে যাহাই বলুন— ভারতবর্ষের বিচিত্র সমস্যা প্রতিনিয়ত কবির মনকে পীড়িত করিতেছে। ভারতের এই যে-সব manufactured complexities, যেগুলির উদ্‌ভাবক হইয়াছে interested groups led by ambition and outside instigation— তাহার সমাধান কিভাবে করা যায় এই হইতেছে প্রশ্ন। কবির ইচ্ছা য়ুরোপ-আমেরিকার ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ মিলিত হইয়া সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া ভারতের কল্যাণপথ নির্দেশ করুন। তবে সেকাজে পোলিটিশিয়ানের প্রয়োজন নাই, ভাবুক সমাজের প্রয়োজন।[৩] নেভিন্‌সনকে কবি এই কথাই লেখেন অন্যভাবে কয়েকদিন পরে।

এই সময়ের কাছাকাছি (২১ ডিসেম্বর ১৯৩৯) চীন হইতে আসেন শিল্পী জ্যু পেয়ঁ (Ju Peon)। কলাভবনে তাঁহার যে সংবর্ধনা হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বাগত করেন।[৪]

১ প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬; গীতবিতান, পৃ ৮৫৭। ইংরেজি অনুবাদ ২৫-১২-৩৯। দ্র *Visva-Bharati News*, January 1940; *Poems*, p 107।

২ এই গানটি এখনো মন্দিরে খ্রীষ্ট-জন্মদিনে (বড়োদিনে) গীত হয়। কিন্তু যথার্থভাবে এটি Easter-এ গীত হইবার উপযোগী; কারণ বড়োদিন যীশুর জন্মদিন— সেদিন আনন্দসংগীত গীত হয়।

৩ World Order; *Visva-Bharati News*, January 1940, pp 53-54।

৪ *Visva-Bharati News*, February 1940, p 53। শান্তিনিকেতনে শিল্পী জ্যু পেয়ঁ— ডক্টর কালিদাস নাগ; প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬, পৃ ৫৫৩-৫৬। সচিত্র। (জ্যু পেয়ঁ— জন্ম মে ১৮৯৪ - মৃত্যু ডিসেম্বর ১৯৪১)।

শান্তিনিকেতনে গান্ধীজি

মনের পরিবেশের সম্পূর্ণ বদল হইয়া গেল— বাড়িতে বিবাহ। রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিনীর[১] বিবাহ (৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৯)। বিবাহোৎসবে[২] বিপুল আড়ম্বর হয়। কবি আছেন 'উদীচী' নামে নূতন বাড়িতে, 'পুনশ্চ'র পরে রাস্তার ধারে দ্বিতল এই বাড়িটি বিশ্বভারতীর আচার্যের জন্য বিশ্বভারতী হইতে নির্মিত হইয়াছিল। এই বাড়ির নাম সরকারীভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে উদীচী। কবি কখনো লিখিয়াছেন সেঁজুতি, কখনো বা চামেলি। কবি আপন মনে পড়াশুনা লইয়া আছেন; চারি দিকে কোলাহল; মাঝে মাঝে আলিহোসেনের সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে— 'সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে সানাই লাগায় তার সারঙের তান'।[৩] সানাইয়ের সুরে আগমনীর গান জাগাইয়া তোলে কবিচিত্তে নিজ জীবনের 'শেষ বেলার ছবি'।[৪] অতীত জীবনকথা অকস্মাৎ কানে-আসা সানাইয়ের সুরে কি আজ জাগিল? কে জানে! তাই যেন লিখিতেছেন:

এল বেলা পাতা ঝরাবারে;
শীর্ণ বলিত কায়া, আজ শুধু ভাঙা ছায়া
মেলে দিতে পারে।
একদিন ডাল ছিল ফুলে ফুলে ভরা
নানা-রঙ-করা।

সানাই-এর গান ও কবিতা[৫] লেখা, বিচিত্র সামাজিক কর্তব্য পালন ও তৎসঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে দুই-একটি

১ নন্দিনীর পিতা কচ্ছদেশীয় বণিক, নাম চতুর্ভুজ। ১৯২১ সালে তিনি সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আসেন; পুরাতন 'প্রাক্কুটীর'র গৃহে (গুরুপল্লী যাইতে বাম দিকে বর্তমান চীনা ভবনের কাছে) চতুর্ভুজ প্রথমে থাকেন। তার পর মাঠের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন। তখন রতনকুঠি ও ঐ বাড়িটি ছাড়া অন্য কোনো ঘরবাড়ি ও দিকে ছিল না। যাহাই হউক, পুরাতন প্রাক্কুটীতে যখন চতুর্ভুজরা বাস করিতেছেন সেই সময়ে প্রতিমা দেবীর দৃষ্টি এই পরিবারের প্রতি পড়ে। চতুর্ভুজের পত্নী ছিলেন উন্মাদ-রোগ-গ্রস্তা, প্রতিমা দেবী শিশুটিকে লইয়া গিয়া লালনপালন করেন। বহুকাল নন্দিনী জানিত প্রতিমা দেবীই তাহার গর্ভধারিণী জননী। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা গল্প নন্দিনীর জন্য বা ইহাকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত হয়। কন্যার ডাক নাম পুপে, পুপু ইত্যাদি।

২ নন্দিনী-অজিতের বিবাহ। 'তোমরা দুজনে একমনা'— প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮। বোম্বাইএর অজিতসিং মোরারজি পাটাউ-এর সহিত বিবাহ হয়। এই বিবাহ উপলক্ষে কবি ১৪ পৌষ ১৩৪৬ (৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৯) নিম্নলিখিত গান-তিনটি রচনা করেন— 'নবজীবনের যাত্রাপথে দাও দাও এই বর'; 'প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি'; 'সুমঙ্গলী বধূ সঞ্চিত রেখো প্রাণে স্নেহমধু' (গীতবিতান, পৃ ৮৫৫-৫৬)।

৩ সানাই, ৪ জানুয়ারি ১৯৪০; সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৮১-৮৩।

৪ শেষ বেলা, ১১ জানুয়ারি ১৯৪০; নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৬০-৬১।

৫ নিম্নে এই সময়ের কবিতা ও গানের তালিকা প্রদত্ত হইল—

৪ জানুয়ারি (১৯৪০)— 'সানাই', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৮১। ১০ জানুয়ারি— 'রূপকথায়', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৯২; 'আহ্বান', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৯৩; 'পূর্ণা', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৮৪; 'দেওয়া-নেওয়া', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৮৮। ১১ জানুয়ারি— 'শেষ বেলা', নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৬০। ১২ জানুয়ারি— 'শেষদৃষ্টি', নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৭। ১৩ জানুয়ারি— 'অনাবৃষ্টি', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৭৬; 'অধরা', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৭৮; 'নতুন রঙ', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৭৭; 'ব্যথিতা', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৭৯। ১৫ জানুয়ারি— 'জানালায়', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৭৪; 'ক্ষণিক', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৭৫। 'দ্বিধা', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ১০২; 'আধোজাগা', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ১০৩। ২০ জানুয়ারি— 'রাত্তিরে কেন হল মর্জি', ছড়া, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ২৬। ২১ জানুয়ারি— 'বিপ্লব', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৭১ (১৬-১-৪০-এ প্রথম খসড়া হয়, দ্র পৃ ৪৮১)। ২৮ জানুয়ারি— 'রূপ-বিরূপ', নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৬২; 'কর্ণধার', সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৬৮।

গদ্য প্রবন্ধ রচনা চলিতেছে। এই সময়ে প্রমথ চৌধুরীর অনুরোধেই বোধ হয় 'অলকা'র জন্য ফিন্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে একটা 'বিবরণ সংগ্রহ করে' প্রবন্ধ লেখেন।[১] ৩০ নভেম্বর ১৯৩৯ সোভিয়েট রাশিয়া ফিন্‌ল্যান্‌ড্‌ আক্রমণ করে— জারমেনির সঙ্গে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধারম্ভের তিন মাস পরে।

'অলকা'র প্রবন্ধ-শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "রাশিয়া এই অসমকক্ষ দ্বন্দ্বে জিতলেও তার লজ্জা ঘুচবে না।" এই সময়ে অমলা দেবীর 'মনোরমা' নামে গল্পের বই কবির হাতে পড়ে; বইখানি পড়িয়া লিখিতেছেন[২]— "এই বইখানিতে অনেকগুলি গল্প আছে যা নিষ্ঠুর। তাকে মনোরম বলা যায় না। ফিন্‌ল্যান্‌ডের উপর সোভিয়েটের বোমা নিক্ষেপের বিবরণ হৃদয়ভেদী কিন্তু হৃদ্য নয়। তবু প্রতিদিন তীব্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে খবরের কাগজ খুলে দেখি দানবিকতার শল্য মানব ইতিহাসের মর্মস্থলে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছল।.." কয়েক মাস পরে কালিম্পঙে লিখিত 'অপঘাত'[৩] (১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) কবিতার মধ্যে শেষ দুই পংক্তিতে পাই— "টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে ফিন্‌ল্যান্‌ড্‌ চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।"

ঘটনার দিক হইতে একটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য। জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে (১৭ই) চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত তাই-সু (Tai-shu) কয়েকজন সঙ্গীসহ শান্তিনিকেতনে আসিলেন। ইঁহারা ভারতে goodwill mission বা শুভেচ্ছা-সফরে আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে এই অতিথিদের অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, "The ancient friendship between China and India might be revived by contact in the realms of spirit and culture।" বৌদ্ধ আচার্য বলেন, 'প্রভু বুদ্ধ ভারতীয় জীবনে এক নূতন ভাববন্যা আনিয়াছিলেন। বর্তমান ভারতে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার মূর্ত প্রতীক।'[৪]

কয়েকদিন পরেই শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসব। রবীন্দ্রনাথ এই দিনের জন্য 'পূর্ণের সাধনা' শীর্ষক ভাষণ লিখিয়াছিলেন (৯ মাঘ ১৩৪৬)। এই ভাষণে তিনি বলেন, "এ যুগকে বলে বৈজ্ঞানিক যুগ। বিজ্ঞানবুদ্ধির পরিচালনায় মানুষের মন আজ এসে প'ড়েছে প্রাকৃত জগতের অপরিসীম বাস্তবলোকে।" আমরা পূর্বে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংজ্ঞা ক্রমেই অভিব্যক্ত হইয়া আসিতেছে। আধুনিক জীবনে ধর্ম বলিতে কী বুঝায় সে সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আজ জীবনসন্ধ্যায় অতি স্বচ্ছ; বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বিরোধ তাঁহার সাধনায় আজ নিশ্চিহ্ন। এই প্রবন্ধে কবি আদিম মানবের মনের উপর আরণ্য বাসভূমির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে, "মানুষের মনও তার বাসস্থানের অনুরূপ ছিল; তার ভাবনা-চিন্তা ছিল জটিল বাধায় ছায়ান্ধকারে আবিল। তার বিশ্বজগতের ধারণা ছিল অনেকখানিই কল্পনা দিয়ে গড়ে তোলা, সবই যেন স্বপ্নের সৃষ্টি। সেই কল্পনা যতই অদ্ভুত অস্বাভাবিক ও বিকৃত হত ততই তার সভ্যতা সম্বন্ধে প্রত্যয় মনে চিহ্ন দিত জোরের সঙ্গে। আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি কোনো দৈবশক্তির খেয়াল থেকে অযৌক্তিক ভাবে দেখা দিয়েছে, আর সেগুলি যে আমাদেরই দণ্ডপুরস্কাররূপে বিহিত এ ছাড়া আর কোনো কারণ তারা ভাবতে পারত না।..

"দেবতা অকারণে পীড়নপ্রিয় এবং ঈর্ষান্বিত এই ধারণা দৃঢ় হয়েছিল প্রাকৃতিক ঘটনায় বারংবার অপ্রতিহার্য বিপৎপাত দেখে এবং সেই-সকল অপঘাতের মধ্যে শ্রেয়োনীতির কোনো পরিচয় না পেয়ে। এ কথা মানুষ ভুলেছিল— প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ব্যবহার বুদ্ধির, ধর্মানুষ্ঠানের নয়।.. সে পদে পদে আপন অদৃশ্য শত্রুকে দেখেছে বিশেষ বারে, বিশেষ লগ্নে, বিশেষ গ্রহে, বিশেষ বাহ্য লক্ষণে এবং সেই শত্রুতার প্রতিকার কল্পনা করেছে এমন কোনো প্রক্রিয়ায়

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১৩২, ১০ জানুয়ারি ১৯৪০। পত্র ১৩৩, ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০। পৃ ৩১২-১৩। অলকা, দ্বিতীয় বর্ষ, মাঘ ১৩৪৬, পৃ ৩৮৭-৮৮।

২ সমালোচনা, প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬।

৩ অপঘাত, সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ১৩২।

৪ *Visva-Bharati News*, February 1940। ভারত, ৪ মাঘ ১৩৪৬।

যার মধ্যে কোনো অর্থ নেই, বুদ্ধির কোনো বিচার নেই। শাঁখঘণ্টা বাজিয়েছে বধিরতার কাছে, ছায়াকে তাড়না করেছে শিশুর মতো বিশ্বাসে।"

অবশেষে বিজ্ঞান মানুষের মনকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে আরম্ভ করিল। মানুষ ক্রমে ক্রমে বুঝিতে লাগিল যে, প্রকৃতির সঙ্গে তাহার 'যোগ কোনো অলৌকিক শক্তির প্রসাদের অপেক্ষা করে না'। সমস্ত সভ্যদেশ সত্য প্রণালীতে প্রকৃতিকে জানার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় সম্মোহনের প্রতি তাহার দুর্বল ভীরু বুদ্ধির বিশ্বাস দূর হইতেছে। "কেবল ভারতবর্ষে আমাদের রক্তের মধ্যে এমন একটা মুগ্ধতা আছে যে শিক্ষা সত্ত্বেও প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে নিয়মের অমোঘতার প্রতি বিশ্বাস আমরা দৃঢ় রাখতে পারি নে, অন্ধসংস্কার আমাদের বুদ্ধিকে পরিহাস করতে থাকে জাদুর প্রলোভন দেখিয়ে। তাকেই আমরা সনাতন ধর্মবিধান বলে মনে করি, জানি নে এই হল তমসাচ্ছন্ন নাস্তিকতা।"

বিশ্বব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মানুষ যেমন জাদুক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াছিল, তেমনিই আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও বাহ্যানুষ্ঠানের কৃচ্ছ্রসাধনপ্রণালীর উপর তাহার বিশ্বাস ছিল দৃঢ়।

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের এই আধ্যাত্মিক তামসিকতা হইতে মুক্তির বাণী আসে বুদ্ধদেবের নিকট হইতে। 'তপস্যায় কৃচ্ছ্রসাধনকে তিনি অস্বীকার করলেন।' ভারতবর্ষে জ্ঞানীরা বলেন যে, "যথার্থ সাধনা উপকরণে নয়, কষ্টদায়ক কোনো প্রণালীতে নয়, সে সাধনা সত্যে ত্যাগে দয়ায় ক্ষমায়। এই-সমস্ত চারিত্রগুণের সর্বপ্রধান ধর্ম এই যে, এরা মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়। নইলে এদের আর কোনো অর্থই নেই। এই মিলনের সাধনাই মানুষের ধর্মসাধনা।" আমাদের শাস্ত্রে যোগের কথা আছে ; সকলের সঙ্গে যোগের পথ তাহাতে নির্দেশ করা আছে করুণায় মৈত্রীতে ও অহিংসায়। "মানুষকে ছেড়ে কোনো দেবতাকে পাওয়ার কথা এ নয়, এ নয় পৃথিবীকে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গের দিকে তাকানো।"

এই ভাষণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের সাধনার কথার অতর্কিতভাবে আভাস দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি জানি নে কোনো বাহ্যপ্রক্রিয়া . . আমি কেবল জানি মনের উপর বাণীর প্রভাব . . তেমন বাণী আমরা পেয়েছি আমাদের ঋষিদের কাছ থেকে, তাঁদের পরিপূর্ণ জীবনের ফলস্বরূপে। এ বাণী আমরা নির্বাচন ক'রে নিতে পারি নিজের স্বভাবের বিশেষ প্রবর্তনা থেকে। কোনো এক শুভক্ষণে আমি পেয়েছি আমার জীবনের মন্ত্র শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। আমি চেষ্টা করি এই মন্ত্র আমার চিত্তের কুহরে ধ্বনিত ক'রে রাখতে।" শান্তিনিকেতনের মাঘোৎসবের উপাসনায় এইটিই রবীন্দ্রনাথের শেষ ভাষণ।[১] পর-বৎসরে উৎসবে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

মাঘোৎসবের কয়েকদিন পরেই শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব— ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪০)। প্রধান অতিথিরূপে আসিয়াছেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক। এই উৎসবের আঙ্গিকরূপে যে প্রদর্শনী হয় সেটি উন্মোচন করেন তিনি। 'পল্লীসেবা'[২] সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মৌখিক ভাষণ দান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নূতন কথা বেশি নাই ; তৎসত্ত্বেও দুই-একটি কথা পুনরুক্ত হইলেও স্মরণীয়। তিনি বলেন, "অশিক্ষিত পল্লীবাসীর সঙ্গে শিক্ষিত শহরবাসীর ভেদ দূর করতে না পারলে দেশ কখনো বড়ো হতে পারবে না। আজ বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। . . সব শিক্ষার পথকে সহজ করে গ্রামে সর্বজনের সুগম করে দিতে পারাটাই সকলের চেয়ে বড়ো সেবা। যে শিক্ষা য়ুরোপ থেকে এসেছে আমাদের দেশে তাকে গ্রহণ করে সকলের মাঝে ঢেলে দিতে হবে, কারণ শিক্ষার মধ্যে দেশবিদেশের

১ পূর্ণের সাধনা, ৯ মাঘ ১৩৪৬। প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৬, পৃ ৬৩৮-৪২।

২ পল্লীসেবা, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ : অভিভাষণের অনুলিখন, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৬, পৃ ৬৬২-৬৪। পল্লীপ্রকৃতি (বিশ্বভারতী, ১৩৬৮)।

ভেদ নেই।" শিক্ষা ও বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যতীত মূঢ় মনের জড়তা দূর হইতে পারে না— এইটিই কবির প্রধান বক্তব্য।

এই ভাষণে কবি দেশবাসী ও শ্রীনিকেতনের কর্মীদের বলেন যে, দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে জ্ঞানের পংক্তিভেদ করিলে চলিবে না। কবি বলিলেন, "গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না।..মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য।" এই ভেদহীন শিক্ষার কথা কবির বহু ভাষণের মধ্যে দেখা যাইতেছে।

এ দিকে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের ফলে প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধনিরত দেশেই ব্যক্তিস্বাধীনতা বহুলভাবে খর্বিত হইতেছিল। ইংলন্ডে H. W. Nevinson, National Council for Civil Liberties -এর প্রেসিডেন্ট-রূপে এক পত্র সর্বত্র প্রেরণ করেন। এই প্রচারপত্র পাইয়া কবি নেভিন্‌সনকে লিখিতেছেন (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০): "I join with you in your crusade for the liberty of the human spirit and share your hope that the Western Civilization will yet triumph over the ordeal that it has set for itself. In some ways it is even harder for India to pursue the path of freedom ; not only our unnatural political situation which hampers free national expression but the legacies of mediaeval habits and thoughts will have to be overcome.

"It is therefore, all the more necessary that leaders of thought in your country and ours should counteract the passions of the day and maintain close contact in our human endeavour."[১]

যুদ্ধ আরম্ভের দুই বৎসর পূর্বে লন্ডনে আহূত ব্যক্তিস্বাধীনতা-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ এই বাণীটি প্রেরণ করিয়াছিলেন: "When rivalry for colonial exploitation becomes still more acute, the British citizens will find it necessary to arm their Government at home with extraordinary powers to defend their possessions abroad. Then they will suddenly wake up to find that they have forfeited their own liberty and drifted into fascist group.'[২]

মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে কবি বিলাত হইতে তথাকার ব্যক্তিস্বাধীনতা সংঘের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ পাইলেন। তদুত্তরে কবি নেভিন্‌সনকে লিখিলেন (৩১ মার্চ ১৯৪০)—"It has been most kind of you to have asked me to join the National Council for Civil Liberties as a Vice-President and I accept the honour with great pleasure. I can of course do nothing more at present than just lend my name to it ; 80 is after all a very advanced age in the tropics. But I should not complain, as, on the whole, I am keeping quite fit."[৩]

এ কথা আশা করি সকলেই স্বীকার করিবেন যে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া কবির পক্ষে অধর্ম নহে। চিন্তাশীল,

১ *Amrita Bazar Patrika*, 6 February 1940। দ্র *Visva-Bharati News*, February 1940, p 61।

২ *Amrita Bazar Patrika*, 17 October 1937।

৩ Henry W. Nevinson, Esq, 4 Downside Crescent, Hampstead. N. W. 3. England।

ভাবুক, শিল্পী ও কবিদের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ক্রোচে (Croce) বলিতেছেন, "A man could only suppress his political interest by at the same time suppressing all his others ; he would not be unpolitical only but apathetic, and total apathy is death, the death of thought and imagination, of philosophy and poetry, which have no subject matter but the life of the passions." Croce বলেন যে, সমাজের দার্শনিক কবি ও শিল্পীরা unpolitical man হইবেন না ; "if we may so speak more exactly, 'a sympolitical' one, who is concerned in politics as in every human activity. He is concerned not to produce bad propagandist poetry, philosophy or history, still less to undertake political activities outside his province, but simply to transmute his passionate concern into pure poetry, philosophy or history ; and this he could not do if he had not this passionate concern, if his mind were indifferent that is to say empty."[১]

ইতিমধ্যে জানা গেল মহাত্মা গান্ধী শান্তিনিকেতনে আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে আছেন কস্তুরাবাঈ। উভয়ে একত্র আসিয়াছিলেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। এবার আগমনের উদ্দেশ্য, কবির সহিত উভয়ের শেষ সাক্ষাৎ। পঁচিশ বৎসর পূর্বে ইঁহাদের পুত্রেরা ও পুত্রোপম ফিনিক্স-ছাত্ররা ভারতে প্রথম আশ্রয় পাইয়াছিল এই শান্তিনিকেতনে, সেই স্থানের পুরাতন অধ্যাপক ও কর্মীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য এবার আসা।

বোলপুর আসার সঙ্গে গান্ধীজির কোনো রাজনৈতিক কর্মের যোগ ছিল না : তৎসত্ত্বেও বোলপুর স্টেশনে কয়েকজন উৎসাহী 'স্বদেশসেবক' মহাত্মাজিকে অপমান করিবার অপচেষ্টায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[২]

মহাত্মাজি ও কস্তুরাবাঈ আশ্রমে আসেন ১৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৪০)। সেইদিন অপরাহ্নে আম্রকুঞ্জে গান্ধীজির সংবর্ধনা হইল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গান্ধীজিকে মাল্যভূষিত করিয়া স্বাগত করিলেন : "I hope we shall be able to keep close to a reticent expression of love in welcoming you into our Ashrama and never allow it to overflow into any extravagant display of phrases. Homage to the Great naturally seeks its manifestation in the language of simplicity and we offer you these few words to let you know that we accept you as our own as one belonging to all humanity."

গান্ধীজি প্রতিভাষণে বলেন, প্রথমেই এখানে আসিয়া তাঁহার এন্‌ড্রুজের কথা মনে পড়িতেছে— আজ সকালে কলিকাতায় এন্‌ড্রুজের সহিত সাক্ষাৎই ছিল তাঁহার প্রথম কাজ। এন্‌ড্রুজের বড়োই ইচ্ছা ছিল যে আশ্রমে গান্ধীজি ও কবি মিলিত হন। আজিকার এই উৎসবে তাঁহার অনুপস্থিতিজনিত বেদনা সকলেই বোধ করিতেছেন। মহাত্মাজি বলেন, শান্তিনিকেতনে আসিলে মনে হয় যেন নিজ গৃহে আসিয়াছেন ; ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনের আতিথ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে সেদিন যখন তাঁহাদের মাথা গুঁজিবার স্থান কোথাও ছিল না, এই শান্তিনিকেতনেই তাঁহারা আফ্রিকা হইতে আসিয়া আশ্রয় পান। সেই সময় হইতে তিনি অনুভব করিয়া আসিতেছেন গুরুদেব তাঁহাকে কী ভালোবাসেন। কবির আশীর্বাদ পাইবার প্রথম সুযোগেই তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি গুরুদেবের আশীর্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়াছে।

১ Croce, 'Unpolitical Man' (1931) in his *My Philosophy*, selected by Klibansky and trans. by Carritt, pp 53-54 ।

২ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৬, পৃ ৮৩২।

গান্ধীজি শেষ আসেন ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে— এই সময়ের মধ্যে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা তিনি শান্তিনিকেতনের প্রত্যেকটি বিভাগ দেখিলেন ও পুরাতন কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির কাজকর্ম বিশেষভাবেই দেখিলেন। নন্দলাল কংগ্রেসমণ্ডপ ও গ্রাম-উদ্যোগ সম্মেলনের বিভূষণে কয়েকবার ভার গ্রহণ করেন; গান্ধীজি তাঁহাকে ভালো করিয়া জানিতেন; সেইজন্য কলাভবনের কাজকর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই পর্যবেক্ষণ করিলেন। অতঃপর শ্রীনিকেতনের গ্রামসেবার কাজ, শিক্ষাসত্র ও শিল্পসদনের উদ্যোগসমূহ দেখিয়া আসিলেন। মহাত্মাজি শিক্ষাসত্র দেখিয়া নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে তাঁহার বুনিয়াদি শিক্ষার ও কবির গ্রাম্য শিক্ষার মূলে একটু ভেদ আছে। কবি চাহিয়াছিলেন শিশুর মনোবিকাশের ছন্দ প্রকাশিত হয় আর্টের মাধ্যমে— self-expression-এর মধ্য দিয়া; মহাত্মাজির শিক্ষাবিধির ভিত্তি কারুকেন্দ্রিক, বা craftএর মাধ্যমে, প্রয়োজনের চাহিদা মিটানোতেই শিক্ষার সার্থকতা। অপরাহ্নে কবির সহিত তাঁহার দীর্ঘ কথোপকথন হয়; কী কথাবার্তা হয় তাহা প্রকাশিত হয় নাই। "Gandhiji had soveral intimate talks with Gurudev. But they are of too sacred and personal a character for recapitulation here."

সন্ধ্যার পর উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে গান্ধীজির জন্য 'চণ্ডালিকা' নাটিকার অভিনয় হইল। 'হরিজন' পত্রিকার সাংবাদিক লিখিয়াছেন যে গান্ধীজিকে এরূপ তন্ময় হইয়া অভিনয় দেখিতে তিনি কখনো দেখেন নাই।[১]

মহাত্মাজি শান্তিনিকেতন ভ্রমণ করিয়া গিয়া বলেন, "The visit to Santiniketan was pilgrimage to me"। শান্তিনিকেতন ছাড়িবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির হস্তে একখানি পত্র দেন (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০); তাহাতে তিনি গান্ধীজিকে একটিমাত্র অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহার অবর্তমানে বিশ্বভারতীর প্রতি তিনি (গান্ধীজি) যেন দৃষ্টি রাখেন।[২] কলিকাতার পথে গান্ধীজি কবির পত্রখানি পড়েন ও উত্তর লিখিয়া জানান যে বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব-বিষয়ে তিনি তাঁহার যথাসাধ্য করিবেন।

গান্ধীজি কলিকাতায় গিয়া কবির পত্রখানি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে দেখান। তার পর ভারত স্বাধীন

১ At seventynine the Poet's countenance shows no diminution in its lustre, the eyes burn brighter than ever, the step is firm although he needs support and moves about only with difficulty. The voice has lost none of its vigour or its sonorous musical quality, and the spirit retains all the freshness and irrepressible exuberance of youth. He insisted upon Gandhiji witnessing the performance of his favourite musical pantomime, *Chandalika*, in which his grand-daughter [Nandita, Mrs. K. R. Kripalani] played the principal part. He personally supervised the rehearsal and even delayed the programme by a quarter of an hour till he was satisfied that everything was tip-top. It was a sight to be remembered when at one stage he almost jumped to the edge of his seat and broke out into a musical interpolation to provide the cue when the performers had seemed to have lost it. His enthusiasm must have got an infection quality in it, for I have never seen Gandhiji follow with such sustained and rapt interest any entertainment as he did this one during the full one hour that it lasted.—*Harijan*, 9 March 1940।

২ *Visva-Bharati News*, April 1940 : Two Letters. Tagore's letter : "Accept the institution under your protection, giving it an assurance of permanance if you consider it to be a national asset. Visvabharati is like a vessel which is carrying the cargo of my life's best treasure, and I hope it may claim special care from my countrymen for its preservation."

হইলে মৌলানা সাহেব শিক্ষামন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে মহাত্মাজি পুনরায় তাঁহাকে কবির প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ পালিত হয় ১৯৫১ সালে— কবির মহাপ্রস্থানের দশ বৎসর পর!

সিউড়ি ও বাঁকুড়ায়

স্থির হইয়া বসিয়া থাকা কবির ভাগ্যেও নাই, স্বভাবেও নাই। তাহা না হইলে আশি বৎসর বয়সে লোকেই বা তাঁহাকে আহ্বান করিবে কেন, আর তিনিই বা আহ্বানে সাড়া দেন কেন। এবার আহ্বান আসিয়াছে বীরভূমের সদর সিউড়ির প্রদর্শনী উদ্‌বোধনের (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০) জন্য। তখন বীরভূমের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বিনোদবিহারী সরকার। তিনি সাহিত্যভক্ত ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরক্ত। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান তখন জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জিতেন্দ্রলালের ন্যায় তেজস্বী নির্ভীক বিদ্বান কর্মীর জীবনকথা ও কর্মণ্যতা আজ বিস্মৃত। কিন্তু এক সময়ে তাঁহার বাগ্মিতা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। জেলাবোর্ডের তরফ হইতে তিনি যে ভাষণ দান করেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্লেষণ ও প্রশস্তি ছিল তাহা তাঁহার ন্যায় সাহিত্যিকেরই উপযুক্ত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কথা শুনিবার ও তাঁহাকে দেখিবার জন্য সভাক্ষেত্রে কত সহস্র লোক যে সমবেত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন।

অপরাহ্ণে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে বিরাট পার্টি হয়, তাহাতে শহরের বহু শত লোক সমবেত হন। কবি সন্ধ্যার পর আহমদপুর হইয়া ট্রেনযোগে ফেরেন।

ইহার পরই কবির আহ্বান আসিল বাঁকুড়া হইতে; কবি দূরদুরান্তের দেশবিদেশে গিয়াছেন, ঘরের কাছের স্থানে যাইবার সুযোগ হয় নাই, আহ্বানও আসে নাই। এই সময়ে সুধীন্দ্রকুমার হালদার আই. সি. এস বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও বর্ধমান বিভাগের অস্থায়ী কমিশনরও বটে। সুধীন্দ্রকুমার বিখ্যাত অধ্যাপক হীরালাল হালদারের পুত্র, ইঁহার পত্নী উষা দেবী কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের কন্যা, কবির একান্ত স্নেহাস্পদা। পশ্চিম বাংলার বহু জনহিতকর কার্যের সহিত উষা দেবীর এককালে যোগ ছিল। ইঁহাদের আগ্রহে ও ব্যবস্থায় কবির বাঁকুড়া যাওয়া সম্ভব হইল।

বোলপুর হইতে ট্রেনযোগে খানা স্টেশন পর্যন্ত গিয়া, সেখান হইতে মোটরে করিয়া কবি বাঁকুড়া যান রানীগঞ্জের পথে। কবিকে দেখিবার জন্য পথে পথে কী ভিড়! রানীগঞ্জে জনতার চাপে মোটরগাড়ি ভাঙিবার মতো হয়।

বাঁকুড়ায় কবি ছিলেন হিল্‌হাউস নামে একটি বাড়িতে (১-৩ মার্চ ১৯৪০ : ১৭-১৯ ফাল্গুন ১৩৪৬)। পৌঁছিবার পরদিন কবি বাঁকুড়া-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন; তৎপূর্বে মণ্ডপতলে নানা প্রতিষ্ঠান হইতে কবিপ্রশস্তি পাঠ ও কবি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।[১] রবীন্দ্রনাথ সকল অভিনন্দনের উত্তরে একটি ভাষণ দান করেন।[২]

পরদিনেও কয়েকটি অনুষ্ঠানে কবিকে যোগদান করিতে হয়; ইহার মধ্যে ছাত্রসভায় কবির অভিভাষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সভার পর কবি বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল পরিদর্শনে গিয়া খুবই প্রীত হন; কবি লেখেন, "কর্তৃপক্ষদের প্রসাদ-বঞ্চিত এই হিতানুষ্ঠানটিকে বাঁকুড়ার গৌরব-স্থান বলিলে অল্প বলা হয়, বস্তুত ইহা বাংলাদেশেরই একটি মহতী কীর্তি।"[৩] সেইদিনই লেডি ডাফরিন হাসপাতালের প্রসূতি-সদনের ভিত্তিস্থাপন

১ বাঁকুড়ার পৌরজনের পক্ষ হইতে হরিসাধন দত্ত, অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও শিক্ষাসম্মিলনীর পক্ষ হইতে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভিনন্দন পাঠ করেন।

২ বাঁকুড়ার জনসভায় অভিনন্দনের উত্তরে লিখিত, ১৮ ফাল্গুন ১৩৪৬। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭। অভিভাষণ, পল্লীপ্রকৃতি (১৩৬৮), পৃ ১৭১।

৩ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৬, পৃ ৮২৭-৩০, ৮৩৯।

কবি-কর্তৃক সম্পন্ন হয়। কবি মেডিক্যাল বিভাগের ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, "বর্তমান যুব-সম্প্রদায়ের উচিত বস্তুজগতের এমন একটি নূতনতর রূপের প্রবর্তন করা, যাহার দ্বারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু আত্মোৎসর্গের মহামন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে এরূপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না।" 'ভারত' পত্রিকা (২৩ ফাল্গুন ১৩৪৬) এই উক্তি সম্বন্ধে বলেন, "কবিগুরু অতি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে এত গভীর বিষয় নিহিত আছে যে, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য বিশেষরূপ মননশীলতার প্রয়োজন। কবির বিজ্ঞানী মন বস্তুজগৎগত কল্যাণের কথা বলে— কোনো ভাবুকতার বাণী ইহা নহে।

বাঁকুড়ার ছাত্রদের উদ্দেশে কবি যে বক্তৃতা করেন তাহাতে স্থানীয় ছাত্ররা উপলক্ষ্যমাত্র। দেশে ছাত্রদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভাবচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, কবি তাহারই সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ছাত্ররা "এ-কথা . . ভুলে যায় যে, যারা অকুণ্ঠিত মনে নিয়ম ভাঙতে চায় তারা নিয়ম গড়তে কোনোদিন পারে না। এই ভাঙন-ধরানো মন সাংঘাতিকভাবে বিস্তার লাভ করছে, এদের হাতে কীর্তি গঠিত হচ্ছে না, কীর্তি ভাঙছে। দলাদলিতে ক্রমাগতই ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে দেশের আশ্রয়সৌধকে। ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা এই সৃষ্টিশক্তি সৃষ্টিপ্রীতির মূলে আঘাত করেছেন তাঁরা এটা করেছেন স্বাজাত্য-কর্তব্যের দোহাই দিয়ে। সভা-ভাঙা দল-ভাঙা ইস্কুল-ভাঙা মাথা-ভাঙা সমস্ত এর অন্তর্ভুক্ত ক'রে মারণ-তাণ্ডবের পিছনে দাঁড়িয়ে বাহবা দিয়েছেন। যে-বয়সে কোনো একটা গড়ে তোলবার শক্তি বা অভিজ্ঞতা থাকে না সেই বয়সে তাঁরা নিজের দলের সুযোগ ঘটাবার জন্যে এদের কানে ভাঙার মাহাত্ম্য ঘোষণা ক'রে নেশা জমিয়েছেন। দেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার কাজে ছেলেদের উৎসাহ জাগিয়েছেন,— এই কাজটা সবচেয়ে সহজ। . .

"ধ্বংস করবার কাজে যখন আগুন লাগানো হয় তখন সর্বনাশ করতে করতে সেটা আপনি ছড়িয়ে পড়ে— তাতে কারো কোনো কৃতিত্বের প্রয়োজন হয় না, বুদ্ধির তো নয়ই। যে-বয়সে স্বভাবতই পরিণাম-দৃষ্টি থাকে না, যখন দায়িত্ব-বোধের যথেষ্ট চর্চা হয় নি, তখন এই আগুন লাগানোর মাতামাতিতে দল বাঁধতে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো দেশের অনিষ্ট সাধন আমি তো কিছু মনে করতে পারি নে।"[১] কবির এই সতর্কবাণীর অবহেলার ফল যে কী হইয়াছে তাহা আজ কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

তিন দিন বাঁকুড়ায় থাকিয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে কলিকাতা হইয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। আসিয়া লিখিলেন 'দূরের গান' (সানাই); এই প্রায় আশি বৎসর বয়সেও কবির মন বলে, 'আমি সুদূরের পিয়াসী।' তাই নূতন স্থান হইতে, নূতন মানুষের আহ্বান আসিলে, নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যাইবার জন্য মন বলে, 'চলি গো চলি গো, যাই গো চলে।'

সুদূরের-পানে-চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি
মন সেই আঘাটায় তীর্থপথগামী
যেথায় হঠাৎ-নামা প্লাবনের জলে
তটপ্লাবী কোলাহলে
ওপারের আনে আহ্বান,
নিরুদ্দেশ পথিকের গান। . .
মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে

১ বাঁকুড়ার ছাত্রদের উদ্দেশে; প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ ৯৪।

দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে ;
আজিও চলেছি তার টানে।
বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।[১]

কিন্তু ক্রমশই চলার বেগ চলিতেছে চরম অচলার অভিমুখে। বাহিরের সমস্ত কর্মব্যস্ততা, হাসিবিদ্রূপ, কাব্যসৃষ্টি, রূপসৃষ্টি— সমস্তর পিছনে মনের মধ্যে নিয়ত উঁকি মারিতেছে চরম চলার শেষ আবেদন। এই মনোভাবটি একভাবে প্রকাশ পাইয়াছে দ্বিজেন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের ভাষণে।[২] ২৯ ফাল্গুন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব ; মন্দিরে কবির অভিভাষণ পঠিত হয়। কবি ভাষণে বলেন, "আমি আজ নিজের কথাই জানাই। এই তো দেখছি জরা ক্রমশই আমার চারদিকে তার ফাঁসগুলি আঁট করে দিচ্ছে। সৃষ্টিগতিস্রোতের সঙ্গে আমার যে-সব ইন্দ্রিয়বোধ-শক্তির সহচারিতা এত দীর্ঘকাল চলে এসেছে আজ তাদের মাঝখানে ক্রমশই নানা বেড়া উঠছে স্থূল হয়ে। সেই ব্যবধানে প্রতিহত হয়ে জীবনলীলা চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কথা সহজে মনে আসতে পারে। কেননা এই ব্যবধানের অতীত পথে যে অস্তিত্ব-স্রোত তাকে আমরা দেখতে পাই নে।.. বিনাশ যদি কোনোখানেই সৃষ্টির প্রতিকূলে সত্যরূপে থাকত তা হলে সেই রন্ধ্র দিয়ে বহিঃসৃত হয়ে সৃষ্টি কোন্‌কালে যেত অতলে তলিয়ে।.. সব কিছু একাকার হয়ে যেত অবৈচিত্র্যে, সব চলা হয়ে যেত স্তব্ধ। কিন্তু ক্লান্তিবিহীন মৃত্যু দূর করে দেয় সঞ্চরমান কালের ক্লান্তি। জীর্ণতাকে সে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে নূতন রচনার তোরণ নির্মাণ করছে সেই উপকরণে। প্রথমকে সে বারে বারে ফিরিয়ে আনছে শেষকে অতিক্রম করে।" বিজ্ঞানীদের মতে কোনো একটা বিশেষ দূর সীমানায় বিশ্ব আপনার ক্রমবিস্ফারিত স্ফীতিতে বিদীর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইবে— কবি এ তত্ত্ব মানিতে প্রস্তুত নহেন ; ভারতীয় সাধকদের ধ্যানদৃষ্টি অনুসারে সৃষ্টির আদিও নাই অন্তও নাই, আছে কল্পকল্পান্তর, প্রকাশের পর প্রকাশের অনুবর্তন, প্রলয়ের চক্রপথে।

কয়েকদিন পরে দোলপূর্ণিমা বসন্ত-উৎসব। যথাবিধি শান্তিনিকেতনে তাহা নিষ্পন্ন হইল। সেদিন কবি বসন্তকে আহ্বান করিলেন একটি কবিতায়[৩] ; তবে তাহা নূতন সুরে বাঁধা। আমরা একটু পরেই কাব্যে অবচেতনতা সম্বন্ধে যে আলোচনার আভাস দিয়াছি, তাহার সুর 'সানাই' ও 'নবজাতক'এর কয়েকটি কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়— কেবল 'প্রহাসিনী' ও 'ছড়া'র মধ্যেই নহে। 'অস্পষ্ট'র মধ্যে অবচেতনার আমেজ স্পষ্টই। জীবনের অনেক কিছুই থাকিয়া যায় অস্পষ্ট। তবুও মানুষ বৃথাই সমস্তকেই স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল—

চেতনার জালে এ মহাগহনে
বস্তু যা-কিছু টিঁকিবে,
সৃষ্টি তারেই স্বীকার করিয়া
স্বাক্ষর তাহে লিখিবে।
তবু কিছু মোহ, কিছু কিছু ভুল

১ দূরের গান ; উদয়ন, শান্তিনিকেতন, ২২ ফাল্গুন ১৩৪৬ (৬ মার্চ ১৯৪০)। সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, সানাইয়ের প্রথম কবিতা।

২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্র-শতবার্ষিকী .. [মন্দিরে পঠিত অভিভাষণ], প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ ৫-৭।

৩ অস্পষ্ট ; উদয়ন, শান্তিনিকেতন, ২৭ মার্চ ১৯৪০। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ২৯।

জাগ্রত সেই প্রাপণার
প্রাণতন্তুতে রেখায় রেখায়
রঙ রেখে যাবে আপনার।
এ জীবনে তাই রাত্রির দান
দিনের রচনা জড়ায়ে
চিন্তা-কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব
রয়েছে ছড়ায়ে ছড়ায়ে।
বুদ্ধি যাহারে মিছে বলে হাসে
সে যে সত্যের মূলে
আপন গোপন রসসঞ্চারে
ভরিছে ফসলে ফুলে।
অর্থ পেরিয়ে নিরর্থ এসে
ফেলিছে রঙিন ছায়া—
বাস্তব যত শিকল গড়িছে,
খেলেনা গড়িছে মায়া।

'অস্পষ্ট' ও 'জবাবদিহি' (নবজাতক) পর-পর দিন রচিত কবিতা। 'জবাবদিহি'র দিনে 'আসা-যাওয়া' ও 'জ্যোতির্বাষ্প' (সানাই) লিখিত বলিয়া তারিখ দেওয়া আছে। দোলের পরদিন লিখিলেন জবাবদিহি।[1] আপাতদৃষ্টিতে একটি হালকা ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উহা রচিত, যেমন হালকাভাবে রচিত 'অস্পষ্ট' কবিতাটি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কবির জীবন-জিজ্ঞাসার একটি গভীর ইঙ্গিত মেলে। মৃত্যু বা 'কালো রঙ'কে অথবা বিস্মৃতিকে কবি 'সৃষ্টির প্রতিকূলে' চরম বিনাশ রূপে দেখিতেছেন না—

সকাল বেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি
কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা,
কালো এসে আজ লাগালো বুঝি
শেষ প্রহরে রঙহরণের পালা।
ওরে কবি, ভয় কিছু নেই তোর—
কালো রঙ যে সকল রঙের চোর।
জানি যে ওর বক্ষে রাখে তুলি
হারিয়ে-যাওয়া পূর্ণিমা-ফাল্গুনী—
অস্তরবির রঙের কালো ঝুলি,
রসের শাস্ত্রে এই কথা কয় শুনি।
অন্ধকারে অজানা-সন্ধানে
অচিন লোকে সীমাবিহীন রাতে

১ জবাবদিহি, ২৮ মার্চ ১৯৪০। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৩৯।

রঙের তৃষা বহন করি প্রাণে
চলব যখন তারার ইশারাতে,
হয়তো তখন শেষ বয়সের কালো
করবে বাহির আপন গ্রন্থি খুলি
যৌবনদীপ— জাগাবে তার আলো
ঘুমভাঙা সব রাঙা প্রহরগুলি।
কালো তখন রঙের দীপালিতে
সুর লাগাবে বিশ্ব-সংগীতে।

সেইদিনই (২৮ মার্চ) লেখেন আসা-যাওয়া।[১]

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।

সেইদিনই লিখিত জ্যোতির্বাষ্প[২] কবিতায় যে কথাটি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা আদৌ অস্পষ্ট নহে—

অনন্তের সমুদ্রমন্থনে
গভীর রহস্য হতে তুমি এলে আমার জীবনে।..
জ্যোতির্ময় বাষ্প-মাঝে দূরবিন্দু তারাটিরে হেরি।

এই দূরবিন্দু তারা আমাদের পরিচিতা— বারে বারে নানা ভাবে কাব্যে গীতে সংলাপে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে

নবজাতক ও সানাই -এর পর্ব

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে লিখিত অথচ কোনো কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয় নাই এ-শ্রেণীর বহু কবিতা জমিয়া উঠিয়াছে। কবির ইচ্ছা সেগুলি আগামী জন্মদিনে একখানি কাব্যখণ্ডে প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৩৩৯ হইতে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত লিখিত কবিতাগুলি জড়ো করিয়া দেখা গেল, সেগুলি এমন বিচিত্র ভাবের যে, একটি কাব্যখণ্ডে প্রকাশিত হইলে উহার কোনো রূপই ফুটিয়া উঠিবে না। কবিকে এইটি দেখাইলেন অমিয় চক্রবর্তী। অমিয়চন্দ্র যে কবিতাগুলি বাছিয়া দিলেন তাহা দুইখানি কাব্যে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। নির্বাচিত কবিতাগুলির মধ্যে তেমন ভাবিক যোগ নাই; উভয় কাব্যের মধ্যেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য যে আছে, নামেই তাহার প্রকাশ। এই কাব্য দুইখানির একটি 'নবজাতক' অপরটি 'সানাই'।[৩] নবজাতক প্রকাশিত হইল ১৩৪৭এর বৈশাখ মাসে। 'কবিতা'র সমালোচক বলিতেছেন যে কবির এই নূতন কাব্যগ্রন্থের নামকরণ ইঙ্গিতময়। সম্প্রতি তাঁহার কাব্যে মৃত্যু অনেকখানি প্রাধান্য পাইয়াছিল, এই কাব্যখণ্ডে মৃত্যু গিয়াছে দূরে। "প্রান্তিকে দেখেছি কবিকে অন্ধকারের ভীষণ শক্তির সঙ্গে যুঝতে, এবারে

১ আসা-যাওয়া; কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৭। সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৭০।
২ জ্যোতির্বাষ্প; দেশ, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৭। সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৭৩।
৩ দ্র কবিকথা, পৃ ৫৭-৫৯।

হার হয়েছে অন্ধকারের, নতুন সূর্যোদয় দিগন্তে। তাঁরই অনুপম ভাষা চুরি ক'রে বলতে হয় যে তিনি চিরজীবিত, তাই তিনি বার বার নবজাতক।"[১] নবজাতকের 'শেষ কথা'[২] কবিতাটি ভূমিকা বা সূচনা লেখার (৪ এপ্রিল) একই দিনে রচিত—

এ ঘরে ফুরালো খেলা,
এল দ্বার রুধিবার বেলা।..
জানি না, বুঝিব কি না প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না, এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি, শিল্পীকবি।

নবজাতকের সূচনায় কবি বলিয়াছেন যে তাঁহার "কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে।..কাব্যে এই যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক"..কিন্তু "কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমঝদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে।" এই সমঝদার হইতেছেন অমিয় চক্রবর্তী, যিনি কবির সমসাময়িক কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক্ করিয়া দেন। কবি লিখিতেছেন, অমিয়চন্দ্র "হয়তো দেখেছিলেন, এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।"

কিন্তু মন এই মননজাত খোরাক পাইতেছে না বলিয়া তাঁহার আপসোস। অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন (৩১ মার্চ ১৯৪০), "আমার মুশকিল, আমার দেহ ক্লান্ত, তার চেয়ে ক্লান্ত আমার মন; কেননা মন স্থাণু হয়ে আছে, চলাফেরা বন্ধ— তুমি থাকলে মনের মধ্যে স্রোতের ধারা বয়— তার প্রয়োজন যে কত তা আশপাশের লোকে বুঝতে পারে না।"[৩] এ-কথা অতি সত্য। কারণ কবির মনকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারে আর-একটি মন্ যাহার মননশক্তি সক্রিয়, যে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে, তর্কের দ্বারা, বিচারের দ্বারা চেতনাকে উত্তেজিত করিতে পারে— অমিয়চন্দ্র সেই শ্রেণীর ভাবুক; আধুনিক জগতের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া তিনি কবির মনের ঠিক খোরাকটি জোগান দিতে পারিতেন— 'আশপাশের লোকে' বুঝিতে পারে না কবির মন কী চায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী সবটাই কবিমানসের ইতিহাস নহে; শান্তিনিকেতনে 'অসম্ভব ভিড়ের আক্রমণ নিরবচ্ছিন্ন চলছে'—[৪] যাহার প্রধান কেন্দ্র কবি। বিশিষ্টদের মধ্যে আওয়াগড়ের মহারাজা ও সুরগুজার মহারাজা আসিয়াছেন; এই-সব অতিথির আগমনে কবিকে স্বভাবত বিব্রত হইতে হয়। আওয়াগড়ের মহারাজা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "উনি অত্যন্ত সাদা মানুষ— ওঁর থাকার মধ্যে কোনো ভার নেই।"[৫]

১ কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃ ৪৪।

২ শেষ কথা; উদয়ন, শান্তিনিকেতন, ৪ এপ্রিল ১৯৪০। নবজাতক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৬৩।

৩ কবিতা, আষাঢ় ১৩৫১।

৪ তুলনীয়, চিঠিপত্র ৫, পত্র ১৩২, ১০ জানুয়ারি ১৯৪০। "আগন্তুকের বিষম ভীড়, প্রাণ বেরিয়ে গেল। কাজকর্ম ক্ষতবিক্ষত, অকাজ ধরাশায়ী।"

৫ এই সময়ে আওয়াগড়-ভবনের নির্মাণকার্য শুরু হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বিশ্বভারতীকে এই অট্টালিকা দানপত্র করিয়া দেন।

জীবনের ভার যখন গুরু, দেহ যখন জরাগ্রস্ত, মন যখন প্রকাশ-অনুকূলতার অভাবে ক্ষণে ক্ষণে শুষ্ক হয়, তখন কবিচিত্ত আপনার অন্তর্বেদনাকে শমিত করিবার চেষ্টা করে হাস্য-উপহাসে। গাণিতিক নিয়মে curveএর মতন যেন ইহার গতিরেখা— কঠোর মননজাত কবিতা বা আত্মানুভূত রস-উদ্‌বেলিত গানের ধারার পরে এই বক্ররেখাগতির পথে হাসির পাথেয় খুঁজিয়া পান। তাই 'জীবনের রস আজ মজ্জায়' রসপ্রলাপ জাগায় ক্ষণে ক্ষণে। সে রসপ্রলাপ কখনো 'প্রহাসিনী'র কৌতুকহাস্যে, কখনো ছড়ার প্রলাপে ব্যক্ত। এই-সব ছড়া হালকাভাবের মুক্তশৃঙ্খল কল্পনায় পূর্ণ, দায়িত্বহীন আনন্দকোলাহলে মুখর। শব্দের যোজনায়, বাক্যের বুননে, ছন্দের রননে বিচিত্র, অদ্ভুত রূপসৃষ্টিতে মন বল্‌গাহারা। কবির এই 'ছড়া'র সূত্রপাত হয় 'খাপছাড়া' ও 'সে'র মধ্যে। তার পর 'ছড়ার ছবি' 'প্রহাসিনী'র মধ্য দিয়া চলে হাসি ও গল্পের কবিপ্রলাপ, 'গল্পসল্পে' তার শেষ। 'ছড়া' কাব্যখণ্ডের কবিতাগুলি লেখেন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে।[১] কালিম্পঙে শেষ অসুস্থতার পরেও লেখেন দুইটি। এই ছড়াগুলির উদ্‌ভব কোথায় তাহার বিশ্লেষণ নিজেই করিয়াছেন 'ছড়া'র ভূমিকায় (২১ পৌষ ১৩৪৭। ৫ জানুয়ারি ১৯৪১)

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে,
কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি
যে-মুহূর্তে থামে,
এলোমেলো ছিন্নচেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানি নে কোন্ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত—
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ—
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি,
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।...
পষ্ট আলোর সৃষ্টি-পানে
যখন চেয়ে দেখি

১ 'ছড়া'র তালিকা : ১. ২০ জানুয়ারি ১৯৪০, উদীচী, ছড়া ৮ ; ২. ১৭ ফেব্রুয়ারি, উদয়ন, 'শ্রাদ্ধ', প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৬, ছড়া ৬ ; ৩. ১৮ ফেব্রুয়ারি, উদয়ন, 'মামলা', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭, ছড়া ৪ ; ৪. ৭ মার্চ, উদয়ন, ছড়া ১০ ; ৫. ৯ মার্চ, উদয়ন, 'পরিস্থিতি', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭, ছড়া ৩ ; ৬. ১৭ মার্চ, উদয়ন, 'রবিবারী সংস্করণ' বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৪৭, ছড়া ৯ ; ৭. এপ্রিল-মে, মংপু, ছড়া ২ ; ৮. ১৫ মে, কালিম্পং, ছড়া ১ ; ৯. ২০ অগস্ট, উদীচী, 'চলচ্চিত্র', শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৭, ছড়া ৫ ; ১০. ১০ নভেম্বর, পুনশ্চ, ছড়া ৭ ; ১১. ৫ ডিসেম্বর, উদয়ন, ছড়া ১১ ; ১২. ৫ জানুয়ারি ১৯৪১, উদয়ন, ছড়া (ভূমিকা)। ১০, ১১, ১২ -সংখ্যক অথবা 'ছড়া'র ৭, ১১ ও ভূমিকা লিখিত হয় শেষ অসুস্থতার পর। দ্র 'ছড়া'র সমালোচনা, বুদ্ধদেব বসু, কবিতা, কার্তিক ১৩৪৮। ছড়া, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬।

মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কি।

মংপুতে শেষ বাস-কালে (২১ এপ্রিল - ৭ মে ১৯৪০) একদিন বলিয়াছিলেন[১], "আজ আমায় পাগলামিতে পেয়েছে। যা রোদ উঠেছে, কবির মাথায় মিলগুলোকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে মিলের স্কন্ধে চেপে।" সেদিন লেখেন (ছড়া ২)—

কদমাগঞ্জ উজাড় করে আসছিল মাল মালদহে,
চড়ায় প'ড়ে নৌকাডুবি হল যখন কালদহে

এই ধরণের হঠাৎ-আসা অর্থহীন ছন্দদোলা সম্বন্ধে ভূমিকায় বলিয়াছিলেন—

খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী-সব
ডুবছে এবং ভাসছে—
ওরা কী-যে দেয় না জবাব,
কোথা থেকে আসছে।

পণ্ডিতেরা বলেন, অবচেতন বা মনের অজ্ঞাত গহন হইতে অসংলগ্ন ছড়া, কবিতার জন্ম হয়। এ-সব তত্ত্ব তাঁহার অনেক জানা ছিল তাই লিখিলেন, "অবচেতনমনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম।.. কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।"[২]

'নবযুগের কাব্যে'র[৩] বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, শোনা যাইতেছে "এখনকার কবিতা অবচেতন তত্ত্বে-পাওয়া কবিতা। অবচেতন মনের লীলা খাপছাড়া অসংলগ্ন। অর্থের সংগতি ঘটায় যে-মন সে সেখানে অনেকখানি ছুটি নিয়েছে।" কবির মতে "অবচেতনী কল্পনার অসংলগ্নতার আঙ্গিক কাব্যে ব্যবহার করা চলতে পারে যদি ঠিকমত তার ব্যবহার হয়। যদি এই প্রণালীতে বিশেষ একটা ছবি ফুটে ওঠে, বিশেষ একটা রস জাগে মনে। কাব্যের এই বিশেষত্বকে উপেক্ষা করা চলবে না।

"অবচেতন মন যা-তা আঁকজোক পাড়ে, কিন্তু রেখা রঙের সমন্বয় ক'রে ছবি আঁকে না। হাল আমলের কবি হয়তো পণ করেন আঁকজোক কিছুই বাদ দেব না, তাতে যেখানে সেখানে নানা আঁচড়ে ছবির ঐক্যকে যদি অস্পষ্ট করে দেয় সেও স্বীকার। এটা খানিকটা বিজ্ঞানীবুদ্ধি। বিজ্ঞান আর্টের মতো শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়— যা-কিছু আছে তাদের সমান দাম দিয়ে মেনে নেবার দিকে তার ঝোঁক। আর্টের মধ্যে আছে সম্ভোগের দাবি, আর সায়ান্স সব-কিছুকে নির্বিচারে টেনে আনে। আধুনিক যুগের প্রকাশতত্ত্বে আছে এই দুয়ের মিল।"

আধুনিক নবীন কবিদের মধ্যে অমিয়চন্দ্র বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রপরিবেশের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও তিনি তাঁহার কাব্যসাধনায় অনুকারক-শ্রেণী-ভুক্ত হন নাই। অমিয়চন্দ্র কবিকে তাঁহার নবপ্রকাশিত 'খসড়া' ও 'একমুঠো' নামে কাব্য দুইখানি পাঠাইয়াছিলেন। এই কাব্য দুইখানিকে আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'নবযুগের কাব্য'[৪] নামে প্রবন্ধটি লেখেন। ইতিপূর্বে অমিয়চন্দ্রের 'চেতন স্যাকরা' নামে কবিতাটি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ মংপু হইতে অমিয়চন্দ্রকে এক পত্র লিখিয়া অভিনন্দিত করেন। কবি বলিতেছেন, "আমার সম্পর্কীয় একটা

১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, এপ্রিল ১৯৪৩, পৃ ২৫২।
২ অবচেতনায় অবদান, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, পৃ ২৯৫।
৩ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৬, পৃ ৭৩৬-৪২ ; দ্র সাহিত্যের স্বরূপ।
৪ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৬, পৃ ৭৩৯-৪০।

অপবাদ শুনেছি যে আমার নিজের ছাঁদের কবিতা ব্যূহ বেঁধে আছে বাংলাসাহিত্যকে ঘিরে। তারি বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অসহিষ্ণুতা প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। সে বিদ্রোহ জয়ী হোক্ এ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। তাই আমি আনন্দ পেয়েছি অমিয়চন্দ্রের কাব্যে তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে।"

এন্‌ড্রুজের মৃত্যু

কবির দিন এইভাবে কাটিতেছে। এমন সময়ে খবর আসিল (৫ এপ্রিল ১৯৪০) কলিকাতায় এন্‌ড্রুজের মৃত্যু হইয়াছে। কিছুকাল হইতে তাঁহার শরীর খারাপ হইতেছিল, অবশেষে ২৭ জানুয়ারি কলিকাতায় Riordam Nursing Home -এ তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সেইখানেই মৃত্যু হয়।[১]

সেদিন মন্দিরে উপাসনায় কবি এন্‌ড্রুজের কথা বলেন।[২] জীবনে তিনি তাঁহার কাছে কী পরিমাণ ঋণী তাহা গভীর আবেগে প্রকাশ পায় সেদিন। এই খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর নিকট ভারত যে কতভাবে ঋণী তাহার সম্যক্ আলোচনা জাতীয় ইতিহাসের দিক হইতে এখনো হয় নাই। কবি এই দিনের ভাষণে বলেন, "দেখেছি দিনে দিনে নানা উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের কাছে তাঁর অসামান্য আত্মোৎসর্গ।" কবির মুখে কতবার শুনিয়াছি যে তাঁহার বন্ধুভাগ্য নাই; তবে একমাত্র বন্ধু যাঁহার উপর তিনি নির্ভর করিতে পারেন তিনি এন্‌ড্রুজ। আমরাও এই খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, খ্রীষ্টের বাণী ইঁহার জীবনে সফল হইয়াছে। দেশাত্মবোধ জাত্যভিমান প্রভৃতির ঊর্ধ্বে যে এমনভাবে উঠা যায়, তাহা এ-মানুষকে যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। অন্যযুগে জন্মগ্রহণ করিলে ইঁহাকে খ্রীষ্টীয় সমাজ 'সেন্ট' বা সাধু আখ্যা দিত।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্‌ডে কবির সহিত এন্‌ড্রুজের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তার পর এই দীর্ঘকাল (২৮ বৎসর) তিনি আশ্রমের সহিত নানা ভাবে যুক্ত ছিলেন; কবি ইঁহাকে বিশ্বভারতীর অন্যতম উপাচার্য মনোনয়ন করেন। তবে এন্‌ড্রুজ যে কেবল রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীরই সহিত যুক্ত ছিলেন তাহা নহে; তিনি শ্রমিক-আন্দোলন এবং বিশেষভাবে বিদেশে ভারতীয় শ্রমিকসমস্যা ও মহাত্মাজির স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে বরাবরই একাত্ম ছিলেন। মানুষের দুঃখ ও যে-কোনো পরাধীন জাতির বন্ধন-মুক্তি-দান ছিল তাঁহার জীবনের আকাঙ্ক্ষা। তজ্জন্য কী কষ্ট কী লাঞ্ছনাই না ভোগ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথকে এন্‌ড্রুজ কী চক্ষে যে দেখিতেন তাহার সম্যক্ আলোচনা হয় নাই; অসংখ্য পত্র, ভাষণ ও রচনার মধ্যে কবির প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্‌ডের সাদাম্‌প্‌টন হইতে এন্‌ড্রুজ যাহা লিখিয়াছিলেন (২০ মার্চ ১৯৩৬) তাহা এখানে উদ্‌ধৃত করিলে পাঠক বুঝিবেন রবীন্দ্রনাথ এন্‌ড্রুজের জীবনে কী পরিবর্তন আনিয়াছিলেন— "Twentyfive years ago, my whole heart was given to the poet Rabindranath Tagore, and it has remained with him ever since. He has been my Gurudeva, teaching me to understand and love humanity in the East no less than I had

১ অস্ত্রোপচারের প্রাক্‌কালে এন্‌ড্রুজ অমিয় চক্রবর্তীকে যে পত্র লেখেন তাহার তর্জমা, দ্র প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ ১২০।

২ দীনবন্ধু এন্‌ড্রুজ, ৫ এপ্রিল ১৯৪০, শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত ও শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -কর্তৃক অনুলিখিত, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ ১২৮-৩১। দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অমিয়চন্দ্রের পত্র, পুরী ৬.৪.৪০; প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ ১০৩।

learnt in earlier years, to love it in the West. By his love and patience he broke down within me the narrow barriers of religious tradition which had confined me before owing to my birth, upbringing and education. Nothing but friendship so deep and sincere as his could have effected this. Now looking back after a quarter of a century, I can say with truth that this friendship has grown stronger as the years have passed and has remained steadfast throughout. It has been a supreme treasure in my life ; the greatest gift God has given me in human ways".[১]

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে এন্‌ড্রুজ মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি ১৯৪০) ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বে[২] উদ্‌ধৃত করিয়াছি।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য কী উদ্‌বেগ। এ শুধু ভারতের জন্য নহে। ইনি মহাত্মাজির অসহযোগ আন্দোলন মনেপ্রাণে সমর্থন করেন, কিন্তু খিলাফত আন্দোলনকে বরদাস্ত করিতে পারেন নাই ; কারণ তাহার দ্বারা মুসলিম-জগতের উপর তুর্কীর সুলতানের আধিপত্য কায়েম করা হইত। পৃথিবীর কোনো জাতি কাহারও অধীন থাকে এই ভাবনা এন্‌ড্রুজের ছিল অসহ্য।

জবহরলাল নেহরু তাঁহার আত্মজীবনীতে এন্‌ড্রুজ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"C. F. Andrews wrote a pamphlet advocating independence for India. I think it was called *Independence— the Immediate Need.* This was a brilliant essay based on some of Seeley's writings on India, and it seemed to me not only to make out an unanswerable case for independence but also to mirror the inmost recesses of our hearts .. It was wonderful that C. F. Andrews, a foreigner and one belonging to the dominant race in India, should echo that cry of our inmost being .. Andrews had written that 'the only way of self-recovery was through some vital upheaval from within. It could not come through loans and gifts and concessions and proclamations from without. It must come from within.' Therefore, it was with the intense joy of mental and spiritual deliverance from an intolerable burden, that I watched the actual outlook of such an inner explosive force, .. when Mahatma Gandhi spoke to the heart of India the *mantram*—'Be free ! Be slaves no more !' and the heart of India responded. In a sudden movement her fetters began to be loosened, and the pathway of freedom was opened". (Pp 66-67)।

মৃত্যুর চারি মাস পূর্বে কবি নববর্ষের দিন যে ভাষণ[৩] দান করেন তাহাতে এন্‌ড্রুজ সম্বন্ধে তাঁহার শেষ অভিমত ব্যক্ত করেন—"আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। .. দৃষ্টান্তস্থলে এন্‌ড্রুজের নাম করতে পারি, তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খ্রীষ্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব

১ *Visva-Bharati News*, May-June 1936, p 88। ২ রবীন্দ্রজীবনী ৩, পৃ ৯২-৯৩।
৩ সভ্যতার সংকট, ১ বৈশাখ ১৩৪৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬।

আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। . . তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই [ইংরেজ] জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে।"

মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "একদিন দুপুর বেলা কথা উঠল এন্‌ড্রুজ সাহেবের। তার অল্পদিন পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সুধাকান্তবাবু 'দেশ' পত্রিকায়[১] একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই আমার হাতে কাগজটা দিয়ে বললেন, "পড়ে দেখো। ভালো লিখেছে . . সমস্ত মানুষটি ফুটে উঠেছে। পড়তে পড়তে মনে পড়তে লাগল তাকে। সকাল বেলা এসেই গুরুদেব ব'লে জড়িয়ে ধরত। কী অকৃত্রিম আশ্চর্য ভালবাসাই ছিল তার। কত করেছে আমাদের জন্য, কী অজস্র পরিশ্রম নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ভাবে, অথচ তার জন্য এতটুকু গর্ব নেই। যথার্থ ক্রিশ্চান। অথচ প্রথম দিকে আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ ওকে সন্দেহ করেছে ক[illegible]ম, সে সব কথা ওর কানেও গেছে। জলভরা চোখে শান্তিনিকেতনের মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে।" বলতে বলতে ওঁর গলা ধরে এলো, বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলেন। "কেবল মনে পড়ে সেই লাল ধুলোয় ধূসর জামা কাপড়, ধুতি খুলে খুলে পড়ছে, কোনোমতে সামলে সামলে চলেছে সন্ন্যাসী'।"[২]

এন্‌ড্রুজের মৃত্যু-সংবাদ যখন আসিল তখন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মৃত্যুশয্যায়। বর্ষশেষের দিন (১৩ এপ্রিল ১৯৪০) ইন্দিরা দেবীকে কবি যে পত্রখানি লেখেন তাহাতে তাঁহার মনের দেহের ও পারিপার্শ্বিকের সংবাদগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুস্পষ্ট। তিনি লিখিতেছেন, "সুরেনের জন্যে মন কী রকম উদ্বিগ্ন হয়ে আছে তা বলে উঠতে পারি নে। . . আমার নিজের শরীর একটুও ভালো নেই— প্রায়ই জ্বর হয়। আর অহোরাত্র থাকে সেই জ্বরের দুর্বলতা। কাজ করবার শক্তি কমেছে, রুচিও নেই, অথচ এত কাজের আক্রমণ এর আগে আর কখনো মনে পড়ে না। বয়স যতই বাড়ছে মন যতই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে জরায়, নিরবকাশ ততই নীরন্ধ্র হয়ে উঠচে। আমার কাজের সঙ্গে এত

১ এন্‌ড্রুজ-স্মৃতি, শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী, দেশ, বৈশাখ ১৩৪৭ ; দ্র প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭, পৃ ২২২-২৩।

এন্‌ড্রুজের মৃত্যুর পাঁচদিন পরে এই গানটি লিখিত (২৮ চৈত্র ১৩৪৬। ১০ এপ্রিল ১৯৪০)—

প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে।
তাই স্বপ্ন মনে হল তারে—
দিই নি তাহারে আসন।
বিদায় নিল যবে, শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে,
সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন,
নিশীথতিমিরে বিলীন—
দূরপথে দীপশিখা, রক্তিন মরীচিকা।

—গীতবিতান (২য় সং) পৃ ৯০০।

এন্‌ড্রুজের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য আয়োজন চলিতে লাগিল : মহাত্মাজি এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেন। যে টাকা উঠিল তাহা দ্বারা বিশ্বভারতীতে খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতি চর্চার জন্য 'দীনবন্ধুভবন' খোলা হইয়াছে। এ ছাড়া শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মধ্যে Andrews Memorial Hospital-এর ভিত্তিপ্রস্তর মহাত্মাজি প্রোথিত করেন (১৯৪৫)। কিন্তু সে স্মৃতিমন্দির এখনো নির্মিত হয় নাই এবং খ্রীষ্টধর্মালোচনার ব্যবস্থাও হয় নাই। শোনা যাইতেছে বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় সেই গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করিতেছেন। Miss Marjorie Sykes, *Life of C. F. Andrews* লিখিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে বানারসী দাস চতুর্বেদী হিন্দিতে একখানি জীবনী লেখেন। মিস্ সাইক্‌স্ ইহার সহায়তায় ইংরেজি বইখানি লেখেন। বানারসী দাস বহুকাল এন্‌ড্রুজের সহকারী রূপে আশ্রমে ছিলেন। বহির্ভারতে ভারতীয়দের অবস্থার বিষয়ে ইনি এককালে অনেক কাজ করেন। মিস্ সাইক্‌স্ জুলাই ১৯৩৯ হইতে Society of Friends -এর অর্থানুকূল্যে আশ্রমে অধ্যাপিকা রূপে নিযুক্ত হন। বর্তমানে ইনি দক্ষিণ-ভারতে তামিলী সংঘের সহিত যুক্ত। এন্‌ড্রুজের আত্মজীবনী *What I owe to Christ* (1932) বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'ঋণাঞ্জলি' নামে (১৯৬০)। এই গ্রন্থের ভূমিকারূপে এন্‌ড্রুজের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক ভারতীয়ের পাঠ করা আবশ্যক— কিভাবে অতি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান পরিবারে, খ্রীষ্টানী পরিবেশে লালিত ও বর্ধিত হইয়া তিনি খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান ভেদ ভুলিয়াছিলেন এবং সমস্ত পীড়িত মানবের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (১৯৪৩), পৃ ২৯১।

লোকের দায়িত্ব জড়িত যে অস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে তাকে সরিয়ে রাখতে পারি নে।

"কিন্তু আমারো তো যাবার সময় হয়ে এসেছে— কোনো কিছুর জন্যে পরিতাপ করবার সময় নেই জানি, তেমনি আর সময় নেই কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি নেবার।.. এইজন্যে দুর্বল স্বাস্থ্যের কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনের অস্বচ্ছ আলোয় ঝুঁকে পড়ে কাজ করে চলেছি।.. কিন্তু কী হবে নালিশ করে আর কতদিনকারই বা মেয়াদ। এতদিন পরে সুরেনকে যদি হারাতেই হয় তা হলে আমার পক্ষে সান্ত্বনা এই থাকবে যে তার বিচ্ছেদ বেশি জায়গা পাবে না নিজেকে বিস্তীর্ণ করবার জন্যে।"[১]

কয়েকদিন পরে রথীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, "বুঝতে পারচি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে সুরেন পেরে উঠবে না। এত কষ্টও পাচ্ছে। নানা রকম কষ্টের ভিতর দিয়ে ওর জীবনটা গেল। অমন মানুষের ভাগ্যে এত কষ্ট ঘটতে পারে এ কথা ভাবলে অত্যন্ত ধিক্কার জন্মায় বিশ্ববিধানের উপর। মনটার ভিতর বৃথা ছটফট করতে থাকে।"[২]

মংপু-কালিম্পঙে

শান্তিনিকেতনে নববর্ষ-দিনে (১৩৪৭) রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন-উৎসব পালিত হইল।[৩] এতদুপলক্ষে চীন হইতে মার্শাল চিয়াংকাইশেক শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন ও চীনের শিক্ষামন্ত্রী Chien Li-fu কবির উদ্দেশে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান। কবি উৎসবক্ষেত্রে, তাঁহার জীবনে কী চাহিয়াছিলেন এবং কী করিয়াছেন, তাহার মনোজ্ঞ এক বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার ধ্যানজীবন ও ভাবময় জীবনের সহিত কর্মজীবনের যোগ হইয়াছে কি না সে কথা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, কর্মের সঙ্গে তাঁহার যোগ যে হইয়াছে তাহার প্রমাণ শান্তিনিকেতন। "কিন্তু সে লোহালক্কড়ে বাঁধা যন্ত্রশালার কর্ম নয়, কর্মরূপে সেও কাব্য। আমার মনে যে সজীব সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত ক'রে। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের স্থান দিতে চেয়েছি।" শান্তিনিকেতনে "যেমন আহ্বান করেছি প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যোগ, তেমনি একান্ত ইচ্ছা করেছি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে অন্তঃকরণের যোগ করে তুলতে। কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে অন্তঃকরণের যোগধারা কৃশ হয়ে ও'ঠ সেখানে নিয়ম হয়ে ওঠে একেশ্বর। সেখানে সৃষ্টিপরতার [creation] জায়গায় নির্মাণপরতা [construction] আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমশই সেখানে যন্ত্রীর যন্ত্র কবির কাব্যকে অবজ্ঞা করবার অধিকার পায়।.. যেখানে বহু লোককে নিয়ে সৃষ্টি সেখানে সৃষ্টিকার্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্ভব হয় না। মানবসমাজে এইরকম অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক তপস্যা সাম্প্রদায়িক অনুশাসনে মুক্তি হারিয়ে পাথর হয়ে ওঠে। তাই এইটুকু মাত্র আশা করতে পারি যে ভবিষ্যতে প্রাণহীন দলীয় নিয়মজালের জটিলতা এই আশ্রমের মূলতত্ত্বকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেবে না।"

আশ্রমের প্রথম-অবস্থায় ইহার স্বরূপ কী ছিল তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন, "উপকরণবিরলতা ছিল এর বিশেষত্ব। সরল জীবনযাত্রা এখানে চারদিকে বিস্তার করেছিল সত্যের বিশুদ্ধ স্বচ্ছতা। খেলাধুলায় গানে অভিনয়ে ছেলেদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অবারিত হত নবনবোন্মেষশালী আত্মপ্রকাশে। যে শান্তকে শিবকে অদ্বৈতকে ধ্যানে অন্তরে আহ্বান করেছি তখন তাকে দেখা সহজ ছিল কর্মে।.. অল্প যে কয়জন শিক্ষক ছিলেন আমার সহযোগী তাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন.. এই অক্ষর পুরুষে আকাশ ওতপ্রোত। তাঁরা বিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারতেন.. সেই এককে

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮১, বর্ষশেষ, চৈত্র ১৩৪৬; ১৩ এপ্রিল ১৯৪০, শান্তিনিকেতন।

২ চিঠিপত্র ২, মংপু, ২৫ এপ্রিল ১৯৪০।

৩ জন্মদিন, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭, পৃ ১৪৭-৫২।

জানো, সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মস্থেব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে নয়— মানবপ্রেমে, শুভকর্মে, বিষয়-বুদ্ধিতে নয়,— আত্মার প্রেরণায়। এই আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তখনকার দিনকৃত্যের অর্থদৈন্যে ছিল ধৈর্যশীল ত্যাগধর্মের উজ্জ্বলতা।" কবি তাঁহার এই আশি বৎসরের আয়ুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া শান্তিনিকেতনের অন্তরের কথাটি সেদিন বলিলেন; আশ্রম সম্বন্ধে ইহাই তাঁহার শেষ ভাষণ।

এই ভাষণের আরম্ভভাগে প্রকৃতির মধ্যে বিশেষকে বিশেষভাবে রূপ দিবার যে প্রবর্তনার কথা তুলিয়াছেন তাহার নাম দিয়াছেন 'স্বাভাবিকী বলক্রিয়া' [natural forces ?]। কয়েকদিন পরে মংপুতে 'প্রথম প্রৈতি' নামে যে কবিতা লেখেন সেইটি এই ভাষণের এই অংশের বার্তিক বলিতে পারা যায়।[১]

কবির প্রশ্ন এই যে, ক্ষণিকের জন্য বুদ্‌বুদের মতো আমরা ভাসিয়া উঠিতেছি অসীম কালের প্রবাহের মধ্যে— কোথা হইতে ইহার উদ্‌ভব ? বিরাট অসীম এক বিশ্বসত্তা যেন এতটুকু এতটুকু কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে বাঁধিতেছে এবং আপনাকে খুলিতেছে।

জন্মোৎসবের তিন দিন পরে (১৭ এপ্রিল) কবি কলিকাতায় গেলেন— কালিম্পং যাইবেন। কলিকাতায় তাঁহাকে Calcutta Builders Stores Ltd -এর Trust House উন্মোচন করিতে হইল (১৯শে)। এই ব্যবসায়ের মালিক যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যৌবনে বরিশাল হইতে আসেন ও কাঠের ছোটোখাটো কাজের ঠিকা লইয়া সামান্যভাবে ব্যবসায় শুরু করেন (১৯১৭)। তার পর নিজ নিষ্ঠাবলে তিনি বিরাট কর্মশালার ও প্রভূত ধনের অধিকারী হন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পূর্ব বৎসর (২৬ জানুয়ারি ১৯৩৯) ইঁহার কারখানাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করেন; এবার গৃহদ্বার[২] উন্মোচন করিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পরদিন (২০ এপ্রিল ১৯৪০) কবি কালিম্পং যাত্রা করিলেন; পূর্বদিন পীড়িত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শেষবারের মতো দেখিয়া আসিয়াছিলেন।[৩]

কলিকাতায় আসিলে নানা লোক আসেন, দেশের ও দশের নানা সমস্যা লইয়া আলোচনা হয়। কবিও মতামত দিয়া যান। এইরূপ একটি ঘটনা কবিকে অত্যন্ত বিব্রত করে।

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন; দেশের অনেক কথা তাঁহার সহিত হয়। এই দীর্ঘ কথোপকথনে স্বদেশীযুগের বাংলাদেশ, সোভিয়েট দেশ, সাম্প্রতিক রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া অবশেষে কবি বলেন, "এই আমাদের দেশ, এ দেশের কোন্ সফল কীর্তি আমরা আশা করতে পারি ? আদুরে ছেলের মতো আমরা আব্দারের ঠোঁট ফুলিয়ে ভাঙবার কাজেই আছি। গড়ার কাজ ধৈর্যের— পুরুষের। আমাদের দিয়ে তার কোনোটা হল না। শুধু মেয়েলি নালিশ— ওরা দিলে না এই অধিকার; সুতরাং কান্না শুরু করো, অলক্ষ্যে মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ো। নিজেরা করব না, কাউকে কিছু করতে দেব না।

"ভারতবর্ষের গ্লানির কেন্দ্র আজ এই বাংলাদেশ। অথচ বাঙালির আর্ত নালিশ অহরহ শোনা যাচ্ছে,— হিংসায় ও ঈর্ষায় তাকে নাকি চেপে মারছে অন্যান্য প্রদেশের সম্মিলিত চেষ্টা, বাঙালির ভালো আজ আর কেউ দেখতে পারে না। এর চেয়ে মিথ্যে নালিশ আর কিছু হতে পারে না। . . এই আমাদের ললাটলিপি। নইলে [রাজনীতির ক্ষেত্রে]

১ দ্র জন্মদিনে, ১১, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ ৭৯-৮০। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ২৬৭।

২ ৩৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা।

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮২, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত। চিঠিপত্র ২, মংপু, ২৪ এপ্রিল ১৯৪০।

যে সুযোগ বাঙালি পেয়েছিল, তেমন সুযোগ জাতির জীবনে কচিৎ আসে। না আসুক, কিন্তু সেদিনের শিক্ষা কি আমাদের কোনো কাজে লেগেছে। যে খোকামি প্রশ্রয় পেয়ে আজ বাংলাদেশের কপিধ্বজ রথের চূড়ায় চ'ড়ে বসেছে, সেই খোকামির স্বরূপ চেনবার শক্তি বাঙালির এতদিনে অর্জন করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় তা হয় নি। বাংলাদেশের আধুনিক পলিটিক্স সেই নিষ্ফলতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথের এই বিবৃতি[১] ১২ বৈশাখ ১৩৪৭ যুগান্তরাদি সমসাময়িক দৈনিকে প্রকাশিত হইলে লোকে অনুমান করিল— কবির এই আক্রমণস্থল সুভাষচন্দ্র; কারণ এই সময়ে তিনি কংগ্রেসবিদ্রোহী, বাংলাদেশের নানা রাজনৈতিক অশান্তি ও উত্তেজনার জন্য লোকে তাঁহাকে দায়ী করিতেছিল। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 'ভারত' দৈনিকে লিখিলেন (১৭ বৈশাখ ১৩৪৭), "বাংলাদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে যে অসাধুতার জয়গীতি চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে . . রবীন্দ্রনাথ তীব্রতম ভাষায় নিজের ব্যথা ও দেশের ব্যথার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।" দাশগুপ্ত মহাশয় লিখিতেছেন যে বারো-চোদ্দ মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে দেশগৌরবের আখ্যা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন-সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহাতে কবির পক্ষে হয়তো তাঁহার সেই মত রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের শেষ ভাগ হইতে বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, কন্‌গ্রেস 'খাদি' ও 'সুভাষী' এই দুইটি দলে ভাগ হইয়া পড়ে। এই ভাগাভাগি নূতন না হইলেও এবার উগ্রভাবে দেখা দিয়াছিল বাংলার রাজনীতিতে। সুভাষচন্দ্র কন্‌গ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর হইতে নূতন দল গঠনে প্রবৃত্ত হন। এখন কলিকাতার ছাত্র ও যুবকদের নেতৃস্থানীয় তিনিই। 'খাদি' বা গান্ধিবাদীদের সহিত বিরোধ প্রায়ই বাধে; শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 'জাতীয়-সপ্তাহে' (৬-১৩ এপ্রিল ১৯৪০) যে চরখা-কাটা বা সূত্রযজ্ঞ চলিতেছিল তাহা নবীনপন্থীদের দৌরাত্ম্যে প্রায় দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে থাকে। মফস্বলেও তাহার তরঙ্গ পৌঁছায়; কবির বাঁকুড়ার বক্তৃতায় এই উচ্ছৃঙ্খলতার তিরস্কার ছিল। ইতিপূর্বে রামগড়ে কন্‌গ্রেস সভামণ্ডপের অনতিদূরে সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় রফাবিরোধী (anti-compromise) সম্মেলন আহূত হয়। মোটকথা কলিকাতায় সুভাষচন্দ্রের অনুকূলে যেমন একটি দল গড়িয়া উঠে, তাঁহার কন্‌গ্রেস-বিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধবাদীর দলও সৃষ্ট হয়। আমাদের পক্ষে সে-সব সমসাময়িক কদর্য ইতিহাস আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। যাহাই হউক, দেশনেতা সম্বন্ধে কবির মত ইংরেজি কাগজেও প্রকাশিত হইলে দেশময় আলোচনা শুরু হইল। এই রচনার জের চলে প্রায় তিন মাস; তার পরে কালিম্পং হইতে ফিরিয়া জুলাই (১৯৪০) -এর গোড়ায় কবি প্রেসে যে বিবৃতি দেন তাহাতে আলোচনা কিছু শুরু হয়; তবে তখন সুভাষচন্দ্র কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। সে বিবৃতি সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

রথীন্দ্রনাথদের কালিম্পঙে আসিতে দেরি থাকায় রবীন্দ্রনাথ অমিয়চন্দ্রকে লইয়া মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীদের বাসায় উঠিলেন (২১ এপ্রিল); এখানে এবার সতেরো দিন থাকিয়া ৭ মে কালিম্পঙে যান।

মংপুতে কবি আনন্দে ও আরামেই থাকেন; আপন মনে কবিতা লেখেন— কখনো লিরিক,[২] কখনো ছড়া। এখানে আসিবার পরদিন এন্‌ড্রুজের একটি ইংরেজি কবিতা অনুবাদ করিলেন— 'পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে'

১ রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি। তাঁহার আশি বৎসর বয়সে বন্ধু-আত্মীয়-মহলে যে-সব কথা বলেন বা মত ব্যক্ত করেন তাহার সবটাই সত্য সত্য প্রকাশ্য কি না, তাহা সেক্রেটারিদের দেখা উচিত ছিল। মুখে এক কথা বলা যায় উত্তেজনার মুহূর্তে, ছাপার হরফে সেই বিবৃতি দাঁড়ায় বিকৃতরূপে। সাংবাদিকদের কাছে কবিসুলভ উত্তেজনায় মতামত ব্যক্ত করিয়া পরে তাহার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন এ ঘটনা একাধিকবার ঘটিয়াছিল।

২ শেষ অভিসার, মংপু, ২৩ এপ্রিল ১৯৪০। সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ১২৬।

(২২ এপ্রিল)।[১] এন্‌ড্রুজের মৃত্যু হইয়াছে মাত্র পক্ষকাল। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে এন্‌ড্রুজের প্রসঙ্গে কথা হয়।[২]

কিছুকাল আগে শান্তিনিকেতনের অন্যতম অধ্যাপক নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী কবিকে ছেলেদের উপযোগী তাঁহার বাল্যকথা লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেইটি মনে করিয়া 'পালকি' ও 'বাল্যদশা' লেখেন গদ্য ছন্দে।[৩] কিন্তু সে ছন্দে যে ছেলেদের বই হয় না, তাহা বুঝিয়া কবি সহজ গদ্যে যাহা লিখিলেন তাহা 'ছেলেবেলা'[৪] নামে সুপরিচিত।

অসম গদ্য ছন্দের সঙ্গে চলে 'ছড়া'। কিছুকাল হইতে মাঝে মাঝে ছড়া লিখিতেছিলেন। একদিন মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেন, "আজ আমায় পাগলামিতে পেয়েছে।.. মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে মিলের স্কন্ধে চেপে।" এতদিন গদ্য ছন্দে লিখিতেছিলেন বলিয়াই বোধ হয় এই কথাটি বলেন। একদিন লেখেন 'ছড়া'র দুই-সংখ্যক কবিতাটি—

কদমাগঞ্জ উজাড় করে
আসছিল মাল মালদহে,
চড়ায় পড়ে নৌকোডুবি
হল যখন কালদহে
তলিয়ে গেল অগাধ জলে
বস্তা বস্তা কদমা যে,
পাঁচ মোহানার কৎলু-ঘাটে
ব্রহ্মপুত্র নদ-মাঝে—[৫]

ছড়া লেখার কারণ, আমাদের মনে হয়, বাল্যস্মৃতির সুখ অনুভূতি।

ইতিমধ্যে তাগিদ আসিয়াছে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ হইতে- রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ড প্রস্তুত হইতেছে— 'চিত্রা' গ্রন্থের জন্য ভূমিকার প্রয়োজন। কবি লিখিলেন সেইটি। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে কবির সহিত এই কাব্য-খণ্ড লইয়া বিস্তর আলোচনা আছে। জানি না এই-সব আলোচনার অভিঘাতে 'প্রৈতি' কবিতার জন্ম হয় কি না।

গম্ভীর ধ্যান-মন্থিত বাণী শুনি 'প্রৈতি' কবিতায় (জন্মদিনে, ১১-সংখ্যক)—

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধরিল কায়া।
সত্তা আমার, জানি না সে কোথা হতে
হল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে।

১ 'পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে', ২২ এপ্রিল ১৯৪০; প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭, পৃ ৭৬৫।

২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ২৯১।

৩ পালকি (২৪ এপ্রিল ১৯৪০) ও বাল্যদশা (২৮ এপ্রিল) দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬৫৬-৬২। 'বাল্যদশা' রচনাটি 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ-মধ্যে (পৃ ২৪১-৪৪) প্রথম পাওয়া যায়।

৪ ছেলেবেলা। ভাদ্র ১৩৪৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬।

৫ কদমাগঞ্জ উজাড় করে। ছড়া ২। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ২৫২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৯।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি নববর্ষের ভাষণের সহিত ইহার ভাব তুলনীয়।

মংপুতে কবির জন্মোৎসবের আয়োজন করিলেন মৈত্রেয়ী দেবীরা। রবিবার ২২ বৈশাখ (৫ মে ১৯৪০) উৎসবের ব্যবস্থা হয়। মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "সকাল বেলা দশটার সময় স্নান ক'রে কালো জামা কালো রং-এর জুতো প'রে বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ বৃদ্ধ স্তোত্র পাঠ করল। উনি ঈশোপনিষদ থেকে অনেকটা পড়িলেন।

"সেইদিন [৫ মে] দুপুর বেলা 'জন্মদিন' বলে তিনটে কবিতা লিখেছিলেন।" (জন্মদিনে ৫, ৬ ও ৭ -সংখ্যক)।

জন্মদিন উপলক্ষে রচিত প্রথম কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহুপূর্বে রচিত 'বসুন্ধরা' (১৩০০ সাল) প্রভৃতি কবিতার সুর যেন শুনিতে পাই। কবিমনের বিশ্বানুভূতি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদের উপর যে প্রতিষ্ঠিত, এ কথা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি— এই কবিতায় সেই জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ ধ্যানলব্ধ অনুভূতি নূতন ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে—

জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে—
লক্ষকোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।. .
অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা—
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।

জন্মদিন উপলক্ষে রচিত আরও দুইটি কবিতা আছে : একটি বিশেষভাবে বুদ্ধেরই স্মরণ, কারণ বুদ্ধভক্তেরা কবি-প্রণাম করিতে আসিলে বুদ্ধের কথাই মনে হইতেছে (৬-সংখ্যক)। জন্ম-উৎসবের পরদিন ৬ মে রবীন্দ্রনাথকে সুধাকান্ত জানাইলেন যে গত ৩ মে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের[১] মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারা পূর্বদিনই খবর পান, কিন্তু উৎসবের জন্য

১ "বাংলায় তিনি (সুরেন্দ্রনাথ) 'একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত সকুরাপুষ্প' নাম দিয়া একটি জাপানী গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মহাভারতের প্রধান গল্পটি সাধুভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ এবং অনেক প্রবন্ধ এবং ছোটোগল্প তিনি অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথকে জানানো হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তথাচ ইহা তাঁহার কাছে পুত্রশোকতুল্য।

সেদিন তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখিলেন, "তোরা বোধ হয় জানিস আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি ভালোবেসে ছিলুম। নানা উপলক্ষ্যে তাকে আমার কাছে টানবার ইচ্ছা করেছি বারবার, বিরুদ্ধ ভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয় নি। - এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধ হয় কাছে আসব, সেইদিন নিকটে এসেছে।"[১]

সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ পাইবার পরদিন (৭ মে) যে কবিতাটি[২] লেখেন তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
প্রেমের অসীম মূল্য
সম্পূর্ণ বঞ্চনা করে লবে
হেন দস্যু নাহি গুপ্ত
নিখিলের গুহা-গহ্বরেতে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

কালিম্পঙে (৭ মে) ফিরিবার কয়েক দিন পরে কবি শান্তিনিকেতন হইতে কালীমোহন ঘোষের মৃত্যুসংবাদ (১২ মে ১৯৪০) পাইলেন। বিশ্বভারতীর ইতিহাসে কালীমোহন ঘোষের নাম চিরস্মরণীয় ; কারণ, কবির গ্রাম-উদ্যোগ পর্বের প্রারম্ভ হইতে কালীমোহন যুক্ত হন। গ্রামসেবা তাঁহার জীবনের ধর্ম ও কর্ম ছিল, চাকুরিমাত্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ভাবের বাহক, কিন্তু তাঁহার ভাবকে রূপ যাঁহারা দিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম হইতেছেন কালীমোহন।[৩] কিছুকাল হইতে কালীমোহনের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে ও তিনি ২২ নভেম্বর ১৯৩৯ কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কালিম্পং হইতে কবি শান্তিদেব ঘোষকে লিখিয়াছিলেন (১৯ মে ১৯৪০), "তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদে গুরুতর আঘাত পেয়েছি। শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্বে থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ঘটেছিল। কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। অকৃত্রিম

করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের গান ও সুর যেমন বহুজনের অধিগম্য করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমনি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা বাংলা ও বাঙালী জাতির বাহিরের লোকদের অধিগম্য করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহা না করিলে কবির বহু রচনা বাংলা-না-জানা লোকদের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।" — প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭, পৃ ২৫৩ (বিবিধ প্রসঙ্গ)।

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮৩। মংপু, ৬ মে ১৯৪০।

২ কবিতাটি ৭ মে ১৯৪০ মংপু অথবা কালিম্পঙে লিখিত। কালিম্পঙেই মনে হয়, কারণ 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। 'অনন্ত আমি' নামে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। ইহা 'শেষ লেখা' গ্রন্থের ২-সংখ্যক সংখ্যক কবিতা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬।

৩ ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন স্মৃতি ; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃ ৩৬৮-৭০।

নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কাছে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক জনহিতৈষা শ্রীনিকেতনের নানা শুভকর কার্যে নিজেকে সার্থক করেছে।"[১] কালীমোহন সম্বন্ধে কবির এই উক্তি কবি-উক্তি নহে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। দুঃখের বিষয় এই ভাবুক-কর্মী সম্বন্ধে কোনো সুষ্ঠু আলোচনা কেহ করেন নাই।

সুরেন্দ্রনাথের ও কালীমোহনের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে ব্যথিত করে নিঃসন্দেহেই; কিন্তু এ শ্রেণীর আঘাতে তিনি আযৌবন অভ্যস্ত, তাই মৃত্যুর আঘাত তাঁহার অন্তরকে অভিভূত করে না, তিনি আপনার জগতে আপনি আছেন। শুরু করিয়াছেন এবার 'খুচরো কবিতা লিখতে'। এখনকার অনেক কবিতা তাঁহার ভাষায় 'দুর্দিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ'। আপন জীবনের মধ্যে যে-সব দুর্যোগ ঘটিতেছে, কি দৈহিক, কি মানসিক— সেগুলিকে যেমন বলিষ্ঠভাবে ঠেলিয়া দিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছেন আপনার সৃষ্টিসাধনায়, তেমনই সমসাময়িক জাগতিক ব্যাপারের দুষ্কৃতকারীদের স্পর্ধাকে তিরস্কৃত করিতেছেন কাব্যমাধ্যমে। একটি ছড়ার মধ্যে[২] সমসাময়িক দেশীয় রাজনীতির উপর কটাক্ষ আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। ব্যাখ্যা করিয়া স্পষ্ট করা কঠিন—

লোকে বলে, কলঙ্কদল সূর্যলোকের আলো
দখল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো।
তাই তো সবই উলট-পালট, উপর-নামনা নীচে—
ভয়ে ভয়ে নিচু মাথায় সমুখটা যায় পিছে।
হাঁচির ধাক্কা এতখানি, এটা গুজব মিথ্যে—
এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধোঁকা; রাগল অপর পক্ষে—
বললে, পড়াশুনোয় কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।
অন্য দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্ সে।
এর পরে দুই দলে মিলে ইঁটপাটকেল ছোঁড়া—
চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল, কেউ বা হল খোঁড়া।
পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এপারেতে একেই বলে লড়াই;
সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।

এইটি যেমন হইল স্থানীয় রাজনীতির ব্যঙ্গ, তেমনি আধুনিক বর্বর-সভ্যতাকে ধিকৃকৃত করিয়াছেন 'অভিশাপ' (জন্মদিনে, ২১) ও 'নবজাতকের কাণ্ড' (জন্মদিনে, ১৬) কবিতাদ্বয়ে। মানুষের 'পরে এত বিশ্বাস, আদর্শবাদের 'পরে এমন নিষ্ঠা আজ কি সব নষ্ট হইবে! কবির বিশ্বাস—

দিন-বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।

১ কালীমোহন স্মৃতি (পুস্তিকা), শান্তিনিকেতন প্রেস। ২ ১।১। কালিম্পং, ১৪ মে ১৯৪০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৬।

শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়—
নইলে কেন এত অপব্যয়,
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়।[১]

পৃথিবীর ইতিহাসে আবার laws of the jungle ফিরিয়া আসিল। মানুষের মধ্যে সুপ্ত পশুটিকে শিক্ষায়, শাসনে, উপদেশে শমিত করিবার যে চেষ্টা এত যুগ ধরিয়া চলিতেছে, তাহাকে ব্যর্থ করিয়া সভ্যতার যে বিকট মূর্তি আজ ধরিত্রীর বুকে দেখা দিয়াছে, কবি তাহার নাম দিলেন 'দন্তুর সভ্যতা।'[২] কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন, "কয়েক শতাব্দী পূর্বে য়ুরোপীয় সভ্যতা হঠাৎ সদাগরী শাবক প্রসব করতে শুরু করেছিল। তারা খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমাদের এসিয়া-আফ্রিকার পাড়ায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল মোটা মোটা পিণ্ড চর্ব্য চোষ্য লেহ্য নানাবিধ আকারে। এই ভোজের লোভনীয় মাংসগন্ধ পৌঁচচ্ছিল য়ুরোপীয় নাসারন্ধ্রে। যে-সব বঞ্চিত শাবকদের জিবে জল আসছিল অথচ মুখে গ্রাস জুটছিল না, তাদের জঠরানল ঠাণ্ডা ছিল না। অবশেষে ভুক্ত অভুক্ত দুইপক্ষের মধ্যে লেগে গেছে কামড়াকামড়ি। একদা ছিল শিকার এবং শিকারীর পালা, এবার শুরু হল শিকারী এবং শিকারীর পালা। য়ুরোপ-জননীর পক্ষে এটা শোকাবহ। আজ সে কাতর কণ্ঠে বলছে শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি তো বাইরে থেকে আসে না, ভিতরে তার উৎস।.. লুব্ধ অভ্যাসবশত অন্যদের না খেয়ে যাদের চলে না সেই মাংসাশীদের মধ্যে হনন-নীতি কিছুতেই থামতে পারে না। বহুদিন থেকে এদের কারো বা সামনের দিকে প্রকাশ্যে, কারো বা কসের দিকে গোপনে দাঁতগুলি কী অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে চলেছিল আজকের দিনে বড়ো ক'রে বদন ব্যাদান করতেই ভীষণ ভাবে সেটা প্রকাশ পেল।[৩]

কিন্তু এই 'দন্তুর সভ্যতা' কখনোই মানবের শেষ কথা হইতে পারে না—এইটি হইতেছে কবির বিশ্বাস। কবি মনে করেন যে, অভিব্যক্তির তপস্যায় উদ্ভিদ পশুপক্ষী যেমন একটা সুশ্রীতায় পৌঁছিয়াছে, মানবের অন্তরের মধ্যে সেইরূপ একটি সুসম বোধ জাগিবে। "দেখছি এতে স্খলন ঘটে, ছন্দ মেলে না, ওজনের ভুল হয়, বুঝতে পারি তিনি সর্বশক্তিমান নন, সেইজন্যে তাঁকে এত কাটাকুটি করতে হয়, সেই কাটাকুটির দুঃখ আমরা এড়াব কী ক'রে। আমাদের সেই চেষ্টাই নৈতিক চেষ্টা, যে চেষ্টায় কাটাকুটির কারণের শোধন হয়, জগৎগুরুরা তারি ধ্যান করেছেন।.. তা যদি না হ'ত তবে যাঁরা সত্যের জন্যে মঙ্গলের জন্যে martyr হয়েছেন তাঁদের পাগল বলতুম। উলটে এই কি প্রমাণ হচ্ছে না যে যারা তাঁদের বিদ্ধ করেছে তারাই মত্ত তারাই অন্ধ।"[৪]

মনের এই কথাটিই ব্যক্ত করিয়াছিলেন 'অভিশাপ' কবিতায় একমাস পূর্বে (২২ মে ১৯৪০):

১ খুচরো কবিতা: ছড়া (১) 'সুবলদাদা আনলে টেনে' (১৫ মে)। মানসী (২২ মে), অভিশাপ (২২ মে), নামকরণ (২১ মে), অন্তঃশীলা (২৮ মে), আত্মছলনা (গীতবিতানের গান, পৃ ৩৬৬) (২৯ মে), অপঘাত (২৯ মে। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭)। নবজাতকের উত্তরকাণ্ড (৩১ মে), বিমুগ্ধতা (জুন)। অধিকাংশই 'সানাই'এর অন্তর্গত; তবে আমাদের মনে হয় সানাইয়ের অ-তারিখী আরও কতকগুলি কবিতা এই সময়ের রচনা। দ্র. অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, ২৫ মে ১৯৪০ [১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭]; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৭।

২ কালিম্পং, ২০ জুন ১৯৪০। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৭, পৃ ৪২৩।

৩ ১৯৪০ এপ্রিল মাসে জারমেনির নাৎসি বাহিনী ডেনমার্ক, নরওয়ে আক্রমণ করে; কবি যখন মংপুতে তখন বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড নাৎসিদের কবলে পড়ে। কালিম্পঙে বাস-কালে জানিতে পারেন ফ্রান্স জারমেনির কাছে নতি স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়াছে। সোবিয়েত রুশ রুমানিয়ার অংশ দখল করিয়াছে।

৪ মহামানবের সত্য, ২০ জুন ১৯৪০, কালিম্পং। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৭, পৃ ৪২৪-২৫। এইদিন 'দন্তুর সভ্যতা' পত্রখানি লিখিত।

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শতশত নগর গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে ; . .
যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য শিকারীর দল পোষ-মানা শ্বাপদের মতো,
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর ;
আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে,
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।[১]

ভারতের তথা পৃথিবীর ঘনায়মান জটিল রাজনীতি কবিকে খুবই ম্রিয়মাণ করে ; ভাবিতেছেন স্বাধীনতার প্রতীক আমেরিকা বুঝি কিছু শান্তি দান করিতে পারিবে। ১৫ জুন ১৯৪০ কালিম্পং হইতে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে নিম্নলিখিত তার পাঠান— "Today, we stand in awe before the fearfully destructive force that has so suddenly swept the world. Every moment I deplore the smallness of our means and the feebleness of our voice in India, so utterly inadequate to stem, in the least, the tide of evil that has menaced the permanence of civilization.

"All our individual problems of politics today have merged into one supreme world politics, which, I believe, is seeking the help of the United States of America as the last refuge of the spiritual man, and these few lines of mine merely convey my hope, even if unnecessary, that she will not fail her mission to stand against the Universal disaster that appears so imminent।"[২] কিন্তু এ যে কবির বাণী, রাজনৈতিকদের হৃদয়ে তাহা প্রবেশ করে না।

কবির এই সময়ের সকল রচনাই জগদ্ব্যাপী মারণযজ্ঞের নিন্দা নহে, আপন ক্লান্তমনের ক্ষোভপ্রকাশ নহে। এমন সব কবিতা আছে যাহা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও লিরিক্যাল— 'সানাই'-এর কবিতাগুলি তারই দৃষ্টান্ত। সেই ব্যক্তিগত কথার আমেজ পাই 'ছেলেবেলা'র খসড়ায় যাহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ছেলেদের জন্য কিছু লিখিবার প্রেরণা যেখান হইতে আসুক—নিজ জীবনেরই ছেলেবেলার কথা বলার কারণ আরও গভীরে। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন স্মৃতির মধ্যে ঘুরিবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা মানুষ মাত্রেরই মধ্যে দেখা দেয়, কবির শেষ জীবনে সেটি

১ জন্মদিনে ২১, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫। ২৬ মে ১৩৪০ কালিম্পং হইতে কবি উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত স্বামী জগদীশ্বরানন্দ -অনূদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও স্বামী গম্ভীরানন্দ -সম্পাদিত 'স্তবকুসুমাঞ্জলি' উপহার পাইয়া পত্র দেন।

২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কবি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া যান নাই।

খুবই স্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছে। "কিছুকাল হল একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এই বইটাতে বালভাষিত গদ্যে।"[১] কবিজীবনের শেষ কয় বৎসর সংকীর্ণ বাল্যজীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি ঘিরিয়া সাহিত্য নানা ভাবে পল্লবিত হইয়াছে। এই স্মৃতির কেন্দ্রে অনেকখানি ছিলেন বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবী। মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "বিস্মিত মনে তাই ভাবি, এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পরেও যে স্নেহের স্মৃতি এমন ওতপ্রোতভাবে তাঁর জীবনে জড়িয়েছিল, তাঁর কল্পনায় মাধুর্য বিস্তার করত, অসংখ্য কবিতায় কবিত্বের কেন্দ্র হোতো, সে না জানি কি প্রভাবমণ্ডিত ছিল! কিংবা কবির মন তার আপন আলোতেই সৃষ্টি করে জগৎ, বাইরে তার অবলম্বন উপলক্ষ্য মাত্র। তবুও এ কথা মনে না ক'রে পারা যায় না, এমন অভূতপূর্ব বিরাট প্রতিভার মধ্যে এত গভীর দীর্ঘকালস্থায়ী প্রভাব যিনি বিস্তার করতে পারেন— তিনি কম প্রতিভাশালিনী নন।"[২]

প্রত্যাবর্তনের পর

কালিম্পং হইতে কবি কলিকাতায় ফিরিলেন আষাঢ়ের মাঝামাঝি (২৯ জুন ১৯৪০)। সেইদিন সন্ধ্যায় বিচিত্রা-ভবনে 'গীতালি' সমিতির অধিবেশন, কবিই উদ্বোধক। তদুপলক্ষে কবি সংগীত সম্বন্ধে একটি মৌখিক ভাষণ দান করেন; কবি বলেন যে, "আমার গান যাতে আমার গান ব'লে মনে হয়, এইটি তোমরা করো।.. স্টীম রোলার চালিয়ে তাকে চেপ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে দরদ থাকবে না।" কবির এই দুর্ভাবনার কারণ ছিল। লোকে তাঁহার গানকে বিকৃত করিয়া গাহে তাহা তিনি জানেন— স্বকর্ণেও বহুবার শুনিয়াছেন। কবি একবার গল্প বলিয়াছিলেন যে, গয়ায় একবার এক মজলিসে 'আমার মাথা নত করে দাও' গানটি একজন গান করেন; কবি পরে বলেন, 'সে গান শুনিয়া আমার মাথা সত্যই নত হইয়া গেল।' এই ভাষণে কবি আরও বলেন, "আজ বাংলাদেশে গানে একটা খেলো ভাব এসে পড়েছে। কারণ, গান নিয়ে দোকানদারী প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি তো ভীত হয়ে পড়েছি। দোকানের মাপেতে দর অনুসারে বাঁকাচোরা ক'রে তার রসটস চেপেচুপে চলেছে আমারই গান।" এই নাতিদীর্ঘ ভাষণে নিজ গান সম্বন্ধে কবির মনের দুঃখটি প্রকাশ পাইয়াছে।[৩]

কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে আর একদিন সন্ধ্যায় 'ছেলেবেলা'র কিছুটা অংশ এক ঘরোয়া বৈঠকে পড়িয়া শুনাইলেন। সেখানে কয়েকদিনের জন্যও আসিলে কবিকে নানা কাজের মধ্যে এখনো জড়াইয়া পড়িতে হয়। আশি বৎসর বয়সেও লোকে তাঁহাকে রেহাই দেয় না। আচার্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী অবলা বসু -প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা সমিতি একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান; তাহার অন্তর্গত বিধবাদের শিক্ষাকেন্দ্র বাণীভবনে ২ জুলাই কবিকে লইয়া যাওয়া হয়।

১ ভূমিকা, ছেলেবেলা; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬। Symbolic memory is the process by which man not only repeats his past experience but also reconstructs this experience. Imagination becomes a necessary element of true recollection।" — Cassirer, *An Essay on Man*, p 82.

২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (১৩৫০), পৃ ২৩২; তুলনীয়, গানের মন্ত্র, ১৮ জুলাই ১৯৪০, সানাই: "চাবি করা চুরি, প্রাণের গোপন দ্বারে প্রবেশের সহজ চাতুরী।" দ্র জীবনস্মৃতি, 'ঘরের পড়া' পরিচ্ছেদে চাবি চুরির কথা আছে।

৩ সমসাময়িক দৈনিক ১৭ আষাঢ় ১৩৪৭।

এখানে কবি বিধবা ছাত্রীদের সম্বোধনে বলেন যে, আত্মমর্যাদা অনুভব ও অন্ধসংস্কার ত্যাগ ব্যতীত আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া যাইবে না।

কবি কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে একদিন (১ জুলাই ১৯৪০) সুভাষচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে কী কথোপকথন হয় তাহা আমরা জানি না; তবে পরদিন য়ুনাইটেড প্রেস মারফত কবির এক বিবৃতি বাহির হইল; তাহাতে কবি বলিলেন, "অল্প কয়েকদিন হল আমার কোনো ভাষণে আমি দেশের লোকের কাছে যে বেদনা জানিয়েছিলাম সেটাতে বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে একটা অনুমান সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সেটা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে ব্যক্তি-বিশেষকে এরকম গঞ্জনা আমার স্বভাবসংগত নয়।

"মোকাবিলায় আমি সুভাষকে কখনো ভর্ৎসনা করি নি তা নয়, করেছি তার কারণ তাঁকে স্নেহ করি। কিন্তু সেদিন আমি সাধারণত বাংলাদেশের সেই শ্রেণীর লোককেই ধিক্কার জানিয়েছিলুম, যাঁরা কাজ করেন না, কলহ করেন, দল বাঁধতে গিয়ে দল ভাঙেন।[১] . . ব্যক্তিগতভাবে সুভাষকে আমি স্নেহ করি। . . তিনি দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসেন এবং দেশবিদেশের রাজনীতি চর্চা করেছেন, সেইজন্য তাঁর কাছে আমি আশা করি এবং দাবি করি তিনিও দেশকে তার বর্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, তার সাংঘাতিক অনৈক্য-গহ্বরের উপরে সেতু বন্ধন করবেন, তাঁর প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্‌বুদ্ধ করবেন, তাঁর দেশসেবা সার্থক হবে। চারি দিকে দলীয় আঘাতে অভিঘাতে তাঁর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই সস্নেহ শুভকামনা।"[২]

বলা বাহুল্য, এই-সব বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে স্বেচ্ছায় নামিবার বয়স আর নাই; তবে বহু লোকে কবির স্নেহের ও দেহের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আপনাদের অনুকূলে বাণী আদায় করিয়া লইতেন। মাঝে একবার দৈনিক কাগজে মোটা অক্ষরে মুদ্রিত হইল রবীন্দ্রনাথ কন্‌গ্রেসের চারি আনার সদস্য হইয়াছেন! এই শ্রেণীর স্নেহের উপদ্রব বহুভাবে ভোগ করিয়াছেন।

সুভাষ সম্বন্ধে কবির ভাষণ প্রকাশিত হইলে সমসাময়িক আনন্দবাজার পত্রিকার (২০ আষাঢ় ১৩৪৭) সম্পাদকীয় বীথিতে এই ঘটনার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়— "প্রায় দুই মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশীযুগের স্মৃতি'কে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলাদেশের কয়েকখানি কাগজে যে মাতামাতি শুরু হইয়াছিল এবং ঐ মর্মস্পর্শী প্রবন্ধটি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত হীন ও নির্লজ্জ প্রচারকার্যে ব্যবহার করিবার যে কুৎসিত সাড়া পড়িয়াছিল, তাহার উত্তরে আমরা লিখিয়াছিলাম, 'তাঁহার [কবির] লেখাকে কেহ দলগত স্বার্থসিদ্ধি করিবার কদর্য কার্যে ব্যবহার করিতে পারে, তাহা বোধ হয় কবি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার লেখার এমন অপপ্রয়োগ আর কখনও হইয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না'।" দীর্ঘ দুইমাস পরে কবি সেই আপত্তি জানাইয়াছেন, আরও কিছুদিন পূর্বে জানাইলেই ভালো করিতেন। কারণ এই সময়ে হলওয়েল মনুমেণ্ট স্থানান্তরিত করিবার জন্য আন্দোলনের ফলে সুভাষকে বাংলা গভর্নমেণ্ট পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক লিখিতেছেন, "সমগ্র দেশ কবির এই শুভ কামনায় যোগ দিতেছে। আমরা বিশ্বাস করি কারাপ্রাচীরের অন্তরালেও কবির আশীর্বাদ সুভাষচন্দ্রের নিকট পৌঁছিবে।"[৩]

১ তুলনীয়, সমুদ্রপাড়ি; আরবসমুদ্র, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯। পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৪৮৮।

২ আনন্দবাজার পত্রিকা; ২০ আষাঢ় ১৩৪৭, ৪ জুলাই ১৯৪০।

৩ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৭, পৃ ৫-১০; 'বিবিধ প্রসঙ্গে' লিখিতেছেন, "বাংলা সরকার সুভাষবাবুকে বন্দী করিয়া নিজেদের কোন সুবিধা করিতে পারেন্ নাই, সুবিধা ও উপকার করিয়াছেন সুভাষবাবুর ও তাঁহার দলের লোকদের। . . সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ সুভাষবাবুর গ্লানি মোচনের নিমিত্ত যে বাণীর প্রচার করাইয়াছেন, তাহা হইতেও এই সুবিধা কিছু হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না।"

ব্রিটিশ শক্তির সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য সুভাষচন্দ্র প্রস্তুত হইলেন ; কলিকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে লর্ড কর্জন প্রতিষ্ঠিত হলওয়েল মনুমেণ্টকে অপসারিত করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমান যুবজনকে তিনি প্ররোচিত করেন। সেই অপরাধে গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে অন্তরীণাবদ্ধ করিয়াছিল (জুলাই ১৯৪০)।

কলিকাতা-বাস-কালে ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস কবির সহিত দেখা করিতে আসেন। সেইদিন কবি যান অসুস্থ ডাক্তার নীলরতন সরকারকে দেখিবার জন্য।

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (৩ জুলাই)। কালিম্পঙে যে খুচরো কবিতা লিখিতেছিলেন তাহার ধারা এখানে আসিবার পরেও চলিতেছে, সে কবিতাগুলি 'সানাই'এর অন্তর্গত।[১]

এবার আশ্রমে ফিরিয়া কবি বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন ; নিজে বড়ো ছেলেদের বাংলার ক্লাস লইতেছেন ; এ কাজ তাঁহার বয়সে খুবই ক্লান্তিকর, তবুও তরুণদের মনের স্পর্শ পাইবার জন্য তাহাদের আহ্বান করেন। তপোবন[২] প্রবন্ধটি পড়াইবার সময় কবি যে কয়টি কথা বলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিতেছি। কবি বলেন, "প্রথমেই ব'লে রাখা দরকার, ঐতিহাসিক তপোবনের কথা আমি জানি নে। কেউ জানে ব'লে আমি বিশ্বাস করি নে। তপোবনের কথার উল্লেখ আছে পুরাণে, কিন্তু এত অসম্ভব অলৌকিক অতিপ্রাকৃত কাহিনীর সঙ্গে সে জড়িত যে তাকে ঐতিহাসিক সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে কাউকে অনুরোধ করি নে।" কয়েকটি অলৌকিক কথার উল্লেখ করিয়া কবি বলেন, "এমন সব কথা বিশ্বাস করবার আশ্চর্য শক্তি যাঁদের আছে তাঁদের পড়াশুনো করবার দরকার নেই।" কবির মতে 'তপোবনের জনশ্রুতি যখন কাব্যে পুরাণে দেখা দিয়েছিল তখন তার অস্তিত্ব এক কল্পনা ছাড়া আর কোথাও ছিল না।' রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তপোবন সম্বন্ধে এই মন্তব্য করার কারণ ছিল। তাঁহার তপোবন সম্বন্ধে ভাষণ ও নানা উক্তির সমালোচনা হইয়াছিল ঐতিহাসিক মহলে। কবি সে-সব কথা জানিতেন বলিয়া আজ তিনি স্পষ্ট করিয়া তপোবন বলিতে যথার্থ কী বুঝায় তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলেন। অধ্যাপনার মাঝে মাঝে বুধবারে[৩] মন্দিরে উপদেশ দান করিতেছেন, দীর্ঘকাল তিনি মন্দিরে উপদেশ দেন নাই।

এই-সব নিত্যকর্মের মধ্যে সামান্য লেখকদের গ্রন্থের কাহারও পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দেন, কাহারও প্রকাশিত গ্রন্থের প্রশংসাপত্র লেখেন। আমাদের আলোচ্য পর্বে (শ্রাবণ ১৩৪৭) শান্তিনিকেতনের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত[৪] কবির প্রেরণায় 'পৃথ্বীপরিচয়' নামে ছোটো একখানি বিজ্ঞানের বই লেখেন। সে-সম্বন্ধে প্রমথনাথ গ্রন্থকারের নিবেদনে বলেন, "বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু তথ্য আহরণ ক'রে শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-শিক্ষার ভূমিকা ক'রে দেবার অতিগুরুভার অর্পণ করেছেন 'গুরুদেব' আমাদের মতো অক্ষমের হাতে। এই বইখানি আগাগোড়া পড়ে, দরকার মতো ভাষা ও তথ্যের পরিবর্তন করতে গুরুদেব অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর সহায়তা না পেলে আমার পক্ষে এই বই লেখা অসম্ভব ছিল।"

এই বইখানি প্রকাশিত হয় লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা একই উদ্দেশ্যে

১ সানাইয়ের এই কবিতাগুলি লিখিত— ১৬ জুলাই ১৯৪০ : অসম্ভব ছবি, অসম্ভব। ১৭ জুলাই : স্বপ্ন। ১৮ জুলাই : গানের মন্ত্র। ১৯ জুলাই : অবসান (সানাইয়ের শেষ কবিতা)।

২ 'তপোবন' প্রবন্ধ (শিক্ষা, ১৯৬০) পড়াইবার সময় যে ব্যাখ্যান করেন তাহা 'দেশ' পত্রিকায় বাহির হয় ; দ্র প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃ ৬৫৭-৫৯। 'মানসী' কাব্যের ভূমিকা, দেশ ১৩৪৭ ; দ্র প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭। মনোবিকাশের ছন্দ, দেশ ; দ্র প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭।

৩ বুধবারে মন্দিরের উপদেশ— 'আশ্রমের আদর্শ', ৮ শ্রাবণ ১৩৪৭ ; প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃ ৬৫। 'ভারতবর্ষের ধর্ম', ১৫ শ্রাবণ ; প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭, পৃ ৭৫০। মন্দিরে 'অভয় বাণী', ২২ শ্রাবণ ; প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃ ৬৬।

৪ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-সচিবালয়ে অন্যতম উপ-সচিব।

প্রকাশিত হয় নাই। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার[১] উদ্দেশ্য সহজ ভাষায় বিষয়কে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করা। কবি প্রমথনাথের বইয়ের ভূমিকায় লিখিতেছেন, "বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান সহজে আয়ত্তগম্য নয় ব'লেই বিজ্ঞান-অধ্যাপনায় শিক্ষকেরা সচরাচর দুরূহ শব্দের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। দুর্বোধ শিক্ষার ভার দুর্গম ভাষার পথে বহন করতে গিয়ে প্রথম শিক্ষার্থীদের মন পীড়িত পিষ্ট হতে থাকে, এবং তাহাদের শক্তির প্রভূত অপচয় ঘটে। এই অনর্থক মানসিক ক্ষতি নিবারণ অত্যন্ত আবশ্যক ব'লে আমি মনে করি। জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা পাশ্চাত্য দেশে আজকাল বহুপ্রচলিত। এই কর্তব্যসাধনে যাঁরা প্রবৃত্ত তাঁরা কেবল যে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ তা নয়, তাঁরা ভাষা-ব্যবহারে নিপুণ। তাঁরা শিক্ষণীয় বিষয়কে যথোচিত সরল করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। দেশের চিত্তক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সেচন ব্যাপারকে ব্যাপক ক'রে তোলা তাঁরা কত বড়ো সতর্ক সাধনার বিষয় ব'লে মনে করেন এর থেকে তার প্রমাণ হয়। আমাদের দেশে জনসাধারণ যেখানে বিজ্ঞানের পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত সেখানে সহজ প্রণালীতে বিদ্যাদানের অধ্যবসায়কে আমি পুণ্য কর্ম ব'লে গণ্য করি। লোকশিক্ষাসংসদ এই কাজের ভার গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত।"

রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে মানুষের মনের মুক্তি হইবে বিজ্ঞানচর্চায়; মূঢ়তার অপনোদন না হইলে যথার্থ সত্যের জ্যোতি কখনো উদ্‌ভাসিত হইতে পারে না। সত্য অখণ্ড— বিজ্ঞানের সত্যের সহিত মানবতার সত্য, অধ্যাত্মজীবনের সত্যের বিরোধ নাই। সমস্ত জ্ঞানের বুনিয়াদ বিজ্ঞানচর্চা।

কবির দৃষ্টি ও সহানুভূতি ছিল বহুব্যাপক। আলোচ্য পর্বে বর্তমান লেখক সামান্য একখানি গ্রন্থ লেখেন; কবির সম্মুখে সেটি দিলে তিনি ভালো করিয়া দেখিলেন ও পরে লিখিয়া দিলেন (২৫ আষাঢ় ১৩৪৭): "জ্ঞানভারতীর সম্পাদনায় শ্রীযুত প্রভাতকুমারের অধ্যবসায় সার্থক হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শব্দভাণ্ডারে এই গ্রন্থের সংগ্রহ আদরণীয়।" মংপু-বাস-কালে ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় ব্যাধি ও প্রতিকার' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি দেখিয়া দেন এবং তার ভূমিকাও লেখেন। এইভাবে কত লোককে যে তিনি উৎসাহবাক্য দিয়াছেন সে সম্বন্ধে তথ্য এখনো সংগৃহীত হয় নাই।[২]

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কাজ, বোলপুর শহরে টেলিফোন-উন্মোচন। কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া পড়িলে শান্তিনিকেতনবাসীরা কিরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। সেই হইতে গভর্নমেন্টের সহিত শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের পত্রব্যবহার চলে ও অবশেষে ২৪ জুলাই (১৯৪০) বোলপুরে টেলিফোন কেন্দ্র স্থাপিত হইল। প্রাতে কবি শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ হইতে কলিকাতাস্থ পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রধানের সহিত বাক্যালাপ করেন। অপরাহ্ণে বোলপুর টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জে গিয়া কবি উহা উন্মোচন করিয়া আসেন।

কিন্তু কবিজীবনের সবটাই কবিতা লেখা, ভূমিকা লেখা বা সভা করা নহে; হাসি-বিদ্রূপ তাঁহার জীবনের অঙ্গ। আজ জীবনসন্ধ্যায় সেই চিরসরসতা কিছু ম্লান হয় নাই। 'কালান্তর' (২৯ জুলাই। ১৩ শ্রাবণ) ও 'তুমি' (৪ অগস্ট) কবিতা দুইটি এই মনোভাবের উদাহরণ। তবে 'কালান্তর' কবিতাটি প্রহাসিনীর মধ্যে সংযোজিত হইলেও তাহাকে বিশুদ্ধ হাস্যোদ্দীপক বলা যায় না; কারণ কালান্তরজনিত দীর্ঘনিশ্বাস ছন্দ-মধ্যে স্পষ্ট শোনা যাইতেছে। দ্বিতীয় কবিতা

১ লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ বিশ্বপরিচয়, দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রাচীন হিন্দুস্থান ও তৃতীয় গ্রন্থ পৃথ্বীপরিচয়।

২ পূর্ব বৎসর (৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) কুঞ্জেশ্বর মিশ্র -রচিত রামায়ণবোধ বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ নামক গ্রন্থ পাইয়া কবি লিখিয়াছিলেন, "সাধনালোকপ্রদীপ্ত 'রামায়ণবোধ' গ্রন্থখানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইহাতে যে মননশীলতার পরিচয় আছে, তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য।" প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬, পুস্তক-পরিচয়, পৃ ৩৮৬।

'ভূমি'র[১] লক্ষ্যস্থল হইতেছেন সুধীরচন্দ্র কর ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। 'ঐ ছাপাখানাটার ভূত' [Printer's Devil] দিয়া কবিতাটির সূত্রপাত। এই সময়ে সুধীরচন্দ্র প্রকাশন বিভাগের কাজের সঙ্গে যুক্ত— কবির আপিসেই কাজ করেন, লেখার কপি বা প্রুফের তাড়া লইয়া ঘনঘনই দেখাসাক্ষাৎ করিতে যাইতে হয়। কবির শেষ কয় বৎসরের টুকরো টুকরো হাসিপ্রলাপের কবিতাগুলির কিছু 'খাপছাড়া'র সংযোজন অংশে গিয়েছে। তবে এ ছাড়াও বহু ছড়া ইতস্তত ছড়াইয়া আছে— সমসাময়িক প্রবন্ধাদির মধ্যে তাহাদের সন্ধান মেলে।[২]

এই শ্রাবণ (১৩৪৭) মাসে কবির কাব্যখণ্ড 'সানাই' প্রকাশিত হইল। নানা পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৪৫ হইতে ভাদ্র ১৩৪৭ পর্যন্ত প্রকাশিত ৩৮টি কবিতা 'সানাই' কাব্যখণ্ড-ভুক্ত হয়।[৩] সানাইয়ে বিচিত্র সুরের সমাবেশ হইয়াছে। ইহার কতকগুলি ছোটো ছোটো কবিতার স্বতন্ত্র সংগীত-রূপ প্রচলিত আছে; কোথাও বা গান আগে রচিত হয়, কোথাও বা কবিতা।[৪] আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে-সব খুচরা কবিতা জমা

১ প্রহাসিনী, সংযোজন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৬৩, ৬৫ ; দ্র নিরুক্ত মাসিকপত্র, ১৯৪০।

২ বিশ্বভারতীর ঘটনার দিক হইতে এখানে বলিবার মতো বিষয় হইতেছে ধীরেন্দ্রমোহন সেনের শ্রীনিকেতন ত্যাগ। তিনি সেখানকার শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন (জুলাই ১৯৩৮ হইতে)। এবার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আহ্বান আসিল ; তিনি দিল্লিতে Technical Assistant to Education Commissioner [Sergeant] also Secretary to the Advisory Board of Education নিযুক্ত হন ১ অগস্ট ১৯৪০। শ্রীনিকেতন শিক্ষাবিভাগের ভার গ্রহণ করিলেন মার্জোরি সাইক্স্ (M. Sykes)। ইনি কোয়েকার সম্প্রদায় হইতে প্রেরিত হন।

৩ দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৪৭৪-৭৬। এখানে সানাইয়ের কবিতার সাময়িকপত্রে প্রকাশের সূচী প্রদত্ত হইয়াছে।

৪ দ্রষ্টব্য তুলনামূলক তালিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ৪৯১ :

সানাইয়ের কবিতা	গীতবিতানে প্রকাশিত গীতরূপের প্রথম ছত্র ও পৃষ্ঠাঙ্ক
১৩।১।১৯৪০	
অনাবৃষ্টি	মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন, পৃ ৩৬১।
নতুন রঙ	ধূসর জীবনের গোধূলিতে, পৃ ৩৬৫ ও ৩৭৪। (২টি পাঠ।)
গানের খেয়া	আমি যে গান গাই, পৃ ৩৬৩।
অধরা	অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে, পৃ ৩৬৩।
ব্যথিতা	ওরে জাগায়ো না, পৃ ৩৬৪।
[১৩৪৬]	
বিদায়	বসন্ত সে যায় তো হেসে, পৃ ৩৬০।
যাবার আগে	এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে, পৃ ৩৬০।
১০।১।৪০	
পূর্ণা	ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৃ ৪৮১।
[জানুয়ারি ১৯৪০]	
কৃপণা	এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে, পৃ ৪৭৮।
[১৩৪৫]	
ছায়াছবি	আমার প্রিয়ার ছায়া, পৃ ৪৭৪। (২৫ অগস্ট ১৯৩৮)
২৮।৩।৪০	
আসা-যাওয়া	প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে, প ৯০০।

সানাইয়ের কবিতা	গীতবিতানে প্রকাশিত গীতরূপের প্রথম ছত্র ও পৃষ্ঠাঙ্ক
১০।১।৪০	
দেওয়া-নেওয়া	বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল, পৃ ৪৭৫। (৩০ জুলাই ১৯৩৯)
আহ্বান	এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও, পৃ ৪৭৬। (১ অগস্ট ১৯৩৯)
[জানুয়ারি ১৯৪০]	
দ্বিধা	এসেছিলে তবু আস নাই, পৃ ৪৭৮।
আধোজাগা	স্বপ্নে আমার মনে হল, পৃ ৪৭৭।
(৩০।৯।৩৯)	
উদ্বৃত্ত	যদি হায় জীবনপূরণ নাই হল, পৃ ৩৬২।
(১২।৭।৩৯)	
ভাঙন	তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে, পৃ ৩৫৯।
[১৯৩৯]	
গানের জাল	দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে, পৃ ৩৬৬।
মরিয়া	আজি মেঘ কেটে গেছে, পৃ ৪৮০।
(৮।১২।৩৮)	
গান	যে ছিল আমার স্বপনচারিণী, পৃ ৩৫২ ও ৯২৬।
[১৩৪৬]	
বাণীহারা	বাণী মোর নাহি, পৃ ৩৬১।
(২৯।৫।৪০)	
আত্মছলনা	দোষী করিব না, পৃ ৩৬৬।
১০।১।৪০	
রূপকথায়	কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার, পৃ ৮০৩।

হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি নবজাতক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল; অবশিষ্টগুলি এবার সানাই গ্রন্থে সংগৃহীত হইল। নবজাতকের ন্যায় এই কাব্যখণ্ডেও কবিতাগুলির মধ্যে নিবিড় ভাবানুষঙ্গ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তবে স্তবকে স্তবকে রচনাকালের নৈকট্যহেতু কিছু কিছু ভাবের মিল থাকিতে পারে। এই কাব্যের বিশেষ লক্ষণীয় ইহার গানগুলি। বিবাহ-অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিক সূচনা করে 'সানাই' কবিতা।

এ দিকে শান্তিনিকেতনে খুবই উৎসাহ; সাতই অগস্ট (১৯৪০) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কবিকে সাহিত্যাচার্য উপাধি দান করিবার জন্য স্যর মরিস্ গ্যয়ার প্রমুখ সুধিগণ আসিতেছেন। তাঁহাদের উপযুক্ত আতিথ্য, তাঁহাদের ভাষণের প্রত্যভিভাষণ রচনা প্রভৃতি বিষয় লইয়া কবি ও কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত। অক্সফোর্ডের রীতি অনুসারে মানপত্র লাতিন ভাষায় লিখিত হয়; স্থির হইল বিশ্বভারতীর আচার্য রূপে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভাষণ সংস্কৃতে দিবেন। পণ্ডিতদের সহায়তায় সেইভাবে ভাষণ অনূদিত ও মুদ্রিত হইল।

সেইদিন বুধবার। আমরা পূর্বে বলিয়াছি কবি গত কয়েক সপ্তাহ হইতে স্বয়ং মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উপদেশ দান করিতেছেন। একবার ভাষণের মধ্যে ছিল কবির অভয়বাণী। পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য একটা আতঙ্কের আবির্ভাব হইয়াছে—বুঝি বা বর্তমান যুদ্ধের ফলে মানবসভ্যতা লুপ্ত হয়! কবি এই আতঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁহার মহতী বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন; কবি সেদিন প্রাতে বলেন যে, পৃথিবীতে পুরাকালে বহু জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ভূভাগের সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জন প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। যখন সেই-সব ঘটিয়াছিল, তখন সে-যুগের মানুষ ভাবিয়া থাকিবে সৃষ্টি বুঝি লোপ পাইবে, প্রলয়কাল উপস্থিত। কিন্তু সেই সমুদয়ের মধ্য দিয়া পৃথিবী পূর্ণ পরিণতির দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সেইরূপ নানা বিপ্লব, নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষ ও তাহার সভ্যতা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বস্তুত কবির মতে মানবসৃষ্টি এখনো শেষ হয় নাই। সভ্যতার ভাঙন ধরে নাই, সভ্যতা এখনো পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাই হইতেছে আশাবাদী কবির বাণী।[১] এই কথা কবি অন্যভাবে কালিম্পং হইতে অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে লেখেন, এবং একটি কবিতার মধ্য দিয়াও আংশিকভাবে ব্যক্ত করেন। সেদিন অপরাহ্নে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি-প্রশস্তির উত্তরে কবি যে কথা কয়টি বলেন তাহার মধ্যেও এই আশাবাদীর অভয়বাণী শুনিতে পাই।

সাতই অগস্ট (১৯৪০। ২২ শ্রাবণ ১৩৪৭) সিংহসদনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর অব্ লিটারেচর বা সাহিত্যাচার্য উপাধি দান করিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কবির ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইলে এই প্রস্তাব একবার উঠে; তখন বোধ হয় রাজনৈতিক কারণে লর্ড কর্জন সে প্রস্তাব বেশি দূর অগ্রসর হইতে দেন নাই। রোদেনস্টাইন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে সম্মান দান করিতে ইংলন্ড্ কৃপণতা করিয়াছিল,ভারতের সহিত নিঃসম্পৃক্ত সুইডেন কবিকে সেই সম্মান প্রথম প্রদর্শন করিল। যাহা হউক, এতকাল পরে, কবির মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর পূর্বে, ইংলন্ড্ কবির প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া আপনার ত্রুটির অপনোদন করিল।

সমাবর্তন-সভায় ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর মরিস্ গ্যয়ার (মৃত্যু সেপ্টেম্বর ১৯৫২) ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতপ্রবাসী অক্সফোর্ডের উপাধিপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রগণ, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ, বিশ্বভারতীর সদস্য, অধ্যাপক ও বহু সুহৃদ্ সেদিন সভায় উপস্থিত হন।[২]

১ কবির অভয়বাণী, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃ ৬৬১-৬২, 'বিবিধ প্রসঙ্গ'; এই নামটি দেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

২ বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ বটম্‌লি, হাইকোর্টের অন্যতম জজ মিঃ হেন্‌ডারসন, শাহেদ সুরাবর্দি, অপূর্বকুমার চন্দ, ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুশোভন সরকার প্রভৃতি।

অক্সফোর্ডের চিরাচরিত রীতি-অনুসারে মানপত্র লাতিন ভাষায় পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার প্রত্যুত্তর সংস্কৃতে পাঠ করেন; অবশ্য দুইটি ভাষণই ইংরেজিতে তর্জমা করিয়া পড়া হয়।[১] স্যর মরিস গোয়ার তাঁহার ভাষণে বলেন, "the university, whose representative I am, has in honouring you, done honour to itself।" এ কথা অতি সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনসন্ধ্যায় বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ সম্মান না পাইলে, তাঁহার কিছু অগৌরব হইত না, পাওয়াতেও বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি পাইল না; তবে দেশের দিক হইতে ঘটনাটি তুচ্ছ নহে। কারণ, প্রতীচ্যের এক প্রভু-জাতির অতি রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রাচ্যের এক কবিকে সম্মান দান করিয়া তাঁহার বৈদগ্ধ্য স্বীকার করিয়া লইলেন।

সেদিন উৎসব-সময়ে ভীষণ বৃষ্টি হয়, তৎসত্ত্বেও সিংহসদনের হল লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যায় অতিথিদের বিনোদনার্থে ছাত্রছাত্রীরা 'শাপমোচন' অভিনয় করিয়াছিল।

উত্তেজনা উদ্‌বেগ শমিত হইল। আশ্রমের স্বাভাবিক শান্ত জীবন যথাবিধি চলিতেছে; শ্রাবণ-শুক্লাসপ্তমীর দিন (২৫ শ্রাবণ ১৩৪৭) উত্তর-ভারতের ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাসজির মৃত্যুতিথি শান্তিনিকেতনে উদ্‌যাপিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাহাতে কেবলমাত্র গোস্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহাকে এই সভায় আকর্ষণ করে। কবি সভায় বলিলেন:

"তুলসীদাসের স্মৃতিবাসরে আজকে তোমরা আমাকে সভাপতিরূপে বরণ করেছ— তুলসীদাসের সাহিত্যের সঙ্গে আমি বিশেষ ভাবে পরিচিত নই, সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা আমার দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠবে না। নৌকোর ধ্বজা তার গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্য, যাত্রার সময়ে ধ্বজা তাকে সহায়তা করে না। আমি কেবল মাত্র তেমনি তোমাদের স্মৃতিবাসরে গৌরব বৃদ্ধিই করতে পারব— তুলসীদাসকে জানবার সহায়তা করতে পারব না।

"ছোটো ছোটো কবিরা জন্মগ্রহণ ক'রে ভাষার গাঁথুনিকে ধীরে ধীরে শক্ত করে বেঁধে তোলে, সাহিত্যকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাহিত্য তাদের শক্তিসঞ্চারে যে-পরিমাণে পরিপুষ্টিলাভ করে তা দেশের জনসাধারণের কাছে ধরা পড়ে না। বড়ো কবিরা যখন তাঁদের অপূর্ব শক্তি নিয়ে অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন মহীরুহ বনস্পতির মতো তখন তাঁদের কাব্যের মূল পৌঁছায় দেশের অন্তস্তলে। সমগ্র দেশকে তাঁরা রস পরিবেশন করে থাকেন; তাঁদের কর্মকুশলতা ভাষাকে নতুন করে গড়ে তোলে, চিন্তা করবার প্রণালীকে নতুন রূপ দেয়, মানুষের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে নতুন প্রেরণায়।

"তুলসীদাস তাঁর 'রামচরিতে'র উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন বাল্মীকির রচনা থেকে; কিন্তু সেই উপকরণকে তিনি সম্পূর্ণ নিজের ভক্তিতে রসসমৃদ্ধ করে নতুন করে দান করেছেন। সেইটেই তাঁর নিজস্ব দান— পুরাতনের আবৃত্তি নয়, তাতে তাঁর যথার্থ প্রতিভার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নতুন দৃষ্টি নিয়ে সেই পুরাতন উপকরণকে নতুন রূপ দান করে পরিবেশন করেছেন সমস্ত দেশকে। ভক্তিদ্বারা যে ব্যাখ্যায় তিনি রামায়ণকে নতুন পরিণতি দিয়েছেন সেটা সাহিত্যে অসাধারণ দান।

"বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করছে, মানুষের রুচিতে পরিবর্তন এসেছে। তবু তুলসীদাসের দান যুগকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে আছে। এই যে সমস্ত কালকে অধিকার করা— এ সৌভাগ্য অল্পলোকেরই হয়। হিন্দীসাহিত্যে তুলসীদাসের দানকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে গণ্য করা হয়েছে এবং চিরকাল তাঁর সে গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাঁর রচনা হিন্দী সাহিত্যে স্রোত বইয়ে দিয়েছে— পরিবর্তনের পথে নতুন গতিদান

১ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃ ৬৮১-৮৩।

করেছে— হিন্দী ভাষার গৌরব বাড়িয়েছে। অনুভবে এর সত্যতা আমাদের কাছে সহজেই ধরা পড়ে। আজ পর্যন্ত সেই স্রোত বিশিষ্ট পথ রচনা করে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বয়ে চলে এসেছে।

"আমার মনে পড়ে বাল্যকালে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির দারোয়ানরা তুলসীদাসের রামায়ণ গান করত। তারা সেই গান থেকে যেন অমৃতলাভ করে সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর করত— তাদের অবসর সময়কে রসময় করে তুলত। তাদের ভিতর দিয়ে আমি সর্বপ্রথম তুলসীদাসের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি।

"বর্তমানে বাংলা এবং হিন্দী সাহিত্যে নতুন কাল এসেছে। সমস্ত পরিবর্তিত হতে চলেছে— আমাদের চিত্তের গতি বদলে গিয়েছে কালের প্রভাবে— মানুষের কাব্যরুচিকেও সে-গতি দিয়েছে বদলে। য়ুরোপের সাহিত্য আমাদের দেশের সাহিত্যকে এক নতুন পন্থায় নিয়ে গেছে— নতুন বিকাশের পথ খুঁজে দিয়েছে। তবু এ কথাও ভুললে চলবে না— যাঁদের শিক্ষিত বলি তাঁদের প্রভাব অতি সামান্য, জনসাধারণের চিত্ত হচ্ছে দেশের যথার্থ ভূমি ; যেখানে স্বভাবত প্রকৃতির প্রেরণায় ফসল ফলে সে হচ্ছে সর্বজনের চিত্তক্ষেত্র। সে-ক্ষেত্রে যথার্থ সৃষ্টির অধিকারের পথে য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব ব্যাঘাত জন্মাতে পারবে না। দেশের সেই সর্বজনের চিত্তক্ষেত্র থেকে তুলসীদাসের অধিকার কোনো কালেই যাবে না। তাঁর দান স্থায়ী মহান প্রতিভার বিকাশ নিয়ে কালের প্রভাবকে অতিক্রম করে চিরকাল দেশকে সমৃদ্ধ করবে।"[১]

বিবিধ রচনা

বার্ধক্যের দিনগুলি কবির মন্থর গতিতে চলিতেছে। শরীর রীতিমত ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং দ্রুত ভাঙিতেছে। দৃষ্টিশক্তি এখন অতি ক্ষীণ, শ্রবণশক্তি ততোধিক দুর্বল ; হাঁটিতে চলিতে অসম্ভব কষ্ট হয়। কিছুকাল হইতে ঠেলা চেয়ার-গাড়িতে ঘোরাঘুরি করেন। তৎসত্ত্বেও ছোটো বড়ো কাজের জন্য লোকও আসে, লেখার জন্য তাগিদও আসে — দর্শনপ্রার্থীর দলও আসে। শরীরের এই অবস্থাতে লিখিতে খুবই কষ্ট হয়— কিন্তু না লিখিয়াও পারেন না।

বাহির হইতে যে-সব দর্শনপ্রার্থী এই সময়ে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন (২১ অগস্ট ১৯৪০) তাঁহাদের মধ্যে বিশেসভাবে উল্লেখযোগ্য— বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, উক্ত সমিতির সহকারী সভাপতি লাবণ্যলতা চন্দ ও রাজনৈতিক কর্মী মনোরঞ্জন গুপ্ত।[২] ইঁহাদের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের আশুলক্ষ্যে পৌঁছিবার উন্মাদনায় বাংলার রাজনৈতিক কর্মিগণ ভুলিয়া যান যে ভারতবর্ষে সর্বব্যাপী বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে হইলে সাংস্কৃতিক প্রগতির প্রয়োজন। তিনি বলেন, ভারতের শোচনীয় সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা বহু অশুভের মূলে রহিয়াছে। ভারতের একাংশ অপরাংশকে কতটুকু চেনে। কাশ্মীর ও কুমারিকা, আসাম ও পঞ্জাবের মধ্যে কি সাংস্কৃতিক যোগ আছে? কথাটি সংক্ষেপে উক্ত ও বিবৃত হইলেও ইহার মধ্যে যে গভীর সত্য রহিয়াছে তাহা চিন্তনীয়।[৩]

১ ১৩৪৭ সালে শান্তিনিকেতনে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন -অনুষ্ঠিত তুলসীদাসের স্মৃতিবাসরের সভাপতিরূপে গুরুদেব-কর্তৃক কথিত ও রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী -কর্তৃক অনুলিখিত। ২০ আশ্বিন ১৩৬০, বালুচর (পোস্টঅফিস পালং, ফরিদপুর, পূর্ব পাকিস্তান) হইতে অনুলেখক এই লেখাটি পাঠাইয়াছেন। কবি-কর্তৃক ভাষণটি সংশোধিত বা অনুমোদিত হইয়াছিল কি না জানি না।

২ মনোরঞ্জন গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ২০ খানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

৩ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও মনোরঞ্জন গুপ্তের বিবৃতি। দ্র সমসাময়িক দৈনিক, ২৩ অগস্ট ১৯৪০।

ইতিমধ্যে কবির হাতে আসিয়া পড়ে 'আধুনিক কাব্য' নামে একটি কাব্যসংগ্রহ। কাব্যখানি সম্পাদন করেন আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'আধুনিক' এই শব্দ সংযোগ দ্বারা বইখানিকে বিশিষ্টতা দান করা হইয়াছিল; কবি বইখানি পড়িয়া 'কিঞ্চিৎ বিস্মিত' হইয়া লিখিতেছেন (২২ অগস্ট ১৯৪০): "দেখলুম তার অনেক কবিতাই আমাদের কালের হাট থেকে এসেছে। তার আকৃতি চেনা, তার প্রকৃতিও। তা হলে বলতে হবে আধুনিক কবিতা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে, কবির প্রেয়সী বুড়ি হয়ে মরে যায় না।.. এই সংকলন-গ্রন্থে.. এখনো অনেক কবিতা দেখলুম যাতে কাল-শিল্পী বিকৃতিকে নূতনত্ব বলে স্পর্ধা করেছে। বিকৃতি তার অস্বাভাবিকতা দ্বারা চমক লাগায়— যে জন্যে আপন পোষা জীবজন্তুর মধ্যে ইচ্ছা করে মানুষ বিরূপের সন্ধান করে। অস্বাভাবিক আকস্মিক স্বাভাবিক চিরকালের। অদ্ভুত এবং অপূর্বের মধ্যে যে প্রভেদ সে তো কবিরাই জানে। বিজ্ঞানীর কাছে দুইয়ের মূল্যই সমান।"[১] এই কাব্যখণ্ডে 'শিশুতীর্থ' রচনাটি গদ্য-কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে সম্পাদক অন্তর্ভুক্ত করেন। ২০ অগস্ট (১৯৪০) আবু সয়ীদ আইয়ুবকে কবি যে পত্র লেখেন, সে পত্রাংশ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।[২]

এই সময়ে কবির হাতে আরও কয়েকখানি বই আসিয়া পড়ে। চট্টগ্রাম হইতে আবুল ফজল নামে এক সাহিত্যিক 'চৌচির', 'মাটির পৃথিবী' ও 'বিচিত্রকথা' নামে তিনখানা বই কবিকে পাঠাইয়া লেখেন, 'লেখাগুলির স্থান-বিশেষও যদি রবির স্নেহরশ্মিপাতে ধন্য হয়' তিনি সুখী হইবেন। এই পত্রে নবীন লেখক বলেন যে, মুসলমান-সমাজের এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা ব্যবহার না করিলে ঠিক সমাজচিত্র ফুটিয়া উঠে না। রবীন্দ্রনাথ 'চৌচির' গল্পটি তাঁহার 'দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করেও' পড়িলেন ও দীর্ঘ পত্রে তাহার জবাবও লিখিলেন (৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০)। এই পত্রে বাংলাভাষার মধ্যে বিদেশী শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে কবির মত ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "আচারের পার্থক্য ও মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব অনুবর্তন না করলে ভাষার সার্থকতা থাকে না। তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলতা করলে ভাবপ্রকাশের বাহনকে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়।.. ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটা বিধান আছে যার দ্বারা নূতন শব্দের যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে সেই বিধান না মানলে জারজ শব্দ কিছুতেই জাতে ওঠে না।"

মুসলমান লেখকদের নবসাহিত্য-প্রয়াস সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, "শক্তিমান মুসলমান লেখকরা বাংলাসাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায়নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব।.. চাঁদের এক পৃষ্ঠায় আলো পড়ে না, সে আমাদের অগোচর, তেমনি দুর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানা সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তা হলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারে ভুল ঘটতে থাকবে। কিন্তু এই পরিচয়স্থাপন ব্যাপারে কোনো একটা জিদবশত ভাষার প্রতি যদি নির্মমতা করেন তা হলে উল্টো ফল ফলবে। এই উল্টো ফল ফলাবার অধ্যবসায়ে বাংলাদেশ আজ কণ্টকিত।"[৩]

ইতিমধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার পূজাসংখ্যার জন্য নূতন গল্পের তাগিদ আসিয়াছে, টাকাও অগ্রিম আসিয়া গিয়াছে, লিখিতেই হইবে। অগস্ট মাসের শেষ ভাগে একটি গল্প লেখেন। কালিম্পঙে প্রতিমা দেবীকে লিখিতেছেন, (৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪০) "গল্পটা শেষ হয়ে গেছে, এখন তাতে প্ল্যাস্টার লাগাচ্ছি।" পক্ষকাল পরে কলিকাতা হইতে অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন, "দায়ে পড়ে একটা গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছিলুম, বহু কষ্টে লিখে নিষ্কৃতি নিয়েছি।

১ পত্র, ২২ অগস্ট ১৯৪০ (৬ ভাদ্র ১৩৪৭)। মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৫২।

২ রবীন্দ্রজীবনী ৩, পৃ ৪১০, পাদটীকা ১।

৩ পত্র, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০। সওগাত, বৈশাখ ১৩৪৮, পৃ ৬৩৯-৪০।

আনন্দবাজার পূজা-সংখ্যায় যাবে— কিরকম হয়েছে কী জানি। লিখতে আর প্রবৃত্তি নেই।" এই 'ল্যাবরেটরি'—'তিনসঙ্গী'র অন্তর্গত।

গল্পটি লেখা হইয়া গেলে কবি একদিন শান্তিনিকেতনের কয়েকজনের কাছে সেটা পড়িয়া শোনান। কালিম্পঙে প্রতিমা দেবীকে লিখিত মীরা দেবীর এক পত্র হইতে কবির সাম্প্রতিক মনের ও স্বভাবের একটি নিখুঁত চিত্র আমরা পাই। তিনি লিখিতেছেন, "বাবা যে-গল্পটা [ল্যাবরেটরি] লিখছিলেন সেটা শেষ হয়েছে দুই-তিন দিন আগে, জন-কয়েককে প'ড়ে শুনিয়েছেন। সেদিন সকাল থেকে সে কী একসাইট্‌মেণ্ট বাবার, . . বাবা এমন ইরিটেটেড মেজাজে ছিলেন, পড়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যে-ক'টি আমরা উপস্থিত ছিলুম গল্প-পড়ার সময় ভয়ে সব জুজু হয়ে বসে, কারো মুখে হাসি নেই বা কথা নেই। . . যে-বিষয় নিয়ে এত ভয় সঞ্চার হয়েছিল আসলে গল্পটা কিন্তু সে-রকম ভয়াবহ নয়। . . গল্পটি হচ্ছে বর্তমান যুগের মেয়েদের নিয়ে।"[১] গল্পের প্রধান নায়িকা সোহিনী— রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি; ইতিপূর্বে সৃষ্ট কোনো নারীচরিত্রের সঙ্গে ইহার মিল পাওয়া যায় না। "সোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ-কেউ আলোচনা করতেন, তাঁদের প্রায়ই [কবি] বলতেন, 'সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না। সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশানো খাঁটি রিয়ালিজ্‌ম, অথচ তলায়-তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজ্‌মই হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ'।"[২] কবি জানিতেন, আধুনিকারা সোহিনীকে সহ্য করিতে পারিবেন না, প্রাচীনাদের তো কথাই নাই। আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় (১৩৪৭) গল্পটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি রোগশয্যায়। "কী আগ্রহ তাঁর গল্পটি দেখে, ডাক্তারদের বারণ সত্ত্বেও তিনি কাগজখানি হাতে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে গেলেন।"

ল্যাবরেটরি সম্বন্ধে একজন আধুনিক লেখক লিখিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ মানবচরিত্র লইয়া স্বয়ং বৈজ্ঞানিক খেলা খেলিয়াছেন। "তিনি এই গল্পের নরনারীকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেছেন। আচারহীন পাত্রে বুদ্ধি, আচারের সংকীর্ণ পাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর বিজ্ঞানের পাত্রে তরল চরিত্র ঢেলে নীচে দিয়েছেন বুনসেন বার্নার। ফুটন্ত চরিত্রগুলোকে একসঙ্গে মেশানো হ'ল। রাসায়নিক বস্তুগুলি পরস্পর পরস্পরকে কেবল আঘাত করতে লাগল, মিলতে পারল না। প্রত্যেকটি চরিত্র অতি প্রখরভাবে জীবন্ত কিন্তু অতি নিষ্ঠুরভাবে ট্র্যাজিক। তারা পরস্পরকে অপমান করে চলেছে।" কারণ ইহারা শিক্ষার আবরণযুক্ত হইলেও কালচারহীন বা ধর্মহীন। "সবগুলো চরিত্রই এখানে মিলেছে হয় বিশুদ্ধ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে, না হয় বিশুদ্ধ স্বার্থের ক্ষেত্রে।" এই গল্পের নরনারীরা "গল্পের বিচারে সফলতা লাভ করায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উগ্রভাবেই। কিন্তু কোনোমতেই আমাদের মনে অনুকম্পা জাগায় না। মানবজীবনের পূর্ণ চাঞ্চল্য নিয়েও তারা যেন মনুষ্যত্বের বিকার। একমাত্র রেবতীর মধ্যে কিছু সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে অভীক নয়; সে তৃণখণ্ডমাত্র। স্রোতে ঘুরপাক খেয়ে ভেসে বেড়াল এবং শেষ পর্যন্ত পিসিমা-রূপ অতীত যুগের অতিপরিচিত খোলসে গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেল।"[৩] তিনসঙ্গীর গল্পত্রয় এবং 'বদনাম' কবির পুরাতন গল্পধারা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক্ সে কথা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ বয়সে কি ছন্দে, কি চিত্রে, কি গল্পে— পুরাতনের পথ বা conventionকে বহুল পরিমাণে অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন। সে, খাপছাড়া, প্রহাসিনী, ছড়ার ছবি, গল্পসল্পর মধ্যে যে-সব মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা তাঁহার ছবির ন্যায় unconventional type; অর্থাৎ ইহাদের কোনো 'জাত' নাই। তিনসঙ্গীর ল্যাবরেটরির চরিত্রগুলি সৃষ্টিছাড়া অর্থাৎ unconventional— এবং সোহিনী, কবির ভাষায়, সাদায়-কালোয় মেশানো খাঁটি

১ প্রতিমা দেবী, নির্বাণ, পৃ ৩-৪। ২ নির্বাণ, পৃ ২৪।

৩ পরিমল গোস্বামী, 'রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, পৃ ৬১৮।

রিয়ালিজম্‌, ইহার 'জাত' নাই, সকলেই ইহার ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া পাশ কাটাইয়া যাইবে, আত্মীয় বলিয়া কেহই পরিচয় দিবে না। বুদ্ধদেব বসু এই কথাটা আর-একভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "সোহিনীতে সেই চরিত্রবতীকে তিনি এঁকেছেন, যে এক দিক থেকে বাস্তবিকই খারাপ মেয়ে কিন্তু অন্য দিকে একটি মহৎ জীবনব্রতে সে উৎসর্গিত। সেখানেই তিনি অকুণ্ঠিত অভিনন্দন জানিয়েছেন যেখানে দেখেছেন এমন-কোনো লক্ষ্যের প্রতি নিষ্কম্প্র নিষ্ঠা, যা প্রচলিত ভালোমন্দর বাইরে ও নিজের সুখদুঃখের উপরে।"[১] আবার এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ভারতের চিরন্তন স্বামীভক্তির আদর্শ সোহিনীর চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে!

'বদনাম' গল্পের সৌদামিনী বা সদু conventional সমাজনীতি বা ধর্মনীতি অনুসারে পতিব্রতা নহে। সে-ও আইডিয়ার কাছে নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে বলি দিল— স্ত্রীলোক বদনাম কিনিল। রবীন্দ্রনাথ একদিন প্রসঙ্গকথায় রানী চন্দকে বলিয়াছিলেন যে মেয়েদের সমস্যা হইয়াছে অর্থনৈতিক। তাহাদের উপার্জন করিতে দেওয়া হয় নাই। "পুরুষরা নিয়েছে সেই ভার— তোমরা থাকবে পরম নিশ্চিন্তে। প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্প বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পারবেন কেন। তার পর আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধা পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।"[২]

বুদ্ধদেব বসু ঠিকই বলিয়াছেন যে, "সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো, যত বয়স বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন। যা সাময়িক, যা প্রথাগত, যা দেশে কালে আপেক্ষিক, যা লোকাচারের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধিমাত্র, সে সমস্তের ঊর্ধ্বে গেছে তাঁর দৃষ্টি, নীতির চেয়ে সত্যকে বড়ো করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে।" জবহরলালও কবি সম্বন্ধে এই ভাবেরই কথা বলিতেছেন: "Contrary to the usual course of development as he [Tagore] grew older he became more radical in his outlook and views."[৩] "তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতরভাবে যেন প্রগতিপন্থী হয়, সচরাচর এমন ঘটে না বরঞ্চ এর উল্টোটাই হয়ে থাকে।"[৪]

'ল্যাবরেটরি' গল্প পড়া হইয়া গেল— দিন যায়, কিন্তু মন শান্তিনিকেতনে টিকিতেছে না। রথীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী কেহই কাছে নাই। প্রতিমা দেবী কালিম্পঙে, রথীন্দ্রনাথ জমিদারি-সফরে গিয়াছেন। কবি প্রতিমা দেবীকে ৩ সেপ্টেম্বর (১৯৪০) লিখিতেছেন, "হংসবলাকার দলে যদি নাম লেখা থাকত তা হলে উড়ে চলতুম মানসসরোবরের দিকে, মংপুতে মাগুরমাছের সরোবর-তীরেও হয়তো শান্তি পাওয়া যেতে পারত। মধ্য-সেপ্টেম্বরের প্রতীক্ষায় রইলুম।"[৫]

যেদিন এই পত্রখানি লিখিলেন সেইদিন শান্তিনিকেতনে প্রাতে বৃক্ষরোপণ উৎসব ও সায়াহ্নে বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত হয় (৩ সেপ্টেম্বর)। এবারকার বর্ষামঙ্গলের জন্য কবি একটিমাত্র গান লেখেন— 'এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন।' ইহাই কবির শেষ বর্ষাসংগীত।[৬]

প্রতিমা দেবীকে তেসরা তারিখের পত্রে লেখেন যে মধ্য-সেপ্টেম্বরে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিবেন। সত্যই

১ সব-পেয়েছির দেশে, পৃ ১০২।

২ রানী চন্দ, আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১০৩–০৪। বদনাম গল্পটি লেখা হয় জুন ১৯৪১। দ্র গল্পগুচ্ছ ৪।

৩ Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India*, 1946, p 404।

৪ ভারত সন্ধানে, পৃ ৩৭৯।

৫ দ্র নির্বাণ, পৃ ১। প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্র।

৬ রচিত ১৬ ভাদ্র ১৩৪৭, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪০। দ্র গীতবিতান, পৃ ৯০১; দ্র কবিকথা, পৃ ১৮২।

সকলের নিষেধ ও বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সুধাকান্তকে সঙ্গে লইয়া কবি কলিকাতা চলিয়া গেলেন (১৭ সেপ্টেম্বর), পাহাড়ে যাইবেনই।

কলিকাতায় গেলে ডাক্তার নীলরতন সরকার ও বিধানচন্দ্র রায় কবিকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া এক বিবৃতিতে বলিলেন যে, দেশবাসী যদি কবিকে আরও কিছুদিন বাঁচিতে দিতে চান তবে যেন তাঁহারা কবির উপর অকারণ আর জুলুম না করেন। চিকিৎসকদের নিষেধ সত্ত্বেও কবি দুইদিন পরে কালিম্পং যাত্রা করিলেন; যাত্রার পূর্বে লিখিতেছেন, "কিছুদিন থেকে আমার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়ছে, দিনগুলো বহন করা যেন অসাধ্য বোধ হয়। তবু কাজ করতে হয়েছে, তাতে এত অরুচিবোধ— সে আর বলতে পারি নে। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই যেখানে পালিয়ে থাকা যায়। ভিতরের যন্ত্রগুলো কোথাও কোথাও বিকল হয়ে গেছে— বিধান রায় আশঙ্কা করেন হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটতে পারে। সেইজন্যে কালিম্পঙে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মন বিশ্রামের জন্যে এত ব্যাকুল হয়েছে যে তাঁর নিষেধ মানা সম্ভব হোলো না। চল্লুম আজ কালিম্পঙ।"[১]

কবির কোনো বিষয়ে ঝোঁক উঠিলে, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বড়ো কেহ পারিত না। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ "যদি বোঝাতেন তখনি শিষ্ট ছেলের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন। এই ব্যাপারটি ছিল পরিজনবর্গের একটি আমোদের বিষয়।"[২] তিনি দূরে থাকায় অনুচর ও সেবকগণকে বাধ্য হইয়া কবির হুকুমই তামিল করিতে হয়। প্রতিমা দেবী কালিম্পঙে হঠাৎ টেলিফোন-যোগে জানিতে পারিলেন যে কবি সেখানে আসিতেছেন। এই শরীরে কালিম্পং যাওয়ায় যে কী ঘটিল তাহা আমরা যথাস্থানে বলিব।

আমাদের আলোচ্য পর্বে কবির 'চিত্রলিপি' নামে বই প্রকাশিত হইল। গত দশ বৎসর হইতে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিতেছেন, এখানে-সেখানে সাময়িক পত্রিকাদিতে দু-চারখানি ছবির 'ছবি' মুদ্রিত হইয়াছে। 'বিচিত্রিতা'র মধ্যে কয়েকখানির প্রতিলিপি ছিল। এইবার চিত্রলিপিতে (সেপ্টেম্বর ১৯৪০) কবির অঙ্কিত ১৮ খানি চিত্রের প্রতিলিপি (১০ খানি বহুবর্ণ) এবং চিত্রের ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়া ১৮টি ক্ষুদ্র কবিতা ও তাহার ইংরেজি তর্জমা স্বহস্তলিখিত প্রতিলিপি সমেত প্রকাশিত হইল। এতদ্‌ভিন্ন কবির রচিত একটি ইংরেজি ভূমিকা ও শিল্পাধিষ্ঠাত্রী চিত্রলেখা দেবীর উদ্দেশে রচিত আর-একটি বাংলা কবিতা ও তাহার অনুবাদ আছে।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনা[৩] করিয়া বলিতেছেন, "শিল্পের দিক হইতে এই ছবিগুলির সার্থকতা অথবা, এগুলির নিরর্থকতা বিচার করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি, কবির আঁকা অনেকগুলি ছবিই আমার কাছে উপভোগ্য। রঙের সমাবেশের দরুন অনেকগুলির মূল্য আমার কাছে শব্দহীন গানের সুরের গুঞ্জনের মতো মনে হয়। আমার কাছে কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে, কবির হাতে আঁকা কতকগুলি মুখ। আমার মনে হয় এইখানে কবি মুখের আকার ও ভঙ্গীর দ্বারা অদ্ভুত ভাবে ছবিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এখানে তাঁহার কৃতিত্ব একেবারে শিশু চেষ্টিতের মতো নহে, ওখানে যেন অকস্মাৎ প্রৌঢ় শিল্পের, ওস্তাদ শিল্পীর হাতের ঝংকার দেখা দিয়াছে। . . এই মুখচিত্রগুলি নূতন ভাবে, নিরতিশয় শক্তি সহানুভূতি ও সার্থকতার সঙ্গে মানব-চরিত্রের সম্বন্ধে কবির সুগভীর আত্মীয়তাবোধের এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিতেছে। এই প্রকারের মুখের ছবিগুলির জন্যই আমি রবীন্দ্রনাথকে উচ্চকোটির রূপশিল্পীর আসন দিতে ইতস্তত করিব না।"

১ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০। ২ প্রতিমা দেবী, নির্বাণ, পৃ ১২।
৩ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৭।

এই সময়ে Hilda Seligman নামে এক মহিলা লেখিকা অশোকের সময়কার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একখানি উপন্যাস লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ অশোক সম্বন্ধে কোনো গাথা বা কবিতা লেখেন নাই সত্য, তবে অশোকের আদর্শকে তিনি যে শ্রদ্ধা করিতেন তাহার প্রমাণ আছে।[১] প্রয়াণ-কালের এক বৎসর পূর্বে তিনি দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের উদ্দেশে তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিলেন, "In an age of fratricide, aided by intellectual dehumanization in large areas of the world, it is difficult to restore the calm air so necessary for the realization of great human ideals. Hilda Seligman has chosen in her book to reveal the organization side of a great humanism which came with King Asoka of India. My good thoughts go with the author in her venture to present ancient India through its message which has a perennially modern significance."[২]

শেষ সফর

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া কালিম্পঙ যাত্রা করিয়াছিলেন ১৯ সেপ্টেম্বর (১৯৪০) সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এবার সেখানে থাকা হয় মাত্র সাত দিন। প্রথম কয় দিন শরীর ভালোই ছিল, আপন মনে লেখাপড়া করিতেছিলেন— কবিতা লিখিতেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন (২৫শে): "কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্ছে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমস্ত দিন, মনের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণাপাণির বীণার গুঞ্জন।"

মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণ-দুর্গে বন্দী রহি'
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী . .।[৩]

শব্দের অফুরন্ত লীলার কথা ও অগণিত রূপান্তরের কথা ব্যক্ত হইয়াছে—

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে। . .
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ ?[৪]

এই দুইটি কবিতা পর পর লেখা, মনের মধ্যে ধ্বনি ও বাহিরে রঙ— অরূপ ও রূপ, অসীম ও সসীম এই দুইয়ের লীলাতরঙ্গ কবিকে চিরদিনই আনন্দ দিয়াছে।

১ প্রবোধচন্দ্র সেন, 'রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোক', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৯; 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ২, অশোক', বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯।

২ Hilda Seligman, *When Peacocks called*, The Bodley Head; ১৯৪০। বইখানি লেখিকা-কর্তৃক কবিকে উপহৃত হয়।

৩ জন্মদিনে ২০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

৪ জন্মদিনে ১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

২৫ সেপ্টেম্বর অমিয় চক্রবর্তীকে যে পত্র দেন তাহাতে তাঁহাকে কালিম্পঙে আসিবার নিমন্ত্রণ আছে; সেইদিন খবর পাইলেন মংপু হইতে মৈত্রেয়ী দেবী পরদিন আসিতেছেন। এই দিন হইতে কবির শরীর খারাপ হইতে থাকে; পরদিন হঠাৎ অজ্ঞানভাব দেখা দিল। কালিম্পঙের মতো স্থানে এইরূপ আকস্মিক ঘটনার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না; সুধাকান্তর ছেলের অসুখ বলিয়া কবি কয়দিন পূর্বে তাঁহাকে জোর করিয়া বোলপুর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সচ্চিদানন্দ বা আলু রায় আছে সেখানে, আর পুরাতন ভৃত্য বনমালী। মংপু হইতে মৈত্রেয়ী দেবী আসাতে খুবই ভালো হইয়াছিল। তাঁহার আগমনে প্রতিমা দেবী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

কালিম্পঙের বিস্তৃত বর্ণনা প্রতিমা দেবী -কৃত 'নির্বাণ' গ্রন্থে আছে, সুতরাং তাহার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। রথীন্দ্রনাথ তখন জমিদারিতে, কোথায় ঘুরিতেছেন জানা নাই। প্রতিমা দেবী কলিকাতায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও শান্তিনিকেতনে অনিল চন্দকে টেলিফোনে কবির অবস্থা জানাইলেন। প্রশান্তচন্দ্র কলিকাতা হইতে তিনজন ডাক্তার— সত্যসখা মৈত্র, অমিয়নাথ বসু ও জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকারকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ কর, অনিল চন্দ, সুধাকান্তও শান্তিনিকেতন হইতে আসিয়া পড়িলেন। সেই দিনই তাঁহারা কবিকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিলেন। ইহাই কবির শেষ ভ্রমণ।

কলিকাতায় প্রায় এক মাস অসুস্থ থাকিয়া কবি সারিয়া উঠিলেন বটে, তবে আর পুরাতন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। কালিম্পং হইতে কলিকাতায় ফিরিবার দুই দিন পরে ওয়ার্ধা হইতে মহাদেব দেশাই আসিলেন মহাত্মাজির বার্তা লইয়া। প্রতিমা দেবী লিখিতেছেন, "মহাদেব দেশাই অনিলকুমারের সঙ্গে বাবামশায়ের ঘরে এসে মহাত্মাজির সহানুভূতি, আন্তরিক প্রেম ও প্রীতি জানালেন। অনিলকুমার জোরে-জোরে মহাদেব দেশাই মহাশয়ের বার্তা গুরুদেবকে বুঝিয়ে দিলেন, কেননা তখন তিনি ভালো করে শুনতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল, চোখের জল তাঁর এই প্রথম দেখলুম। নার্ভের উপর এত বেশি সংযম তাঁর ছিল যে, অতি বড়ো শোকেও তাঁকে কখনো বিচলিত হতে দেখি নি, আজ যেন বাঁধ ভেঙে গেল।"[১]

জোড়াসাঁকোর বাটীতে কবি শয্যাশায়ী, যথার্থ রোগীর ন্যায় দিন যায়। তাহারই মধ্যে শরীর একটু ভালো বোধ করিলে মুখে মুখে কবিতা বলিয়া যান, পার্শ্বের সেবকরা লিখিয়া লন। কালিম্পঙে শেষ রচনা লেখেন ২৫ সেপ্টেম্বর— তার পর 'রোগশয্যায়'এর কবিতা 'জপের মালা' (৩-সংখ্যক) লিখিলেন ৩০ অক্টোবর। সেই হইতে রচনার উৎস আবার খুলিয়া গেল— 'রক্তে জোয়ার' আসিল না সত্য, কিন্তু ক্ষীণ স্রোত দেখা দিল। ইহার মধ্যে বাণীর জন্য অনুরোধ আসে— অন্ধদের দুঃখলাঘব-শিবির (Blind Relief Camp) প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাঁহাকে কয়েক ছত্র লিখিয়া দিতে হইবে; এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন কলিকাতার লর্ড বিশপ ও ভারতের মেট্রোপলিটন— খ্রীষ্টীয় চার্চের সর্বাধ্যক্ষ— স্বর্গীয় এনড্রুজের বন্ধু ও তাঁহার অন্তিমশয্যার আশীর্বাদক। কবি এই কয়টি পঙ্‌ক্তি লিখাইয়া পাঠাইয়া দিলেন (২ নভেম্বর)—

আলোকের পথে প্রভু, দাও দ্বার খুলে—
আলোকপিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,
প্রদোষের ছায়াতলে হারায়েছে দিশা,
সমুখে আসিছে ঘিরে নিরাশার নিশা,

১ পূর্বোল্লিখিত নির্বাণ, পৃ ২২।

নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহারা,
আঁধারের আবরণে খোঁজে ধ্রুবতারা,
তাহাদের দৃষ্টি আনো রূপের জগতে—
আলোকের পথে।[১]

পরদিন (৩ নভেম্বর) যে কবিতাটি লেখেন (রোগশয্যায় ৪) সেটি এই কবিতারই অনুক্রমণ। কবির নিজ দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তাই যেন লিখিতেছেন—

অজস্র দিনের আলো . .
দু চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি, মহারাজ।

কলিকাতায় ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ছিলেন; সে সময়ে 'রোগশয্যায়'এর ১০টি কবিতা লিখিত হয়। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াও 'রোগশয্যায়'এর কবিতা রচনা চলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। তখন থেকে শুরু হয় প্রধানত 'আরোগ্য'র কবিতাগুচ্ছ; তাহার সঙ্গে আছে 'গল্পসল্প', ও 'জন্মদিনে'র কবিতা, অন্যান্য পাঁচ রকমের রচনা ও চিঠিপত্র। সবই অনুলিখিত হয়— আর নিজে পারেন না।

রোগের কষ্ট ও যাতনাকে কবি আজ নিজ ব্যক্তিসত্তার বাহিরে অনাদিকালের সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে দেখিতেছেন। বিশ্বসৃষ্টিকে এক সময়ে নৃত্যলীলা রূপে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।[২]

আজ বলিতেছেন—

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে,
চূর্ণ হতে থাকে গ্রহতারা।
উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যত
দিক্‌বিদিকে অস্তিত্বের বেদনারে
প্রলয়দুঃখের রেণুজালে
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে।[৩]

অন্য আর-একটি কবিতায় বলিলেন-

১ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, পৃ ২৭০। ২ গীতবিতান, পৃ ৫৪৪।
৩ রোগশয্যায় ৫, জোড়াসাঁকো, ৪ নভেম্বর ১৯৪০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি অনাদি আকাশে।

মানুষের জয়গান কবি চিরদিন করিয়াছেন; আজ দেহযন্ত্রণার মাঝেও যে মুক্ত চেতনার দুর্জয় শক্তি অনুভব করিতেছেন তাহার বিস্ময় কবিকে অভিভূত করে—

মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।..
মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহদুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।
এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা—
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে—
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি,..

কিন্তু সর্বমানবের মধ্যে সচেতনে দুঃখকে বরণ করিয়া চলিবার আনন্দ-আবেগ আজও বিশ্বব্যাপী হয় নাই; কারণ মানুষ এখনো অসম্পূর্ণ। তাই—

আদিমহার্ণবগর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণহস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ,
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে।
মূর্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।[১]

কবিদের বিশ্বাস, মানুষ বহু ভাঙাচোরার মধ্য দিয়া গিয়া অবশেষে একদিন পূর্ণতা লাভ করিবে। তাঁহাদের এ স্বপ্ন যদি সত্য হয় তবে বৈচিত্র্যহীন সে পৃথিবী কি বাসের যোগ্য থাকিবে? সমগ্রের জন্য পূর্ণতার আশা কবিস্বপ্ন মাত্র।

১ রোগশয্যায় ৯, জোড়াসাঁকো, ১৩ নভেম্বর ১৯৪০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

কিন্তু স্বপ্নজগৎ ছাড়া জাগ্রত জগতের প্রতিও কবির দৃষ্টি আজ তেমনই দরদে পূর্ণ, সে দরদ মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ গাছপালা ফুলফলে— বিশ্বচরাচরে সমভাবেই ব্যাপ্ত। বিনিদ্র রজনী-শেষে আলোর প্রথম অভ্যুদয়কে তিনি অভিনন্দিত করেন; আবার সকলের বিরক্তি-উৎপাদক চড়ুই পাখি, কোনো কবি যাহার জন্য দুইটি পঙ্‌ক্তিও লিখিয়া যান নাই— তাহাকে অমর করিয়া গেলেন ছন্দোমধ্যে।

ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি,
একটুখানি আঁধার থাকতে বাকি
ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে
শাসির পরে ঠোকর মার' এসে,
দেখ কোনো খবর আছে নাকি।[১]

সমস্ত কবিতাটির মধ্যে কী দরদ, কী সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ! কত পাখি কত গাছ কত ফুল, যাহাদের কোনো কবি সম্মান দেন নাই, তাহাদের কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন— সে সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারে।

শান্তিনিকেতনে শেষবার

কবি ১৭ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতন হইতে বাহির হইয়াছিলেন; সেখানে ফিরিলেন দুই মাস পরে ১৮ নভেম্বর। কলিকাতা-বাস-কালে 'রোগশয্যায়'এর কবিতা লিখিতেছিলেন, শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া সে ধারা চলিল।[২] প্রত্যাবর্তনের পরদিন লেখেন 'ছড়া' (৭-সংখ্যক) 'গলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়ি' ইত্যাদি। 'রোগশয্যায়'এর কবিতাগুলি ৩০ অক্টোবর হইতে ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে লিখিত। এই কাব্যখণ্ডের অনির্দিষ্ট উৎসর্গপত্রে যে-দুইটি নারীর কথা আছে, 'নির্বাণে' প্রতিমা দেবীর সাক্ষ্য অনুসারে তাঁহারা হইতেছেন নন্দিতা কৃপালনি ও অমিতা ঠাকুর। নন্দিতা কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর কন্যা; অমিতা স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা— অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, তাঁহাদের বাড়ির বধূ।

কবির শেষ অসুস্থতার সময়ে যে কয়জন ব্যক্তি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, সুধাকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। তিনি রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছেন,[৩] "রোগের নিদারুণ যন্ত্রণায় রোগী কাতরতা প্রকাশ করে এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু . . রোগকাতর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা যা লক্ষ্য করলুম, তা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ব্যাপার। যন্ত্রণাকে অবিচলিতভাবে সহ্য করার অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যাঁরা তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন তাঁদের চিত্তবিনোদন করেন তিনি নানারকম হাস্য-পরিহাস দিয়ে, নিজের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করবার উপায়ও হয়তো তাই। বিমর্ষতার চর্চা করা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।"

রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা বলে জানি—

১ রোগশয্যায় ৬, জোড়াসাঁকো, ৪ নভেম্বর ১৯৪০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

২ 'রোগশয্যায়' গ্রন্থে ৩৯টি কবিতা; তন্মধ্যে কলিকাতায় ৩০ অক্টোবর হইতে ১৫ নভেম্বর ১৯৪০ -এর মধ্যে ১২টি কবিতা লিখিত হয়। অপর ২৭টি শান্তিনিকেতনে লেখা— ১৯ নভেম্বর হইতে ৫ ডিসেম্বর ১৯৪০। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫। ৫ ডিসেম্বরে লেখা একটি কবিতা 'আরোগ্য' গ্রন্থ-ভুক্ত হইয়াছে (২৫-সংখ্যক)। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ ৬২।

৩ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭। পৃ ৪৭৩-৭৭।

তার চেয়ে বিনা বাক্যে আত্মহত্যা ভালো।
মুখশ্রীর করিবে কি প্রতিবাদ
মুখোশের নির্লজ্জ নকলে।[১]

রোগ-কক্ষ যাহাতে বিষাদময় না হইয়া উঠে তজ্জন্য তাঁহার কী চেষ্টা! মাঝে মাঝে মুখে মুখে ছড়া কবিতা বলিয়া সকলকে আনন্দিত রাখিবার চেষ্টা করেন; পার্শ্বের সেবক বা সেবিকারা লিখিয়া লইতেন। সেবিকাদের মধ্যে নন্দিতা, বৃদ্ধ 'দাদামহাশয়ের সেবাশুশ্রূষার অধিকাংশ কর্তব্যের ভার তিনি নিয়েছেন পরমানন্দে।' তাঁহার উদ্দেশে লেখেন 'গানের সুরে রাঙা পরিহাস'—

ঐ দেখা যায় তোমার বাড়ি
চৌদিকে মালঞ্চ ঘেরা,
অনেক ফুল তো ফোটে সেথায়
একটি ফুল সে সবার সেরা। ইত্যাদি

'মালঞ্চ' নন্দিতাদের বাড়ির নাম। এই ধরণের কয়েকটি ছড়া সুধাকান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।[২]

সুস্থ থাকিলে অনেক সময়েই কবি সকালেই লেখা লইয়া বসেন। সুধাকান্ত বলিতেছেন, "লেখার কাজ শেষ হলেই ডাক পড়ে সেই 'পূর্ববঙ্গীয় ব্যক্তিটি'র যিনি কবি সুধীরচন্দ্র কর বলে পরিচিত। ইনি রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনার রক্ষক। এঁর কাছে সযত্নে থাকে সব জমা। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে ঐ তহবিল থেকে গান কবিতা খরচের হিসেবে চলে যায় এক-একটি কাগজে, পাঠকসমাজের কাছে। এ ক্ষেত্রে একটু বলে রাখা ভালো যে, এই হিসাবী ভাণ্ডারী এই জমা-খরচের কারবারে জমার অঙ্কে রস-সামগ্রীর ঘাটতি পড়লেই, অমনি কবিকে তাগিদ দিয়ে জমার ঘরে নূতন রচনা সংগ্রহ করে নেন। এর উদ্দেশেই 'বাঙাল' শীর্ষক ছড়াটি রবীন্দ্রনাথ তৈরী করেছিলেন" (২২ ডিসেম্বর ১৯৪০)। কবি প্রায়ই বলেন, "আর বেশিদিন নয়.. ক্লান্ত হয়ে গেছে মন, এবার বিদায় নিলেই হয়।" শেষ দাঁড়ি টানিয়াছেন বলিয়া ভাবিতেছেন— কিন্তু—

বাঙাল যখন আসে মোর গৃহ-দ্বারে
নূতন লেখার দাবি লয়ে বারে বারে,
আমি তারে হেঁকে বলি সরোষ গলায়—
শেষ দাঁড়ি টানিয়াছি কাব্যের কলায়।
মনে মনে হাসে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে!
তার পর এ কী! সকালে উঠিয়া দেখি
নির্লজ্জ লাইনগুলো যত
বাহির হইয়া আসে গুহা হতে নির্ঝরের মতো।
পশ্চিম-বঙ্গের কবি দেখিলাম মোর
বাঙালের মতো নেই জেদের অপ্রতিহত জোর।

১ রোগশয্যায় ২৪, উদয়ন, ২৬ নভেম্বর ১৯৪০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।
২ রবীন্দ্র-দৈনিকী, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭, পৃ ৬১৪-১৫।

যে রবীন্দ্রনাথ সেবা গ্রহণ করিতে চিরকাল পরাঙ্মুখ ছিলেন, আজ তিনি অসহায়ভাবে সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী।[১]

সজীব খেলনা যদি
গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে
কী তাহার দশা হয়
তাই করি অনুভব
আজি আয়ুশেষে।[২]

পরের সেবা, বিশেষভাবে নারীর সেবা, কবি কখনো তেমন গ্রহণ করেন নাই— প্রয়োজনও হইয়াছে কম। আজ সেবিকারূপিণী নারীকে নূতনভাবে দেখিতে পাইতেছেন।[৩] নারীপ্রশস্তি কবিধর্ম; রবীন্দ্রনাথ অগণিত কবিতায় আকৈশোর নানা ভাবে নারীর স্তুতি করিয়াছেন; কিন্তু চারি দিকে আজ নারীর কী অপমান, পুরুষের কী ঘৃণ্য ব্যবহার! বাংলাদেশে নারীর অপমান-কাহিনী নিত্য কানে আসে। এই সময়ে (১৯৪০) বাংলাদেশে মুসলিম লীগের শাসন চলিতেছে। নারীহরণ ও নারীনির্যাতন দেশের দৈনন্দিন ঘটনা। অথচ অপরাধের দমন নাই। অপরাধীর শাসন নাই। মনের এই অবস্থায় 'অবিচার' (১৯ ডিসেম্বর) কবিতাটি লিখিত হয়—

নারীর দুঃখের দশা অপমানে জড়ানো
এই দেখি দিকে দিকে ঘরে ঘরে ছড়ানো; . .
অর্ধেক কাপুরুষ অর্ধেক রমণী।
তাতেই তো নাড়ী-ছাড়া এ-দেশের ধমনী।
বুঝিতে পারে না ওরা এ বিধানে ক্ষতি কার,
জানি না কী বিপ্লবে হবে এর প্রতিকার।
একদা পুরুষ যদি পাপের বিরুদ্ধে
দাঁড়ায়ে নারীর পাশে নাহি নামে যুদ্ধে
অর্ধেক কালীমাখা সমাজের বুকটা
খাবে তবে বারে বারে শনির চাবুকটা।
এত কথা বৃথা বলা, যে পেয়েছে ক্ষমতা
নিঃসহায়ের প্রতি নাই তার মমতা,
আপনার পৌরুষ করি দিয়া লাঞ্ছিত
অবিচার করাটাই হয় তার বাঞ্ছিত।[৪]

একদিন রোগশয্যায় শুইয়া কবি রানী চন্দকে বলেন, "এক হিসেবে নারী হচ্ছে universal, তাদের স্থান হচ্ছে সৃষ্টির মূলে। দয়া, সেবা, লালনপালন এতেই তাদের সত্যকার রূপ প্রকাশ পায়। পুরুষ যেমন

১ কবির শুশ্রূষাকারী ও সেবিকাদের মধ্যে ছিলেন অনেকেই: নন্দিতা কৃপালনি, অমিতা ঠাকুর, রানী মহলানবিশ, শ্রীমতী ঠাকুর, মৈত্রেয়ী সেন, রানী চন্দ, সুরেন্দ্রনাথ কর, বিশ্বরূপ বসু, অনিলকুমার চন্দ, তেজেশচন্দ্র সেন, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, বিনায়ক মাসোজি প্রভৃতি।

২ রোগশয্যায় ১৯, উদয়ন, ২৩ নভেম্বর ১৯৪০।

৩ দ্র রোগশয্যায় ১৪।

৪ অবিচার, প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭, পৃ ৪২৯।

বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি, কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা নয়। সব নারী মিলে— এক নারী।"[১] এই দিন কবি লেখেন 'নারী' কবিতাটি।[২] কবিতাটি লিখিয়া কবি রানী দেবীকে দিয়া বলেন, "তোকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বের নারীদের লিখেছি। রোগী তোদের কাছে দেবতা।"

যে অভাগ্য নাহি লাগে কাজে,
প্রাণলক্ষ্মী ফেলে যারে আবর্জনা-মাঝে,
তুমি তারে আনিছ কুড়ায়ে,
তার লাঞ্ছনার তাপ স্নিগ্ধ হস্তে দিতেছ জুড়ায়ে।

তাঁহার শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন নিত্য জাগ্রত; তাঁহার সেবাকে কবি অমর করিয়া গেলেন 'আরোগ্য' কাব্য উৎসর্গ দ্বারা। এই কবিতার মধ্যে আছে—

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে—
কেহ বা খেলার সাথি, কেহ কৌতুহলী,
কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধা।
আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়-স্পর্শ দিতে।
তোমরা পথিক-বন্ধু,
যেমন রাত্রির তারা
অন্ধকারে লুপ্তপথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে॥

সত্যই সুরেন্দ্রনাথের নীরব চিরসহিষ্ণু সেবা সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। আর-একটি কবিতায় সরোজরঞ্জনের সেবানিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন।[৩] বিশ্বরূপ বসুর কথাও আছে সেইদিনের আর-একটি রচনায়।[৪] অপরদের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

পাশে যারা দাঁড়ায়েছে দিনান্তের শেষ আয়োজনে,
নাম নাই বলিলাম তাহারা রহিল মনে মনে।
তাহারা দিয়েছে মোরে সৌভাগ্যের শেষ পরিচয়, . .

সুধাকান্ত সম্বন্ধে একটি কবিতা মুখে মুখে বলেন, সেটি প্রকাশিত হয় নাই; নিম্নে পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।[৫]

১ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৭২।

২ আরোগ্য ২৩, ১৩ জানুয়ারি ১৯৪১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

৩ আরোগ্য ২১, ৯ জানুয়ারি ১৯৪১।

৪ আরোগ্য ২০, ৯ জানুয়ারি ১৯৪১।

৫ আরোগ্য ১৫, ৯ জানুয়ারি ১৯৪১।

৬ উদয়ন, ১২ মার্চ ১৯৪১। রবীন্দ্রভবন থেকে প্রাপ্ত—

সুধাকান্ত
বচনের রচনে অক্লান্ত—
মুখে কথা নাহি বাধে,
পসরা ভরিয়া রাখে বহুবিধ কুড়ানো সংবাদে,
প্রত্যহ কণ্ঠের পায় সাড়া
পাড়া হতে পাড়া।
আজি তার আত্মত্যাগ বাক্যত্যাগে হয়েছে কঠোর
রোগীর সেবার কার্যে মোর।

এই অসুস্থতার মধ্যেও বিশ্বভারতীর সংবাদ রাখেন সবই। এই সময়ে চীন হইতে ভারতে যে goodwill mission আসে, তাহার অধিকর্তা হইয়া আসেন তাই-চি-তাও; ইনি চীনা যুয়ান বা ব্যবস্থাপক সভার বিশিষ্ট সভাপতি, চীনের পাবলিক সার্বিস কমিশনের সভাপতি, চীন-হিন্দু-সংস্কৃতি সমাজের সভাপতি এবং চীনের অগ্নিযুগে সানইয়াৎ সানের অন্যতম সহায়ক ছিলেন।

তাই-চি-তাও প্রমুখ চীনা শুভেচ্ছা বাহিনীর সদস্যরা ৯ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে আসিলেন। পরদিন প্রাতে আম্রকুঞ্জে অতিথিদের যথারীতি অভ্যর্থনা হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ বলিয়া তাই-চি তাওকে তাঁহার কক্ষেই লইয়া যাওয়া হয়। দোভাষীর সাহায্যে উভয়ের বাক্যালাপ হইতে থাকে। কথাপ্রসঙ্গে তাই-চি-তাও বলেন, "আমি বাহির হইতে অতিথির ন্যায় এখানে আসি নাই, অন্তরের রাজ্যে আমি এই দেশেরও অধিবাসী। . . যে-সময়ে চীন ও ভারত আপনাদের যথার্থ সত্তাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল, সেই মুহূর্তে চীনদেশে আপনার আবির্ভাব দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ। ১৯২৪ সালে আপনি যে কেবল ভারতবর্ষের বাণীই চীনে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা নয়, আপনি আমাদিগের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে আমরা পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার মায়াপাশ ছেদন করিয়া নিজেদের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ চিনিয়াছি; সেই সময় হইতেই আমাদের সংস্কৃতির নবযুগের সূচনা।" বিদেশীর পক্ষে এইটি যে কত বড়ো স্বীকৃতি তাহা ভাবিলে বিস্ময় লাগে। দুর্বল চীনের প্রতি বহিঃশত্রুর উপদ্রবের বিরুদ্ধে কবি চিরদিন প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, তবে তাঁহার আশা যে 'আপন বীর্যের বলে সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া চীন স্বাধীনতার পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।'[১]

কবির মনে চীনের কথা জাগিতেছে, তাই-চি-তাও ও তাঁহার সঙ্গীরা চলিয়া যাইবার পরদিন প্রাতে লিখিলেন:

সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে
সংবাদে ছিল না মুখরিত
নিস্তব্ধ খ্যাতির যুগে—

ও পাশের ঘরে
দিন কাটে সঙ্গীহীন নিঃশব্দ প্রহরে।
বাধা দেয় যাদের প্রবেশে
আহা যদি কাছে পেত এই ব'লে মরে যে ক্ষোভে ক্ষে।
তবু বিধাতার বর
আছে তার 'পর,
বাক্যরুদ্ধ হয়ে গেলে তবু তার কাছে
অন্য পথ আছে।
অনায়াসে শব্দ আর মিল
কলমের মুখে তার করে কিলবিল।
মোর দিন মান
মুখর খাতায় তার যাহা তাহা দিতেছে জোগান
রচে বসি তুচ্ছতার ছবি—
ভয়ে মরি ছাই-চাপা পড়ে বুঝি কবি।
মনে আছে একমাত্র আশা
বুদ্‌বুদের ইতিহাসে সুদীর্ঘ কালের নেই ভাষা।
বাহিরেতে চলিয়াছে দেশে দেশে বিরাটের পালা
অকিঞ্চিৎকরের স্তূপ জমাইছে এ আরোগ্যশালা।
লিখিবার কথা কোথা রুদ্ধ ঘরে দু চক্ষু বুলাই।
কোনোমতে ছড়া কেটে নিজেরে ভুলাই।
ধাক্কা তারে দেয় পিছে খ্যাপা উনপঞ্চাশ বায়ু,
এ বেলা ও বেলা তার আয়ু,
এরি মধ্যে কপি-বেশে সুধাকান্ত এল,
ইহাকেই বলে না কি strange bed-fellow!

১ শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও তাই-চি-তাও সংবাদ; প্রবাসী, পৌষ ১৩৪' পৃ ৪২৩-২৪। On Cultural Relations, Between India and China by Tai-Chi-Tao, with a biographical introd ction by Tan-Yun-Shan. The Sino-Indian Cultural Society in India Pamphlet No. 8, January 1947।

আজিকার এইমত প্রাণযাত্রাকল্লোলিত প্রাতে
যাঁরা যাত্রা করেছেন
মরণশঙ্কিল পথে
আত্মার অমৃত-অন্ন করিবারে দান
দূরবাসী অনাত্মীয় জনে,
দলে দলে যাঁরা . .
মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে,
সমুদ্র যাঁদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া,
অনারব্ধ কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা,
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে,
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি,
আজি এই প্রভাত-আলোকে—
তাঁহাদের করি নমস্কার।[১]

সেইদিন প্রাতে কবি সাতই পৌষের ভাষণটি মুখে মুখে বলিয়া যান, অমিয় চক্রবর্তী সেইটি লিখিয়া লন; পরে কবি সেটি দেখিয়া দেন। ভাষণটির নাম 'আরোগ্য।'[২] কবি বলেন, "আজ আমি রোগের দশা অতিক্রম করছি ব'লেই আরোগ্য কাকে বলে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করি, কিন্তু যথার্থ আরোগ্য সে জীবনের সকল অবস্থারই সম্পদ।" যৌবনের তেজ যখন প্রখর থাকে লোকে তখন ভাবে, বার্ধক্যটা একটা অভাবাত্মক দশা, অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে সমস্ত শক্তি হ্রাস হইয়া সেই দশা মৃত্যুর সূচনা করে। কিন্তু আজ কবি ইহার ভাবাত্মক দিক উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। তাই বলিতেছেন, "সত্তার যে বহিরঙ্গ, যাকে আমরা অহং নাম দিতে পারি, তার থেকে শ্রদ্ধা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে।"

কবির মনে সদ্যপ্রত্যাগত চীনা অতিথিদের কথা জাগিতেছে। তাহাদের দুঃখ তাঁহাকে পীড়িত করে, তাহাদের বীরত্বের মধ্যে আশার অরুণালোক দেখিতে পান। ভারত ও চীনের ক্ষেমধর্মের আদর্শে কবির গভীর শ্রদ্ধা। তাই তিনি আশা করেন একদিন চীনের আত্মবিরোধের অবসান হইবে, তখন চীন তার সেই চিরন্তন প্রাচীন শান্তিকে পুনরায় পৃথিবীতে স্থাপন করিতে পারিবে। ভারত সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ আশা। জীবনের সন্ধ্যায় চারি দিকের অকথিত বর্বরতার মধ্যে এখনো 'শান্তি এবং কল্যাণ এবং সর্বমানবের মধ্যে ঐক্য' আদর্শে কবি আস্থাবান। তাঁহার শেষ পৌষ-উৎসবের কামনা, "আমাদের পিতামহের মর্মস্থান থেকে উচ্চারিত [শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্] এই বাণী আমাদের প্রত্যেকের ধ্যানমন্ত্র হয়ে জগতে শান্তির দৌত্য করতে থাক্। . . মানুষের সম্বন্ধে অদ্বৈতবুদ্ধি অর্থাৎ অখণ্ড মৈত্রী প্রচার করবার জন্য সেদিনকার বুদ্ধভক্ত ভারত থেকে প্রাণান্ত স্বীকার করেও দেশবিদেশে অভিযান করেছিল,

১ প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭, পৃ ৪৬৬; জন্মদিনে ১৭, উদয়ন, শান্তিনিকেতন, ১২ ডিসেম্বর ১৯৪০।

২ আরোগ্য। উদয়ন, শান্তিনিকেতন, ১২ ডিসেম্বর ১৯৪০; শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী-কর্তৃক অনুলিখিত, কবি-কর্তৃক অনুমোদিত, ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন-কর্তৃক পঠিত; প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭, পৃ ৪৬৪-৬৬।

পরস্পরকে আত্মসাৎ করবার জন্তে নয়।"[১]

পৌষ-উৎসব (১৩৪৭) আসিয়াছে ; ৫ পৌষ ছেলেমেয়েদের আনন্দবাজারের মেলা। কবির মন ছাত্রদের উৎসবক্ষেত্রে। মৈত্রেয়ী দেবী, প্রতিমা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী ও সুধাকান্তের কাছে সেইদিন তিনি গল্প করিয়া বলেন, পূর্বে একবার ছেলেরা কী করিয়া তাঁহার কাছ হইতে টাকা আদায় করিয়াছিল ; আরো বলিলেন, "এবার তো আমি যেতে পারব না। তা আমার বৌমার [প্রতিমা দেবী] কাছে পাঁচ টাকা জমা আছে . . সেই টাকা আনন্দবাজারের দোকানীদের দিয়ে আসবে।" আনন্দবাজারের লভ্যাংশ দরিদ্রভাণ্ডার বা বিশেষ কোনো সেবাকর্মে ব্যয়িত হয়।

পৌষ-উৎসবের দিন মন্দিরে কবি উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আশ্রমে উপস্থিত আছি অথচ ৭ই পৌষের উৎসবের আসন গ্রহণ করতে পারি নি এরকম ঘটনা আজ এই প্রথম ঘটল।"

এই দিন প্রাতে উপাসনার নিবেদনের ন্যায় যে ক্ষুদ্র কবিতাটি (জন্মদিনে, ২৩) লেখেন, তাহার শেষ কয় পংক্তি বিশ্বপ্রসবিতা সবিতার ধ্যান—

হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

জীবনের শেষ সাতই[২] পৌষ— ১৩৪৭। কবি মন্দিরে যাইতে পারেন নাই, সেই সকালে লিখিলেন 'ভক্ত কুকুর' সম্বন্ধে কবিতা।[৩] আজ কবির সহানুভূতি সর্বত্র বিরাজমান— সামান্য এক কুকুরের প্রতিও—

দেখি যবে মূক হৃদয়ের
প্রাণপণ আত্মনিবেদন
আপনার দীনতা জানায়ে,
ভাবিয়া না পাই ও যে কী মূল্য করেছে আবিষ্কার
আপন সহজ বোধে মানবস্বরূপে ;
ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা

১ আরোগ্য। প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭, পৃ ৪৬৪-৬৫।

২ এই শেষ সাতই পৌষের (১৩৪৭) দিন কবি প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের অটোগ্রাফের খাতায় এই কয়টি পংক্তি লিখিয়া দিলেন—

বরষে বরষে শিউলিতলায়
ব'স অঞ্জলি পাতি,
ঝরা ফুল দিয়ে মালাখানি লহ গাঁথি ;
এ কথাটি মনে জানো
দিনে দিনে তার ফুলগুলি হবে ম্লান—
মালার রূপটি বুঝি
মনের মধ্যে রবে কোনোখানে
যদি দেখ তারে খুঁজি।
সিন্দুকে রহে বন্ধ,
হঠাৎ খুলিলে আভাসেতে পাও
পুরানো কালের গন্ধ।

প্রদ্যোতকুমার শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। ১৩৪২ হইতে ১৩৪৭ পর্যন্ত প্রতিবৎসর সাতই পৌষ তিনি কবির নিকট হইতে অটোগ্রাফ গ্রহণ করেন। সেগুলি প্রকাশিত হয় প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭, পৃ ৪৩০-৩১।

৩ আরোগ্য ১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না—
আমারে বুঝায়ে দেয় সৃষ্টিমাঝে মানবের সত্য পরিচয় ॥

সেইদিন সন্ধ্যায় অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে কবির 'মানবিক অভিব্যক্তি' সম্বন্ধে যে দীর্ঘ আলোচনা হয়, তাহা সুধাকান্ত সুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[১]

শরীর ভালো থাকিলে সন্ধ্যায় কবি নানা রকমের আলোচনা করেন; অমিয় চক্রবর্তী উপস্থিত থাকিলে কথাবার্তা জমে ভালো। জগদ্‌ব্যাপী যুদ্ধের কথা উঠায়একদিন বলিলেন, "মানুষকে মানুষ মারছে পশুর মতো, কী ভয়ংকর নির্মমতা। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার দেখো, একদল মানুষ এইসব দুঃখ কী তীব্রভাবে অনুভব করছে অন্তরে। এই যে তোমার মনে আমার মনে বাজছে—আরো কত লোকের মনে ব্যথা বাজছে— এর কারণ কী? আমার মনে এর একটা গূঢ় কারণের সন্ধান পাই। . . আমার চিন্তায় এবং অনুভূতিতে টের পাই— একটা বিরাট মানব-সত্তা আছে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে জুড়ে, যে-সত্তার মধ্যে ক্রমাগত চলেছে একটা ভালোর তপস্যা।. .

"সকলের মধ্যে একটা সাধারণ ভালোর জন্য একটা তাগিদ আছে, সকলের মধ্যেই অকল্যাণের বিরুদ্ধে কম-বেশি প্রতিবাদ আছে। . . বিরাট মানবসত্তার মধ্যে সব কালকে জড়িয়ে অনন্তকাল ধরে যে ভালোর তপস্যা চলেছে, ঐ সব মানুষের মধ্যেও একটি অবিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্রে চলেছে তারি ক্রিয়া।

"কিন্তু সে ঐক্যের ভিতর দিয়ে যে মানুষ সেই বিরাট মানবসত্তার পরম লক্ষ্যের কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর না হতে পারে— সে চলে যায়, ঝরে যায়। . . আমগাছে মুকুলের অজস্রতা ঘটে। কিন্তু সেই অগণ্য মুকুলের মধ্যে যারা ফলের পূর্ণতাকে প্রাপ্ত না হয়ে ঝরে যায় মরে যায় তাদের কথা কেউ ভাবে না . .।" ইহাই হইতেছে প্রকৃত ঘটনা— প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যাহারা উঠিল না তাহারা গেল অতলে; জগতে দেখা যায় মহৎদেরই লোকে স্মরণে রাখে। এই মহৎ কে? কবি বলিতেছেন, "বহুযুগ ধরে যে মনের সত্তা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানকে নিয়ে রয়েছে তারই পরম লক্ষ্যের দিকে যখন কোনো মানুষের মনুষ্যত্বের পরিণতি সার্থক হয়েছে তখন তিনি হয়েছেন মহৎ। . . তাঁর বিনাশ নেই, তিনি পৌঁচেছেন পরম সত্যে।" এই প্রাকৃত ও মহতের মধ্যে বহুস্তরে বহু মানবের উদ্‌ভব হয়। "সংসারে যাঁরা কিছু ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছেন কিম্বা এক-একটা বিষয়ে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা জীবজগতের মধ্যে নিশ্চয়ই এক-একটি পর্যায়ের এক-এক পংক্তিতে কেউ এতটুকু বড়ো কেউ অতটুকু বড়ো হয়েছেন, সেটা মনের এবং সেই দিক দিয়ে ইন্‌টেলিজেন্‌সের একটা ক্রমবিকাশের ফল বলতে পার। কিন্তু তাঁরাও, আমি যে মানবাত্মার কথা বলছি সেই বিরাট আত্মার লক্ষ্যের অন্তর্গত নন।" এই শ্রেণীর প্রতিভাবানদের সম্বন্ধে কবি বলিলেন যে, কালের বুকে ইহাদের স্মৃতিও মুছিয়া যায়। "কেননা তাঁদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা সবই কেবলমাত্র জীবলোকের এক-একটা দিকের অনন্য-সাধারণতার অন্তর্গত।" কবির মতে "মানুষের যেটা পরম সার্থকতা সেটা আত্মার অনুভূতিতে, সেই বিরাট মানবাত্মার সঙ্গে যে মানুষের একাত্মতার অনুভূতি এবং উপলব্ধি যত গভীর সে মানুষ ততটাই সত্য। . . যে মানুষ আত্মার রাজ্যে সেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতাকে না উপলব্ধি করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে, যেমন করে ব্যর্থ হয় ফল-না-হওয়া কত ফুল, তাদের সুখদুঃখের পর্ব ক্ষণিকতার মধ্যে কিছুক্ষণ বেঁচে থেকেই কালের মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে যায়, তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই।" কবির বিশ্বাস এই শ্রেণীর মহামানব বা মহাত্মা যাঁহারা পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম, "তাঁরা ভবিষ্যতের লোকে রচনা করেন তাঁদের আসন। সে-আসন থেকে কেউ তাঁদের নামাতে পারে না। . . তাঁরা সাময়িক সুখদুঃখকে নির্ভয়ে

১ প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭, পৃ ৪৭৬-৭৭।

আনন্দে জলাঞ্জলি দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে স্থির করেছেন তাঁদের সাধনা।" কবি-জীবনের শেষ পৌষ-উৎসবের এই দুইটি দিন স্মরণীয়।

এই উৎসবের অন্তর্গত খ্রীষ্ট-জন্মদিনে কবির মনে চারি দিকের নৃশংসতা যে দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেছে, তাহার প্রকাশ হয় 'প্রচ্ছন্ন পশু' (২৪ ডিসেম্বর ১৯৪০) কবিতায়—

সংগ্রাম-মদিরা-পানে আপনা-বিস্মৃত
দিকে দিকে হত্যা যারা প্রসারিত করে
মরণলোকের তারা যন্ত্রমাত্র শুধু,
তারা তো দয়ার পাত্র মনুষ্যত্বহারা।
সজ্ঞানে নিষ্ঠুর যারা উন্মত্ত হিংসায়
মানবের মর্মতন্তু ছিন্ন ছিন্ন করে
তারাও মানুষ ব'লে গণ্য হয়ে আছে,
কোনো নাম নাহি জানি বহন যা করে
ঘৃণা ও আতঙ্কে মেশা প্রবল ধিক্কার,
হায় রে নির্লজ্জ ভাষা হায় রে মানুষ!
ইতিহাস-বিধাতারে ডেকে ডেকে বলি
প্রচ্ছন্ন পশুর শাস্তি আর কত দূরে
নির্বাপিত চিতাগ্নিতে স্তব্ধ ভগ্নস্তূপে।[১]

দেহের এই অবস্থাতেও কোনো দিকে কোনো ত্রুটি না হয়—তাহার দিকে সজাগ দৃষ্টি আছে। এখনো কেহ কোনো অভিমত চাহিলে তাহাকে বিফলমনোরথ করেন না। এই সময়ে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'য় প্রকাশের জন্য ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য -লিখিত 'আহার ও আহার্য' নামক গ্রন্থখানি কবির কাছে আসে। ডাক্তার পশুপতিকে কবি খুবই স্নেহ করিতেন; ইতিপূর্বে তাঁহার 'ভারতীয় ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' গ্রন্থ পাঠ করিয়া অভিমত দিয়াছিলেন। এবারও বইখানি দেখিয়া কবি খুশি হইয়া লিখিলেন (৬ জানুয়ারি ১৯৪১): "পশুপতি, পরিভাষাবর্জিত সরল প্রণালীতে রচিত পথ্যবিচার সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার ভালো লেগেছে ব'লে আমাদের লোকশিক্ষা গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছি। আমাদের দেশে কুপথ্যজীর্ণ পাকস্থলীর পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। আশা করি, তোমার এই লেখা দেশের লোকে আহার সম্বন্ধে অভ্যস্ত রুচির সংস্কার সাধনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করবে।"

রোগশয্যায় দিন যায়, কখনো কেদারায়, কখনো বিছানায়। রাত্রি কাটে, কখনো অনিদ্রায়, কখনো বিচিত্র ভাবনায়। ইহারই মধ্যে চলে বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টি— কোনোটি গম্ভীর, কোনোটি লঘু, কোনোটি গদ্য, কোনোটি পদ্য। যেদিন সকালে (৫ মাঘ) লিখিলেন "করিয়াছি বাণীর সাধনা / দীর্ঘকাল ধরি, আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে / উপহাস পরিহাস করি।" .. (জন্মদিনে) সেই দিনই লেখেন 'মিলের কাব্য'; হালকাভাবে লিখিত বলিয়া 'প্রহাসিনী'তে সংযোজিত কবিতাটি নিছক হাস্য উদ্রিক্ত করে না, তার প্রমাণ ইহার ভূমিকাটি।[২]

১ প্রচ্ছন্নপশু। প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭, পৃ ৪২৮। ২ কবিতা, চৈত্র ১৩৪৭।

কবি বলিতেছেন, "আমি ঠাট্টা করে বলে থাকি, আমার জীবনের প্রথম পালা কল্যাণরাগে, তখন সুস্থ শরীরে চলাফেরা চলত, দ্বিতীয় পালা এই কেদারা রাগিণীতে অচল ঠাটে বাঁধা।" হঠাৎ কবি বলিতে শুরু করিলেন, "যখন মনে ভাবি কিছু একটা হল, সুখদুঃখের তীব্রতা নিয়ে এমন করে হল যে কোনো কালে তার ক্ষয় হবে বলে ধারণাই হয় না, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাকাল পিছনে ব'সে ব'সে মুখ ঢেকে তার চিহ্নগুলো মুছতে শুরু করে দিয়েছেন। কিছুকাল পরে দেখি সাদা হয়ে গেছে, মনে যদি বা স্মৃতি থাকে তবু যে অনুভূতি তার সত্যকার প্রমাণ আজ লেশমাত্র তার বেদনা নেই। তা হলে যেটা হল শেষ পর্যন্ত সেটা কী। সংস্কৃত শ্লোকে প্রশ্ন আছে, রঘুপতির অযোধ্যাপুরী গেল কোথায়। রঘুপতির অযোধ্যা বহু লোকের বহুকালের নানাবিধ সুস্পষ্ট অনুভূতিতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই বিপুল অনুভূতি গেল শূন্য হয়ে। তা হলে যা ছিল সে কী ছিল। মস্ত একটা 'না' প্রকাণ্ড একটা 'হাঁ'য়ের আকার ধরেছিল। নাস্তিত্ব সে অস্তিত্বের জাল গেঁথেই চলেছে, আবার সে জাল গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের মধ্যে। এই দুর্বোধ রহস্যকে বাস্তব বলব কেমন করে। এই যে ইন্দ্রজাল এর মধ্যে দুইয়ের মিল চলেইছে, তাই একে মিত্রাক্ষর কাব্য বলতে হবে— একের উপাদানে সৃষ্টি হয়ই না। সৃষ্টি জোড় মিলনের কাব্য। গদ্যের ধারা শেষকালে মুখে মুখে ছড়ার ছন্দে লাইনে লাইনে গাঁট বেঁধে চলল।" 'মিলের কাব্য' কবিতাটির উদ্‌ভব এইভাবে হয়।

কাব্য বলে বেঠিক কথা, এক হয়ে যায় আর—
যেমন বেঠিক কথা বলে নিখিল সংসার।
আজকে যাকে বাষ্প দেখি কালকে দেখি তারা,
কেমন করে বস্তু বলি প্রকাণ্ড ইশারা।
ফোটা-ঝরার মধ্যখানে এই জগতের বাণী
কী যে জানায় কালে কালে স্পষ্ট কি তা জানি।
বিশ্ব থেকে ধার নিয়েছি তাই আমরা কবি
সত্য রূপে ফুটিয়ে তুলি অবাস্তবের ছবি।
ছন্দ ভাষা বাস্তব নয়, মিল যে অবাস্তব—
নাই তাহাতে হাট-বাজারের গন্ধ কলরব।
হাঁ-য়ে না-য়ে যুগল নৃত্য কবির রঙ্গভূমে।
এতক্ষণ তো জাগায় ছিলুম এখন চলি ঘুমে।[১]

ইতিমধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের[২] নিকট হইতে এক পত্র আসিয়াছে; তিনি কবির প্রায় সমবয়সী— তিনি নিজে পীড়িত, রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবনের পাথেয়রূপে আশিসপ্রার্থী হইলেন। কবি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—

হে বন্ধু, হে সাহিত্যের সাথি,
আসিছে আসন্ন হয়ে রাতি।

১ মিলের কাব্য, ১৯ জানুয়ারি ১৯৪০; দ্র প্রহাসিনী, সংযোজন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ৬৭-৬৮।

২ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩, মৃত্যু ২৯ নভেম্বর ১৯৪৯। হাস্যরসিক ও ঔপন্যাসিক। নিবাস দক্ষিণেশ্বর,২৪ পরগনা। পিতা গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার আগেই তাঁহাকে চাকুরিজীবন আরম্ভ করিতে হয়, চাকুরির জন্য ভিনদেশেও কাটাইতে হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহচর্যে সাহিত্যজীবনে প্রবেশ। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যের সংগঠনে ও 'উত্তরা' মাসিক পত্রিকার সঙ্গে তাঁহার নাম চিরকাল যুক্ত হইয়া থাকিবে। চাকুরি শেষ হইবার পূর্বেই অবসর লইয়া শেষ জীবন কাশীতে ও পূর্ণিয়ায় কাটান। বহু রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কাশীর কিঞ্চিৎ (রসকবিতা)), কোষ্ঠীর ফলাফল (উপন্যাস), এবং আই হ্যাজ (উপন্যাস)।

আছি দোঁহে দিনান্তের প্রদোষচ্ছায়ায়
পারের খেয়ার প্রতীক্ষায়।
পথে দীপ ধ'রে আছে জানি না সে কোন্ শুকতারা,
কোন্ প্রভাতের কূলে বিদায়ের যাত্রা হবে সারা।
মায়াবিজড়িত এই জীবনের স্বপ্নরাজ্য হতে
চির জাগরণ হবে পূর্ণের আলোতে—
মৃত্যুর আনন্দরূপ এ আশ্বাসে অন্তিম আঁধারে
দেখা দিবে এ জন্মের দ্বিধাদ্বন্দ্ব-পারে।
সহযাত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১]

জীবনের সন্ধ্যায় কত কথা মনে পড়ে— কতটুকু তার আজ ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন। মনে হইতেছে 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।'[২]

সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

কবি নিজ জীবনে সর্বলোকের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, সে খেদ তাঁহার ছিল।

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তার খোঁজে।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে শৌখিন মজ্দুরি।

১ 'পারের খেয়ার প্রতীক্ষায়', ১৭ জানুয়ারি ১৯৪১। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ৭২৪।
২ জন্মদিনে ১০। উদয়ন, ২১ জানুয়ারি ১৯৪১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করে দাও তুমি।
অন্তরে যে-উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি'। -
সাহিত্যে ঐকতান সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়,
মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশিরে স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনার খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।[১]

ছাব্বিশে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসের স্মরণেই বোধ হয় (২৪ জানুয়ারি) লিখিলেন একটি কবিতা—

সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা,
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা। . .

আজ মহাযুদ্ধে বৃটেন ভারতের সহায়তা চাহিতেছে— কিন্তু কে সাহায্য দান করিবে? আজ ভারতকে কী দুর্বল, কী অসহায় করিয়া রাখিয়াছে ইংরেজ।

সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহা দায়।
এক পাখা শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না স্থির,
সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন—
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।

১ ঐকতান। প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭, পৃ ৫৭০-৭৭; জন্মদিনে ১০, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।[১]

এ কি কবির ভবিষ্যদ্‌বাণী বৃটিশের ভাবী দশা সম্বন্ধে? বহু বৎসর পূর্বে কবি গাহিয়াছিলেন, "আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,/বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।" ইতিহাস কি আজ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে না? ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এখন (১৯৪১) অত্যন্ত সংকটাপন্ন; ইংরেজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যস্ত, ভারতের কোনো দাবিদাওয়া সে শুনিতে চায় না। সে চায় ভারতের আনুগত্য, যুদ্ধে সহযোগিতা। এ দিকে ভারতও স্বাধীনতা-লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব। স্বাধীনতাকামীদের পক্ষ হইতে সত্যাগ্রহ, সাম্রাজ্যবাদীদের তরফ হইতে নিগ্রহ যুগপৎ সমান্তরাল রেখায় চলিতেছে। গান্ধীজির অহিংসমন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা চিরদিনের; আজ ইংরেজ গভর্নমেণ্টের সন্ত্রাস-প্রয়াসকে উপেক্ষা করিয়া জবরদস্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য ভারত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কবির মনে আজ সেই কথাটি জাগিতেছে— তিনি লিখিলেন—

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী, কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।[২]

কবির মর্তজীবনের শেষ মাঘোৎসব আসিল। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে (১১ মাঘ ১৩৪৭) গুরুদয়াল মল্লিক উপাসনা করিলেন; তদনন্তর কবির অভিভাষণ[৩] পঠিত হয়। ইহার একস্থানে কবি স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, "১১ই মাঘের উৎসব যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাকে আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বীকার করে নি। যা তারা স্বীকার করে না তাকে কলঙ্কিত করে। যিনি পরমশ্রদ্ধেয়, যেমন মহাত্মা রামমোহন রায়, তাঁর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজও প্রশমিত হয় নি।" কবির মতে মহাপুরুষের 'সম্মানে স্বদেশের প্রতিই সম্মান' এ কথা আমরা ভুলিয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে রামমোহন যে কতখানি স্থান জুড়িয়া ছিলেন, যাঁহারা কবির লিখিত রামমোহন সম্বন্ধে রচনা ও মাঘোৎসবের ভাষণগুলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার সাক্ষ্য দিবেন। 'চিরস্মরণীয়' কবিতা (জন্মদিনে ১৮) রামমোহন-স্মরণেই রচিত।

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য-পরিচয়।
তাহাদের খর্ব করো যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে র'বে নিরবধি।

১ জন্মদিনে ২২। উদয়ন, ২৪ জানুয়ারি ১৯৪১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

২ গান্ধী মহারাজা, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪০।

৩ ১১ই মাঘ ১৩৪৭।. . প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭, পৃ ৫৭৮-৭৯। দ্র. ভারতপথিক রামমোহন (৩য় সং), পৃ ৩২-৩৭।

তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।[১]

শেষ মাঘোৎসবের দিন কবি দুইটি কবিতা লেখেন। প্রাতে লিখিলেন—

সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার,
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।
আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।..

এইটি আছে 'জন্মদিনে' গ্রন্থে (১৩)। অপরটি সন্ধ্যায় লিখিত, সেইটি আছে 'আরোগ্য' খণ্ডে (৩৩)—

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি,
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্বমানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।..

কবির জীবন কী গভীরে প্রবেশ করিতেছে তাহা এই সময়ের কবিতাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। প্রান্তিক রোগশয্যায়, আরোগ্য ও জন্মদিনে, এই কাব্য-চতুষ্টয়কে যদি আমরা কেবলমাত্র কাব্য হিসাবে বিচারে প্রবৃত্ত হই তবে হয়তো আমাদের প্রয়াস আংশিকভাবে সফল হইতে পারে; কিন্তু কাব্যকলা অতিক্রম করিয়া কবি-মানসের যে বিরাট সত্তার স্পর্শে আমরা আসি, তাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরের বস্তু; অথবা প্রাকৃত লোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সাধারণ সংজ্ঞা পোষণ করে, কবির ঈশ্বরচেতনা তাহা হইতে অনেক দূরে বলিয়া তাহার আবেদন তাহাদের অন্তরে পৌঁছায় না। তাঁহার ঘোষণা 'জয় অজানার জয়'। সত্যই ইহসংসারে এই-যে আমাদের বাস— সে তো জানা-অজানার মধ্যেই; বিপুলা এ পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যেমন সীমায়িত, তেমনি চক্ষের মনের ও ধ্যানের অগম্য অজ্ঞাত লোক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও অস্পষ্ট। উপনিষদে আছে—

১ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭, পৃ ৫৮০। জন্মদিনে ১৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

রামমোহন রায় যে কেবল রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন তাহা নহে, অনেকের জানা নাই যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। ভগিনী নিবেদিতাকে এ বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—"It was here too that we heard a long talk on Rammohan Roy, in which he pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message,—his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu. For all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohan Roy had mapped out." Notes on some wanderings with the Swami Vivekananda. Authorised ed. 1913—Ed. by Swami Saradananda, Udbodhan office, Calcutta, Chap II, p 19; প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৭, পৃ ৩২৪ হইতে উদ্‌ধৃত।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥[১]

'আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে, এই বাক্যের মর্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।'

গভীর জীবনের ধ্যানলব্ধ সত্যের প্রকাশ ও কবিজীবনের অনুভূতির প্রকাশ চলে যুগপৎ এই জীবনসন্ধ্যায়। ইহারই সঙ্গে আছে রূপসৃষ্টির প্রয়াস— গল্পের মধ্য দিয়া। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আমরা বারে বারে দেখিয়াছি গভীর মনন-ধর্মী বা লিরিক-ধর্মী কবিতার সঙ্গে বা পরে পরেই চলে গল্পের মধ্য দিয়া বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টির পালা। 'রোগশয্যায়' প্রভৃতি কাব্যগুলির শেষ ভাগে দেখা দিল 'গল্পসল্প'। ইহার আগেই দেখা দেয় 'ছড়া'র আনন্দলহরী; সে আনন্দ-দীপ সকলপ্রকার শারীরিক দুঃখের মধ্যেও অনির্বাণ। 'ছড়া'গুলি লিখিয়া তাহার ভূমিকায় বলিয়াছিলেন—

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে
কর্মরথের ঘড়্‌ঘড়ানি
যে মুহূর্তে থামে
এলোমেলো ছিন্নচেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানি নে কোন্‌ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত—
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ।—
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।[২]

'গল্পসল্প'র গদ্য ও পদ্য লেখেন ফেব্রুয়ারি ও মার্চ (১৯৪১) মাসে; সেগুলি শেষ জীবনের অপরূপ সৃষ্টি; অসুস্থ শরীরের অবসাদগ্রস্ত মনের কোনো ছায়া নাই এ রচনার মধ্যে: গল্পসল্পে যে চরিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলিই কবির বাল্যকালের দেখা মানুষ; কবির ভাষাবিন্যাসে তাহারা কেহ হইয়াছে বড়ো, কেহ হইয়াছে ছোটো; মোটকথা সকলেই হইয়াছে অমর—সাহিত্যের সজ্জায়।

গল্পসল্পের শেষ রচনা 'দাদা হব ছিল বিষম শখ' (১২ মার্চ ১৯৪১)। এই হালকা সুরে গাঁথা কবিতাটির মধ্যে

১ ব্রাহ্মধর্মঃ, চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক ৬।

২ 'ছড়া' কবিতাগুচ্ছের ভূমিকা, ৫ জানুয়ারি ১৯৪১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬।

জীবনের শেষ ছবি যেন আঁকা।

সাঙ্গ হয়ে এল পালা,
নাট্যশেষের দীপের মালা
নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে,
রঙিন ছবির দৃশ্যরেখা,
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা
আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জমে।
সময় হয়ে এল এবার
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,
নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা ;
খাতা হাতে এখন বুঝি
আসছে কানে কলম গুঁজি,
কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা।
চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা
ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা
কোনোমতেই চলবে না তো আর ;
অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে
পড়বে ধরা শেষ গণিতে
জিত হয়েছে, কিংবা হল হার।

'গল্পসল্প' লিখিবার মূলে ছিল শিশুদের দ্রুতপাঠ-উপযোগী সরস গ্রন্থের অভাব-মোচনের চেষ্টা। প্রথমে শান্তিনিকেতন পাঠভবন হইতে প্রকাশিতব্য পাঠ্যগ্রন্থমালার অন্তর্গত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য ইহার রচনা শুরু হয়। তৎকালীন সম্পাদক শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ক্ষিতীশ রায় কবির এই পরিকল্পনাটির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু লেখা অগ্রসর হইলে, বইখানিকে কবির অন্যান্য সাহিত্যগ্রন্থের মর্যাদায় স্বতন্ত্ররূপেই বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক প্রকাশের ব্যবস্থা হয়।[১] গল্পসল্পের মধ্যে ১৬টি গদ্য গল্প ও ১৬টি কবিতা আছে ; কবিতাগুলি 'ছড়া'-ধর্মী বা ছড়ার ছন্দে লেখা। দুই-তিনটি রচনা ছাড়া সবগুলিই প্রায় ৬ ফেব্রুয়ারি হইতে ১২ মার্চের (১৯৪১) মধ্যে লিখিত হয়। অনেকগুলি আরোগ্য-জন্মদিনের কবিতার সমকালীন রচনা। গল্প বলিবার প্রেরণা হইতে যেমন ছোটো ছোটো 'গল্পসল্প' জমিয়া উঠিল, তেমনি তিন-চারটি ছোটোগল্পেরও (short story) খসড়া করেন আর কয়েক দিন পরে।

বসন্ত-উৎসব আগত। এই অসুস্থতার মধ্যে যাহাতে উৎসব নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য শৈলজারঞ্জন ও শান্তিদেবকে যথাযথভাবে এখনো উপদেশ দান করিতেছেন। 'নটীর পূজা'র অভিনয় হইবে সেদিন সন্ধ্যায়। কবি যাইতে পারিবেন না ; তাই তাঁহার সম্মুখে একদিন অভিনয় হইল। কিন্তু আজকাল তাঁহার শ্রবণদর্শন-শক্তি উভয়ই হ্রাস পাইয়াছে ; গানের সমস্ত সুর আজকাল ধরিতে পারেন না। এই বসন্তোৎসবের দিন কবি লেখেন—

১ দ্র কবিকথা, পৃ ৪৩। গল্পসল্প, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬৫৩-৫৪।

আর বার ফিরে এল উৎসবের দিন।. .
বসন্তের অজস্র সম্মান . .
রুদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি—
এ বৎসরে বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।[১]

সেদিন ও তার পূর্ব দিনে লিখিত কবিতাগুলি ‘জন্মদিনে’ নামে কাব্যখণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত। যদিও বসন্তোৎসবের সময় লিখিত, এগুলি যথাযথভাবে জন্মদিনের কবিতা। নিজ জন্মদিনের কথা কেন আজ স্মরণে আসিতেছে বলিতে পারি না, হয়তো মনে মনে আশঙ্কা ছিল জন্মদিন ফিরিয়া নাও আসিতে পারে। তাই যেন শেষ কথাটি বলিতে চেষ্টা করিলেন এই তিনটি কবিতায়—‘সেদিন আমার জন্মদিন’; ‘বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে’; ‘জন্মবাসরের ঘটে নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি করিয়াছি আহরণ, এ-কথা রহিল মোর মনে’।[২]

শেষ কয় মাস

নববর্ষ আসিতেছে, তদুপলক্ষে কবির নিকট হইতে একটি গান চাওয়া হয়। শান্তিদেব লিখিতেছেন, “প্রথমে আপত্তি করলেন, কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে . . বললেন, ‘সৌম্য [ঠাকুর] আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটা কবিতা লিখতে। সে বলে আমি যন্ত্রের জয়গান গেয়েছি, মানবের জয়গান করি নি। তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।’ কবিতাটি ছিল বড়ো, দেখে ভাবলাম এত বড়ো কবিতায় সুরযোজনা করতে বলা মানে তাঁকে কষ্ট দেওয়া। সুর দেবার একটু চেষ্টা করে সেদিন আর পারলেন না, বললেন ‘কালকে হবে।’ পরের দিন সেই কবিতাটি সংক্ষেপ করতে করতে শেষ পর্যন্ত, বর্তমানে ‘ঐ মহামানব আসে’ গানটি যে আকারে আছে, সেই আকারে তাকে পেলাম।”[৩]

এই মহামানব কী? এ তো কোনো ব্যক্তি যাঁহাকে আমরা মহাপুরুষ বলি তাঁহার আবাহন নহে। এই আবাহন কবির Man-কে—যে মানব আইডিয়ারূপে, শাশ্বত ঐক্যরূপে চিরন্তন, যে মানব ভাবীকালের অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। সেই দিক হইতে গানটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এই নববর্ষে (১ বৈশাখ ১৩৪৮) কবির ‘জন্মদিনে’ কাব্যখণ্ড প্রকাশিত হয়; ইহাই তাঁহার জীবিত কালের শেষ মুদ্রিত কাব্য। এই মাসে ‘গল্পসল্প’ও বাহির হয়।

রোগক্লান্ত জীবনের শেষ নববর্ষ আসিল। এবার তাঁহার জন্মোৎসবের ভাষণ হইল ‘সভ্যতার সংকট’। আজ য়ুরোপ ও পৃথিবীর স্থানে স্থানে যুদ্ধের যে মরণতাণ্ডব চলিতেছে, তাহারই কারণ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই ভাষণে। পাশ্চাত্য দেশের অষ্টাদশ শতকের আদর্শবাদ— য়ুরোপীয় বিশেষ করিয়া ইংরেজি সাহিত্যের সৌন্দর্য এককালে ভারতীয়দের যে কি মুগ্ধ করিয়াছিল— সে কথা কবি স্মরণ করেন। কিন্তু আজ বিংশশতকের মধ্যভাগে ইংরেজের কী মূর্তি দেখা যাইতেছে। কবি বলিতেছেন, “মানব-আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই

১ জন্মদিনে ৪। উদয়ন, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।
২ জন্মদিনে ১, ২, ৩। রচনা: ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১।
৩ উদয়ন, শান্তিনিকেতন। ১ বৈশাখ ১৩৪৮। দ্র গীতবিতান (নূতন সং), পৃ ৯৮৭ ও রবীন্দ্রসংগীত, পৃ ২৮৩-৮৫।

পারি নি।" ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র্য হৃদয়বিদারক। তাহার সহিত যখন বহির্জগতের তুলনা করেন তখন মনের প্রশান্তি রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। কবি অতি দুঃখে বলিতেছেন, "যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কিরকম সম্পদ্‌বান্ হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি . . আর দেখেছি রাশিয়ায় মস্কৌ নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়— সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কৌ শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল— দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা।"[১]

এই অভিভাষণের শেষে কবি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ভবিষ্যদ্‌বাণীর ন্যায় সফল হইয়াছে— এখন কেবল অপেক্ষা নিখিল-জগতে মহামানবের জাগরণ। কবি বলিতেছেন— "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব! আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

"এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

রোগশয্যার দিন কিভাবে যাইতেছে তাহার কথা বলিয়াছি। প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু বলেন, পাশের লোকে লিখিয়া লয়। রানী চন্দ কথাবার্তা লিখিতে চেষ্টা করেন, তার আভাস 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

১ সভ্যতার সংকট। ১ বৈশাখ ১৩৪৮, জন্মোৎসব উপলক্ষে পুস্তিকা-আকারে শান্তিনিকেতনে বিতরণ করা হইয়াছিল। কবির উপস্থিতিতে ক্ষিতিমোহন সেন ইহা পাঠ করেন। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬।

এক-একদিন এক-একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন— কোনোদিন পুরাতন কথা, বিলাতে হেন্‌রী মর্লি কিভাবে পড়াইতেন— বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ বই পড়িয়া কী বলেন, ইত্যাদি। সমাজে মেয়েদের স্থান যে কত বড়ো এবং কেন-যে বড়ো একদিন সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন (২০ এপ্রিল ১৯৪১)। সেদিন বলিলেন, "সব মানুষই Instinct নিয়ে জন্মায়। সবার ভিতরেই থাকে কামনা, ইচ্ছে। ক্ষুধার অন্ন— এই অন্ন দেহ মন দুই-ই চায়। মানুষের ভিতরে-ভিতরে অনেকরকম পশুবৃত্তি আছে যা নির্মল নয়, অথচ প্রবল। যারা ভালো তারা চায়, সেই instinctটাকে জয় করতে। . . এইখানেই দরকার হয় শিক্ষার। শিক্ষার দ্বারা instinctকে মার্জিত সুন্দর সংযত সুসভ্য করা যায়। Instinctকে মার্জিত করেই সাধক, মুনি, সাধু হতে পেরেছে। এই জায়গায়ই শিক্ষার প্রয়োজন; সংস্কারে এ হয় না।"[১]

কিছুকাল হইতে কবির মনে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগিতেছে।[২] যুগের পরিবর্তনে মানুষের রসসম্ভোগের মানেরও পরিবর্তন হয়। অতীতের মুহূর্তগুলি এক সময়ে তো 'বর্তমান' ছিল; সেই অতীতের 'বর্তমানে' সে যুগের কবি ও শিল্পীরা যথাযথ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ কয়জনকে আমরা স্মরণ করি, কয়জনের নাম সর্বসাধারণের জ্ঞাত? অথচ একদিন সেই যুগের সর্বসাধারণ তাঁহাদের জয়জয়কার করিয়াছিল; মনে হইয়াছিল তাঁহাদের যশ অনন্তকাল থাকিয়া যাইবে। আসল কথা, চিরকাল গীতিকাব্যের অনির্বচনীয়তা ফুটিয়া উঠে ভাষার ব্যঞ্জনার দ্বারা। ভাষা কালে কালে বদল হয় ও সেইসঙ্গে রসের ও সৌন্দর্যের মানেরও বদল হয়। এককালের রস অন্যকালের মানুষ পাইবে না।[৩] কিন্তু এই সাহিত্যের কতকগুলি বিষয় 'সুবর্ণের লিপি'তে লিখিত হয়; সাহিত্যিক যেখানে চরিত্র সৃষ্টি করেন সেখানে তাহার বিনাশ নাই, যদি সে একবার মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, সেক্সপীয়র প্রভৃতিতে যে-সব চরিত্র জীবন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহারা মানবহৃদয়ে স্থান পাইয়াছে; ভাষার পরিবর্তন হইয়াছে, রসের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের অপরূপ চরিত্রগুলি অমরত্ব লাভ করিয়া আজও লোকসমাজে জীবিত। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও দেখা যায় যে কবিও তাঁহার রচনায় বহুশত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন— তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ইতিমধ্যেই বাঙালি শিক্ষিতসমাজের কথোপকথনের মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিম প্রেরণা 'কথা কও', 'গল্প বলো' হইতে এখনো লিখিতেছেন 'গল্পসল্প'— কবিজীবনের শেষ রূপসৃষ্টি।

এই আলোচনায় কবি যে বলিলেন, এককালের সাহিত্যের রস অন্যকালের মানুষ পায় না, সেই কথাটি সেদিনকার কবিতার মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু 'কিছু বা যায় না মোছা'—

আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,

১ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৮৮।

২ তুলনীয়, সাহিত্যের মূল্য, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, পৃ ২০১-০২; উদয়নে কথিত, ২৫ এপ্রিল ১৯৪১। দ্র আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৯৫-৯৭।

৩ অতি আধুনিক একজন সাহিত্যিক এ বিষয়ে যে কী বলিয়াছেন তাহা এখানে উদ্‌ধৃত করিতেছি— "Art is man's noblest attempt to preserve Imagination from Time, to make unbreakable toys of the mind, mud pies which endure; and yet even the masterpieces whose permanence grants them a mystical authority over us are doomed to decay; a word slithers into oblivion, then a phrase, then an idea . . each generation discovers anew the value of masterpieces, generations are never quite the same and ours are in fact coming to prefer the response induced by violent stimuli-film, radio, press— to the slow permeation of the personality by great literature," —Cyril Connolly, The Condemned Playground (The Macmillan). 1946।

নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে;
কিছু-বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।[১]

কয়েক দিন পরে লিখিত 'ধূলি'[২] কবিতায় বলিতেছেন—

বাণীর মুরতি গড়ি একমনে
নির্জন প্রাঙ্গণে পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি— অসমাপ্ত মূক
শূন্যে চেয়ে থাকে নিরুৎসুক।
গর্বিত মূর্তির পদানত মাথা ক'রে থাকে নিচু,
কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু।
বহুগুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে
এক কালে যাহা রূপ পেয়ে
কালে কালে অর্থহীনতায়
ক্রমশ মিলায়।[৩]

কয়েক মাস পূর্বে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় জোড়াসাঁকো-বাস-কালে এই ভাবটি অন্যভাবে মনের মধ্যে উদিত হয়; কবির বিশ্বাস যে ভবিষ্যতে তাঁহার কাব্যের 'গুঞ্জন' চিরদিন রবে কিন্তু লোকে 'ভুলে যাবে তার মানে।'. .

শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে . .
'বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে
বেঁচেছিল কেউ বুঝি,
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই
তাই সে পেয়েছে খুঁজি।'[৪]

এই দিনে রচিত অন্য কবিতাটির মধ্যেও বলিতেছেন—

ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয়-নর্তনে।[৫]

এই কথাটির অন্তরালে আছে আরো গভীর তত্ত্ব, বিশ্বজগতে যে ধ্বংসলীলা চলিতেছে এ যেন তাহারই ব্যাখ্যা।

১ শেষ লেখা ৭; উদয়ন, ২৫ এপ্রিল ১৯৪১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৪৪।

২ শেষ লেখা ৯; ৩ মে ১৯৪১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৪৬।

৩ সাহিত্যের মূল্য লইয়া যেদিন আলোচনা করেন সেদিন, ২৫ এপ্রিল— নন্দিতার বিবাহদিনের পঞ্চবার্ষিকী; কবি একটি কবিতায় তাঁহার ভাবনা লিপিবদ্ধ করেন (শেষ লেখা ৮)।

৪ রোগশয্যায় ১০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫।

৫ রোগশয্যায় ১১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা
সুতীব্র অক্ষমা।
অগোচরে কোনোখানে একটি রেখার হলে ভুল
দীর্ঘ কালে অকস্মাৎ আপনারে করে সে নির্মূল।

যুগে যুগে কত প্রাণী পর্যাপ্ত শক্তির সম্বল লইয়া ধরায় আবির্ভূত হইয়াছিল, কত জাতির অভ্যুদয় হয় এই শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, কিন্তু

সে শক্তিই ভ্রম তার,
ক্রমেই অসহ্য হয়ে লুপ্ত করে দেয় মহাভার।

কবির মতে 'দারুণ ভাঙন এ যে পূর্ণের আদেশে'। কবির বিশ্বাস যে একদা সৃষ্টির শেষে বহিয়া 'নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।' তাই বলিতেছেন এই নিদারুণ অক্ষমার উদ্দেশে

হে অক্ষমা,
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা;
শান্তির পথের কাঁটা তব পদপাতে
বিদলিত হয়ে যায় বার বার আঘাতে আঘাতে।

কবির জন্মদিন আসিতেছে— মর্তজীবনের শেষ জন্মদিনের জন্য লিখিলেন (২৩ বৈশাখ ১৩৪৮) 'হে নূতন, দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' এই গানটি। আসলে 'পূরবী'-কাব্যের পঁচিশে বৈশাখ নামে কবিতাটির কতকগুলি ছত্র লইয়া ও একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া গানটি রচিত হয় ও স্বয়ং সুরযোজনা করেন। কবির জন্মদিন সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম রচিত গান লিখিত হয় ১৩০৬ সালে— 'ভয় হতে তব অভয়-মাঝারে নূতন জনম দাও হে' (কল্পনা)।[১]

কবির জন্মদিন ২৫ বৈশাখ (১৩৪৮) শেষবারের ন্যায় অনাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। কয়েকদিন পূর্বে নূতন বৎসরের পত্রিকাদিতে রবীন্দ্রজয়ন্তী সম্বন্ধে আলোচনার কথা শুনিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে এইটি তুলনীয়। তিনি বলেন, "সাহিত্যজীবনে খ্যাতি বড়ো ক্ষণস্থায়ী . . দুদিনেই সব উবে যায়। সংসারের বড়ো জিনিস হচ্ছে প্রীতি, খ্যাতি নয়। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যখন তোমাদের কাছ থেকে প্রীতি, ভালোবাসা পাই। . . আমি এই ভালোবাসাই পেয়েছি জীবনে অনেক— কী দেশে কী বিদেশে। পেয়েছি নিজের লোকের কাছ থেকে, তার ঢের বেশি পেয়েছি অনাত্মীয়ের কাছ থেকে।[২] এই জন্মদিন উপলক্ষেও একটি কবিতা লেখেন। অন্নদাশঙ্কর রায়কে বাঁকুড়ায় সেটি লিখিয়া পাঠান—[৩]

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা,
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্তের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।

১ দ্র কবিকথা, পৃ ১৬৪-৬৬। ২ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৯০-৯১।
৩ শেষ লেখা ১০; উদয়ন, ৬ মে ১৯৪১। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃ ৪০৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬।

শূন্য ঝুলি আজিকে আমার ;
দিয়েছি উজাড় করি
যাহা কিছু আছিল দিবার,
প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা—
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

সেদিন সন্ধ্যায় আশ্রমবালিকারা ‘বশীকরণ’ প্রহসনটি অভিনয় করিয়াছিল; কবি অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত বসিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার শেষ অভিনয়-দর্শন।

কয়েকদিন পরে (১৩ মে) ত্রিপুরা-দরবার হইতে রাজপ্রতিনিধিরা আসিলেন রবীন্দ্রনাথকে ‘ভারত-ভাস্কর’[১] উপাধি অর্পণ করিবার জন্য। কবি প্রতিনিধিদের বলেন যে, তাঁহার জীবনের প্রত্যূষে তিনি ত্রিপুরা-দরবার হইতে যে সম্ভাষণ পান তাহা তাঁহার কাব্যজীবনের প্রথম পাথেয়; আজ জীবনসন্ধ্যায় সেই ত্রিপুরা হইতে তাঁহার বিদায়কালে শেষ অর্ঘ্য আসিল। কবির ভাষণ পাঠ করেন রথীন্দ্রনাথ।

এই গ্রীষ্মাবকাশে শান্তিনিকেতনে আসেন অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু সপরিবারে ও সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায়। শান্তিনিকেতন-বাসের এই কাহিনী বুদ্ধদেববাবু ‘সব-পেয়েছির দেশে’[২] নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবি অসুস্থ, বুদ্ধদেবের ধারণা ছিল কবি “হয়তো দু’একটির বেশি কথা বলবেন না, হয়তো আগেকার মতো নিঃসংশয় নিঃসংকোচে তাঁর পাশে গিয়ে বসা চলবে না। দেখে ভুল ভাঙল।. . মুখ তাঁর শীর্ণ। আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে হয়েছে, কিন্তু হাতের মুঠি কি কব্জির দিকে তাকালে বিরাট বলিষ্ঠ দেহের আভাস এখনো পাওয়া যায়।

১ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, পৃ ৭৫৪ : গত ৮ মে কবির জন্মদিনে আগরতলায় রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে মহারাজা বাহাদুরের রোবকারি বা ঘোষণাবাণীতে এই সংকল্পের কথা প্রচারিত হইয়াছিল— “যেহেতু বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত ;

“যেহেতু মর্ত দেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ— ‘মর্তোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্’, ঋষিরা কাব্যের ভিতর দিয়া ভগবদ্‌সত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগৎকে দিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনায় অঙ্কুরোদ্গত সেই অমর জ্যোতিঃপ্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতামহ গুণী রসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করায়— তিনিই তরুণ রবিকে রাজ-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন ;

“যেহেতু এ পক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব-যুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহৃদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে, কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন ;

“যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃকার্যে বৃত হইবার গৌরব লাভ এ পক্ষে হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্মবার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভ স্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা-যুগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুরা-রাজের কর্তব্য—“জ্যোৎস্নাভিরাহত মহদ্ভূদয়ান্ধকারম্”—অতএব এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে ‘ভারতভাস্কর’ আখ্যায় ভূষিত করা যায় ;—এবং শ্রীভগবান তদীয় আশীর্বাদে কবিবরকে সুস্থদেহে শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।” দ্র. সম্পাদক গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, পৃ ১৫০-৫১, মানপত্রের প্রতিলিপি ৪২।

২ দ্র The Land of Heart's Desire, *Visva-Bharati News*, June 1941, pp. 95-96।

কেশরের মতো যে কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামত তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু মাথার মাঝখান দিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত কুঞ্চিত শুভ্র দীর্ঘ কেশের সৌন্দর্য এখনো অম্লান। . . এই অপরূপ্‌ রূপবান পুরুষের দিকে এখন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন ক'রে আমরা শিল্পীর গড়া কোনো মূর্তি দেখি। এত সুন্দর বুঝি রবীন্দ্রনাথও আগে কখনো ছিলেন না, এর জন্যে এই বয়সের ভার আর রোগদুঃখভোগের দরকার ছিল। . .

"কে বলবে তাঁকে দেখে যে তাঁর অসুখ! . . কণ্ঠস্বর ঈষৎ ক্ষীণ, মাঝে মাঝে একটু থামেন, কিন্তু কথার জন্য কক্ষনো হাৎড়াতে হয় না, ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি আপনিই মুখে এসে বসে। . . সেদিন এক ঘণ্টার উপরে প্রায় অনর্গল কথা বললেন, সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা জীবনদর্শন হাস্যপরিহাস মেশানো এক আশ্চর্য অবিশ্রান্ত ঝরনায় নেয়ে উঠলুম। এঁর অসুখ! ভাবা যায় না। এই প্রদীপ্ত মনীষা, জীবনের ছোটো বড়ো সমস্ত ব্যাপারে এই জ্বলন্ত উৎসাহ, ভাষার উপর এই রাজকীয় কর্তৃত্ব— এর সঙ্গে কোনো রকম রোগ কি বৈকল্যকে সংশ্লিষ্ট করতে আমাদের মন একবারেই বিমুখ হয়। অথচ সত্যি তিনি অসুস্থ, অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁর রোগে যন্ত্রণা যেমন, ছোটোখাটো বিরক্তিকর আনুষঙ্গিকও কম নয়। . . কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপের এতটুকু বিকৃতি কোথাও হয়নি। তাঁর মুখে সব কথাই আছে, রোগের কথা একটিও নেই। . . এতটুকু শৈথিল্য নেই আচরণে কি চিন্তায় কি ব্যবহারে।" বুদ্ধদেব শান্তিনিকেতনে তেরো দিন ছিলেন; ইহার মধ্যে কবির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করিতে যাইতেন। কবির কথা ও আলোচনা সম্বন্ধে তিনি বলেন, সে "যেন বর্ণাঢ্য গীতিনিঃস্বন, যেন গীতধ্বনিত ইন্দ্রধনু।"

বুদ্ধদেব কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার কয়েক দিন পরে কবি লিখিতেছেন (৪ জুন ১৯৪১): "এবারে আশ্রম থেকে তুমি অনেক ঝুড়ি বকুনি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গিয়েছ। আশা করি তার বারো আনাই আবর্জনা নয়। বাজে বকুনির বাহুল্য প্রমাণ করে খুশির প্রাচুর্যকে, সেটা নিন্দনীয় নয়।"[১]

রবীন্দ্রনাথের সহিত বুদ্ধদেবের বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা হয়, তবে প্রধানত যাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য ও চিত্র সম্বন্ধে কবির অভিমত। সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে কবি যে-সব কথা বলেন তা লিপিবদ্ধ করিয়া (২৫ মে ১৯৪১) বুদ্ধদেব 'কবিতা'য় প্রকাশ করেন।[২] সেগুলি 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' ও 'সাহিত্যের উৎস' -বিষয়ক দুইটি আলোচনা। এইগুলি পরে কবি স্বয়ং দেখিয়া (বা শুনিয়া) কিছু কিছু রদ-বদল করিয়া প্রবাসীতে প্রেরণ করেন।[৩] এই-সব আলোচনার মধ্যে কবি একদিন বলেন যে, তাঁহার সৃষ্টিকার্যের তিনটি পর্যায়— সাহিত্য, গান ও ছবি: "এদের ভিতর দিয়ে আমি প্রকাশ করেছি আমাকে, আমার আনন্দকে।"

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়াদি গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ হইয়াছে; এবার এ অঞ্চলে ভীষণ অনাবৃষ্টি— অসহ্য গরম; কবি সারাদিন এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড্‌ ঘরে থাকেন। সন্ধ্যার পর বারান্দায় আনিয়া কবিকে বসানো হয়; মাঝে মাঝে নূতন নূতন গল্পের প্লট বলেন, তাহারই একটি 'বদনাম' নামে প্রকাশিত হয়।[৪]

কবির শরীর ক্রমশই মন্দের দিকে যাইতেছে; কিন্তু চিঠিপত্র আসিলে বা ভালো বই পাইলে তাহার ঠিকমত জবাব এখনো পাঠান। বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় 'পরিচয়' পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যায় কবির চিত্রশিল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন; সেইটি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি লেখক বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়কে 'ছবির স্বৈরাচার' সম্বন্ধে (২৩ জুন

১ সব-পেয়েছির দেশ, পৃ ১০৫।

২ কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ১১২-১৪।

৩ সাহিত্য, গান, ছবি; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ৩৬২-৬৫। সাহিত্য, শিল্প; আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ৩৬৫-৬৬। সাহিত্যে চিত্রবিভাগ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, পৃ ২৬৪ ক খ।

৪ বদনাম; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮। গল্পগুচ্ছ ৪।

১৯৪১) এক পত্র লেখেন : "আমি পঞ্চাশ বছর ধরে ভাষার সাধনা করছি। সুতরাং তার সমস্ত কৌশল, তার গতিবিধির নিয়ম, সে এক রকম জেনে নিয়েছি। কিন্তু এই ছবি যা অকস্মাৎ আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হয়েছে, তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ চেনাশোনা হয়নি। তার স্বৈরাচার আমাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু স্বৈরাচারের অন্তর্নিহিত যে নিয়ম তাকে ভিতরে ভিতরে চালনা করে, সে আমার কাছে অত্যন্ত গোপনে আছে। . . এই চিত্রকলা আমাকে এড়িয়ে চলে। এর গতিবিধি আমার অগোচর . . সাহিত্যের বাহন হচ্ছে ভাষা, ভাষা আপন অর্থ আপনি নিয়ে চলে। সেই অর্থের কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু বর্ণবিন্যাস ও রেখাবিন্যাস, সে নিস্তব্ধ, তার মুখে বাণী নেই, তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেয় যে, ঐ দেখো। আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।"[১] ইহার কয়েকদিন পূর্বে শিল্পী যামিনী রায়কে কবি চিত্র সম্বন্ধে একপত্র লেখেন (৭ জুন)।

যামিনী রায় শিল্পজগতে পৃথক-সম্প্রদায়-ভুক্ত, অর্থাৎ 'ইন্ডিয়ান আর্ট' বলিতে যে শিল্পকলার চর্চা হইতেছে সে সম্প্রদায়ের নহেন ; তাঁহার স্বকীয়তা আছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের ছবিকে তাহার দৃঢ় বলিষ্ঠ ছন্দোময়তার জন্য শ্রদ্ধা করিতেন। কবি যামিনী রায়কে লেখেন, "যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় মনকে টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেল। গাছপালা, জীবজন্তু, সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারি দিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দরকার নেই।"[২]

এমন সময়ে হাতে আসিল অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'র পাণ্ডুলিপি ; শ্রীমতী রানী চন্দর লেখনী অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথাগুলিকে সুন্দরভাবে রূপ দান করিয়াছে। কবি অবনীন্দ্রনাথকে লিখিলেন (২৭ জুন): "কী চমৎকার— তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠল।" বই সম্বন্ধে বললেন—"এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয় এ যে সৃষ্টি— সাহিত্যে এ পরম দুর্লভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে— এমন সুযোগ দৈবাৎ ঘটে।" দুই দিন পরেও অবনীন্দ্রনাথকে 'ঘরোয়া' সম্বন্ধে আরো একখানি পত্র লেখেন[৩] ও ১৩ জুলাই গ্রন্থখানির জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। সেখানে কবি বলেন যে, অবনীন্দ্রনাথ "দেশকে উদ্ধার করছেন আত্মনিন্দা থেকে। আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন।"

আমাদের এই আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনসন্ধ্যায় তাঁহাকে শেষ বারের মতো ভারতের প্রতি এক বিদেশীর অপমানকর উক্তির প্রতিবাদ করিতে দেখি। এই সময়ে মিস্ রাথবোন[৪] ভারতের নিন্দা করিয়া এক তীব্র খোলা চিঠি লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই রোগজীর্ণ দেহে তাহার এক উত্তর 'খোলা চিঠি' রূপেই প্রকাশ করিলেন। মিস্ রাথবোন ব্রিটিশ বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে পার্লামেন্টের সদস্য— ব্রিটেনের শিক্ষিত সমাজে ও রাজনৈতিকদের মহলে সুপরিচিত। সুতরাং তাঁহার মতামত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ও ইংরেজি ভাষাভাষী দেশের অধিবাসীদের নিকট উপেক্ষণীয় ছিল না। ভারতের দুর্দিন, কংগ্রেস-মন্ত্রিত্ব রদ হইয়া যাইবার পর নেতাদের অনেকেই

১ প্রবাসী : কার্তিক ১৩৪৮, পৃ ২০।

২ ছবি, শিল্পী যামিনী রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (৭ জুন ১৯৪১), প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃ ৪০৬। দ্র. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যামিনী রায়ের সম্বন্ধে ; সাহিত্য পত্র, ১৩৫৮। দ্র. রবিপ্রদক্ষিণ ; বিষ্ণু -দে লিখিত 'শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রবীন্দ্রকথা', পৃ ৩৬২।

৩ অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া', প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮, পৃ ২।

৪ Miss E. Rathbone, M. A., M. P. (1872-1951), President, National Union of Societies of equal citizenship since 1919, Vice-chairman, Family Endowment Society ; Independent member of Parliament for combined English Universities since 1929.

অন্তরীণে অথবা কারাগারে আবদ্ধ। দেশবিদেশে ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা হইতেছে ইংরেজ রাজনীতিকদের নিয়োজিত বিশিষ্ট লোকেদের প্রধান কাজ। মিস্ রাথবোনের পত্রের মর্ম এই যে, ভারতীয়রা ইংরেজদের দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া সর্বতোভাবে উন্নত, কিন্তু আজ ইংলণ্ডের যুদ্ধে তাহারা সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ— ইহা অকৃতজ্ঞতা। তিনি ভারতীয়দের উদ্দেশে বলেন, "আপনাদের সাহায্য ব্যতিরেকেও আমরা যুদ্ধে জিতিব— যাঁহাদের চিন্তাধারা আপনাদের হইতে পৃথক তাঁহাদের সাহায্য আমরা পাইতেছি।" তবে তিনি পত্রমধ্যে এ কথাও কবুল করেন যে তাঁহার অভিযোগটা হয়তো একদেশদর্শী হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্টা দিকেও অনেক কথা বলিবার আছে। তৎসত্ত্বেও তিনি দীর্ঘ পত্রে ভারতীয়দের আক্রমণ করিলেন।

মিস্ রাথবোনের চিঠির উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মারফত ভারতের ইংরেজি সকল দৈনিকে মুদ্রিত হইল (৫ জুন ১৯৪১)। অসুস্থ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বহুকাল নিজ হস্তে কিছু লিখিতে পারিতেন না। এ ক্ষেত্রেও কৃষ্ণ কৃপালনি কবির নির্দেশে মন্তব্যটি লিখিয়া দিলেন। কবি বলিলেন, "ভারতীয়দিগকে লিখিত মিস্ রাথবোনের খোলা চিঠি পড়িয়া আমি গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছি।.. তাঁহার এই পত্র প্রধানত জবহরলালের উদ্দেশেই লিখিত এবং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মিস্ রাথবোনের দেশবাসিগণ আজ যদি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহানুভব যোদ্ধার কণ্ঠ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ না রাখিত, তাহা হইলে তিনি মিসের এই অযাচিত উপদেশের যথাযোগ্য ও সতেজ উত্তর দিতেন। বলপ্রয়োগজনিত তাঁহার মৌন আমাকেই, রোগশয্যা হইতেও, এই প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য করিয়াছে।

"মহিলাটি আমাদের বিবেকের প্রতি অবিবেচনা এবং বস্তুতঃ ধৃষ্টতার সহিত যে স্পর্ধিত অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসীদের অভীষ্টসিদ্ধির কোনো সাহায্য হয় নাই। 'বৃটিশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ বারি পান করিয়াও' গরিব স্বদেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থের জন্য কিছু চিন্তা আমরা এখনো করি, আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মিস্ রাথবোন লজ্জায় স্তম্ভিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ চিন্তাধারার যতটুকু পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্তম ঐতিহ্যের প্রতীক, ততটুকু হইতে আমরা বাস্তবিক বহু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। কিন্তু একথাও না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই শিক্ষা হইতে লাভবান হইয়াছেন, আমাদের অশিক্ষিত করিবার সর্বপ্রকার সরকারি প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই তাঁহাদিগকে এই লাভটুকু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। অন্য যে-কোনো য়ুরোপীয় ভাষার সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের অন্যান্য জাতি কি সভ্যতার আলোকের জন্য ইংরেজদের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল? আমাদের সে-সকল তথাকথিত ইংরেজ-বন্ধু মনে করেন যে, তাঁহারা যদি আমাদের 'শিক্ষাদান' না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতে ব্রিটেনের সরকারি শিক্ষার প্রণালী বাহিয়া যাহা আমাদের সন্তানগণের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে, উহার উচ্ছিষ্ট অসার অংশ। ফলে ভারতীয়রা তাহাদের নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইংরেজি ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য পথ নাই, তবে সেই 'ইংলণ্ডীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ পান করিবার ফলে' দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজি ভাষায় লিখনপঠনক্ষম (literate) হইয়াছে। অন্য দিকে, রাশিয়ার মাত্র পনেরো বৎসরের সোভিয়েট শাসনের ফলে ১৯৩৯ সালে সোভিয়েট য়ুনিয়নে শতকরা ৯৮টি বালকবালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। (এই সংখ্যাগুলি ইংরেজ-প্রকাশিত 'স্টেট্স্‌ম্যান্স ইয়ার বুক' হইতে উদ্ধৃত। ঐ বহির রাশিয়ার অনুকূলে পক্ষপাতভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই)।

"কিন্তু এই তথাকথিত সংস্কৃতির চেয়ে আজ জীবনধারণের সম্বল চাই আগে। জীবনোপায়ের ভিত্তির উপরই জ্ঞানালোক দানের নিমিত্ত শিক্ষায়তন নির্মিত হইতে পারে।

"আমাদের দেশের টাকার থলি দুই-শতাব্দী-কাল দৃঢ় মুষ্টিতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে তাহারা আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কী করিয়াছে? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, অনশনশীর্ণ লোকেরা অন্নের জন্য ক্রন্দন করিতেছে। আমি পল্লীনারীদিগকে কয়েক ফোঁটা জলের জন্য কাদা খুঁড়িতে দেখিয়াছি, কেননা ভারতের গ্রামে পাঠশালা হইতেও কূপ বিরল। আমি জানি যে ইংলণ্ডের লোক আজ দুর্ভিক্ষের দ্বারে উপস্থিত। আমি তাহাদের জন্য ব্যথিত। কিন্তু যখন দেখি যে, খাদ্যসম্ভারপূর্ণ জাহাজগুলিকে পাহারা দিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে পৌঁছিয়া দিবার জন্য ব্রিটিশ নৌবহরের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা হইতেছে, এবং যখন এমন অবস্থাও মনে পড়ে যে, এদেশের একটা জেলার লোক অনাহারে মরিতেছে অথচ পাশের জেলা হইতে এক গাড়ি খাদ্যও তাহাদের দ্বারে পৌঁছিতে দেখি না, তখন আমি বিলাতের ইংরেজ এবং ভারতের ইংরেজের মধ্যে একটা পার্থক্য না দেখিয়া থাকিতে পারি না।

"ব্রিটিশ-রাজ আমাদিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশে 'আইন ও শৃঙ্খলা' রক্ষা করিয়াছেন, এইজন্যই কি আমরা ইংরেজের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, দেশের সর্বত্র দাঙ্গার উদ্দাম প্রাদুর্ভাব চলিতেছে। যখন কুড়িতে কুড়িতে লোক নিহত হইতেছে, আমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে, নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট হইতেছে, কিন্তু শক্তিমান ইংরেজের অস্ত্র তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত নড়িতেছেও না, তখন কিন্তু পরপার হইতে ইংরেজরা চীৎকার করিয়া আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, তোমরা তোমাদের ঘর সামলাইতে পার না।

"ইতিহাসে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই যে, সশস্ত্র যোদ্ধারাও প্রবলতর শক্তির সম্মুখীন হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের এমন অবস্থা দেখা গিয়াছে যে, বীরশ্রেষ্ঠ ইংরেজ, ফরাসী এবং গ্রীক সৈনিকগণও প্রবলতর অস্ত্রশক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া য়ুরোপের রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু যখন আমাদের দেশের দরিদ্র নিরস্ত্র অসহায় কৃষক, রোরুদ্যমান শিশুর ভারে ভারাক্রান্ত কৃষক সহস্র গুণ্ডার আক্রমণ হইতে ঘরবাড়ি রক্ষা করিতে না পারিয়া পলায়ন করে, তখন বোধ হয় ইংরেজ রাজপুরুষগণ আমাদের কাপুরুষতা দেখিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসেন; ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক তাহার ঘরবাড়ি শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ফতোয়া জারি করিয়া লাঠি চালনা শিক্ষা পর্যন্ত নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চিরকাল সন্ত্রস্ত এবং তাহাদের সশস্ত্র প্রভুদের কৃপার উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার জন্য আমাদের দেশের লোকদিগকে ইচ্ছা করিয়াই নিরস্ত্র ও পৌরুষহীন করিয়া রাখা হইয়াছে।

"এত কাল ইংরেজ পৃথিবীব্যাপী যে প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, আজ নাৎসীরা তাহাকে সেই প্রভুত্বের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে স্পর্ধিত আহ্বান করিয়াছে বলিয়াই ইংরেজ নাৎসীদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে; কিন্তু মিস্ রাথবোন আশা করেন যে, আমরা প্রণতিপূর্বক তাঁহার দেশের লোকদের হস্ত চুম্বন করিব, কেননা তাহাদের সেই হাত আমাদের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে। কোনো একটি গবর্মেণ্ট ভালো কি মন্দ বিচার করিতে হইলে তাহার মুখপাত্রদের মুখের কথা শুনিয়া বিচার করা চলে না; সেই গবর্মেণ্ট প্রজার কি বাস্তব হিত করিয়াছে তাহা দ্বারাই বিচার করিতে হয়। ইংরেজরা যে আমাদের অনাদরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততটা এইজন্য নহে যে, তাহারা বিদেশী, যতটা এইজন্য যে, তাহারা আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু অছির কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতের স্বল্পসংখ্যক ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে। আমার এরূপ মনে করা অনুচিত হইত না যে, ভদ্রগোছ ইংরেজরা ভারতীয়দের এই-সকল

ক্ষতি ও অনিষ্ট মনে রাখিয়া অন্ততপক্ষে নীরব থাকিবেন এবং আমরা যে নিষ্ক্রিয় আছি তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবেন; কিন্তু তাঁহারা যে আমাদের অনিষ্ট সাধনের উপর আবার অপমানও করিবেন এবং কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবেন, তাহা একেবারে শালীনতার সকল সীমার বাহিরে।"[১]

যাহাই লিখুন বা বলুন, শরীর আর বহিতেছে না। প্রতিমা দেবী লিখিতেছেন, "আষাঢ় মাস পড়তেই বাবামশায় খোলা আকাশে বর্ষার রূপ দেখবার জন্য উতলা হয়ে উঠলেন, তখন তাঁকে উত্তরায়ণের দোতলায় নিয়ে আসা হল। প্রথমটা কিছুতেই আসবেন না, অনেক করে রাজি করানো গেল। এই সময় ডাক্তারদের মত নিয়ে কবিরাজী চিকিৎসা শুরু হয়েছে। [শ্যামাদাস বাচস্পতির পুত্র] কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন।"[২] এই সময়ে কলিকাতা হইতে প্রশান্তচন্দ্রের পত্নী রানীদেবী শান্তিনিকেতনে আসেন। "তাঁকে বাবামশায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তিনি এসে মাসাবধি কাছে থাকাতে অপারেশনের পূর্ববর্তী দিনগুলি গুরুদেবের কাছে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল প্রীতি ও আনন্দের পরিবেশে। রানীর গল্প শুনতে তিনি ভালোবাসতেন এবং তাঁকে কাছে বসিয়ে হাস্যালাপ করে প্রফুল্ল হয়ে উঠতেন।"[২]

কিন্তু কোনো চিকিৎসায় কোনো উপকার দেখা যাইতেছে না। কলিকাতা হইতে ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু, বিধানচন্দ্র রায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ও পরিবারের বন্ধু জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার আসিলেন। তাঁহারা কবিকে পরীক্ষাদি করিয়া স্থির করিলেন শ্রাবণ মাসে অপারেশন করিতে হইবে। ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরাও কয়েকবার আসিলেন। অপারেশন সম্বন্ধে সকলেই একমত।

অতঃপর ২৫ জুলাই (৯ শ্রাবণ) কবিকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল। তৎকালীন ই. আই. রেলওয়ের অধিকর্তা এন. সি. ঘোষ কবির জন্য বিশেষ একখানি সেলুনগাড়ির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রায় সত্তর বৎসর শান্তিনিকেতনের সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ,— বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্যের সকল অবস্থার স্মৃতি এই স্থানের সঙ্গে জড়িত। জানি না আজ সেই স্থান ত্যাগের মুহূর্তে সে-সব স্মৃতির ছবি মনের চক্ষে দ্রুত চলিয়া গিয়াছিল কি না।

জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়িতে আসিলেন। এবার যেন বুঝিতে পারিতেছেন আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। দুই দিন পরে (১১ শ্রাবণ) লিখিলেন—।

প্রথমদিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে

১ 'বিবিধ প্রসঙ্গ', প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ৩৯১-৯২। মিস্ রাথবোনের চিঠির উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। উপরের বাংলাটি সাময়িক পত্রের অনুবাদ, কবিকৃত নহে।

২ নির্বাণ, পৃ ৪০।

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

কয়েকদিন পূর্বে একখানি পত্রে কবি লিখিয়াছেন, "আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী কো বেদঃ, অর্থাৎ কে জানে। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন, কিংবা জানেন না— এমন সন্দেহের বাণী বোধ হয় জগতে আর কোনো শাস্ত্রে প্রকাশ হয় নি যে, যাঁর সৃষ্টি তিনি আপন সৃষ্টিকে জানেন না। সৃষ্টি তাঁকে বহন করে নিয়ে চলে। আসল কথা চরম প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।" যে গৃহের মধ্যেই একদিন এই সত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল, আজ সেখানেই অন্তর্ধানের অপেক্ষায় রহিয়াছে সেই সত্তা।

কয়েকদিন অপারেশনের পরামর্শাদির পর ৩০ জুলাই ডাক্তার ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্রোপচার করিলেন। এই ঘটনার পূর্বে তিনি প্রতিমা দেবীকে শেষ চিঠি দেন নিজ হস্তে— অতি কষ্টে 'বাবামশায়' শব্দটি লিখিয়াছিলেন। প্রতিমা দেবী অসুস্থ অবস্থায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই পত্র পাইয়া তিনি চলিয়া আসেন, তখন কবির জ্ঞান আচ্ছন্ন। অপারেশনের কিছু পূর্বে কবি তাঁহার জীবনদেবতার উদ্দেশে শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা-জালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।[১]

অপারেশনের পর কয়েকদিনের মধ্যে শরীরের গতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। অবশেষে রাখীপূর্ণিমার অবসানে ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ (৭ অগস্ট ১৯৪১) বেলা ১২-১০ মিনিটে কবির মহাপ্রয়াণ হইল।[২]

১ জোড়াসাঁকো, ৩০ জুলাই ১৯৪১, সকাল সাড়ে-নয়টা। শেষ লেখা। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৬৪৯।

২ দ্র প্রতিমা দেবী, নির্বাণ। কুমার শ্রীজয়ন্তনাথ রায়, 'বিশ্বকবির মহানির্বাণ', প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৮, পৃ ৬৪৩ ক্র-এ। সেবিকা [শ্রীমতী রানী চন্দ], 'রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কয়দিন', প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭, পৃ ৭৪১-৪৭। নির্মলকুমারী মহলানবিশ, বাইশে শ্রাবণ।

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ?
জয় অজানার জয় ॥
এই দিকে তোর ভরসা যত, ওই দিকে তোর ভয় !
জয় অজানার জয় ॥
জানাশোনার বাসা বেঁধে কাটল তো দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয় ।
জয় অজানার জয় ॥
মরণকে তুই পর করেছিস ভাই,
জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই ।
দু দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময় ?
জয় অজানার জয় ॥

পরিশিষ্ট

সংযোজন ও সংশোধন

॥ প্রথম খণ্ড ॥

পৃ ৯। "যোড়াসাঁকোস্থ কমলবাবুর বাড়ি ভাড়া লইয়া তাহাতে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়।" ৬ ভাদ্র ১৭৫০ শক; ২০ অগস্ট ১৮২৮। বুধবার। ভাদ্রোৎসব এখনো ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত হয়।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির -প্রতিষ্ঠা, ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০; ১১ মাঘ ১৭৫১ শক; ১২৩৬ বঙ্গাব্দ। শনিবার। ১১ মাঘ (১৭৭২ শক) অক্ষয়কুমার দত্ত সাম্বৎসরিক সভায় ঘোষণা করিলেন, "বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত।" রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী। দ্র সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -সম্পাদিত, মহর্ষির আত্মজীবনী, পরিশিষ্ট ৪৫, পৃ ৪২৩।

পৃ ১১। সুকুমারীর বিবাহ। "বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্মানুযায়ী বিবাহের এই প্রথম সূত্রপাত হয়।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৩ শক, শ্রাবণ ১২৬৮। দ্র ব্রাহ্মবিবাহ ঐ, পৃ ৮১-৮৩। ২৬ নভেম্বর ১৮৬৩; ১১ অগ্রহায়ণ ১২৭০। পুত্রদের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথের বিবাহ ব্রাহ্মধর্মমতে সিদ্ধ হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৮৫ শক, পৃ ১৪। এই ব্রাহ্মবিবাহের বিস্তারিত বিবরণ— ঐ পৃ ১৫৬-৫৮।

পৃ ১২। "মাতৃবন্দনা", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশ, ৬ আষাঢ় ১৩৫৪। শ্রীহলধর হালদার [শ্রীপুলিনবিহারী সেন]। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি -সম্পাদিত আগমনী (মহালয়া ১৩২৬) হইতে রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃবন্দনা' কবিতাবলী পুনর্মুদ্রিত করিতেছি। এই কবিতাগুলিও অবশ্য "সামান্য উল্লেখ" বলিয়া বিবেচ্য; তবু এগুলির অধিকাংশ কোনো গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয় নাই বলিয়া— কেবল 'জননী তোমার করুণ চরণখানি' 'গীতাঞ্জলি'তে মুদ্রিত হইয়াছিল— "সাধারণের নিকট অপরিচিত, এজন্য এগুলি পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।"—

হে জননি, ফুরাবে না তোমার যে দান
শিরার শোণিতে তাহা চির বহমান।
তুমি দিয়ে গেছ মোরে সূর্য তারা চাঁদ,
আমার জীবন সে তো তব আশীর্বাদ।

—

মাতঃ, পুণ্যময়ী মাতৃভূমি
চিনায়ে দিয়েছ তুমি,
তোমা হতে জানিয়াছি নিখিল মাতারে।
সে দোঁহার শ্রীচরণে
নত হয়ে কায়মনে
পারি যেন তব পূজা পূর্ণ করিবারে।

—

জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণ রূপে।
জননি, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।

তোমারে নমি হে সকল ভুবন-মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে,
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি—
ভক্তি পাবন তোমার পূজার ধূপে,
জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণ রূপে।

—

জননি, তোমার মঙ্গল-মূর্তি অমৃতে লভিছে স্ফূর্তি
অমর্ত্য জগতে।
তোমার আশিস-দৃষ্টি করিছে আলোকবৃষ্টি
সংসারের পথে।
তোমার স্মরণপুণ্য করিতেছে গ্লানিশূন্য
সন্তানের মন।
যেন গো মোদের চিত্ত চরণে জোগায় নিত্য
কুসুম চন্দন।

—

হে জননি, বসিয়াছ মরণের মহা-সিংহাসনে,
তোমার ভবন আজি বাধাহীন বিপুল ভুবনে।
দিনের আলোক হতে চাও তুমি আমাদের মুখে,
রজনীর অন্ধকারে আমাদের লও টানি বুকে।
মোদের উৎসব-মাঝে তোমার আনন্দ করে বাস,
মোদের দুঃখের দিনে শুনি যে তোমার দীর্ঘশ্বাস।
মোদের ললাটে আছে তোমার আশিস করতল
এ কথা নিয়ত স্মরি দেহমন রাখিব নির্মল।

—

ওগো মা, তোমারি মাঝে, বিশ্বের মা যিনি
ছিলেন প্রত্যক্ষ বেশে জননীরূপিণী।
সেদিন যা কিছু পূজা দিয়েছি তোমায়,
সে পূজা পড়েছে বিশ্বজননীর পায়।
আজি সে মায়ের মাঝে গিয়েছ মা, চলি,
তাঁহারি পূজায় দিনু তব পূজাঞ্জলি।

জীবনস্মৃতির পরিশিষ্টে কবিতাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

পৃ ১৫। মীরা ও শমীন্দ্রের জন্মতারিখ সম্বন্ধে সংশোধন অংশ দ্রষ্টব্য। তবে শমীন্দ্রের মৃত্যুতারিখ ৭ অগ্রহায়ণ বলা হইয়াছে; বস্তুত ইহার কাছাকাছি কোনোদিন হইবে।

পৃ ২৬। বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। জন্মস্থান রানাঘাটের নিকট আড়ংলে কায়েতপাড়া গ্রামে। পিতা কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী। এগারো বৎসর বয়সে বিষ্ণুচন্দ্র রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং ১৮৩০ হইতে ১৮৯৭ পর্যন্ত সমাজের গায়করূপে সাপ্তাহিক অধিবেশনে একটি দিনের জন্যও অনুপস্থিত হন নাই। আদি-ব্রাহ্মসমাজের সংগীত-গ্রন্থের ৫০০ গানের মধ্যে ২৫০টি গানে বিষ্ণুচন্দ্র সুর-সংযোগ করেন বলিয়া অনুমান। ১৯০১-এ কলিকাতায় মৃত্যু হয়। দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতগুরু', দেশ, বৈশাখ ১৩৬৮।

পৃ ৩১। "ছেলেবেলায় যদি আরব্য উপন্যাস, রবিন্সন্ ক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা না শুনতুম, তা হলে··· ঐ নদী-তীর এবং মাঠের প্রান্তরের দূর-দৃশ্য দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হত না।"—ছিন্নপত্রাবলী; পত্র ৫৮, ২১ জুন ১৮৯২। "ছেলেবেলায় রবিন্সন ক্রুসো. পৌলভর্জিনি প্রভৃতি বইয়ে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেত।"—ছিন্নপত্রাবলী; পত্র ৭০, ২০ অগস্ট ১৮৯২।

"এ সম্বন্ধে পারস্য উপন্যাসে খুব ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলুম।"—ছিন্নপত্রাবলী; পত্র ১২১, ২৪ জুন ১৮৯৪।

পৃ ৩৮। 'কয়েকদিন বোলপুরে থাকিবার কথা হইল।' কয়েক বৎসর পূর্বে রেললাইন খোলা হয়। অজয় ব্রিজ পর্যন্ত রেলপথ খোলা হয় ৩ অক্টোবর ১৮৫৮; সাঁইথিয়া পর্যন্ত, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯; সাঁইথিয়া হইতে তিন পাহাড়, ১৮৬০।

বোলপুর স্টেশন হইতে নামিয়া রায়পুর যাইতে হইলে শান্তিনিকেতন পথে পড়ে না। দ্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতন আশ্রম'।

মহর্ষির বোলপুর আগমন।—আমাদের মনে হয় মহর্ষি আহমদপুরের পথে রায়পুর আসেন। কাটোয়া পর্যন্ত নদী-পথে আসিয়া কাটোয়া গুস্কুটিয়া রাস্তা দিয়া আসিয়া সুরুল-গুস্কুটিয়া সড়কে পড়েন। গুস্কুটিয়া হইতে সুরুল পর্যন্ত যাতায়াতের বড়ো রাস্তা এককালে ছিল। বোলপুরে রেলপথ আসে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে। মহর্ষির সহিত প্রতাপনারায়ণ সিংহের ঘনিষ্ঠতা হয় ১৮৫৮-এর পূর্বে। সিমলা পর্বত হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন [১২ শ্রাবণ ১৭৮০; বঙ্গাব্দ ১২৬৫; ২৭ জুলাই ১৮৫৮] "তুমি শুনিয়া অবশ্য আহ্লাদিত হইবে যে বীরভূম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ ব্রহ্মরসের আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন।" এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের বয়স ৪১ বৎসর। হিমালয়-যাত্রার পূর্বেই প্রতাপনারায়ণদের সহিত পরিচয়াদি হয় এবং পাহাড় হইতে ফিরিয়া দেবেন্দ্রনাথ রায়পুরে আসিয়া থাকেন। কাটোয়ার পথ ছাড়া অন্য পথ ছিল না— কারণ তখনো এই দিকে রেলপথ নির্মিত হয় নাই। অজয় হইতে সাঁইথিয়া পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর। সুতরাং রায়পুরে আসিবার প্রশস্ত পথ ছিল কাটোয়া হইয়া। গুস্কুটিয়া-সুরুলের পথেই শান্তিনিকেতন অবস্থিত। সুরুলের দিকে কয়েক মাইল পথ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পুরাতন ম্যাপ দেখিলেই পথ কোথা দিয়া গিয়াছিল জানা যায়। এই পথের ধারেই ছিল ছাতিম গাছ; সে গাছ এখনো আছে। এ সম্বন্ধে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত প্রথমবার আসেন। সেই সময়ে চীফ্ সাহেবের কুঠির নিকট হরিশ মালীর খরগোশ শিকারের কথা বালকের স্মৃতিতে স্পষ্ট ছিল। দ্র শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৬১, পৃ ১৫-১৬। দ্র রবিচ্ছবি (১৯৬১)

বড়ো হইয়া জমিদারিতে চরে কবি পাখিশিকার নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। কবির সহিত ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরে যাই। রাজ্যের নানা দর্শনীয় স্থান দেখাইয়া একটি প্রকাণ্ড বিলের কাছে আমাদের লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে কোন্ সাহেব কয়শত পাখি মারিয়াছিলেন, প্রস্তরফলকে তাহার

তালিকা খোদিত ছিল। কবি দেখিয়া মনে মনে এমন বিরক্ত হইলেন যে, আর কালমাত্র সেখানে থাকিলেন না।

শান্তিনিকেতন অতিথিশালা—ব্রহ্মচর্যাশ্রম-যুগে 'শান্তিনিকেতন' বলিতে ঐ বাড়িটি বুঝাইত। কালে সমস্ত আশ্রমই ঐ নামে অভিহিত হয়। বর্তমানে ঐ বাড়ি বিশ্বভারতীর আপিস।

পৃ ৪০। হিমালয়ের স্মৃতি বৃদ্ধবয়সে এক কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। শান্তিনিকেতনে নববর্ষ (১৪ এপ্রিল ১৯২৭), 'হাসির পাথেয়' কবিতা দ্রষ্টব্য (বনবাণী। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ ১৪৯)

পৃ ৪২। কুমারসম্ভব। পাদটীকা ৩।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ লইয়া শ্রীকানাই সামন্ত 'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া মালতী পুঁথির একটি পাঠ রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

দ্র রবীন্দ্রপ্রতিভা (১৯৬১), পৃ ২৪৯-৫৫।

পৃ ৪৩। "প্রকৃতির খেদ" কবিতাটি 'রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন' (শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, 'রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস)। "হিন্দুমেলায় উপহার" এবং "প্রকৃতির খেদ" কবিতা দুইটির ভাবসাদৃশ্যও সংশয়াতীত (শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০)। সুখের বিষয়, কবির স্মৃতি ও স্বীকৃতি তথা আভ্যন্তরীণ পরোক্ষ প্রমাণের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করিবার প্রয়োজন আর নাই। 'প্রকৃতির খেদ' যে রবীন্দ্রনাথের রচনা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদিত "সাধারণী" পত্রিকার এক সংখ্যায় (৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) ঠাকুরবাড়ির 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে জানা যায় যে, বিদ্বজ্জন-সমাগমের বিগত অধিবেশনে (বৈশাখ ১২৮২) "বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রকৃতির খেদ' নামে স্ব-রচিত একটি পদ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারত ভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর বয়স ১২।১৩ বৎসর।" তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স আসলে চৌদ্দ বৎসর, বারো-তেরো বৎসর নয়। 'অভিলাষ' প্রকাশের সময়েও (১২৮১) তিনি দ্বাদশবর্ষীয় বালক ছিলেন না। 'অভিলাষ' কোনো সভায় পঠিত হইয়াছিল কি না জানা যায় নাই। 'হিন্দুমেলায় উপহার' যদি সাধারণের সমক্ষে পঠিত (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) প্রথম কবিতা হয়, তাহা হইলে 'প্রকৃতির খেদ' হয়তো উক্ত প্রকার দ্বিতীয় কবিতা। দ্র দেশ, ১৬ চৈত্র ১৩৫২, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা'।

'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'প্রতিবিম্ব' বৈশাখ ১২৮২ (১ম বর্ষ ১ম) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহার সংশোধিত পাঠ পুনরায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আষাঢ় ১২৮২ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত) ৪র্থ খণ্ডে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার 'প্রতিবিম্ব' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র দুইটি পাঠই প্রদত্ত হইয়াছে। পৃ ৮২৮-৩৫ ; ৮৩৫-৩৯।

২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ শিলাইদহ হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথকে কলিকাতায় লিখেন: "বিদ্বজ্জনের Card ও রবির কবিতা পাঠাচ্ছি—কর্ত্তামহাশয় [দেবেন্দ্রনাথ] কবিতাটি পাঠ করিয়া ভাল বলিলেন।"

দ্র সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ, জীবন ও সাহিত্য (১৩৬৭), পৃ ২০৭।

দ্র শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভোরের পাখি', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮, পৃ ১২৪-২৫।

'অভিলাষ' কবিতা। মনে হয় 'ম্যাকবেথ' নাটক পড়িবার পর নরনারীর পাপমলিন আকাঙ্ক্ষাকে বিকৃত করিয়া এইটি রচিত হয়। এতদ্‌ব্যতীত রামায়ণ মহাভারত-বর্ণিত পাপাচারের কথা আছে। কিন্তু বালকের

মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, অভিলাষ যদি না থাকিত তবে কি পৃথিবীর এত উন্নতি হইত? একটি বিষয়কে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই তার ধনাত্মক ও নঙাত্মক দিক দিয়া বিচার করিতেন; বাল্যকালের রচনার মধ্যেও সেই দ্বিধামনকে পাই।

'অভিলাষ' ও বালক (১২৯২) পত্রে প্রকাশিত বালক-রচিত 'অবসাদ' নামে কবিতাদ্বয় সজনীকান্ত দাসের মতে প্রায় একই সময়ে রচিত ও পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু 'মালতী পুঁথি'তে এই কবিতার যে একটি পাঠ আছে, তাহার পাশে ৬ জুলাই ১৮৭৮ আছে। দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ ৮০ ও সংযোজন।

পৃ ৪৪। ১ম পংক্তি 'গুণেন্দ্রনাথের বাড়ীতে' ২০ বৈশাখ ১২৮২ হইবে।

পৃ ৪৯। 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'— সংগীত প্রকাশিকা, অগ্রহায়ণ ১৩১২ সংখ্যায় (৫ম ভাগ ৩য় সংখ্যা) গানটির রচয়িতা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্র শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রনাথের একটি গান', দেশ, ৫ আষাঢ় ১৩৫৫, পৃ ২৮৯-৯১।

পৃ ৫৩, ৮৪। 'উদাসিনী'-উৎস। সংগত কারণেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। এতে পাই আধুনিক রোম্যান্টিক আখ্যায়িকা কাব্য ও গাথা-কাব্যের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, যার আদর্শে সেকালের একাধিক খ্যাতিমান কবি এ জাতীয় কাব্য রচনার প্রেরণা পান। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বাল্যরচনা 'বনফুল' কাব্যের জন্যে উদাসিনীকে আশ্রয় করেন।

উদাসিনীর ভূমিকা যেহেতু এত গুরুত্বপূর্ণ, সে কারণে এই রচনা সম্পর্কে তথ্যগত উল্লেখ নির্ভুল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই কাব্য সংক্রান্ত একটা প্রাথমিক তথ্যই প্রমাদপূর্ণ হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্র-জীবনীর প্রথম খণ্ডে লেখা হয়েছে যে, উদাসিনী "ইংরেজ কবি টমাস পার্নেলের (১৬৭৯-১৭০৮) 'হারমিট' কাব্যের ছায়াবলম্বনে রচিত।" সুকুমার সেনও তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, "উদাসিনী . . কাব্যের আখ্যানবস্তু কতকটা পার্ণেলের 'দি হার্মিট' কাব্যের মত। একদা এই ইংরেজী কবিতাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাঠ্য ছিল, সেইজন্য ইহার অনেকগুলিই বঙ্গানুবাদ বাহির হইয়াছিল।" উভয় ক্ষেত্রে একই তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় আর কেউ এটিকে যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। সম্প্রতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি-প্রাপ্ত এক গবেষণা প্রবন্ধেও এই একই তথ্য পল্লবগ্রাহী তৎপরতায় সন্নিবেশিত হয়েছে [বহ্নিকুমারী চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য); বাংলা গাথাকাব্য, ১৯৬২]। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ইণ্ডিয়া আপিস ক্যাটালগেও লেখা আছে যে, উদাসিনী হল "An imitation of Parnell's *Hermit*."

কিন্তু পার্নেলের মূল কবিতাটি পড়লে স্পষ্ট ধরা পড়ে যে, এই তথ্যটি কতখানি ভুল। উদাসিনীর সঙ্গে সে কবিতার কোনোই যোগ নেই। উদাসিনী প্রণয়মূলক গাথা। পার্নেলের হার্মিটে প্রণয়ের নামগন্ধ নেই, কোনো নারীচরিত্রও নেই। সে কবিতা একান্তই নীতিমূলক, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল এই যে, এ পৃথিবীতে মানুষের সব কাজই ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং তার পিছনে কোনো-না-কোনো মঙ্গলের বিধান বর্তমান থাকে। যা আপাত পাপকার্য বলে বোধ হয় তার পেছনেও মঙ্গলবিধান সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করে। নির্জনবাসী এক সন্ন্যাসীর মনে পাপ সম্বন্ধে সংশয়চিন্তা উদয় হওয়াতে ছদ্মবেশী স্বর্গদূত কয়েকটি ঘটনা দ্বারা ভগবানের মঙ্গলময় বিধান সম্পর্কে সন্ন্যাসীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে।

উদাসিনীর প্রেরণা-উৎস 'হার্মিট' কবিতা বটে, কিন্তু সে 'হার্মিট' কবিতা পার্নেলের নয়; সেটি হল অলিভর গোল্ডস্মিথের (১৭২৮-১৭৭৪)। গোল্ডস্মিথ-রচিত 'এড্উইন ও অ্যাঞ্জেলিনা' নামক ব্যালাড কবিতাটি অক্ষয়চন্দ্রের

কালে 'হার্মিট' নামে খ্যাত ছিল। এই কবিতায় এডউইন ও অ্যাঞ্জেলিনার যে প্রণয়কাহিনী পাই, সেই কাহিনীই হল উদাসিনী কাব্যের মূল কথাবস্তু। এ কথা সমসাময়িক কালে অজানা ছিল না। কবি রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর 'বীণা' নামক মাসিক পত্রে উদাসিনী কাব্য ও তার কবি সম্পর্কে লেখেন, "তাঁহার বর্ণনাশক্তি সুন্দর এবং ভাষাও খুব সরল। কিন্তু উদাসিনীর গল্পটি চোরাই মাল। গ্রন্থকার কবিবর গোল্ডস্মিথের সন্ন্যাসী (Hermit) নামক পদ্যটি সাতাইয়াছেন। পাঠকগণ উদাসিনীর সহিত ইংরাজ কবির সন্ন্যাসী মিলাইয়া দেখিবেন। তবে কিনা সে গল্পটি অতি ক্ষুদ্র, আর উদাসিনীর গল্প দীর্ঘ।" —সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, চতুর্থ খণ্ড, রাজকৃষ্ণ রায়।

উদাসিনীর আগেও গোল্ডস্মিথের হার্মিট অবলম্বনে একাধিক আখ্যায়িকাকাব্য লেখা হয়। তার মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় -রচিত 'প্রমোদকামিনী' কাব্য উল্লেখযোগ্য। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। লেখক নিজেই বিজ্ঞপ্তি দেন, "অলিবর গোল্ডস্মিথ সাহেবের হারমিট নামক উৎকৃষ্ট কবিতা অবলম্বন করিয়া এই প্রমোদকামিনী কাব্য রচিত হইল।" প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক অনুবাদ প্রতিযোগিতায় পার্নেল এবং গোল্ডস্মিথ উভয়েরই হার্মিট কবিতা অনুবাদ করে পুরস্কার লাভ করেন।[১]

পৃ ৫৬। জ্ঞানাঙ্কুর-প্রতিবিম্বে প্রকাশিত 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছ। রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত) ৪র্থ খণ্ডের (গান) শেষ ভাগে আছে।

প্রলাপ ১, পৃ ৮৩৯-৪৫, চার পংক্তির ৩৪টি স্তবক। প্রলাপ ২, ৮৪৫-৪৭। প্রলাপ ৩, পৃ ৮৪৭-৪৯।

দ্র সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, পৃ ২০৯-১১।

পৃ ৫৮। 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমালোচনা প্রবন্ধ 'জ্ঞানাঙ্কুর-প্রতিবিম্বে' প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে অক্ষয় চৌধুরীর হাত না থাকিলেও তাঁহার উপদেশ ও প্রদত্ত উদাহরণমালা যে ছিল তাহা প্রবন্ধটি পাঠ করিলে স্পষ্ট হয়। "Lalla Rookh ও Lyric Poetry, Irish Melodies ও Lyric Poetry, কিন্তু আমরা গীতিকাব্য অর্থে মেঘদূতকে মনে করি নাই, ঋতুসংহারকে গীতিকাব্য কহিতেছি।. ." ইত্যাদি মতামত স্বল্প ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের লেখনী হইতে নির্গত হওয়া সহজ নহে। প্রবন্ধটির অনেকাংশ, সজনীকান্ত দাস -লিখিত রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য গ্রন্থে উদ্‌ধৃত আছে। পৃ ২১২-১৫।

পৃ ৬০। উনশেষ পংক্তি "তাঁহার তাঁত ও দেশালাই-এর কল করিবার প্রয়াস"।

তাঁত ও দেশালাইএর কল প্রস্তুত সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি'তে আছে : "স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন।... অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরি হইল।...

খবর পাওয়া গেল একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ; গেলাম তাহার কল দেখিতে। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত।" ('স্বাদেশিকতা', জীবনস্মৃতি)

উল্লিখিত 'অল্পবয়স্ক ছাত্র' হইতেছেন ত্রিপুরা-কালিকচ্ছ গ্রামের মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী (জন্ম ২২ নভেম্বর ১৮৫৫ : ৮ অগ্রহায়ণ ১২৬১)। ঢাকায় এফ্.এ. পর্যন্ত পড়িয়া কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইতে আসেন (১৮৭২-৭৩)। সঞ্জীবনী সভার উত্তেজনার স্পর্শ পাইবার পূর্বে তিনি দিয়াশলাই তৈরি ও তাঁতের উন্নতি কল্পে

[১] মুদ্রিত বিবরণ শ্রীআদিত্য ওহদেদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

গবেষণা শুরু করেন। দেশী তাঁত মাটির মধ্যে গর্ত করিয়া বসানো হয়। কিন্তু কাপড়ের কলের তাঁত অন্য রকমের . . ইহার fly shuttle।

মহেন্দ্রচন্দ্র কলের তাঁতের অনুকরণে হাতে কাজ করিবার উপযোগী নূতন তাঁত তৈয়ারি করেন। কলিকাতা হইতে কালিকচ্ছ ফিরিয়া তিনি গৃহে তাঁত বসান ও ক্রমে গ্রামের মধ্যে প্রবর্তন করেন। দেশালাইএর কল তাঁহার আবিষ্কার। এ বিষয়ে কিরণচন্দ্র সেন তাঁহার *Match Industry in Danger* গ্রন্থে (পৃ ২) লিখিতেছেন —"The invention by Dr. Mahendra Chandra Nandi of Kalikachchha, in the District of Trippurah, of a small lever type machine for cutting veneers for boxes and splints may be regarded as the first step towards opening up new possibilities in the direction..."। মোট কথা, সঞ্জীবনী-সভার শিল্পোন্নতি প্রয়াসের সহিত এই যুবকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। [এই-সব তথ্য আমার বিশেষ অনুরোধে মহেন্দ্রচন্দ্রের পুত্র শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীসাধকচন্দ্র নন্দী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।]

পৃ ৬১। হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা-পাঠ। নবীনচন্দ্র সেন উপস্থিত ছিলেন। নবীনচন্দ্র সেই সময়ে (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬) চট্টগ্রামের কমিশনার সাহেবের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। মনে হয় ইস্টারের ছুটিতে হিন্দুমেলার সভায় উপস্থিত হন। তাঁহার জীবনী হইতে এ সময়ে কোনো ছুটি লন বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং ১৮৭৬ সালের ইস্টারের ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন মনে হয়।

পৃ ৬৩। দিল্লী-দরবারে কবিতা-পাঠ ছাড়া যে গানটি করেন সেটি আমাদের মনে হয় 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি'। গীতবিতান, পৃ ৮০৭। জাতীয়-সংগীত গ্রন্থের ১ম ভাগ ২য় সংস্করণে (১৮৭৮) মুদ্রিত আছে।

দ্র শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, পৃ ৩১৬।—রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত) ৪, পৃ ৮৪৯-৫০।

পৃ ৬৫। ভারতী। প্রকাশ শ্রাবণ ১২৮৪।

সম্পাদকগণ

শ্রাবণ ১২৮৪ - বৈশাখ ১২৯১	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ - ১৩০১	স্বর্ণকুমারী দেবী (ঘোষাল)
১৩০২-১৩০৪	হিরণ্ময়ী দেবী (মুখোপাধ্যায়)
	সরলা দেবী (ঘোষাল)
১৩০৫	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৬-১৩১৪	সরলাদেবী চৌধুরানী
১৩১৫-১৩২১	স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩২২-১৩৩০	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৩৩১-১৩৩৩ (আশ্বিন)	সরলাদেবী চৌধুরানী

অতঃপর বন্ধ হইয়া যায়।

পৃ ৬৯। পাদটীকা ৩। ভানুসিংহের কবিতা বা ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। ১২৮৪ বর্ষাকালেই অনেকগুলি রচিত বলিয়া মনে হয়। 'ভারতী' ১ম বর্ষ আশ্বিন ১২৮৪ হইতে চৈত্র (কার্তিক মাসে নাই) পর্যন্ত ৭টি এবং ২য় বর্ষ

১২৮৫ হইতে ৫ম বর্ষ ১২৮৮ পর্যন্ত ৬টি, ১২৯০এ ১টি মোট ১৪টি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে ১২৯১ (১৮৮৪)-এ পাই ২১টি গান। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ২০টি। গীতবিতান-অন্তর্গত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর পাঠ স্থানে স্থানে পৃথক দেখা যায়। স্বরবিতানে (২১ খণ্ড) মাত্র ১০টি গানের স্বরলিপি আছে। পদাবলীগুলিতে সুরের উল্লেখ আছে, কিন্তু কানে-শোনা সুর জানা নাই।

পৃ ৮০-৮১। মালতী পুঁথির পাঠ গ্রন্থমধ্যে উদ্‌ধৃত হইয়াছে। ইহার সংস্কৃত পাঠ 'বালক' হইতে দেওয়া হইল।

অবসাদ

দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি,
জাগাও—জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীন হীন।
ঢাল এ হৃদয়মাঝে জলন্ত অনলময় বল।
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন;
নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন স্থল।
নিদাঘ-তপন শুষ্ক ম্রিয়মাণ লতার মতন
ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারিদিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন—প্রাণহীন—জনহীন—মরু মরু মরু—
আঁধার—আঁধার সব—নাই জল নাই তৃণ তরু,—
নির্জীব হৃদয় মোর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে;
এস দেবি এস, মোরে
রাখ এ মূর্চ্ছার ঘোরে
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাও গো উঠায়ে।
দাও দেবি সে ক্ষমতা, ওগো দেবি শিখাও সে মায়া—
যাহাতে জলন্ত, দগ্ধ, নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া,
শুনি সুহৃদের স্বর থাকিলেও বিজনে একাকী।
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয় প্রমোদবনে বাজে সদা আনন্দের গীত।
মুমূর্ষু মনের ভার—
পারি না বহিতে আর—
হইতেছি অবসন্ন—বলহীন চেতনারহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবীতলে—অকর্মণ্য—অনাথ—অজ্ঞান—
উঠাও উঠাও মোরে—করহ নূতন প্রাণ দান।
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।

অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মের অনুষ্ঠান।
দুর্গম উন্নতি পথে পৃথ্বী তরে গঠিব সোপান,
তাই বলি দেবি—
সংসারের ভগ্নোদ্যম, অবসন্ন দুর্বল পথিকে
করগো জীবনদান তোমার ও অমৃত নিষেকে। —বালক, চৈত্র ১২৯২, পৃ ৫৮৫-৮৬।

এই কবিতা সম্বন্ধে সজনীকান্ত দাস 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (পৃ ১০৬-১১)। তাঁহার মতে ইহা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্বে লিখিত। তিনি মনে করেন 'অবসাদ' ও 'অভিলাষ' কবিতা দুইটি পরস্পরের পরিপূরক ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। আমাদের মতে ইহা কোনো ইংরেজি কবিতার অনুবাদ; বিষয়টি গবেষণাসাপেক্ষ।

পৃ ৮২। গ্যেটে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি অংশের মূল আছে Talks in China (১৯২৫) গ্রন্থে, পৃ ৬৭-৬৮। পেকিং শহরে সাহিত্যিকদের এক ভোজসভায় মূল বক্তৃতাটি সর্বপ্রথম প্রদত্ত হয়। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭, পৃ ২৫৩।

পৃ ৮৪। পাণ্ডুরঙ্গ। ডক্টর আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ (১৮২৩-১৮৯৮) গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজের (১৮৪৫) প্রথম দলের ছাত্র। ইঁহার কন্যারা আন্না (অন্নপূর্ণা) ও দুর্গা ইংরেজ মিশনারীর পত্নী মিসেস্ মিচেল (Mitchel)এর নিকট শিক্ষা পাইয়া ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজিয়ানায় পাকা হন। আন্না অপরূপ সুন্দরী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ বিলাত রওনা হইয়া যান। ১১ নভেম্বর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আন্নাকে সদ্য-প্রকাশিত 'কবিকাহিনী' একখণ্ড পাঠাইয়া দেন। ২৬ নভেম্বর আন্না উত্তর লেখেন। তখন তিনি অসুস্থ। অল্পকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই ও আহমদাবাদে প্রার্থনা-সমাজ স্থাপিত হয়। জুলাই মাসে "পুণা নগরে একটি প্রার্থনা সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার উপাসনাপ্রণালী অনেক পরিমাণে আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়। তাহাতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৭৯৪ শক।

মার্চ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ রাণাডে, আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ, আহমদাবাদের ভোলানাথ সরাভাই (অম্বালালের পিতা), গোবিন্দ কাণে, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি এক পত্রযোগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলেন যে, তিন সমাজ একত্র করিয়া United Theistic Church in India গড়িয়া তোলার চেষ্টা তিনি যেন করেন। দ্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮০২ শক, পৃ ২৩৭-৩৮।

পৃ ৯১। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। রাজনারায়ণ বসু দেবগৃহে (দেওঘর) ২০ জ্যৈষ্ঠ [১২৮৭] খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিতেছেন :

"১৫ই জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী' পাঠ করি। 'ইউরোপ-যাত্রী' শিরস্ক প্রস্তাবটি সুরসিকতা ও মনোরম চটুলতায় উপছিয়া পড়িতেছে। লণ্ডনের কলাই-এর দোকান, দরজির দোকান, নাপিতের দোকান, আমোদকাল (season) সকল বিষয়ের বর্ণনা অতি সুন্দর ও প্রতিভাসূচক।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮০৫ [১২৯০।১৮৮৪]। পৃ ২৩৪। য়ুরোপ-যাত্রীর ১১শ পত্রের উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে। সমসাময়িকের দৃষ্টি।

পৃ ৯২। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। কাহাকে লিখিত? "তোমরা আবার দশজনের কাছে গল্প করে বেড়াবে। তোমাদের পেটে যদি কথা থাকে।" (পৌষ ১৩৬৭ সংস্করণ, পৃ ১৯৯)

"তুমি ঘোমটা টেনে বসে থাকবে", ঐ, পৃ ১১৬।

আমাদের মনে হয় পত্রগুলি কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে লিখিত হইলেও 'ভারতী'তে প্রকাশের জন্যই প্রেরিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হইলেও ইহার কাজকর্ম দেখিতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

পৃ ৯৯। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থদ্বয়ের তুলনা।

দ্র শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, বাল্মীকি-প্রতিভা-প্রসঙ্গে রবিবারের যুগান্তর, ৫ চৈত্র ১৩৬৭ (১৯ মার্চ ১৯৬১)। ইনি লিখিতেছেন, "হরপ্রসাদ তাঁর ৮ খণ্ড বা অধ্যায়ে সমাপ্ত 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থে একমাত্র ৪র্থ খণ্ডের একটি পরিচ্ছেদ ছাড়া অন্য কোথাও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই।" 'বাল্মীকির জয়', বঙ্গদর্শন, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র ১২৮৭ সংখ্যায় ও পুস্তকাকারে পৌষ ১২৮৮ (ডিসেম্বর ১৮৮১)-এ প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদর্শনের সমালোচক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত হরপ্রসাদের গ্রন্থাবলীতে 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টে বঙ্গদর্শনের সমালোচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পৃ ১০০। বিলাতি সুরের প্রয়োগ—দ্র ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬; 'রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান', বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৯, পৃ ৪৬-৪৮। পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে ভুলক্রটি সংশোধিত। রবীন্দ্রনাথের 'ভাঙা-গান' (সংযোজন ও সংশোধন), বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯, পৃ ৯৯। পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

পৃ ১১২। শ্রীমতী হে…।

"একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা বিনিময়।"

—আকাশপ্রদীপ। শ্যামা (৩১ অক্টোবর ১৯৩৮)।

পৃ ১১৩। 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হয় ১২৮৮ সালে ও মহারাজ ধীরেন্দ্রমাণিক্যের মহিষী ভানুমতীদেবীর মৃত্যু হয় ১২৮৯এ। ইহার মৃত্যুর পর কাব্যখানি মহারাজার হস্তগত হয়।

পৃ ১৪০। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বঙ্কিমপ্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আছে: "রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] উপন্যাস [বউঠাকুরানীর হাট] কি আপনি পড়িয়াছেন?" উত্তর—"পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে, কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সে কথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ [শাস্ত্রী] তুমি [শ্রীশচন্দ্র] ও রবির মধ্যে আমার বোধ হয় রবি বেশি 'গিফটেড' কিন্তু 'প্রিকোসাস', এখনি তার বয়স ২২।২৩, সেকথা সেদিন রবিকে বলেছি।" — সুরেশ সমাজপতি, 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', পৃ ১৯৬। উদ্‌ধৃতি ভবতোষ দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭, পৃ ২৫২, পাদটীকা ৪।

পৃ ১৪৪। বউঠাকুরানীর হাট। ১২৮৮-৮৯ 'ভারতী'তে প্রকাশিত। ইহাতে ১১টি গান আছে। কিন্তু রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১ম খণ্ডে বউঠাকুরানীর হাটে গানের সংখ্যা ৯টি। 'মা আমি তোর কী করেছি' এবং 'আজ আমার আনন্দ দেখে কে' গ্রন্থ-মধ্যে নাই। ইহার ৪টি গান 'প্রায়শ্চিত্তে' (১৩১৬) পাই। 'পরিত্রাণে' (১৩৩৬) একটি গান আছে।

কেদারনাথ চৌধুরী -রচিত 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকে (১৮৮৬) রবীন্দ্রনাথের ৭টি গান ছিল ; তন্মধ্যে ৫টি 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস হইতে গৃহীত। ২টি নূতন বলিয়া অনুমিত হয়—

ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি টুটবে না —গীতবিতান, পৃ ৭৯৬।
মুখের হাসি চাপলে কি হয় —গীতবিতান, পৃ ৭৯৬।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে দ্বিতীয় গানটি নাই।

পৃ ১৫০। ২৯ জুলাই ১৮৮১। কৃষ্ণকুমার মিত্র (২৭) ও লীলা দেবীর (১৯) বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ৩টি গান রচনা করেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ও সিটি স্কুলের শিক্ষক। রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলার সহিত এই বিবাহ নবনির্মিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। তজ্জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের কেহ ইহাতে যোগদান করেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করিয়া যুবক ব্রাহ্মদের শিখাইয়া দেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (রামমোহন রায়ের জীবনীকার), সুন্দরীমোহন দাস (বিখ্যাত চিকিৎসক), কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুনিলাল ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি গান শিক্ষা করেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সদস্য, বয়স ১৯ বৎসর। পরে ইনি স্বামী বিবেকানন্দ রূপে খ্যাত হন।

গান— দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি —গীতবিতান, পৃ ৬০৯
জগতের পুরোহিত তুমি —তোমার এ জগৎ-মাঝারে —গীতবিতান, পৃ ৮৫৮
শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার —গীতবিতান, পৃ ৬১০

দ্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮০৩ শক (১২৮৮), পৃ ৯৮। শ্রীকালিদাস নাগ, ভানুসিংহের পদাবলী, মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৫৭, পৃ ৬৪৮।

'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' গানটির প্রথম পাঠ পাওয়া যায় যোগেন্দ্র বসুকে লিখিত পত্রে— 'মহাগুরু, দুটি ছাত্র এসেছে তোমার'— (পাণ্ডুলিপি পত্র)।

পৃ ১৫৫। পাদটীকা ৪। ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ হইবে।

পৃ ১৫৬। পাদটীকা ১। ৮ মাঘ ১২৯২ হইবে।

পৃ ১৬০। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ 'অচ্ছুৎ-সমস্যা' সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাহিত্যের এই একটি নূতন দিক। কারোয়ার হইতে স্টীমারে ফিরিবার সময় কয়েকটি গান লেখেন। দ্র জীবনস্মৃতি।

পৃ ১৬২। পাদটীকা। কাব্যসংগ্রহের 'মধ্যে' হইবে।

পৃ ১৭৫। পাদটীকা ২। রবীন্দ্রনাথ নিজের বিবাহ-নিমন্ত্রণ নিজেই করেন। ব্লক ছাপাইয়া বন্ধুমহলে পাঠান। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকেও ঐ পত্র পাঠান।

পৃ ১৭৭। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের তিন মাস পরে স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর সহিত ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। তদুপলক্ষে 'বিবাহ উৎসব' নামে এক গীতিনাট্য যৌথভাবে রচিত হয়। ইহাতে ৭টি দৃশ্য ও মোট ৪৫টি গান ; তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান ২৮টি ; অপরগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী ও স্বর্ণকুমারীর রচিত। সরলা দেবী 'জীবনের ঝরাপাতা'য় লিখিতেছেন —"বৎসরের আমোদ-উৎসব স্বরূপ রবিমামা 'বিবাহোৎসব' বলে একটি গীতিনাটিকা রচনা করে অভিনয় করলেন।" —পৃ ৫৬-৫৭। দ্র গীতবিতান, পৃ ৭৭৫-৮০ ; গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৯৭৪।

পৃ ১৭৮। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮০৬ শক (১২৯১) সংখ্যায় 'স্নান ও মান' শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় আছে, "ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশ হইবে না।" (পৃ ২৮)। কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুর

অব্যবহিত পরেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন। শরৎকুমারী চৌধুরাণী 'ভারতীর ভিটা' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫১) প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীই ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল, ভারতীর সেবকরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না, ভারতী ধুলায় মলিন। এই দুর্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন শক্তির পরিচয় দিলেন . . সেই সংকটকালে তিনি রক্ষা না করিলে আজ ভারতীর নাম লুপ্ত হইয়া যাইত।"

পৃ ১৮০। 'কড়ি ও কোমল'-এর 'কোথায়', 'পুরাতন' প্রভৃতি কবিতার সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভাদ্র ১২৯১ (১৮০৬) সংখ্যায় প্রকাশিত ২টি গান দ্রষ্টব্য।

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই —গীতবিতান, পৃ ১০২

চলিয়াছি গৃহ-পানে, খেলাধুলা অবসান —গীতবিতান, পৃ ৮৩১

পৃ ১৮৩। 'সরোজিনী-প্রয়াণ' প্রবন্ধ-মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সহিত চাপা কান্না আছে। "আবার কেমন হৃদয়ের মধ্যে মেঘ করিয়া আসে, লেখার উপর গাঢ়ীর ছায়া পড়ে,—মনের কথাগুলি শ্রাবণের বারিধারার মত অশ্রুর আকারে ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে চায় . . আমার মনের মধ্যে যাহাই হউক, আমি নিজের মেঘে পাঠকের সূর্যকিরণ রোধ করিয়া রাখিতে চাই না— সুতরাং নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি সরিয়া পড়িলাম . .।" —ভারতী ১২৯১, পৃ ১৮৫। আরও দুই-একটি অংশ এইরূপ মনোভাব হইতে লিখিত।

পৃ ১৮৪। সঞ্জীবনী (সাপ্তাহিক), ৩ বৈশাখ ১২৯০ (এপ্রিল ১৮৮৩) প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, গগনচন্দ্র হোম ও পরেশনাথ সেন ছিলেন প্রতিষ্ঠার মূলে। প্রথম দিকে দ্বারকানাথই প্রধানত পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৮। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা প্রথম বৎসরেই প্রকাশিত হয়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন ১ আশ্বিন ১২৯১ (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪)।

৬ আশ্বিন রবিবার আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' প্রভৃতি ভাষণ প্রদত্ত হয়। আমার মনে হয় এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সদ্য-রচিত দুইটি গান গীত হয়। গান ২টি—

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন —গীতবিতান, পৃ ১৮৭।

তাহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে —গীতবিতান, পৃ ৮৩৫।

দ্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮০৬ শক (১২৯১), পৃ ১২১-২২।

পৃ ১৯১। 'পদরত্নাবলী' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এক পত্রে (২৫ আশ্বিন ১২৯২) লেখেন, "তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন।" বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, পরিষৎ সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ৪১৩।

দ্র শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান (১৩৬১), চতুর্থ অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ (পৃ ৪৪-৫৪) পদাবলীর সংকলয়িতা, এই গ্রন্থমধ্যে পদরত্নাবলী সটীক মুদ্রিত হইয়াছে। ১২৯২-এর পর ১৩৬৮ সালে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র যখন পদাবলী-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তখন সতীশচন্দ্র রায়ের 'পদকল্পতরু' মুদ্রিত হয় নাই।

যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, রবিচ্ছায়া-সম্পাদক। জন্ম ৮ এপ্রিল ১৮৬১; মৃত্যু ১৩ জানুয়ারি ১৯৩২। নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার চাকদহ থানার গৌড়পাড়া গ্রামের নিবাসী। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সিটি স্কুলের শিক্ষক,

তখন হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরক্ত হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সরকারে চাকুরি গ্রহণ করেন; কালে রাজস্ব-বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারি পদে উন্নীত হন।

২০ ডিসেম্বর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনারায়ণ এক পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথের কাছ হইতে তাঁহার সংকলিত গ্রন্থের নাম কি হইবে তাহা জানিতে চাহেন। রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে লেখেন—"আলোছায়া বললে কেমন হয়? আর রবিচ্ছায়া যদি বলেন সে আপনাদের অনুগ্রহ। নামকরণটার ভার আপনার উপরে-- যখন আপনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তার গোত্র ও নাম আপনারি দাতব্য, আমার সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই।" দ্র মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ ৫২৭।

পৃ ১৯২। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। "গদ্যপদ্যর ভেদ ও সেই প্রভেদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অল্পকাল হল ঠা [ঠাকুরদাস] মুখুজ্জের সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা চলছিল। তাঁর মতে ভবিষ্যতে গদ্য এতদূর পর্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে যে পদ্যর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যাবে।..ভাবে বোধ হল তাঁর বিশ্বাস আমার গদ্যে আমার পদ্যের চেয়ে ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক।" কলিকাতা, মঙ্গলবার, ২০ নভেম্বর [১৮৯৪]। ছিন্নপত্রাবলী, পৃ ৩৭৯-৮০।

"এপারে সন্ধের সময় আমার একটি বেড়াবার সঙ্গী পাওয়া গেছে। লোকটির নাম ঠা [ঠাকুরদাস]। বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী, চিন্তাশীল, স্পষ্টবক্তা এবং জমিদারী কাজকর্মে বহুদর্শী। রোজ বেড়াবার সময় এঁর সঙ্গে আমার নানা ভাবের আলোচনা হয়ে থাকে।" শিলাইদহ, ১ ফাল্গুন [১৩০১], ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫। ছিন্নপত্রাবলী, পৃ ৩৯৯।

"আজকাল আর আমার একলা বেড়ানো হয় না। সঙ্গে প্রায়ই শৈ [শৈলেশ মজুমদার] এবং ঠা [ঠাকুরদাস] বাবু থাকেন।..ঠা [ঠাকুরদাস] বাবুর মুখ থেকে এখানকার সেরেস্তার রিপোর্ট শুনতে থাকি এবং সেই রিপোর্টের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রভরা আকাশ উঁকি মারতে থাকে..।" শিলাইদহ, ১০ মার্চ [১৮৯৫], ২৭ ফাল্গুন ১৩০১। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২, পৃ ৪-১৪। ছিন্নপত্রাবলী, পৃ ৪২৫।

ঠাকুরদাস কিছুকাল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর এস্টেটে কাজ করিয়াছিলেন। দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৮৪। ঠাকুরদাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। দ্র 'কবিপ্রণাম' (১৩৪৮)।

ঠাকুরদাস 'মন্ত্রি-অভিষেক' প্রবন্ধের সমালোচনা লেখেন। নব্যভারত, পৌষ ১২৯৭। দ্র বিশু মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসাগর-সঙ্গমে' (১৯৬২), পৃ ৫৯-৭০।

পৃ ২০৫। ১২৯২ সালের ৯ মাঘ ব্রাহ্মসম্মিলন জোড়াসাঁকোর বাটীতে হয়। 'রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গীত স্বয়ং গাহিয়াছিলেন।' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১২৯২, পৃ ২১১।

১২৯২ সালে বীরভূম জেলায় দুর্ভিক্ষ হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৌষ-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সমাজের সম্পাদক হিসাবে বোলপুর ও তন্নিকটবর্তী রামনগর গ্রামে যে রিলিফ কার্য হয়, তাহার প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। সমাজ হইতে ৯৪৬৲ টাকা সংগৃহীত হয়, ৩ জ্যৈষ্ঠ হইতে ১২ কার্তিক (১২৯২) পর্যন্ত ৫২,৬৩২ জনের মুখে অন্ন দেওয়া হয়। গড়ে দৈনিক ৩৫০ জন লোককে সাহায্য করা হইয়াছিল।

ব্রহ্মসংগীত। রবীন্দ্রনাথ উনিশ বৎসর বয়স হইতে ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। উনিশ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি যে-সব ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে; অধিকাংশ গান মাঘোৎসবের জন্য রচিত। গানগুলির পাশে 'গীতবিতান' নূতন সংস্করণের পত্রাঙ্ক দেওয়া হইল। রবীন্দ্রনাথ গানগুলি কিভাবে ছড়াইয়া দিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রহ্মসংগীতের

তালিকা নীচে প্রদত্ত হইল। আরও ব্রহ্মসংগীত এই পনেরো বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছিল কি না তাহা গবেষণাসাপেক্ষ।

১২৮৭ [১৮৮০-৮১]। ১৮০২ শক। বয়স ১৯ বৎসর॥ আমরা যে শিশু অতি, ৮২৩ ; তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, ৩১৮ ; এ কি এ সুন্দর শোভা, ২১৪ ; দিবানিশি করিয়া যতন, ৮২৪ ; কোথা আছ প্রভু, ৮২৫ ; তুমি কি গো পিতা আমাদের, ৮২১ ; মহাসিংহাসনে বসি, ৮২৪।

১২৮৯ [১৮৮২-৮৩]। ১৮০৪ শক। বয়স ২১ বৎসর॥ যাও রে অনন্তধামে মোহমায়া পাশরি, ৬৩৩ ; দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব, ৮২৬ ; কী করিলি মোহের ছলনে, ৮২৫ ; বড়ো আশা করে এসেছি, ৮২৭ ; আজি শুভদিনে পিতার ভবনে, ৮২৬।

১২৯০ [১৮৮৩-৮৪]। ১৮০৫ শক। বয়স ২২ বৎসর॥ বর্ষ ওই গেল চলে, ৮২৭ ; সখা, তুমি আছ কোথা, ৯৪৫ ; প্রভু, এলেম কোথায়, ৮২৮ ; শুভ্র আসনে বিরাজো অরুণছটামাঝে, ১৭৮ ; সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার, ৮২৮ ; কে রে ওই ডাকিছে, ১৮২ ; সকলেরে কাছে ডাকি, ৯৪৫ ; কী দিব তোমায়, ৮২৯ ; তোমারেই প্রাণের আশা কহিব, ৮২৯ ; হাতে লয়ে দীপ অগণন, ৮২৯ ; অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে, ২০১ ; সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, ৮৩০।

১২৯১ [১৮৮৪-৮৫]। ১৮০৬ শক। বয়স ২৩ বৎসর॥ রজনী পোহাইল, চলেছে যাত্রীদল, ৮৩০ ; এ কী সুগন্ধহিল্লোল বহিল, ২১৩ ; আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ, ৮৩১ ; দিন তো চলি গেল প্রভু বৃথা, ৮৩২ ; এ মোহ-আবরণ খুলে দাও, ১৭২ ; দুয়ারে বসে আছি প্রভু, ৮৩৩ ; বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি, ৫৮ ; চলিয়াছি গৃহপানে, ৮৩১ ; দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই, ১০২।

১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাহার পর কার্তিক হইতে মাঘ মাসের মধ্যে রচিত গানের তালিকা :

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন, ১৮৭ ; তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে, ৮৩৭ ; ওঠো ওঠো রে—বিফলে প্রভাত বয়ে যায় যে, ১২১ ; ভব-কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে, ৮৩২ ; আঁধার রজনী পোহালো, ১৩৮ ; ডুবি অমৃতপাথারে, ১৫৪ ; আঁখিজল মুছাইলে জননী, ১৯৭ ; অসীম কালসাগরে, ১৭৮ ; এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ, ১৭৫ ; দেখা যদি দিলে ছেড়ো না আর, ৮৩২ ; আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, ৮৪৫ ; তুমি ছেড়ে ছিলে, ভুলে ছিলে ব'লে, ১৬৩ ; মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, ১৬২ ; ওহে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয়, ৯৪৩ ; তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে, ৮৩২ ; তবে কি ফিরিব ম্লানমুখে সখা, ৮৩২ ; দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে, ৮৩৩ ; দাও হে হৃদয় ভরে দাও, ৮৩৬ ; সখা, মোদের বেঁধে রাখো, ৯৪৬ ; এ কী অন্ধকার এ ভারতভূমি, ৮১৩ ; এসেছে সকলে কত আশে, ১২৭ ; ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে, ৮৩৫ ; চলেছে তরণী প্রসাদপবনে, ৮৩৪ ; এ পরবাসে রবে কে হায়, ১৭৫ ; তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম, ১৮৭ ; বেঁধেছ প্রেমের পাশে, ওহে প্রেমময়, ১৫৭ ; তোমার যতনে রাখিব হে, ৮৩৪ ; সংশয় তিমির-মাঝে না হেরি গতি হে, ১৭১ ; পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে, ৮২৯ ; আইল আজি প্রাণসখা, দেখো রে নিখিলজন, ৮৩৫ ; আমার হৃদয়সমুদ্রতীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে, ১৮৩ ; শোনো শোনো আমাদে ব্যথা, ৮১২।

১২৯২ [১৮৮৫-৮৬]। ১৮০৭ শক। বয়স ২৪ বৎসর॥ দীর্ঘ জীবনপথ, ১০৯ ; দুখের কথা তোমায় বলিব না, ৮৩৫ ; গাও বীণা, বীণা গাও রে, ১৮১ ; একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, ৮১৬ ; শান্তিসমুদ্র তুমি গভীর, ১৫৪ নিশিদিন চাহো রে তাঁর পানে, ১২১ ; ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, ৭৭ ; অন্ধজনে দেহো আলো, ৫২ ; হেরি তব

বিমল মুখভাতি, ১৩৭ ; আমি দীন, অতিদীন, ১৯১ ; শুনেছে তোমার নাম, ১৭৯ ; পেয়েছি অভয়পদ, ১৭৮ ; মিটিল সব ক্ষুধা, ৮৩৮ ; শোনো তাঁর সুধাবাণী, ১২১ ; ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে, ১৭২ ; এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়, ১৩৮ ; আজি বহিছে বসন্তপবন সুমন্দ, ১২৯ ; কী গাব, আমি, কী শুনাব, ১২৮ ; কেন জাগে না, জাগে না অবশ পরান, ১৬৫ ; যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি, ১৬৬ ; তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, ১৬৩ ; তোমার দেখা পাব বলে, ১৭৪ ; হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা, ১৬৯ ; তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন, ২০৮ ; তব প্রেমসুধারসে মেতেছি, ৮৩৮ ; তারো তারো হরি, দীনজনে, ৮৪০ ।

১২৯৩ [১৮৮৬-৮৭]। ১৮০৮ শক। বয়স ২৫ বৎসর ॥ আমারেও করো মার্জনা, ৮৩৮ ; বর্ষ গেল, বৃথা গেল, ১৭৭ ; ফিরো না ফিরো না আজি, ৮৩৯ ; প্রভাতে বিমল আনন্দে, ২১৩ ; নিকটে দেখিব তোমারে, ১৭৪ ; সবে মিলি গাও রে, ৮৩৯ ; অনেক দিয়েছ, নাথ, ১৬৭ ; পেয়েছি সন্ধান অন্তর্যামী, ১৮০ ; নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে (দ্র জীবনস্মৃতি, পৃ ৬১)১৯২, ৮৪৬ ; তোমারে জানি নে হে, ৮৪০ ; দেবাধিদেব মহাদেব, ২০২ ; ভয় হয় পাছে তব নামে আমি, ১৯৫ ; এবার বুঝেছি সখা, ৮৪০ ; বসে আছি হে কবে শুনিব, ৭৭ ; কেন বাণী তব নাহি শুনি, ১৬৩ ; সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ১৭৯ ; আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার, ১৯১ ; কী ভয় অভয়ধামে, ১৯১ ; আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে (কলিকাতায় দ্বিতীয় কন্‌গ্রেসের অধিবেশনে গীত), ২৪৭ ; তুমি জাগিছ কে, ১৮৪ ; আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে, ৮৩৭ ; তোমা লাগি নাথ, জাগি, ১৭৩ ; স্বামী, তুমি এসো আজ, ১৬৯ ; চাহি না সুখে থাকিতে হে, ৮৪০ ; চিরদিবস নব মাধুরী, ২১২ ; আমার যা আছে আমি, ৮২ ; আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, ৮৪১ ; তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, ৩৪ ।

১২৯৪ [১৮৮৭-৮৮]। ১৮০৯ শক। বয়স ২৬ বৎসর ॥ তুমি আপনি জাগাও মোরে, ১২১ ; নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, ১২১ ; সবে আনন্দ করো, ১২০ ; হে মন, তাঁরে দেখো, ৮৪১ ; আজি হেরি সংসার অমৃতময়, ২১৩ ; তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, ৫২ ; শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, ১৮১ ; পূর্ণ-আনন্দ পূর্ণমঙ্গল রূপে, ১৭০ ; অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, ১৬৪ ; আছ অন্তরে চিরদিন, ১৭১ ; জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ, ১৮৬ ; নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা, ১৭০ ; হৃদয়-বেদনা বহিয়া, প্রভু, ১৬৫ ।

১২৯৫, ১২৯৬ সালে নূতন ব্রহ্মসংগীত দেখি না।

১২৯৭ [১৮৯০-৯১]। ১৮১২ শক। বয়স ২৯ বৎসর ॥ নব আনন্দে জাগো আজি, ১৩৭ ; ওই পোহাইল তিমিররাতি, ১২৯ ।

১২৯৮ [১৮৯১-৯২]। ১৮১৩ শক। বয়স ৩০ বৎসর ॥ শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা, ১৭৫ ।

১২৯৯ [১৮৯২-৯৩]। ১৮১৪ শক। বয়স ৩১ বৎসর ॥ জয় রাজরাজেশ্বর, ৮৪১ ; চিরবন্ধু, চিরনির্ভর, ১৭৯ ; এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে, ২১২ ; আনন্দধ্বনি জাগাও, ২৫৫ ; হৃদয়-মন্দিরে প্রাণাধীশ, ১৫৭ ; আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে, ১৮৭ ।

১৩০০ [১৮৯৩-৯৪]। ১৮১৫ শক। বয়স ৩২ বৎসর ॥ এ ভবন পুণ্যপ্রভাবে করো পবিত্র (এসো হে গৃহদেবতা। এসো হে আশ্রম দেবতা), ৬১২ ; হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে, ৭৭ ; আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, ১৩৭ ; অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী, ১০৮ ।

১৩০১ [১৮৯৪-৯৫]। ১৮১৬ শক। বয়স ৩৩ বৎসর ॥ নিত্য নব সত্য তব, ১৬১ ।

১৩০২ [১৮৯৫-৯৬]। ১৮১৭ শক। বয়স ৩৪ বৎসর ॥ পাদপ্রান্তে রাখ' সেবকে, ৫৭ ।

১৩০৩ [১৮৯৬-৯৭]। ১৮১৮ শক। বয়স ৩৫ বৎসর ॥ সুন্দর বহে আনন্দমন্দানিল, ২১২ ; শীতল তব পদছায়া,

১৮৬ ; আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে, ৭৮ ; হৃদয়ে জাগো আজি, ১২০ ; একি করুণা করুণাময়, ১৮২ ; আজি কোন্ ধন হতে, ১০৯ ; আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম, ১৭০ ; আমার সত্য মিথ্যা সকলই, ৫৬ ; আজি রাজ-আসনে তোমারে, ৮৪১ ; কে যায় অমৃতধামযাত্রী, ১১০ ।

পৃ ২১১ । 'Mr. Ashutosh Choudhury B.A. LL.B. (Cantab) and M.A. (Cal) was enroled as an advocate of the Calcutta High Court on 29 April 1886. He was a member of the St. John's College, Cambridge'— *The Statesman*, 30 April 1886. (See *The Statesman*, 30 April 1961, '75 years Ago') । আশুতোষের বিবাহ হয় ১৫ অগস্ট ১৮৮৬ (৩০ শ্রাবণ ১২৯৩) ।

পৃ ২২২ । কড়ি ও কোমলের সমালোচনা । কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'মিঠে কড়া' নামে ব্যঙ্গকাব্য বা প্যারডি লেখেন ১৮৮৮তে 'রাহু' নাম দিয়া । ১৮৮৬ সালে 'কড়ি ও কোমল' বাহির হইয়াছিল, তাহার প্রায় দুই বৎসর পরে 'মিঠে কড়া' মুদ্রিত হয় । ইহাতে লেখা হয় 'ইহা কড়িও নহে কোমলও নহে, পুরো সুরে মিঠে কড়া' । অধ্যাপক সুকুমার সেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ ৪৮) লিখিয়াছেন, "যাঁহাদের চোখে কখনো 'কড়ি ও কোমল' পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না, তাঁহারাও কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের নিতান্ত তুচ্ছ 'মিঠে-কড়া'র নাম শুনিয়াছিল" । দ্র আদিত্য ওহদেদার, রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ধারা, পৃ ২২-২৬ । বিশু মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-সাগর-সঙ্গমে' গ্রন্থে পুস্তিকাটি মুদ্রিত হইয়াছে । পৃ ২৪-৪৭ ।

জুলাই ১৮৯১ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 'কাকাতুয়া দেবশর্মা' ছদ্মনামে 'সাহিত্য' পত্রিকায় (আষাঢ় ১২৯৮, পৃ ১৪৮) 'রবিরাহু' নামে ব্যঙ্গকবিতা লিখিয়াছিলেন । অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 'কবি-মানসী' গ্রন্থে কড়ি ও কোমল সম্বন্ধে স্বর্ণ-মৃণালিনী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন ।

পৃ ২২০-২২১ । পৃষ্ঠা ২২১-এর প্রথম অনুচ্ছেদ ২২০ পৃষ্ঠায় যাইবে ।

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৮০৮ । ফাল্গুন ১২৯৩) ১২৯৩ মাঘোৎসবে গীত হয় । এই গানটি শুনিয়া মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কৃত করেন ।

পৃ ২৩৮ । 'সুরদাসের প্রার্থনা' এই কবিতা সম্বন্ধে অধ্যাপক শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার' গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন । পৃ ৬৬-৭৬ ।

পৃ ২৪৩ । ১ম পংক্তিতে 'চোখে পড়ে'র উপর যে ১ দিয়া পাদটীকা দেওয়া হইয়াছে তাহা ভুল । পাদ-টীকার ১ ও ২ মিশিয়া যাইবে ।

সখিসমিতি । স্বর্ণকুমারীদের বাড়িতে মাদাম ব্লাভাস্কি অল্‌কট্ প্রভৃতি থিওজফিস্টরা যাওয়া-আসা করিতেছেন । কালে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মন্দা পড়িলে থিওজফিস্ট দল এখানেই ভাঙিয়া যায় । সেই-সমস্ত মহিলাদের লইয়া 'সখিসমিতি' নাম দিয়া স্বর্ণকুমারী এক সমিতি বা ক্লাব স্থাপন করেন । 'সখিসমিতি' নামটি রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক প্রদত্ত । [ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ ৩৭৪] । কুমারী ও বিপন্না বিধবাদের বৃত্তি দিয়া পড়ানো, পড়া সাঙ্গ হইলে তাহাদিগকে অন্তঃপুর-মহিলাদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষয়িত্রীরূপে নিয়োগ, মফঃস্বলে ধর্ষিতা নারীদের জন্য প্রয়োজন হইলে উকিল, ব্যারিস্টার নিযুক্ত করা, বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে নারীহস্তশিল্প সংগ্রহ করিয়া মেলার আয়োজন করা এবং মেয়েদের লইয়া অভিনয়াদি করা প্রভৃতি কাজ ছিল সখিসমিতির । 'মায়ার খেলা' সখিসমিতিতে সর্বপ্রথম অভিনীত হয় । দ্র সরলা দেবী, জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ৫৯ ।

১২৯৫ ভারতী ও বালকে 'সখিসমিতি' ও 'মহিলা শিল্পমেলা' প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে । ঐ বৎসরের ভারতী ও বালকে 'সখিসমিতি' নূতন নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়াছে এবং 'সখিসমিতি' ও শিল্পমেলার

কর্ত্রীসভার সখিগণের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সংখ্যা ভারতীতে 'সাত বৎসরের সখিসমিতি' প্রবন্ধ, আশ্বিন ১৩১৫ সংখ্যা ভারতীতে হিরণ্ময়ী দেবী -লিখিত 'মহিলা শিল্পসমিতি' ও ফাল্গুন ১৩৩২ সংখ্যা ভারতীতে সরলা দেবী -লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বাংলাদেশে মহিলাদের গৃহশিল্প ও তাহাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের ইতিহাস গবেষণার বিষয় হইতে পারে।

পৃ ২৪৮। মানসীর যুগ। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে সোলাপুরে যান নাই; বেলাকে লইয়া গিয়াছিলেন এক আয়া সঙ্গে। 'ছিন্নপত্রাবলী'র ৪-সংখ্যক পত্রখানি পড়িলে জানা যায়. . "এমন সময়ে গার্ডটা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমার লেডী কোথায়। আমি বললুম আমার লেডী নেই, একটা maid-servant আছে…।" কলিকাতায় আসিয়া "খোকাকে [রথীন্দ্র] দেখে ভারী নতুন রকম মনে হল।" রথীন্দ্রের জন্ম ২৭ নভেম্বর ১৮৮৮, পত্রখানি লিখিত জুন ১৮৮৯ সালের গোড়ায়, রথীন্দ্রের বয়স তখন ৭ মাস।

পৃ ২৫০। রাজা ও রানী। প্রথম সংস্করণ বহুলভাবে পরিমার্জন ও পরিবর্তন করিয়া যে দ্বিতীয় সংস্করণ করেন, তাহাই আমরা এখন দেখিতে পাই। 'বিসর্জন'ও পরিমার্জিত হয়।

পৃ ২৫৮। Animal Magnetism সাধারণভাবে Mesmerism নামে পরিচিত। Fredrich Mesmer (1733-1815) নামে জার্মান চিকিৎসক এই সম্মোহনবিদ্যার উদ্‌ভাবক।

পৃ ২৬৪। মন্ত্রি-অভিষেক। 'মন্ত্রি-অভিষেক' ভাষণটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম রাজনৈতিক সমালোচনা। লর্ড ক্রসের বিলের প্রতিবাদে এমারেল্‌ড্‌ থিয়েটারে (বীডন স্ট্রীট্স্) সভা হয় ২৬ এপ্রিল ১৮৯০, শনিবারে। সভাপতিত্ব করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত সকলেই, এমন-কি সভাপতিও, ইংরাজিতে ভাষণ দান করেন। এই সভায় Lord Cross -এর Indian Councils Bill -এর প্রতিবাদে ও Charles Bradlaugh -এর Indian Council Reform Bill -এর সমর্থনে ভাষণ দান ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় (বৈশাখ ১২৯৭) প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৫ মে ১৮৯০। এই প্রকাশ-তারিখ দেখিয়া প্রবন্ধপাঠের ২৬ এপ্রিল তারিখ ভুল করা হইয়াছে। এ বিষয়ে নেপাল মজুমদারের বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রি-অভিষেক— রাজনৈতিক পটভূমিকা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। শারদীয়া স্বাধীনতা, ১৩৬৮, পৃ ৬৫-৬৮। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় -লিখিত 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সমালোচনা। নব্যভারত, পৌষ ১২৯৭। দ্র 'রবীন্দ্র-সাগর-সঙ্গমে, পৃ ৫৯-৭০।

পৃ ২৬৭। শেষ পংক্তি— ২২ অগস্ট ১৮৯০ হইবে।

পৃ ২৬৯। পাদটীকা ২। তুলনীয় Toynbeeর মত—

"We have been led to reject the popular assumption that civilisation emerges when environments offer unusually easy conditions of life and to advance an argument in favour of exactly the opposite view."— Somervell, *A Study of History*, p. 80।

পৃ ২৭৩। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের এক মাস পরে রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে দেখি। ১৮৯০ ডিসেম্বর (২২ অগ্রহায়ণ ১২৯৭) শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের উৎসব; দ্বিজেন্দ্রনাথ— উপাসনা; সত্যেন্দ্রনাথ— শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভাষণ ও রবীন্দ্রনাথ সংগীত পরিবেশন করেন।

সেইদিন পরিকল্পিত মন্দিরের ঈশান কোণে ভিত্তিতলে একটি তাম্রফলকে নিম্নোদ্ধৃত বাণী উৎকীর্ণ করিয়া প্রোথিত হয়।

"ওঁ তৎসৎ। ঠকুরবংশাবতংসেন পরমর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণা ধর্ম্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা-

পিতামিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮৮২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যব্দ। অগ্রহায়ণ ২২ রবিবার।" দ্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮১২ শক (১২৯৭) পৃ ১৬৮-৬৯। মহর্ষি এই মন্দির কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই ; মনোপটে উহার নিখুঁত চিত্র সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন।

পৃ ২৮১। "১৩৩৩ সালের 'গল্পগুচ্ছে' সর্বপ্রথম এ-দুটি গল্প বলিয়া স্বীকৃত হয়" এ উক্তি ভুল। ফাল্গুন ১৩০০ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প-সংগ্রহ 'ছোটগল্পে' 'রাজপথের কথা' ও 'ঘাটের কথা' অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে 'গল্পগুচ্ছ' (মজুমদার লাইব্রেরি, ১৩০৭-১৩০৮) হইতে পরিবর্জিত হয় এবং 'বিচিত্র প্রবন্ধে' [১৩১৪] স্থান লাভ করে। ১৩৩৩ সালের বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত 'গল্পগুচ্ছে' পুনরায় ছোট গল্পের আসন প্রাপ্ত হয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (বর্তমান সংস্করণ) হইতে পরিবর্জিত হইয়াছে।

হিতবাদী সংবাদপত্র সম্বন্ধে— ২৮ ভাদ্র ১৩১৭, কবি পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখেন, "সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।… সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প, সমালোচনা ও প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।" দ্র প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয় পৃ ১৩।

হিতবাদী প্রকাশিত হয় ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ (৩০ মে ১৮৯১)। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের আনুমানিক তারিখ : 'দেনাপাওনা'—১৭ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) ; 'পোস্টমাস্টার'— ২৪ জ্যৈষ্ঠ (৬ জুন) ; 'গিন্নি'— ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৩ জুন) ; 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'—৭ আষাঢ় (২০ জুন) ; 'ব্যবধান'— ১৪ আষাঢ় (২৭ জুন) ; 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'— ২১ আষাঢ় (৪ জুলাই) ; ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তও অনুমান করেন "'খাতা' গল্পটিও বোধ হয় হিতবাদীতে সপ্তম সপ্তাহে বাহির হয়"। কিন্তু তাহার কোনো প্রমাণ নাই।

পৃ ২৮৩। পাদটীকা ২। চুহালি জলপথে ১৬ জুন হইবে।

পৃ ২৮৭। রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে C. T. O. Donnel, Supdt. of Census Operation, Bengal -কে পত্র দিয়া জানান, "The members of the Adi Brahmo Samaj are really Hindus"। —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮১২ শক সংখ্যার প্রচ্ছদ-পত্রে 'Notice'। তারিখ ৯ জানুয়ারি ১৮৯১ (২৬ পৌষ ১২৯৭)।

পৃ ৩১৭। ইন্দিরা দেবী বলেন যে, তাঁহার যতদূর মনে আছে 'রাজা ও রানী'র পারিবারিক অভিনয় বির্জিতলার বাড়িতে হয়, পার্ক স্ট্রীটের বাসায় নহে।

পৃ ৩৩২। রবীন্দ্রনাথ কোণার্ক মন্দির দেখিয়াছিলেন (১৮৯৩)। ছিন্নপত্রাবলীর (৮১-সংখ্যক) পত্রে লিখিতেছেন, 'আমরা আবার আজ রাত্রে কনারকে সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে যাচ্ছি।' (পৃ ১৭৫)

তখনকার দিনে সমুদ্রতীর দিয়া যাইতে হইত— গোরুর গাড়ি বা পাল্কী ছিল যান-বাহন। রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ পাল্কীতে করিয়া যান বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহার একটি খাতার হিসাবে পাল্কীর খরচ বাবদ বাইশ টাকার অঙ্ক আছে। দ্র কানাই সামন্ত, 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' (১৯৬১), পৃ ২৬১। রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ খণ্ডগিরি প্রভৃতি পাহাড় দেখিতে যান ; কারণ উক্ত হিসাবের খাতায় খণ্ডগিরিতে গাড়ি টানা কুলিকে আট আনা দেওয়ার অঙ্ক আছে। (ঐ, পৃ ২৬১)।

দশ বৎসর পরে এই স্মৃতি বহন করিয়া 'মন্দির' (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১০। বিচিত্র প্রবন্ধ) লিখিত হয়। সেখানে ভুবনেশ্বর মন্দির দেখার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কনারকের নাম নাই।

পৃ ৩৩৭। পাদটীকা ১। 'দেউল' কবিতার ভাবের সহিত তুলনীয় : "বোধ হয় উড়িষ্যার মন্দিরগুলো দেখে

দেখে আমার এই রকম একটা ভাব মনে এসে থাকবে। ভুবনেশ্বরের একটা মন্দিরের [লিঙ্গরাজ] ভিতরে··· অন্ধকার, বদ্ধ, ধূপের গন্ধে নিঃশ্বাস রোধ হয়, ঠাকুরের অভিষেকজলে মেজে স্যাঁতসেঁতে, বাদুড় চামচিকে উড়ছে, সেখান থেকে বাইরের সুন্দর আলোতে হঠাৎ আসবামাত্র দেবতা যে কোনখানে আছেন টের পাওয়া যায়।"—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১০৭ (৩০ আষাঢ় ১৩০০)।

পৃ ৩৪৮। 'পুরস্কার' কবিতা ৬৬৮ পংক্তি। 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত। মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র কবিকথা খণ্ডে ৪৪২ পংক্তি করা হয়। 'সঞ্চয়িতা'য় মূলপাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু 'চয়নিকা'য় ইহা গৃহীত হয় নাই।

পৃ ৩৫১। ইংরেজ ও ভারতবাসী। সাধনা। আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০, পৃ ৪৯৯-৫৪৬। রাজাপ্রজা, রবীন্দ্ররচনাবলী ১০।

পৃ ৩৬৫। ১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজ বীরেন্দ্রমাণিক্যের আমন্ত্রণে কার্সিয়াঙ্ যান। রবীন্দ্রনাথ এক সভায় ভাষণে স্মৃতি হইতে বলেন, "মহারাজ বীরেন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান গাওয়া যে কতদূর সঙ্কোচের ছিল তা সহজেই অনুমেয়।" আগরতলায় কিশোর সাহিত্যসমাজে বাণী। দ্র ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১২।

এইখানে গ্রন্থমধ্যে বৈষ্ণবসাহিত্য প্রকাশ সম্বন্ধে যে তথ্য আছে, তাহা ১৩০৩ কার্তিক মাসের ঘটনা। কার্সিয়াঙ্ হইতে কলিকাতায় ফিরিবার অল্পকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয় (২৭ অগ্রহায়ণ)।

কবির পূর্বোল্লিখিত ভাষণে আছে—"তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে যখন আমি তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছিলেম···।" দ্র ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৩৬১।

পৃ ৩৭১। নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর (২৬ চৈত্র ১৩০০) পর কলিকাতায় যে শোকসভা হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্‌যোগী হইয়া নবীনচন্দ্রকে এই সভার অধিনায়কত্ব করিতে অনুরোধ করেন। সভা করিয়া শোক প্রকাশ করা ভারতীয় বিধি নহে বলিয়া নবীনচন্দ্র সেন (দ্র 'আমার জীবন', ৫ম খণ্ড) অস্বীকৃত হন। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯ম খণ্ডে মুদ্রিত 'শোকসভা' প্রবন্ধ ও 'আধুনিক সাহিত্যে'র গ্রন্থপরিচয়। তার তিন মাস পরে রবীন্দ্রনাথ (বয়স ৩৩) নবীনচন্দ্র সেনের নিকট হইতে এক পত্র পান। তখন নবীনচন্দ্র রানাঘাট মহকুমার হাকিম (২৮ ফাল্গুন ১২৯৯ হইতে ১৭ বৈশাখ ১৩০২ ॥ ১০ মার্চ ১৮৯৩ হইতে ২৯ এপ্রিল ১৮৯৬)। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৩০১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথমে নবীনচন্দ্র ও পরে রবীন্দ্রনাথ এই দুইজনে সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র রানাঘাট মহকুমার হাকিম থাকিতে থাকিতে কৃত্তিবাসের ভিটা ঘুরিয়া দেখিয়া আসেন এবং আদিকবির স্মৃতিরক্ষার জন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বঙ্গবাসী সাপ্তাহিকের সম্পাদকের নিকট পত্র দেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ অগ্রণী হইয়া এ বিষয়ে বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করেন; সেই পত্রে স্বাক্ষরকারী হিসাবে নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাম যথাক্রমে ছিল। রবীন্দ্রনাথের নাম নিজের নামের নীচে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া নবীনচন্দ্র আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পত্র দেন। সেই পত্রের জবাবে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ হইতে (২৫ শ্রাবণ ১৩০১ ॥ ৯ অগস্ট ১৮৯৪) নবীনচন্দ্র সেনকে রানাঘাটে লেখেন, "যদিও আমি বয়সে আপনার অপেক্ষা অনেক ছোট হইব, তথাপি দৈবক্রমে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার নামের নিম্নে আমারই নাম পড়িয়াছে— আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেও ঐতিহাসিক পর্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অতএব সর্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি— আশা করি ইতিহাসের

শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এই অধিকারটি আমি রক্ষা করিতে পারিব।"

ফাল্গুন ১৩২৬ সালে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ (১৪ ফাল্গুন। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২০) সুরুল হইতে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। 'রবিতর্পণ', রানাঘাট-রবীন্দ্র-শত-বার্ষিকী কমিটি হইতে প্রকাশিত (১৩৬৮) পৃ ৯।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ এখনো হয় নাই। ১৪ শ্রাবণ পরিষদের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হন; তিনি আশা করিয়া গিয়াছিলেন যে নবীনচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। শিলাইদহ হইতে (২৯ শ্রাবণ। ১৩ অগস্ট ১৮৯৪) এক পত্রে কবি বলেন যে, তিনি একদিন নবীনচন্দ্রের আতিথ্য সৌভাগ্যস্বরূপে গ্রহণ করিবেন। ইহার পর ২২ অগস্ট (৭ ভাদ্র) তারিখে নবীনচন্দ্রকে কবি জানান যে কোনো এক রবিবারে তিনি রানাঘাটে যাইবেন।

কবি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ১০ ভাদ্র। ১৪ ভাদ্র ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখিতেছেন যে, তিনি একটি নূতন গানে সুর দিতেছেন— 'কীর্তনের ধরণের ভৈরবী' (ছিন্নপত্রাবলী, ১৪৮-সংখ্যক পত্র)। কবি এই গানটিকে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের অন্তর্গত করেন। 'মেঘ ও রৌদ্রে'র সূত্রপাত হয় কিছুকাল পূর্বে; ১৪ আষাঢ় ১৩০১ লিখিতেছেন, "আজ সকালবেলায়··· গিরিবালা নাম্নী··· একটি··· মেয়েকে আমার কল্পনা-রাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবে মাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি"; (১২৩-সংখ্যক পত্র)। গল্পটি সাধনায় প্রকাশিত হয় আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১ সংখ্যায়। এ গল্পের যে গানটির কথা ছিন্নপত্রে লিখিয়াছেন সেটি হইতেছে—

'এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো।'

কবিকে ২১ ভাদ্র পুনরায় সাহাজাদপুরে দেখি। অর্থাৎ ১৪ ভাদ্র ও ২১ ভাদ্রের মধ্যে কবি রানাঘাটে আসেন; ফিরিয়া গিয়া কয়েকদিন পরে ২৯ ভাদ্র নবীনচন্দ্রকে ধন্যবাদপূর্ণ পত্র দেন। আমাদের মনে হয় ১৮ ভাদ্র ১৩০১ (২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪; রবিবার) রবীন্দ্রনাথ রানাঘাটে আসিয়া নবীনচন্দ্রের অতিথি হইয়াছিলেন এবং যে 'একটি নূতন কীর্তনের গান রচনা করিয়া আনিয়াছেন' সেইটি গাহিয়া শোনান। দ্র নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৮। সমসাময়িকের চোখে রবীন্দ্রনাথ (বয়স ৩৩) কিরূপ ছিলেন, তাহা নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' (৪র্থ খণ্ড) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

পৃ ৩৭৮। গাছের ছাপ Tree Daubing: দ্র ১ম খণ্ডের সংযোজন, পৃ ৫০০-০১।

পৃ ৩৮১। শমীন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ভুল লিখিত আছে। শমীন্দ্রনাথের জন্ম হয় পরে, ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৬ সালে। মীরা হইতে প্রায় তিন বৎসরের ছোট।

পৃ ৩৮২। 'নিশীথে' গল্প সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "সাধনার সেই গল্পটা সাধারণতঃ অধিকাংশ পাঠকের বিশেষ ভালো লেগে গিয়েছিল— সেই কারণে সাহিত্যের [ফাল্গুন ১৩০১] সমালোচনা পড়ে অনেকে চটে গেছে।"— ১৮ মার্চ [১৮৯৫]। 'ছিন্নপত্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫২, পৃ ৭৫-৭৬। ছিন্নপত্রাবলী (২০৩-সংখ্যক পত্র)।

পৃ ৩৮৪। পাদটীকা ২। 'ব্রাহ্মণ' কবিতা। অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'জবালা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "কবির ভাষায় জবালা পুত্রকে ঠিকই বলিয়াছিলেন, 'জন্মেছিস্ ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে'।"—প্রবাসী, পৌষ ১৩৪২, পৃ ৪১১-১৪।

পৃ ৩৮৩-৩৮৪। 'সখা ও সাথী' (মাসিক পত্র)। 'সখা' (মাসিক) বালক-বালিকার পাঠ্য সচিত্র পত্রিকা। জানুয়ারি ১৮৮৩ হইতে প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনে প্রকাশিত হয়। দশ বৎসর পরে ভুবনমোহন রায় -সম্পাদিত 'সাথী'র সহিত (২য় বর্ষ, বৈশাখ ১৩০১) সম্মিলিত হইয়া 'সখা ও সাথী' নাম ধারণ করে, এপ্রিল ১৮৯৩।

রবীন্দ্রনাথের গল্প 'ইচ্ছাপূরণ' 'সখা ও সাথী'র ২য় বর্ষে, আশ্বিন ১৩০২ [অক্টোবর ১৮৯৫] সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৬ চৈত্র ১৩০২ সালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখেন: "সখা ও সাথীর কর্তৃপক্ষেরা দিনকতক তাঁহাদের কাগজে একটা গল্প দিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন। . . অবশেষে আমি একটি নূতন ছোট গল্প লিখিয়া সম্পাদকীয় Perturbed spiritকে শান্তিদান করিয়াছিলাম।"

পৃ ৩৮৯। "সাধনা গেছে আপদ গেছে— এই চার বৎসরে আমাদের চার হাজার টাকার বেশি দণ্ড দিতে হয়েছে।" শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮, পৃ ২।

পৃ ৩৯১। গ্যেটের কথা, The Eternal woman— 'Ewige weibliche' :

Faust নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ দুই ছত্র— Das Ewige-weibliche/Zieht unshinan "The Ever-Womanly/Draws us on high"— শাশ্বত নারীমূর্তিই আমাদের ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। দ্র শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -লিখিত ভূমিকা, কানাইলাল গাঙ্গুলী কর্তৃক অনূদিত 'ফাউস্ত', জেনারেল প্রিন্টার্স হইতে প্রকাশিত।

পৃ ৩৯৫। 'জীবনদেবতা' সম্বন্ধে। কবি আলমোড়ায়। F.W.H. Myers -এর '*Human Personality and Its Survival of Bodily Death*' নামে গ্রন্থখানি পড়িয়া সতীশচন্দ্র রায়কে শান্তিনিকেতনে লিখিতেছেন (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০):

"মনস্তত্ত্বের অপরূপ রহস্যের মধ্যে তলাইয়া গেছি। আশ্চর্য এই যে, আমার কাব্যের মধ্যে কবিতার ভাষায় আভাসে ইঙ্গিতে নানা স্থানেই আমি এই-সকল কথা বলিয়াছি। আমাদের গোচরাতীত চেতনাকে ও ইন্দ্রিয়াতীত জগৎকে আমি নানা ভাবে স্পর্শ করিয়াছি এবং তাহাদের বার্তা নানা ছন্দে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। অধিকাংশ সময়েই এই প্রয়াস আমার নিজের ইচ্ছাকৃত নহে— আমার অন্তঃপুরবাসিনী 'কৌতুকময়ী' আমাকে দিয়া কখন কী লিখাইয়া লইয়াছেন, তাহা আমাকে তখন জানিতেও দেন নাই।"

—একখানি চিঠি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪, পৃ ২০৩।

Frederic William Henry Myers (1843-1901), English poet and essayist : studied mesmerism and spiritualism from c 1870 : one of the founders of Society for Psychical Research wrote biographical studies of Wordsworth, Shelley etc. *Human Personality and Its Survival of Bodily Death* was published in 1903.

পৃ ৩৯৭। ছিন্নপত্র। ১৯১২ [১৩১৯] সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত ৮খানি পত্র ও ইন্দিরাদেবীকে (ঠাকুর) লিখিত ১৪৪খানি পত্র ছিল।

'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে মুদ্রিত পত্রগুলিতে, মূলপত্রের যে সকল অংশ নাই, তাহার অনেক অংশ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩৬১) সংকলিত হইয়াছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকায় 'ছিন্নপত্র'-সম্পাদকরা লিখিতেছেন, "১৮৮৭-১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ শ্রীইন্দিরা দেবীকে যে-সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থখানি প্রধানত তাহারই সংকলন, কেবলমাত্র ৮খানি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা। এই সময়ে লিখিত যাবতীয় চিঠি শ্রীইন্দিরা দেবী দুটি খাতায় স্বহস্তে নকল করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন। এই খাতা দুটি অবলম্বন করিয়াই ১৩১৯ (১৯১২) সালে 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি এই খাতা দুইখানি পাওয়া গিয়াছে এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হইয়াছে।"

১৯০৩ সালে (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) আলমোড়া হইতে সতীশচন্দ্র রায়কে এক পত্রে কবি লেখেন, "চিঠির সেই

দুইখানি খাতা মোমজাম দিয়া মজবুত করিয়া মুড়িয়া রেজেস্ট্রি করিয়া পাঠাইয়ো।” ছিন্নপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে এই খাতা হইতে অংশ নির্বাচন করিয়া কবি ‘বিচিত্র প্রবন্ধের’ (বৈশাখ ১৩১৪) ‘জলে-স্থলে’ অংশে সন্নিবেশিত করেন। বর্জিত পত্রাবলী বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার পর ১৯৬১ সনে ‘ছিন্নপত্রাবলী’ নামে সমগ্র পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ২৫২ খানি পত্র আছে—অর্থাৎ মূল ‘ছিন্নপত্র’ হইতে ইহাতে ১০৮ খানি পত্র অতিরিক্ত আছে। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ডে ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রসংখ্যা ৮৪, অর্থাৎ ইন্দিরা দেবীকে লিখিত মোট ৩৩৬খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইন্দিরা দেবীকে লেখা অনেক চিঠি সম্ভবত পাওয়া যায় নাই।

পৃ ৪০৫। মালিনী। হরিদেব শাস্ত্রী, বৌদ্ধমহিলা রাজনন্দিনী মালিনী।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৪০ শক (১৩২৫) শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা।

পৃ ৪০৮। কাব্যগ্রন্থাবলী। শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত। ১৫ আশ্বিন ১৩০৩, পৃ ৪৭৬।

এই কাব্যগ্রন্থাবলীতে যে-সব গ্রন্থ সন্নিবেশিত হয়, সেগুলি সবই প্রায় সম্পাদিত অর্থাৎ কবি যে কবিতাগুলিকে ভালো বলিয়া পছন্দ করিয়াছিলেন সেইগুলিই ছাপা হয়। ‘বিসর্জন’ তো পুনর্লিখিত হয়। অনুবাদ অংশ পৃথক করিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ এ পর্যন্ত সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মারাঠি, মৈথিলী ও ইংরেজি হইতে যে-সব কবিতা বা গ্রন্থাংশ তর্জমা করিয়াছেন, তাহার একটি পৃথক খণ্ড ‘রূপান্তর’ নামে বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ কর্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

কাব্যগ্রন্থখানির আকার ছিল একখানি বড়ো টালির মতো। লৌকিকভাবে অনেকে এই সংস্করণকে ‘টালি’ এডিশন বলিত। এই সংস্করণ তিনপ্রকারে প্রকাশিত হয়। একটি সংস্করণ সচিত্র, অপরটি সাধারণ। এ ছাড়া মূল ফোটোগ্রাফ-সহ আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় বলিয়া জানা যায়।

‘অনুবাদ’ অংশ রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত) ৪র্থ খণ্ডে ‘বিদেশী ফুলের গুচ্ছ’ নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই নামটি ‘কড়ি ও কোমলে’র অন্তর্গত ছিল।

পৃ ৪০৯। কবি কার্সিয়ঙে।

১৮৯৬ শরৎকালে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। মহারাজের স্বাস্থ্য তখন খুবই খারাপ; তিনি বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী প্রকাশনের পরিকল্পনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বৈষ্ণবকবি ছিলেন, তাঁহার রচিত ‘ঝুলন’ ও ‘হোরি’ বৈষ্ণবীয় গীতিকাব্য। [পৃ ৩৬৫তে ভুল করিয়া ১৩০১ সালের ঘটনা বলা হইয়াছে।]

এই সময়ে মহারাজের সঙ্গে ছিলেন কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর। তিনি লিখিতেছেন, “আলোচনান্তে প্রতিরাত্রে মহারাজ উঠিয়া রবিবাবুকে সিঁড়ি পর্যন্ত আসিয়া বিদায়সম্ভাষণ করিয়া যাইতেন। মহারাজ বীরেন্দ্র অসুস্থ; অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হাস্যমুখেই তিনি আলোচনায় যোগ দিতেন, একথা রবিবাবু জানিতেন। তিনি একদিন, মহারাজ কেন সিঁড়ি পর্যন্ত তাঁহাকে আগুয়াইয়া দেন এরূপ অনুযোগ করিলেন। তখন মহারাজ বলিয়াছিলেন, ‘রবিবাবু, পাছে অলসতা আসিয়া কর্তব্যে ত্রুটি ঘটায়, আমি সে ভয় করি, আপনি আমাকে বাধা দিবেন না’।”—দেশীয় রাজ্য, পৃ ২১১। ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১৩।

১১ ডিসেম্বর ১৮৯৬ (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৩) কলিকাতায় বীরচন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যু হয়। —ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১২৬।

১২ ডিসেম্বর ১৮৯৬ কলিকাতায় কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের জন্ম হয়।

পৃ ৪২৭ পাদটীকা ২। ঢাকায় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত বিলাতে প্রকাশিত কংগ্রেসী পত্রিকা '*India*'র ১ জুলাই ১৮৯৮ সংখ্যা হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন :

"The fourth Provincial conference of Bengal held at Dacca on May 31 and June 1 and 2 [1898] appears to have been most successful. The number of people present was about fifteen hundred. About 20 European gentlemen, a dozen Mohammedan gentlemen and a number of Hindus took their seats on the dais. Mr. Kemp, Editor of *Bengal Times* and an uncompromising opponent of the Congress party, is reported to have been lead away by the proceedings and to have made a very good speech on the plague voting the popular views. The talented Rabindranath, one of the greatest of the living poets of Bengal, sang a national anthem in Bengali. Mr. Guru Prosad Sen welcomed the delegates and the Hon. Kali Charan Banerjee being voted to the chair gave an eloquent and stirring address repeatedly interrupted by cheers."

পাটনার সিংহ লাইব্রেরি হইতে সংগৃহীত।

পৃ ৪৩২। "দেশের ভাষা বলিয়া দেশের বস্ত্র পরিয়া"...

রাজসাহী "শিল্পবিদ্যালয়কে উৎসাহ দিবার জন্য সেখান হইতে আমি সর্বদাই রেশমের বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকি।.. বন্ধুদের নিকট আমার এই উপহার কেবল আমার উপহার নহে, তাহা স্বদেশের উপহার।" ত্রিপুরার মহারাজের জন্য একটি সাদা রেশমের থান পাঠাইতেছেন। দ্র পূর্বাশা, ১৩৪৮।

পৃ ৪৩৫। 'ভারতীর চৈত্র (১৩০৫) সংখ্যা প্রকাশ করিয়া উহার সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলেন।' সেই সময়ে 'সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ' শীর্ষক প্রবন্ধে সম্পাদকত্ব ত্যাগের যে কৈফিয়ত দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিতেছি :

"এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম। ইতিমধ্যে নানাপ্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। সে-সকল ত্রুটির যতকিছু কৈফিয়ত প্রায় সমস্তই ব্যক্তিগত। সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়াকর্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীকেও নানারূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে।... ঠিক মাসান্তে ভারতী বাহির করিতে পারি নাই, সেজন্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। একা সম্পাদককে লিখিতে হয়, লেখা সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক অংশ প্রুফ ও প্রবন্ধ সংশোধন করিতে হয়। এদিকে দেশীয় ছাপাখানার ক্ষীণ প্রাণ ; কম্পোজিটর অল্প, শারীরধর্মবশতঃ কম্পোজিটরের রোগতাপও ঘটে এবং প্লেগের গোলেমালে ঠিকা লোক পাওয়া দুর্লভ হয়।..

.. প্রশ্ন উঠিতে পারে, এ-সকল কথা গোড়ায় কেন ভাবি নাই। গোড়াতেই যাঁহারা শেষটা দেখিতে পান, তাঁহারা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এবং তাঁহারা প্রায়ই কোনো কার্যে ব্রতী হন না— আমার একান্ত ইচ্ছা সেই দলভুক্ত হইয়া থাকি।"— ভারতী, চৈত্র ১৩০৫।

সমকালীন 'সাহিত্য' পত্রিকার সমালোচনা, বৈশাখ ১৩০৬ :

"রবীন্দ্রবাবু উচ্চ প্রতিভার অধিকারী, তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করুন ; মাসিকের জন্য অনবরত লিখিয়া তাঁহার সাহিত্য-শিল্পের যতটা অবনতি হইয়াছে, তাহা বঙ্গভাষার ক্ষতি বলিয়া গণনা করি।" দ্র. রবীন্দ্রসাগরসঙ্গমে, পৃ ৫১৬।

পৃ ৪৪০। কর্ণকুন্তীসংবাদ। 'কথা' কাব্যখণ্ড জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গিত, অগ্রহায়ণ ১৩০৬; মুদ্রিত হয় মাঘ ১৩০৬ সালে (ফেব্রুয়ারি ১৯০০)। কিছুকাল হইতে 'কতকগুলি পৌরাণিক গল্প' কবির 'মস্তিকের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে'; সেগুলি লিখিবার কথা ভাবিতেছেন। জগদীশচন্দ্র বসু দার্জিলিং হইতে ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ (১৯ মে ১৮৯৯) রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন? এখন ভারতীর বোঝা গিয়াছে। মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন।

"একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাঁহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাঁহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহানুভবের সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্জ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।"

কয়েক মাস পরে (১৫ ফাল্গুন ১৩০৬) রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' রচনা করেন; পূর্বোক্ত চিঠির শেষাংশের সহিত কর্ণের শেষ উক্তি স্মরণীয়। কর্ণ কুন্তীকে বলিতেছেন:

যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান,
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে—
জয়লোভে, যশোলোভে, রাজ্যলোভে অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

রবীন্দ্রনাথের গল্প ও কবিতা পড়িয়া জগদীশচন্দ্র কী গভীরভাবে অভিভূত হইতেছেন তাহার দীর্ঘ আলোচনা শ্রীপুলিনবিহারী সেন 'জগদীশচন্দ্র বসু প্রসঙ্গে' করিয়াছেন। দেশ, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬২, পৃ ৩৩০-৩৪।

পৃ ৪৫০। লরেন্স। "এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ খাবার দুর্নিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তার পর মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছে লজ্জিত অনুতপ্ত চিত্তে। কিন্তু কোনোদিন শিলাইদহে মত্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি।"—আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪০। দ্র আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৌষ ১৩৫৮ সংস্করণ। শিলাইদহে একদিন লরেন্সের জন্মদিন পালিত হয়।

পৃ ৪৫৩। বলেন্দ্রের যখন পীড়া গুরুতর তখন কলিকাতায় বালক রথীন্দ্রনাথও অসুস্থ হইয়া পড়েন। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একমাস তাহাদের সেবায় ব্যাপৃত থাকিয়া আষাঢ়ের (১৩০৬) গোড়ায় শিলাইদহে ফিরিয়া গেলেন।

"আত্মীয়দের পীড়া লইয়া প্রায় একমাস কলিকাতায় ছিলাম—সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া [শিলাইদহে] আপনাদের সেই অর্ধশ্রুত গল্পটিতে হাত দিয়াছি। মাসিক পত্রিকার তাড়া নাই— আপন মনে আস্তে আস্তে লিখি। কোন একদিন সায়াহ্নে আপনাদের সেই কোণের ঘরে বসিয়া বোধ করি পড়িয়া শুনাইবার অবকাশ পাইব।"— জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত পত্র, ৪ আষাঢ় ১৩০৬ (১৮ জুন ১৮৯৯)। চিঠিপত্র ৬, পত্র ২। বোধ হয় এই গল্পটি

'বিনোদিনী', যা পরে 'চোখের বালি' নামে বঙ্গদর্শনে বাহির হয়। দ্র প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, প্রিয়নাথ সেনকে পত্র (পৃ ২৯০)। চিঠিপত্র ৮, পৃ ৭৮।

পৃ ৪৬৭। "মহারাজের সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ যোগে" ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ভাবী ভারতরাজন্য সভা (Chamber of Princes) স্থাপনের একটি খসড়া লিখিয়া রাধাকিশোর-মাণিক্যকে বোধ হয় ১৯০১ সালে দিয়া থাকিবেন। দ্র ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৮), পৃ ৩৫৮-৬০। প্রকাশিত রবি (ত্রৈমাসিক পত্র), ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩২ (১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ)।

কবি, বিজ্ঞানী ও রাজা :

জগদীশচন্দ্র ১৯০০-০১ সালে বিলাতে আছেন। তাঁহার গবেষণার বাধা— ভারত-সরকারী মহলের ঔদাসীন্য, বিদেশের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অহমিকা ও ঈর্ষা। রমেশচন্দ্র দত্ত তখন লণ্ডনে আছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ১৬ জুলাই ১৯০১ সালে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া এ বিষয়ে তৎপর হইতে বলেন (চিঠিপত্র ৬, পৃ ১৪৩-৪৫)। এই পত্র রবীন্দ্রনাথ অগস্টের প্রথম দিকে পাইয়া ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোরের সহিত পত্র-ব্যবহার আরম্ভ করেন। ১৯০১ সেপ্টেম্বরে কবি সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আছেন; জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন যে, ত্রিপুরার মহারাজ জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তাঁহার কাছে একজন কর্মচারী পাঠাইয়াছিলেন।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আগরতলায় যাইয়া মহারাজার অতিথিরূপে কয়েকদিন বাস করেন। সেখান হইতে তিনি বিলাতে জগদীশচন্দ্রকে এক পত্রে জানাইতেছেন যে, মহারাজ শীঘ্রই দশ হাজার টাকা পাঠাইতেছেন। সে টাকা কবির নামেই পাঠানো হইবে স্থির হয়। দ্র চিঠিপত্র ৬, পত্র ১৮। পুনশ্চ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, ১৩৬৮, পৃ ১৭৬-৭৮।

পৃ ৪৬৮। কবি ও রাজা :

রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা স্টেটের উন্নতিকল্পে কী পরিমাণ চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি হইতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' নামক গ্রন্থে বহুবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য পত্র মুদ্রিত হওয়ায় আমাদের বক্তব্য আরও সমর্থন লাভ করিয়াছে।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

পৃ ৭। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্র। দ্র পাদটীকা ২।

৯ এপ্রিল ১৯২৮ সালে ডাঃ সরসীলাল সরকারের কোনো পত্রের উত্তরে শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী যে পত্র দেন, তাহারই অনুক্রমণিকায় কবি স্বয়ং এইটি লেখেন। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ ২৮৫-৮৬।

রেঁমা রোলাঁর সহিত কবির সাক্ষাতের সময় কবি স্বামীজি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :

Tagore : I have never been able to love the God of the Old Testament. He is the Lord with the rod. ..

Rolland : But even in the New Testament the same motive occurs. Jesus is the Lamb the Lord sacrificed for the sake of humanity. The emphasis is wrongly placed and the attitude is not spiritual in the larger sense. . . Do you think that Vivekananda

in India tried to check the abuses in this line ?

Tagore : So far as I can make out, Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life··· We must rise higher in our spiritual experience in the domain where neither good nor evil exists. It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them. My attitude toward truth is different. Truth cannot afford to be tolerant where it faces positive evil ; it is like sunlight which makes the existence of evil germs impossible. As a matter of fact, today Indian religious life suffers from the lack of a wholesome spirit of intolerance which is characteristic of creative religion. Even a vogue of atheism may do good to India today, for I know that my country will never accept atheism as her permanent faith · It will sweep away all obnoxious undergrowths in the forest and the tall trees will remain intact. At the present moment even a gift of negation from the West will be of value to a large section of the Indian people.

—Rolland and Tagore, p. 100

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্বামীজির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ; আমি সমকালীন প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

পৃ ১৭। পাদটীকা ১। The South African .. war .. 12 Oct. 1899 .. ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯ .. হইবে।

পৃ ১৯। গল্পগুচ্ছ। ১৯০০-০১ সালে মজুমদার লাইব্রেরি হইতে ২ খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুচ্ছে ৫৩টি, ১৯০৮-০৯ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুচ্ছে ৫৭টি, পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী হইতে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুচ্ছে ৮৪টি গল্প ছিল। অতঃপর 'তিন সঙ্গী'র ৩টি গল্প, এবং গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই অথচ সাময়িক পত্রিকাতে আছে সেরূপ গল্প— মৃত্যুর পূর্বে মুদ্রিত 'বদনাম' (প্রবাসী), মৃত্যুর পর 'প্রগতিসংহার' (আনন্দবাজার পত্রিকা) ও 'শেষ পুরস্কার' (বিশ্বভারতী পত্রিকা)— বাহির হয়। দ্র শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত 'তথ্যপঞ্জী'। শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত 'ঋতুপত্র' নামক দ্বিমাসিক পত্রিকায় (১৩৬২, ২য় সংখ্যা) রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানীর গল্প' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। দ্র দেশ, ৩১ ভাদ্র ১৩৬২ ; 'নির্বাণ' গ্রন্থ। এই-সব গল্প ও 'ভিখারিনী' ও 'করুণা' সমেত মোট গল্পের সংখ্যা ৯৪। দ্র গল্পগুচ্ছ ৪র্থ খণ্ড। গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৩০১-৫৪।

পৃ ২৩। ঐতিহাসিক গিজোর (Guizot) সভ্যতার ইতিহাস (Historie de la civilisation en Europe, 1828)। ১৩১৮ সালে স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি সংকলন ও অনুবাদ করিবার জন্য ধনভাণ্ডার স্থাপন করেন। রিপন কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এই ধনভাণ্ডারের শর্তানুযায়ী গিজো-প্রণীত য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করেন। উহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে। ইংরেজি তর্জমা বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে এবং কবি আমাদের এই বই পড়িবার জন্য উৎসাহিত করেন মনে আছে।

পৃ ২৭। ১৩০৮ বৈশাখ মাসের শেষে রবীন্দ্রনাথ মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের নিমন্ত্রণে দার্জিলিঙে যান।

দ্র চিঠিপত্র ৬, পত্র ১০। বোধ হয় মে মাসের গোড়ায় সেখানে যান। দার্জিলিঙ হইতে ফিরিয়া বেলার বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

পৃ ৩১। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রহ্মবিদ্যালয' পরিকল্পনা। ১৩০৪ সালে পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের তিনি যে নিয়মাবলীর খসড়া করেন তাহা হইতে উদ্ধৃত হইল (বলেন্দ্রনাথের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত)।

১. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করিয়া অধ্যাপন করা হইবে।

২. বিদ্যালয় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে।

৩. আপাততঃ দশজন ছাত্র বিনাব্যয়ে বিদ্যালয়ে থাকিয়া আহার ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

৪. আহার্যের ব্যয়স্বরূপ মাসিক ১০৲ দিলে আরও [illegible] জন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে লওয়া যাইতে পারিবে।

৫. শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাস্টীগণ ব্যতীত আরও চারজন সভ্যকে লইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমিতি গঠিত হইবে। প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে আশ্রমের ট্রাস্টীগণের কর্তৃত্ব থাকিবে। তৎপরে কোনো অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট অধ্যক্ষেরা মিলিয়া অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া লইবেন।

৬. অধ্যক্ষ সমিতি ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিবেন।

৭. শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাস্টীগণের মধ্যে একজন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইবেন। সম্পাদক অধ্যক্ষ-সভার অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন, হিসাব পরীক্ষা, শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ও পরিবর্তন, ছাত্র-নির্বাচন, পুস্তক, শিক্ষা-পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

৮. বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থের সঙ্গে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম এবং চতুর্থ বার্ষিক হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্যাখ্যান অধ্যাপন হইবে।

৯. ৩য় বার্ষিক শ্রেণী হইতে এণ্ট্রান্স পর্যন্ত সমুদয় ছাত্র অধ্যাপকগণ সহ আশ্রমের প্রতি সায়ং উপাসনায় যোগ দিবে। এবং নিম্নশ্রেণীর বালকগণকে লইয়া অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট উপাসনা করিবেন।. .

১২. সকল ছাত্রকেই বিদ্যালয়-ভবনে বাস করিতে হইবে। এবং শিক্ষকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিরূপিত সময়ে একত্র আহারাদি করিবেন। এবং যথাসম্ভব ছাত্রগণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকেও যোগ দিবেন।

১৩. ছুটির সময় ব্যতীত মাসে ৩ দিন ছাত্রগণ অভিভাবকের সম্মতি থাকিলে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া বাটী যাইতে পারিবে।

১৪. অভিভাবকগণ প্রতি রবিবারে গিয়া বালকদিগকে দেখিয়া আসিতে পারিবেন।

পৃ ৩২। ৬ ভাদ্র ১৩০৬ বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মিত হইয়া গেলে ঐ বৎসর শান্তি-নিকেতনের নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব দিনে উহার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করা হয়। ঐ দিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "প্রভাতে ঈশ্বরোপাসনা সমাপন করিয়া এক্ষণে আমরা এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি।. . আমরা দেখিতে পাই বিদ্যা দুই প্রকার— পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। এই অপরাবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে পরাবিদ্যার আলোচনা চাই, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে।. . কিন্তু সেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথমে সৎগুরুর নিকট যাওয়া চাই।. . সেইজন্য এই অনুকূল স্থানে এই ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, এবং যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য সুনিয়ম প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ হইতেছে।. . ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমি এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রযুক্ত করিয়া দিলাম।. . ব্রহ্মবিদ্যায় সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা।. ." সেইদিন সন্ধ্যাকালে মন্দিরের উপাসনায় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ বেদীগ্রহণ করেন ও রবীন্দ্রনাথ 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম'

ভাষণ পাঠ করেন।

এই উৎসবের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮২১ শক (মাঘ ১৩০৬), পৃ ১৬৪-৭২ দ্রষ্টব্য।

পৃ ৩২। ৭ পৌষ ১৩০৬ (১৮৯৯ ডিসেম্বর)। ইহাই কবির প্রথম ধর্মদেশনা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮২১ শক (১৩০৬), পৃ ১৬৪-৭২। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত ২য়। 'উপনিষদ্ ব্রহ্ম' পুস্তিকা শ্রাবণ ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ—The God of the Upanishads by Rabindranath Tagore (Translated from Bengali)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮২৩ শক (১৩০৮) হইতে মাঘ ১৮২৪ শকে (১৩০৯) প্রকাশিত হয়। ইহাই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রথম প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদকের নাম নাই, অনুমান হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করিয়াছিলেন।

পৃ ৩৩। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কয়েকটি তারিখ:

২৮ আশ্বিন ১২৬৫ (১৩ অক্টোবর ১৮৫৮) অজয় সেতু নির্মিত। অজয় হইতে সাঁইথিয়া রেলপথ ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ '

১৮ চৈত্র ১২৬৮ (৩০ মার্চ ১৮৬২) বীরভুম রায়পুর গ্রামে সিংহদের বাটিতে ব্রহ্মোপাসনা করেন।

১৮ ফাল্গুন ১২৬৯ (১ মার্চ ১৮৬৩) বোলপুরের নিকট বিশ বিঘা জমি পাঁচ টাকা খাজনায় মৌরসী পাট্টায় গৃহীত।

২৬ ফাল্গুন ১২৯৪ (৮ মার্চ ১৮৮৮) মহর্ষি-কৃত শান্তিনিকেতন-সম্বন্ধীয় ট্রাস্টডীড্ সম্পন্ন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮১০ শক। ট্রাস্টডীড্। দ্র ব্রহ্মবিদ্যালয়, অজিতকুমার চক্রবর্তী (বিশ্বভারতী সং), ১৩৫৮।

৪ কার্তিক ১২৯৫ (১৯ অক্টোবর ১৮৮৮) শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা। শান্তিনিকেতন-স্মৃতি, পৃ. ৫৭-৬০।

৭ পৌষ ১২৯৮ (২১ ডিসেম্বর ১৮৯১) শান্তিনিকেতন মন্দির -প্রতিষ্ঠা।

৭ পৌষ ১৩০৮ (২২ ডিসেম্বর ১৯০১) শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্‌বোধন।

৮ পৌষ ১৩২৫ (২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮) শান্তিনিকেতনের দক্ষিণে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দ্বারা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা।

৮ পৌষ ১৩২৮ (২২ ডিসেম্বর ১৯২১) বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের উদ্‌বোধন।

২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ (১৬ মে ১৯২২) বিশ্বভারতীর নূতন সংবিধান (constitution) ১৮৬৬ সালের ২১ নং অ্যাক্ট অনুসারে রেজেস্ট্রি করা হয়।

২৫ বৈশাখ ১৩৫৮ (৯ মে ১৯৫১) ভারতীয় পার্লামেণ্ট বা লোকসভায় বিশ্বভারতী অ্যাক্ট (নং ২৯, ১৯৫১ সাল) পাস হয়। ১৪ মে ১৯৫১ হইতে এই অ্যাক্ট কার্যকরী হয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ হয়।

অগ্রহায়ণ ১৩০৮ সালের কোনো এক তারিখে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় আরম্ভ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছুটির দিন ছিল রবিবার, পরে বুধবার হয়। বুধবার কেন ছুটির দিন, এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' (প্রথম প্রকাশ, ১৭৮৬ শক; ২৬ বৈশাখ ১২৭১ বঙ্গাব্দ; ৭ মে ১৮৬৪; শনিবার। পুনর্মুদ্রণ ১১ মাঘ ১৩৬০) বক্তৃতায় বলেন:

"প্রথমে যখন সমাজ স্থাপিত হয়, তখন শনিবারে সমাজ হইত। রবিবারে সকলের অবকাশ ছিল; শনিবার রাত্রিতে অধিককাল পর্যন্ত উপাসনা হইলেও কাহারো অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রামমোহন রায়ের যাঁহারা সহযোগী তাঁহাদের পক্ষে আমোদের দিন শনিবার; সুতরাং সে দিন সমাজে আসিতে তাঁহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন; এই জন্য বুধবার সমাজের দিন স্থির হইল। আমরা যখন [ব্রাহ্ম] সমাজে আসি, তখন বুধবারেই সমাজ [উপাসনা] হইত। ক্রমে এই বারই পবিত্র হইয়াছে।" আদি ব্রাহ্মসমাজের এই রীতি অনুসারে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে বুধবারেই উপাসনা হইয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য

ভাষণ শান্তিনিকেতনে ঐ বারটিতে প্রদত্ত। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম থাকা কালে 'বুধবার' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র বিভূতিভূষণ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইত (১৩২৯)।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায। "এমন সময়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত *Twentieth Century* পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সে রকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি।"—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (১৩৪০)।

৩০ জুলাই ১৯০১ নরহরি দাস এই ছদ্মনামে ব্রহ্মবান্ধব নৈবেদ্যের (প্রকাশ আষাঢ় ১৩০৮। জুন ১৯০১) এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন :

Naivedya is a natural offering of the human heart to the Divine— an offering of joy and sorrow, of struggle and fruition, of all-embracing love, of national aspiration and desire for union with the Unrelated··· In all places of worship, be they Christian, Muhamedan or Hindu, the hundred sonnets can be recited or sung without scruple.··· Naivedya is the essence of 'Bhakti' made compatible with the knowledge of the transcendent···। দ্র চিঠিপত্র ৬, পরিশিষ্ট, পৃ ২০৩।

পৃ ৩৩। পাদটীকা ৩। রেবাচাঁদের মৃত্যু হয় ১২ জানুয়ারি ১৯৪৫ সালে।

পৃ ৩৭। শান্তিনিকেতন মন্দিরে ১৩০৯ নববর্ষে (১৪ এপ্রিল ১৯০২) রবীন্দ্রনাথের উপাসনা ও ভাষণ।

'নববর্ষের চিন্তা। শান্তিনিকেতনে ছাত্রসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা।' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮২৪ শক, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হয়। বঙ্গদর্শন, ২য় বর্ষ, বৈশাখ ১৩০৯ সংখ্যায় 'নববর্ষ' সামান্য পরিবর্তিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ (১৯০৬) গ্রন্থে এই ভাষণ 'নববর্ষ' নামে বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে পঠিত বলিয়া প্রকাশিত হয়— বঙ্গদর্শনের পাঠ হইতে সামান্য পরিবর্তিত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪।

ধর্ম (গদ্যগ্রন্থাবলী ১৬। প্রকাশ ১৯০৯) গ্রন্থে 'নববর্ষ' প্রবন্ধ-শেষে ১৩০৯ আছে। এইটি নূতন ; ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩।

পৃ ৪৩। 'উপাধ্যায সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু অন্যেরা গৃহী ও সংসারী' পড়িতে হইবে।

পৃ ৪৪, ৫৬৭। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর নাম সুশীতলা, ডাক নাম 'সুসি'। ইঁহার পিতা দর্পনারায়ণ ঠাকুর -বংশীয় জামাতা সার্জন-মেজর ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃ ৩৮৮ ৪র্থ অনুচ্ছেদে 'বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুষমা আছে', সুশীতলা হইবে।

৫৬৭ পৃষ্ঠায় সংযোজন ও সংশোধনাংশে বলেন্দ্রের স্ত্রীর নাম 'সাহানা' হইযাছে ; সুশীতলা অসল নাম।

দ্বিতীয় পংক্তির তারিখটি [? ৫ চৈত্র ১৩০৮] বোধ হয ভুল। সংযোজন, পৃ ৫৬৭ দ্রষ্টব্য। সেখানে জানুয়ারি ১৯০১ করা হইয়াছে ; তারিখগুলি নানা ভাবে পাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

পৃ ৪৫। রেবাচাঁদ, পরবর্তীকালের নাম অণিমানন্দ। বয়েজ্ ওন্ স্কুলের (Boys' Own School) স্থাপয়িতা। মৃত্যু ১২ জানুয়ারি ১৯৪৫।

পৃ ৪৬। কলিকাতায় কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী তখন মৃত্যুশয্যায়— মৃত্যুর দশদিন পূর্বে কবি একখানি পত্রে 'বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিত করিয়া' কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ২৭ কার্তিক ১৩০৯ (১৩ নভেম্বর ১৯০২), অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার ঠিক এক বৎসর পরে, এইটি লিখিত হয়। দ্র বিশ্বভারতী

পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ ২০৭-১৬। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত (৭ পৌষ ১৩৫৮) 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' গ্রন্থভুক্ত। এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন লিখিয়াছেন যে ১৯০৮ সালে তিনি যখন আশ্রমের কার্যে যোগ দেন, সেই সময়ে কবি তাঁহাকে এই পত্রখানি দেন। পঞ্চাশ বৎসর এই দলিলখানি অপ্রকাশিত ছিল।

বিংশ শতকের গোড়ায় ইংরেজ তথা পশ্চিমের সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার স্থত্রপাত হয়। কি বিবেকানন্দ, কি রবীন্দ্রনাথ— সকলেই অতীত ভারতের গৌরব-গানে বিভোর ছিলেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারাই ভবিষ্যৎ বাংলাকে গড়িয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অতীত যুগের যে স্বপ্ন দেখিতেছেন তাহা যে কেবল শিক্ষার দিক হইতে বরণীয় তাহা নহে, তাহা তাঁহার মতে স্বদেশের দান বলিয়াই গ্রহণীয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের জন্য যে নির্দেশ তিনি লিখিয়া পাঠান (২৭ কার্তিক ১৩০৯) তাহার এক স্থলে স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এক হিসাবে কিছু-দিন পূর্বে রচিত 'নৈবেদ্যে'রই প্রতিধ্বনি। তিনি ঐ পত্রে লিখিতেছেন :

"ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ করিতে চাই।··· স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা— এমন-কি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব— নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না— অতএব বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।" রবীন্দ্রনাথের জীবনে একসময়ে কিছুকালের জন্য 'অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচার' দেখা দিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এই স্বরেই কথা বলিয়াছিলেন, উপাধ্যায়ও এই মতের পোষক। মোট কথা সেই কালে এটাই ছিল সকলের হৃদ্‌গত বাণী।

পৃ ৪৭। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ (২৩ নভেম্বর ১৯০২)। দ্র হেমলতা দেবী (ঠাকুর), 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ', স্বজনী (১৯৬১), পৃ ১৭৫-৭৯।

পৃ ৬০। পাদটীকা ৩ হইবে ৪; ৪ হইবে ৩। রবীন্দ্রজীবনী ১ম, ৩য় সং, পৃ ৩৬ হইবে।

পৃ ৬৩। পাদটীকা ৩। বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে লিখিত পত্র— ১২ ফাল্গুন ১৩০৮, শান্তিনিকেতন, বোলপুর। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৮, পৃ ৫৯-৬০।

পৃ ৬৭। রেণুকার মৃত্যু-তারিখ লেখা হইয়াছে ভাদ্রের শেষ বা আশ্বিনের গোড়ায়। মনে হয় ২ আশ্বিন ১৩১০ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩), রেণুকার মৃত্যুদিন-স্মরণে 'শিশু' (কাব্যগ্রন্থের ৭ম ভাগ) খণ্ডে তারিখ প্রদত্ত হয়। শিশুর অধিকাংশ নূতন কবিতা আলমোড়ায় রচিত।

পৃ ৮০। শিশুর পুরাতন কবিতা। এই পৃষ্ঠার ২য় পংক্তি— পূজার সাজ, মুকুল, ৫ম খণ্ড, ১৩০৬ হইবে; ৩য়-৪র্থ পংক্তি— কাগজের নৌকা, মুকুল, ১ম খণ্ড, ১৩০২ হইবে।

পৃ ৮২। পাদটীকা ১। কাব্যগ্রন্থ ১ম ভাগ ১ম খণ্ডের 'যাত্রা'র প্রথম কবিতা।

পৃ ১০২। মজঃফরপুর হইতে কোনো আত্মীয়ের বিবাহোপলক্ষে কাশী গিয়াছিলেন। কাশীতে কবির ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তির সহিত প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়, ২৩ বৈশাখ ১৩১১ (৫ মে ১৯০৪)। বিখ্যাত ব্রাহ্মণরা বহু বাদানুবাদের পর স্বীকার করেন "আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহপদ্ধতি সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮২৬ শক; শ্রাবণ ১৩১১। পৃ ৬৬-৬৭। দশ বৎসর পরে ১৯১৪ সালে কবি এলাহাবাদে প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জর্জ-টাউনের বাড়িতে গিয়া কয়েকদিন থাকেন। এখানে 'ছবি' (বলাকা)

কবিতাটি রচিত হয়। দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২, পৃ ৩৮৮।

পৃ ১০৬। অজিতকুমার চক্রবর্তী। ১৫ বৈশাখ ১৩১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়কে (P. K. Roy) অজিতকুমার সম্বন্ধে পত্র দেন: "অজিত বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইঁহার দর্শন বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষকগণ বিশেষভাবে বিস্ময়বোধ করিয়াছিলেন। সেবার মোহিতবাবু চরিত্রনীতি সম্বন্ধে পরীক্ষাকর্তা ছিলেন, তিনি অজিতের কাগজ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ইঁহাকে বোলপুর বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধবশতই আমি অজিতকে আমার বিদ্যালয়ে গ্রহণ করি।"—কবিপ্রণাম, পৃ ১০৫।

পৃ ১১২। এই সময়ে (মাঘ ১৩১২) ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কাশী হইতে বিধুশেখর ভট্টাচার্য নামে এক যুবক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। বিধুশেখরের বয়স তখন ২৬ বৎসর। বিধুশেখর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত; রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় তিনি পালি ভাষা শিক্ষা ও বৌদ্ধদর্শন অধ্যয়ন করেন। ১৩১৫ সালে তাঁহার অনূদিত 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হয়। বিধুশেখর বৈদিকসাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ অনুবাদ করিলে উহাও সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হয় (১৩১৬, ১৩১৮)। বলা বাহুল্য বিধুশেখরের প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি ও অবসরের ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ করিয়া দেন। অধ্যাপনের সহিত অধ্যয়ন ও গবেষণাদি করা বিষয়ে কবির যে কী উৎসাহ ছিল, তাহা সমসাময়িক কর্মীরা জানেন। গবেষণাকে বিদ্যায়তনের কার্য বলিয়া মনে করা হইত, তাহা গবেষকের ব্যক্তিগত কার্য ছিল না; এই শ্রেণীর কার্যের জন্য কেহ নিন্দাভাগী হইতেন না।

পৃ ১১৫। 'মন্দিরের কথা'। রবীন্দ্রনাথ কেবল উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দিরই দেখেন নাই, তিনি কোণার্ক সূর্য-মন্দিরও দেখিয়াছিলেন। দ্র ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৮১; ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩। রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ ৩৩২।

পৃ ১১৯। ২য় অনুচ্ছেদ। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাশেষি স্থলে বৈশাখ মাসের শেষাশেষি হইবে।

পৃ ১২৩। পাদটীকা ২। জীবনী-লেখকের 'ভারতে জাতীয় আন্দোলনে'র নূতন সংস্করণে (জুলাই ১৯৬০) প্রকাশিত হয়।

পৃ ১৩১। চারুচন্দ্র বসুর 'ধম্মপদ' গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনা বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ সনে বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথ বইখানি পাইয়া পালি মূলের পাশাপাশি চারিটি বর্গের বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। বইখানি কবির কাছ হইতে তৎকালীন শিক্ষক সুবোধচন্দ্র মজুমদার পাইয়াছিলেন। সুবোধচন্দ্রের পুত্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র জয়পুর-নিবাসী সমীরচন্দ্র মজুমদার উক্ত পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে দান করিয়াছেন।—বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫, পৃ ১০।

পৃ ১৫৫। 'পল্লীসমিতি'। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ -লিখিত 'কংগ্রেস' গ্রন্থে আছে। তাহা হইতে নিম্নে উদ্‌ধৃত করা গেল (দেশ, ২১ শ্রাবণ ১৩৫৬) দ্র পল্লীপ্রকৃতি, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২, পৃ ২২২-২৪।

পৃ ১৫৮। ১৯০৯ সালে গিরিডিতে একটি শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন লেখকের পিতা গিরিডির উকিল নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা বামনদাস মজুমদার ও হিমাংশুপ্রকাশ রায়। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে বারগণ্ডায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে উঠিতেন। কবি এই বিদ্যালয়ের জন্য একটি প্রচারপত্র লিখিয়া দেন এবং স্বয়ং উহার পৃষ্ঠপোষক হন। ঐ প্রচারপত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। ছোটোনাগপুরের স্বাস্থ্যকর স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা কবি অন্যত্রও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টি বড়ো হইয়া গিরিডি জাতীয় বিদ্যালয় হয় ও বৎসর দুই চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নাই; তবে যদি

কখনো সেই মুদ্রিত প্রচারপত্র পাওয়া যায় তবে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। গিরিডি জাতীয় বিদ্যাল National Council of Education হইতে বার্ষিক ৩০০৲ টাকা সাহায্য পাইত। জীবনীলেখক ১৯০৭ সালে কয়েকমাস এখানে অধ্যয়ন করেন।

পৃ ১৬৯। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষাপরিষদে দুই বৎসর বাংলার প্রশ্নপত্রকর্তা ছিলেন (১৯০৬, ১৯০৭)। ফিফ্‌থ্‌ স্ট্যাণ্ডার্ড অর্থাৎ তৎকালীন এণ্ট্রান্স (ম্যাট্রিকুলেশন্) ও সেভেন্থ স্ট্যাণ্ডার্ড অর্থাৎ ফার্স্ট আর্টস্ (এফ.এ.)—এর বাংলার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করেন। দ্র National Council of Education, Bengal, Calender 1906-1908।

সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, পৃ ২৭-৪৬।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য তিনি আদর্শ প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিয়া দেন। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত ২।

পৃ ১৭০। ১৩১৩ সালে কবি গদ্যগ্রন্থাবলী-সম্পাদনে মন দিয়াছেন। ১৩১৪ বৈশাখ মাসে গদ্যগ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ড, 'বিচিত্র প্রবন্ধ', মজুমদার লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত এই আদি সংস্করণে বহু পরিবর্তন হইয়াছে। ২য় সংস্করণ পরিবর্তিত আকারে চৈত্র ১৩৪২ সালে বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত হয় ইহার ভূমিকায় কবি লেখেন, "এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনা-রস-সম্ভোগে।" প্রকাশকগণ পাঠ-পরিচয়ে লিখিলেন, "বিচিত্র প্রবন্ধের পূর্বের শৃঙ্খলা ভাঙিয়া এবারে রচনাগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো হইয়াছে।" এ ছাড়াও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ ৫৫৯-৬৪)। কবির মৃত্যুর পর আষাঢ় ১৩৫৫ সালে বিশ্বভারতী হইতে যে সংস্করণ প্রকাশিত হইল তাহাতেও কিছু রদবদল হয়। ইতিমধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫ম খণ্ডে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ প্রকাশিত) যে বিচিত্র প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয় তাহা ১৩৪২ সালের গ্রন্থের অনুরূপ হইলেও অবিকল নহে। বর্তমানে যে সংস্করণ চলিত আছে তাহা ১৩৪২ সালের প্রকাশিত গ্রন্থের অনুরূপ ও রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুমোদিত সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

পৃ ১৭৬। শিলাইদহ হইতে ২৯ পৌষ ১৩১৪ (১৪ জানুয়ারি ১৯০৮) রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন, "তোমাদের গ্রামের কাজ ভালো চলছে শুনে আমি ভারি খুশি হয়েছি।" যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই কর্মে উৎসাহী, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছিল তাঁহার সহায়। ভুবনডাঙা গ্রামে হরিজন পল্লি ও মুসলমানদের মধ্যে কাজ শুরু হয়। কবি লিখিতেছেন যে শিলাইদহে "গ্রাম সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা ভাবচি তা এখনো কাজে লাগাবার সময় হয় নি, এখন কেবলমাত্র অবস্থাটা জানবার চেষ্টা করচি। ভূপেশ (রায়) প্রধানত তথ্য সংগ্রহ করচেন— সেইগুলো ভালো করে জমে উঠলে প্ল্যান ঠিক করতে হবে। আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থ ভাবে স্বরাজস্থাপন করতে চাই— সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোটো প্রতিকৃতি— খুব শক্ত কাজ অথচ না হলে নয়। অনেক ত্যাগের আবশ্যক সেই জন্যে মনকে প্রস্তুত করছি— রথীকে আমি এই কাজেই লাগাব, তাকেও ত্যাগের জন্য ও কর্মের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। নিজের বন্ধন মোচন করতে না পারলে আর কাউকে মুক্ত করতে পারব না।"— প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃ ৬৮৫।.. ২০ মাঘ ১৩১৬ সালে কবি তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমেরিকায় লিখিতেছেন, "রথীর কাজের আয়োজন চলছে। যে ক্ষেত্রটি পেয়েছে সেখানে ইচ্ছা করলে অনেক উপকার করতে পারবে। দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতি বিধান করাই এখন আমাদের যথার্থ কাজ।" দেশ, কার্তিক ১৩৬২, পৃ ৯১।

পৃ ১৮২। পাদটীকা। প্রাদেশিক কনফারেন্সের তালিকা। পাবনা অধিবেশনের তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি

১৯০৮ (২৮ মাঘ ১৩১৪)। দ্র হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, ২য় সং, পৃ ২৫২ ; যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত -লিখিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন' প্রবন্ধ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১।

পৃ ২০১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৭ বৈশাখ ১৩০১ [২৯ এপ্রিল ১৮৯৪]। পরিষদের প্রথম অধিবেশনে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম বৎসরের জন্য সভাপতি ও নবীনচন্দ্র সেন সহকারী সভাপতি মনোনীত হন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে— ৪ আষাঢ় ১৩০১ [১৭ জুন ১৮৯৪] দুই জন সহকারী সভাপতির পদ সৃষ্টির কথা হয়। ইতিপূর্বে নবীনচন্দ্র সেন নির্বাচিত হইয়াছিলেন। "অন্যজনের নির্বাচন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অন্যতর সহকারী সভাপতির পদে নির্বাচিত করা হইল।"—সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা, কার্যবিবরণ, পৃ ৫৫।

তৃতীয় অধিবেশন—১৪ শ্রাবণ ১৩০১ [২৯ জুলাই ১৮৯৪] 'পারিভাষিক শব্দ-প্রণয়ন' সমিতি গঠিত হয়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সমিতির সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আরও ৭ জন সদস্য মনোনীত হন।

১৩০১— বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত। সহকারী সভাপতিদ্বয় নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৩০২— সহ-সভাপতি— চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ।

১৩০৩— সহ-সভাপতি— নবীনচন্দ্র, মনোমোহন বসু ও রবীন্দ্রনাথ।

১৩১২— সহ-সভাপতি— রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৩১৩-১৫— সহ-সভাপতি— রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য। ১৩১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত হন।

১৩২৪— রবীন্দ্রনাথ ৮ জনের মধ্যে অন্যতম সহ-সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৃহদ্বার-উন্মোচন সভা। দ্বিতল গৃহে সভাপতি হন পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র, একতলার সভায় সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (দ্র কান্তকবি রজনীকান্ত, পৃ ৯১)। "এই গান শুনে রবি ঠাকুর আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন, আমি দীনেশকে [সেন] সঙ্গে করে রবি ঠাকুরের বাড়ী তার পরদিন [২২ অগ্রহায়ণ, ১৩১৫] সকাল বেলা যাই। সেইখানে তিনি আবার ঐ গান শোনেন, শুনে বলেন যে 'বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হয়েছে, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আর একটা করুন।"— রজনীকান্তর রোজনামচা, কান্তকবি রজনীকান্ত, পৃ ৯৪।

পৃ ২০২। রজনীকান্ত সেন : জন্ম ১২ শ্রাবণ ১২৭২ (২৬ জুলাই ১৮৬৫), মৃত্যু ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০)।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রজনীকান্ত উভয়েই রাজশাহী-বারের উকিল ছিলেন। অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় রজনীকান্ত সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হন ও তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯০১ সালে বড়োদিনের ছুটির সময়ে (ডিসেম্বর মাসে) অক্ষয়কুমার ও রজনীকান্ত দুইজনে মিলিয়া কলিকাতায় আসেন ও সেখান হইতে বোলপুর যাইবার সময়ে রজনীকান্তকেও অক্ষয়কুমার সঙ্গে লন। জগদানন্দ রায় আশ্রমের স্মৃতিকথায় (শান্তিনিকেতন পত্রিকা) এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার আমন্ত্রিত সুধীবর্গের নিকট উৎসাহ পাইয়াও রজনীকান্তের আপনার গান প্রকাশ সম্বন্ধে ইতস্ততভাব দূর হইল না। তাঁহার ভয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে। কলিকাতায় ফিরিয়া সুরেশচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইলে, তাঁহার ভয় ভাঙিল এবং সমাজপতিরই রজনীকান্ত সম্বন্ধে উৎসাহ দেখা গেল বেশি।

১৩১৬ সাল হইতে রজনীকান্ত ক্যানসার্ রোগাক্রান্ত হন ও শেষ আট মাস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকেন, সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ তারিখে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়া রজনীকান্তের সহিত দেখা করেন এবং শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া ১৬ আষাঢ় নিম্নলিখিত পত্রখানি রজনীকান্তকে পাঠান :

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্বক নিবেদন— সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনো মতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রানী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্‌ধৃত করিয়াছিলেন,

—এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?

"ঐ কথা হইতে মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোটো এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই— কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই— পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে! মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।

"যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেই দিনই আমি বোলপুর চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতা যাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে।

"আপনি যে গানটি[১] পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন— আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে— অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন ; আজ আপনার জীবন-সংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" দ্র. কান্তকবি রজনীকান্ত, পৃ ২৩৪-৩৬।

পৃ ২০৭। শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা। বিনয় সরকারের বৈঠক, ১ম ভাগ, পৃ ৪৪৩-৪৫—"উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর ধর্মমিলন— বিশেষভাবে আত্মিক সমঝৌতা— অনিবার্য। . . যুক্তিনিষ্ঠার প্রভাবে মুসলমান নরনারী হিন্দুদের খুব কাছে এসে পড়বে। যুক্তিনিষ্ঠ হিন্দুরাও মুসলমানের কাছে যাবে। . . হিন্দুমুসলমানের ধর্মমিলন অবশ্যম্ভাবী। জনসাধারণের ভেতরও যেমন অবশ্যম্ভাবী, উচ্চশিক্ষিতের ভেতরও

১ "আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ, গর্ব করিতে চুর" ইত্যাদি।

তেমন অবশ্যম্ভাবী।. . সমসাময়িক বঙ্গ সংস্কৃতি আর বঙ্গ সমাজ এই যৌথ ধর্মই মেনে চলছে।. . আমি রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্মগীতগুলার কথা বলছি। এই গানগুলা হিন্দু গানও নয়, মুসলমান গানও নয়, এ-সব হচ্ছে বাঙালি স্ত্রীপুরুষ মাত্রের জন্য ঈশ্বর-বিষয়ক স্তোত্র। এ-সবকে আমি হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ভগবত-গীতা সমঝে থাকি। তা ছাড়া আছে রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্মোপদেশ সমূহ। এই বাক্যগুলা হিন্দুর উপাসনাও নয়, মুসলমানের উপাসনাও নয়। এ-সবের ভেতর আমি পাই বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আত্মবিশ্লেষণ ও পরমেশ্বর ভক্তি। রাবীন্দ্রিক ভগবানকে ১৯৮০ সনের বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান তাদের সার্বজনিক ভগবানরূপে পূজা করবে।" —এইটি বিনয় সরকার বলেন ১৯৪২ সালে। দ্র. প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৯, পৃ ২৮।

পৃ ২১৫। মন্ত্র সম্বন্ধে ৯ ফাল্গুন ১৩১৭ সনে এক পত্রে লিখতেছেন, "মনটিকে অনন্তের ধারণায় নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে আপনিই সমস্ত সহজ হয়ে যায়— মন্ত্রসাধন ছাড়া তার অন্য কোনো পথ আমি তো জানি নে।"— প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৮, পৃ ৪৬০।

পৃ ২২৯। পাদটীকা ২। চয়নিকা। ১৯০৯। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসঞ্চয়ন। চয়নিকা, প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ.। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। এলাহাবাদ 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' হইতে শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত [মুখপত্রে রবীন্দ্রনাথের ফোটো ছিল]। পৃ ৪৫৯ + ৭। মোট ১৩০টি কবিতা।

বিশ্বভারতী হইতে ১৩৩২ সালে যে চয়নিকা প্রকাশিত হয়, তাহা প্রায় নূতন গ্রন্থ। কবির ইচ্ছা অনুযায়ী সঞ্চয়ন করা হয়। উহা আধুনিক 'সঞ্চয়িতা'-র অগ্রদূত। বর্তমানে উহা অচলিত।

পৃ ২৩২। ক্ষিতিমোহন সেন 'রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ'-এ লিখিতেছেন: "১৯০৮ সালের আগে অর্থাৎ গীতাঞ্জলি লেখার পূর্বে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'আত্মদা বলদা যিনি' কবিতাটি ১৮৯৪ সালের (ফাল্গুন ১৩০০) তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইয়াছিল।

"তাহার পর ১৯০৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসের শেষার্ধে কোনো একটি বিশেষ দাবির জোরে তাঁহার কাছে বেদবাণীর অনুবাদ প্রার্থনা করা হয় এবং সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন। ৭ই পৌষের পূর্বে যাহাতে অনুবাদগুলি পাওয়া যায় এইজন্য বিশেষভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল। ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে এক সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার প্রিয় কয়েকটি বেদমন্ত্রের অনুবাদ তিনি করিলেন। সেগুলির দুই একটি সুর দিয়া গানরূপে তিনি পরে প্রকাশিত করেন (যথা, 'তুমি আমাদের পিতা' এবং 'যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই।')"

"আলোয় আলোকময়" গানটি (২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬) রচনার দুইদিন পরে 'পিতা নোঽসি' গানটি রচিত হয় (৮ ডিসেম্বর ১৯০৯)।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি ক্ষিতিমোহন সেনের নিকট ছিল; সেই খাতায় অনেকগুলি বেদমন্ত্রের অনুবাদ আছে। দ্র স্বজনী, পৃ ৩৫-৪০।

বিশ্বভারতী হইতে কবির অনুবাদ 'রূপান্তর' নামে পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ-কৃত কয়েকটি বেদমন্ত্রানুবাদ॥

১. আত্মদা বলদা যিনি

২. তুমি আমাদের পিতা

৩. যিনি অগ্নিতে যিনি জলে

৪. যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে

৫. সত্যরূপেতে আছেন সকল ঠাঁই

৬. যদি ঝড়ের মেঘের মতো

৭. হে বরুণদেব, মানুষ আমরা দেবতার কাছে

৮. অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়।

পৃ ২৩৫। গোরা, পংক্তি ২৭ : 'কোনো ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে' স্থলে 'কোনো ব্রাহ্মণসমাজের পক্ষে' হইবে।

পৃ ২৩৬। পংক্তি ২ : "গোরা কঠোর যুক্তিবাদী" হইবে।

পৃ ২৮০। তত্ত্ববোধিনী পর্ব : ৬ অক্টোবর ১৮৩৯ (২১ আশ্বিন ১৭৬১ শক, কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথি) দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জনী সভা'; দ্বিতী অধিবেশনে 'তত্ত্ববোধিনী' নাম গৃহীত হয়। "ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদা প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। নিজ পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মধ্য হইতে মাত্র ১০ জনকে লইয়া দেবেন্দ্রনা এই সভা আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বয়স (জন্ম ১৮১৭) বাইশ বৎসর মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে জুন ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। ১৮৪৩ সালটি দেবেন্দ্রনাথে জীবনের একটি বিশেষ বৎসর। এই বৎসরে তিনি— ১. এপ্রিল মাসে বাঁশবেড়ের তত্ত্ববোধিনী পাঠশাল প্রতিষ্ঠিত করেন; ২. ১৮৪৩ অগস্ট (ভাদ্র ১২৫০ সাল) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রবর্তন করেন; ৩. ডিসেম্বর মাসে (৭ পৌষ) ২০ জন বন্ধু-সহ প্রতিজ্ঞাপূর্বক বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স ২৫ বৎসর।

পরবৎসর (১৮৪৪) তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে চারিজন ব্রাহ্মণ ছাত্রকে কাশীতে চারি বেদ অধ্যয়নের জ পাঠানো হয়। ১৮৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রমানাথ ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী দীর্ঘকাল ধরিয়া বেদের বাংলা অনুবাদ প্রায় প্রতি মাসে প্রকাশ করেন। ইহাই বেদের প্রথম বঙ্গানুবাদ ভারতের কোনো ভাষায় ইতিপূর্বে বেদের অনুবাদ হয় নাই। বেদ প্রথম মুদ্রিত হয় বিলাতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক :

১৬ অগস্ট ১৮৪৩; ১৭৬৫ শক; ১ ভাদ্র ১২৫০ সাল। প্রথম তিনমাস রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নেতৃত্বে নান লোকের রচনা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণ ১২৫০ সাল হইতে অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী সম্পাদনা করেন।

১৮৪৪-৫৬; ১৭৬৫-৭৭ শক; ১২৫০ হইতে ১২৬২ পর্যন্ত— অক্ষয়কুমার দত্ত।

১৮৫৬-৫৭; ১৭৭৮ শক; ১২৬৩ সাল— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮৫৭-৫৯; ১৭৭৯-৮০ শক; ১২৬৪-৬৫ সাল— নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

৮৫৯-৬১; ১৭৮০-৮২ শক; ১২৬৬-৬৭— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৬১-৬২; ১৭৮৩ শক; ১২৬৮— তারকনাথ দত্ত।

১৮৬২-৬৩; ১৭৮৪ শক; ১২৬৯— আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

১৮৬৩-৬৪; ১৭৮৫ শক; ১২৭০— প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

১৮৬৪-৬৭; ১৭৮৬-৮৮ শক; ১২৭১-৭৩— অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

১৮৬৭-৬৯; ১৭৮৯-৯০ শক; ১২৭৪-৭৫— হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১৮৬৯-৭০; ১৭৯১ শক; ১২৭৬— অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

১৮৭০-৭১ ; ১৭৯২ শক ; ১২৭৭— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৭১-৭২ ; ১৭৯৩ শক ; ১২৭৮— অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৭২-৭৮ ; ১৭৯৪-৯৯ শক ; ১২৭৯-৮৪ — অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

১৮৭৮-৮৪ ; ১৮০০-০৫ শক , ১২৮৫-৯০— হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১৮৮৪-১৯০২ ; ১৮০৬-২৩ শক ; ১২৯১-১৩০৮— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯০২-০৩ ; ১৮২৪ শক , ১৩০৯— হেমচন্দ্র বিদ্যাবত্ন।

১৯০৩-০৬ ; ১৮২৫-২৭ শক , ১৩১০-১২— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব ও হেমচন্দ্র বিদ্যাবত্ন।

১৯০৬-০৭ ; ১৮২৮ শক ; ১৩১৩— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯০৭-০৯ ; ১৮২৯-৩০ শক ; ১৩১৪-১৫— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

১৯০৯-১১ ; ১৮৩১-৩২ শক , ১৩১৬-১৭— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

১৯১১-১২ ; ১৮ সংকল্প ১ম ভাগ, ১৮৩৩ শক , ১৩১৮— ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব।

১৯১২-১৩ ১৮ সংকল্প ২য় ভাগ, ১৮৩৪ শক , ১৩১৯— ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯১৩-১৪ ১৮ সংকল্প ৩য় ভাগ, ১৮৩৫ শক , ১৩২০— ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯১৪-১৫ ১৮ সংকল্প ৪র্থ ভাগ, ১৮৩৬ শক ১৩২১— ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব।

১৯১৫-২২ ১৮৩৭-৪৩ শক ; ১৩২২-২৮— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুব।

১৯২২-২৬ ১৮৪৪-৪৭ শক ; ১৩২৯-৩২— ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুব।

১৯২৬-৩০ ১৮৪৮-৫১ শক ; ১৩৩৩-১৩৩৬— ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুব, বনওযারিলাল চৌধুবী, ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯৩০-৩১ ১৮৫২ শক ; ১৩৩৭— ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুব ও বনওযাবিলাল চৌধুবী।

১৯৩১-৩২ ; ১৮৫৩ শক ; ১৩৩৮— ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুব।

১৩১৮ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাব সম্পাদক হন। শিলাইদহে মীরা দেবীকে ১৩১৮ সালের বৈশাখেব গোড়ায় শান্তিনিকেতন হইতে লিখিতেছেন, "তত্ত্ববোধিনীব সম্পাদক হয়ে আমার কাজ আরো বেড়ে গেছে।" ১৩২১ পর্যন্ত তিনি নামতঃ সম্পাদক ছিলেন কিন্তু কাজ চালাইতেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' পুনশ্চ প্রতিষ্ঠাব জন্য কলিকাতায় চেষ্টা হয়, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আদিব্রাহ্মসমাজেব সম্পাদক ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী-সম্পাদক হন। কিন্তু ইহা কার্যকরী হয় নাই। দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল -প্রণীত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, সাহিত্যসাধক-চবিতমালা ৪৫ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্ত, সাহিত্যসাধক চবিতমালা ১২ ; সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, "তত্ত্ববোধিনী সভা", বিশ্বভাবতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫০, পৃ ১৫-২২।

৫ অনুচ্ছেদ। "ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে হিন্দুসমাজ উৎকর্ষ" হইবে ('উৎকট' নহে)।

পৃ ২৯৫। ৪ ফাল্গুন ১৩১৮ কবি বোলপুর হইতে কলিকাতায় গেলেন। সেখান হইতে শিলাইদহে যান ও চৈত্রের গোড়ায কলিকাতায় আসিয়া (৩ চৈত্র) 'ভাবতবর্ষেব ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৬ চৈত্র বিলাত যাওয়াব প্রাক্কালে শরীব অসুস্থ হওয়ায় যাওয়া হইল না। চৈত্রের মাঝামাঝি শিলাইদহে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে গীতিমাল্যের গান ও ইংরেজি গীতাঞ্জলির তর্জমা করেন।

পৃ ৩০০। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নূতন মাতা' কবিতা (দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃ ৪১৬) ইংরেজি অনুবাদ করেন : সেটি *Lovers Gift* -এর ৫০-সংখ্যক কবিতা The Child। দ্বিজেন্দ্রলাল এই কবিতাটি লেখেন তাঁর স্ত্রীর

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে (২৯ নভেম্বর ১৯০৩)। রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল পূর্বেই 'শিশু'র কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাটি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে। এবং বহুবৎসর পরে সেটি অনুবাদ করেন। 'আলেখ্য' কাব্যে 'নুতন মাতা' কবিতাটি আছে। দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃ ৪১৬-১৮।

পৃ ৩১৪। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আনন্দ-বিদায়ের' একস্থলে আছে—

আমি যতই দেখছি ভেবে আমার কাব্যসূত্র,
দেখছি যে জন্মেছি আমি বাণীর বরপুত্র।
তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা।
পাবে গুরুদাসের নিকট—ওজন দরে সস্তা।

শেষ পংক্তির উক্তিটি দ্বিজেন্দ্রলালের বানানো কথা নয়। ১৮৮৪ সালের ১২ জুলাই রবীন্দ্রনাথ ৯৭নং কলেজ স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির মালিক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন—

"আমার ফর্দে লিখিত পুস্তকগুলি আমি আপনার নিকট দুই হাজার তিন শত নয় (২৩০৯) টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলাম। তন্মধ্যে অদ্য এগার শত ১১০০ টাকা বুঝিয়া পাইলাম। বাকী টাকা আপনি দুইমাসের মধ্যে দুইবারে পরিশোধ করিবেন। ইহা ব্যতীত দোকানদারদিগের নিকট যে সকল পুস্তক আছে তাহা ক্রমে পাঠাইয়া দিব, তাহা নগদমূল্যে লইবেন। এ সকল পুস্তক যতদিন না আপনার বিক্রয় শেষ হইবে ততদিন আর এগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব না। এ সকল পুস্তক অল্প অবশিষ্ট থাকিতে আমাকে জানাইতে হইবে। পুস্তক আপনার ইচ্ছামত মূল্যে আপনি বিক্রয় করিতে পারেন।" —১২ জুলাই ১৮৮৪ [বিবাহের সাত মাস পরে]।

বহুকাল অধিকাংশ বাঙালি লেখকদেরই বইয়ের এই দশা ছিল। দ্র শ্রীপুলিনবিহারী সেন, "রবীন্দ্রনাথের বই-প্রকাশ", আনন্দবাজার পত্রিকা, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৯।

১৮৮৪ জুলাই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মাত্র ১৬ খানি বই প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৭৮। কবিকাহিনী*। ৫০০ কপি। মূল্য ০-৬ আনা
১৮৮০। বনফুল*। ১০০০ কপি। ০-৮ আনা।
১৮৮১। বাল্মীকিপ্রতিভা। ১০০০ কপি। ০-৪ আনা
ভগ্নহৃদয়। ১০০০ কপি। ১-০ টাকা
রুদ্রচণ্ড। ১০০০ কপি। ০-৮ আনা
য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র*। ২০০০ কপি। ১-৪ আনা
১৮৮২। সন্ধ্যাসংগীত। ১১০০ কপি। ০-৮ আনা
কালমৃগয়া। ২৫০ কপি। ০-৪ আনা
১৮৮৩। বউঠাকুরানীর হাট। ১০০০ কপি। ১-৪ আনা
প্রভাতসংগীত। ১০০০ কপি। ১-৪ আনা
বিবিধ প্রসঙ্গ। ১০০০ কপি। ০-৮ আনা
১৮৮৪। ছবি ও গান। ১০০০ কপি। ১-০ টাকা

*এই ১৬খানি বইয়ের মধ্যে 'কবিকাহিনী' প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, 'বনফুল' সোমেন্দ্রনাথ ও 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' সারদাপ্রসন্ন -কর্তৃক প্রকাশিত।

১৮৮৪। প্রকৃতির প্রতিশোধ। ১০০০ কপি। ০-৮ আনা
নলিনী। ১০০০ কপি। ১-০০ টাকা
শৈশবসংগীত। ১০০০ কপি। ১-০০ টাকা
ভানুসিংহের পদাবলী। ১০০০ কপি। ০-৮ আনা

সম্ভবত ৩টি বই বাদ দিয়া অবশিষ্ট ১৩খানি বই গুরুদাসবাবুকে দেওয়া হইয়া থাকিবে। এই ১৩খানি বই আদি ব্রাহ্মসমাজ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৪ হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সমাজের ছাপাখানার মুদ্রণ-ব্যয় পরিশোধের জন্য বইগুলি বিক্রয় করিয়া থাকিবেন।

যদি ১৩খানি বই কবি দিয়া থাকেন তবে তাহার পুরাপুরি মূল্য ছিল ৮৪২৫ টাকা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ সিকি মূল্যের কিছু বেশি পাইয়াছিলেন; তবে অপর ৩টি বই ধরিলে মোট মূল্য বেশি হইত। তবে এই সময়ের মধ্যে বিক্রয়ও কিছু হইয়াছিল।

পৃ ৩২৬। St. John of the Cross. সেন্ট জন্ অব্ দি ক্রস (St. Jean de le Croix—১৫৪২-১৫৮১)। ইনি সাধ্বী থেরেসার (Teresa, Theresa, ১৫১৫-১৫৮২) শিষ্য। থেরেসা কারমালাইট সাধিকা আশ্রম (nunnery) পুনর্গঠন-কালে সেন্ট জনের সহায়তা লাভ করেন। ক্রুজেড্ যুগে ফিলিস্থানের (Palestine) কারমেন পর্বতের উপর এই আশ্রম প্রথম স্থাপিত হয়। পরে তুর্কী মুসলমানদের অভ্যুদয়ে উহা সেখান হইতে বিলুপ্ত হয়। ১৫৬২ অব্দে পোপের অনুমতি লইয়া থেরেসা কারমালাইট-সম্প্রদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই কার্যে সেন্ট জন অব্ দি ক্রসের আধ্যাত্মিকতা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পৃ ৩৩২। রবার্ট ব্রিজেসের প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কালের পরিবর্তনে রবীন্দ্রনাথ দেখিতেছেন যে, ইংলন্ডে তাঁহার কাব্যের সমাদর বিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ৬ মে ১৯৪১ সালে রামানন্দ বাবুকে লিখিতেছেন:

"সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সম্মান— আমি তার স্থায়িত্বকে বিশ্বাস করি না। ইংলণ্ডে আমার রচনার ভাষা তাদের পরিচিত ভাষা। এইজন্য তার সমাদর প্রথম বিস্ময়ের পর ক্রমেই অনুজ্জ্বল হবার কথা। সেখানে সাহিত্যের ভাষা মূলতই তলিয়ে যাচ্ছে। আমার হাতের ইংরেজি ক্ষণকালের জন্য যতই বিস্ময়কর হোক চিরকালের বন্ধনে তার নোঙর আঁকড়ে থাকতে পারবে না, সে আমার জানা কথা। সেইজন্য এই সদ্য-পাওয়া সম্মান নিয়ে গর্ব করতে আমার লজ্জা করে।.. আমি যে তাঁদের সাহিত্যিক মণ্ডলের মধ্যে স্থান নিতে পারি তা আমি কল্পনাও করি নি, প্রত্যাশাও করি নি। সুতরাং এ ব্যাপারটা সবশুদ্ধ একটা দৈবাগত অপঘাত বললেই হয়।"—প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ২৭৫।

ছত্র ১১। ৪ এপ্রিল ১৯১৫ হইবে।

পৃ ৩৩৭। পাঠসঞ্চয় (১৯১৯) গ্রন্থে 'আমেরিকার একটি বিদ্যালয়' প্রবন্ধ (পৃ ৭৫-৮১)। মিস্ মার্থা বেরি (Berry, ১৮৬৬-১৯৪২) জর্জিয়া স্টেটে ১৯০২ সালে একটি স্কুল স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটিতে লেখেন, "এক্ষণে ছয় বৎসর হইয়া গেছে।" সুতরাং ১৯০৮-০৯ অব্দে লিখিত। বর্তমানে বেরির স্কুল বিরাট প্রতিষ্ঠান। ৫টি মাত্র ছাত্র লইয়া অতি দীনভাবে মিস্ বেরি স্কুল আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ কোনো আমেরিকান সাময়িক পত্রিকা হইতে এই স্কুল সম্বন্ধে তথ্যগুলি জানিতে পারেন। দ্র Tracy Byers-লিখিত *Martha Berry, the Sunday Lady of Possorm Trot*, 1932।

পৃ ৩৩৮। আমেরিকায়। ১০ পৌষ ১৩১৯। ২৪ ডিসেম্বর ১৯১২। "আজ খৃষ্টমাস। এই মাত্র ভোরের বেলা

আমরা আমাদের খৃষ্টোৎসব সমাধা করে উঠেছি। রথী, বৌমা শিকাগোতে গেছেন— কেবল বঙ্কিম সোমেন্দ্র এবং আমি এইখানে আছি। আমরা তিনজনে আমাদের শোবার ঘরের একটি কোণে বসে আমাদের উৎসব করলুম— কিছু অভাব বোধ হল না— উৎসবের যিনি দেবতা তিনি যদি আসন গ্রহণ করেন তা হলে কোনো আয়োজনের ত্রুটি চোখে পড়েই না। তাঁকে আজ প্রণাম করেছি তাঁর আশীর্বাদ আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা একান্তমনে প্রার্থনা করেছি যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।"—হেমলতা দেবীকে লিখিত পত্র।

আমেরিকার আর্বানা হইতে শিকাগোতে "Soon after New Year's Day (1913) Mr. Tagore arrived with his son and exquisite little daughter-in-law, and during the winter the visit was repeated three or four times"। দ্র Harriet Monroe, Tagore in Chicago, *The Golden Book of Tagore*, p. 169।

পৃ ৩৪০। শ্রীমতী মুডির মৃত্যুর পর তাঁহার পত্রাদি রবীন্দ্রসদনে আসিয়াছে। এই সংগ্রহে বহু পত্র, টেলিগ্রাম প্রভৃতি আছে।

ওকাকুরা (Okakura)। ১৯১৩ ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ বস্টনে আসেন; সেই সময়ে ওকাকুরা বস্টন মিউজিয়ামের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ। কবি জাপানে প্রদত্ত বক্তৃতায় (১৫ মে ১৯২৯) ওকাকুরা সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ দান করিয়া বলেন:

"Then I had the privilege of meeting him once again in America in Boston, . . and I found what profound admiration he inspired among those cultured Americans of Boston who came into contact with him. On this occasion of our last meeting he was almost mortally ill and intending to come back to his native soil. He asked me to visit China, . . He expressed very profound respect for China, . . According to him, China was a great country with endless possibilities; . . it was his wish that I should know and acknowledge this; and that was another good help which he rendered me. It at once strengthened my interest for that ancient land, my faith in her [China] future, because I could trust him when he expressed his admiration for those people, who are to-day [1929] living in comparative obscurity, whose lamps of culture are not completely lit up, but who were according to him, waiting for another opportunity to have the fullness of illumination, shedding fresh glory upon the history of Asia. When I first met him [1902], I neither knew Japan nor I had any experience of China, I came to know both of these countries from the personal relationship with this great man, whom I had the good fortune to meet and accept as one of my intimate friends."— From Address delivered on the 15th of May, 1929 at the Kogya Kurbu (Industrial Club), Tokyo, *Visva-Bharati News*, Vol I, February 1933, p 73.

পৃ ৩৫২। নূতন পরিচ্ছেদ—'পুরস্কার ও প্রতিক্রিয়া' হওয়া উচিত ছিল।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ইতিহাস। দ্র সাহিত্য আকাদমি হইতে প্রকাশিত শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থের Tagore and the Nobel Prize প্রবন্ধ (পৃ ২০৩-০৬)।—লেখক Anders Osterling। তিনি বলেন

E. Teyner নামে পণ্ডিত বাংলা জানিতেন। তিনি আরও জানাইতেছেন যে, সাহিত্যিক Heidenstam কবির নিকট হইতে গীতাঞ্জলি (ইংরাজি) উপহার পান ও একটি সুইডিশ তর্জমা (rather inadequate rendering) পড়িয়া মুগ্ধ হন। ইনি সুইডিশ আকাদমির সভায় জোর দিয়া বলেন, "If ever a poet may be said to pass the qualities that make him entitled to Nobel Prize, it is he…"।

পৃ ৩৭১। শান্তিনিকেতন হইতে ফাল্গুনের প্রথম ভাগে কবি কলিকাতায় আসেন; এই সময় রামমোহন লাইব্রেরিতে ছোটো একটি সভা হয়। উদ্যোক্তারা ঘরোয়াভাবে সভাটি করিতে চান, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেলে সভায় অসম্ভব লোকসমাগম হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি হইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সভায় আসিয়াছিলেন। শী ্া দেবী লিখিতেছেন, "বক্তৃতা না হইয়া কথোপকথন হয়, ইহাই ছিল কবির ইচ্ছা, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকিলে কথা বাসতে কেহই রাজী হইত না, সুতরাং ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বক্তৃতাই হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে তিনি তাঁহার ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখার ইতিহাস খানিকটা দিলেন। তাহার পর ২৩ নভেম্বর [১৯১৩। ৭ অগ্রহায়ণ ১৩২০] শান্তিনিকেতনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন।. . সভাপতি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়া রবীন্দ্রনাথের মাথায় হাত দিয়া উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদ করিলেন।"—পুণ্যস্মৃতি, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৮, পৃ ৬৭৩।

পৃ ৩৭১। পাদটীকা ৪। কবির উত্তর মানসী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২১ সালে, প্রকাশিত হয়।

পৃ ৩২৫-২৬। প্রথম দিন সভায় কবি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য দেশবাসীর আনন্দ জ্ঞাপনের উত্তরে কিছু বলেন। দ্বিতীয় দিন অক্ষয় মৈত্রেয়ের অনুরোধে সাহিত্য সম্মেলনের সার্থকতা সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন।—নলিনী-কান্ত ভট্টশালী, "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ", শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ৮৪০-৪২।

৩৭২। সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় হাসপাতালে। চতুর্থ ছত্র 'তোতাবাবু' নহে, 'তাতাবাবু'। 'ডাঃ মেনডি' নহে, 'ডাঃ মেনার্ড'।

পৃ ৩৭৯। রামগড়ে বাড়ি ক্রয়। বাড়ির নাম দেন 'হৈমন্তী'। সবুজপত্রে প্রকাশিত 'হৈমন্তী' গল্প এখানে লেখা। রামগড়ে "আসার পর গুরুদেবের ডাক্তার বলে খ্যাতি পাহাড়ীদের গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের বাগানে একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগী প্রায়ই ভিক্ষে করতে আসত। বেচারার কষ্ট দেখে তিনি ওষুধ দিতে লাগলেন। এই রুগীটির জন্য তাঁর কত করুণাই দেখেছি। ক্রমে ক্রমে হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তাকে সুস্থ করে তোলেন। সেই থেকে তাঁর ডাক্তারি সম্বন্ধে পাহাড়ীদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে গেল। গোমস্তা টীকারাম রোজ তাঁর কাছে রুগীদের ওষুধ নিয়ে যেত।"—প্রতিমা দেবী, স্মৃতিচিত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২, পৃ ৫২। কবির নামের পূর্বে Dr. (Doctor) লেখা থাকায় শুনিয়াছি স্থানীয় পোস্টমাস্টারের নিকট হইতে তাঁহার ডাক্তার-খ্যাতি চারি দিকে রটনা হয়।

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য 'ভারতীয় ব্যাধি' গ্রন্থের ভূমিকায় কবির সাঁওতালদের চিকিৎসার কথা লিখিয়াছিলেন। কবির চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি একবার গান শিখিবার জন্য শান্তিনিকেতনে মাস দুই বাস করেন। কবির তিরোধানের পর তিনি লেখেন, "তাঁর ঘরে দেখলাম হোমিওপ্যাথির কয়েকটা মোটা মোটা বই আছে। প্রত্যহ সকালে দেখতে পেতাম, অনেক রোগী তাঁর দরজায় এসে জড়ো হয় ওষুধ নিতে। একদিন দেখলাম, আশ্রমে একটি ছেলের ইরিসিপেলাস হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ওষুধ দিচ্ছেন। ব্যাপারটা নিতান্ত সামান্য হয় নি, কিন্তু কয়েকদিন বাদে দেখলাম ছেলেটি সেরেই গেল। [এই ছাত্রটি রবীন্দ্রজীবনী লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুহৃৎকুমার]। আশ্রমের লোকেরা বললে, উনি চমৎকার ওষুধ দিতে পারেন, তাতেই তাদের অনেক রোগ

সেরে যায়, অন্য ডাক্তার দেখাবার প্রায়ই দরকার হয় না।"—চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ, শনিবারের চিঠি, ১৩৪৮, পৃ ৮৫৭-৫৮।

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আগ্রহে ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য 'ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা' নামে গ্রন্থখানি লেখেন; কবি গ্রন্থের নাম দেন এবং পাণ্ডুলিপি দেখিয়াই মস্ত বড়ো এক ভূমিকা লিখিয়া ডাক্তারকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তাগিদে বই ছাপা হয়। বইখানি বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ; যাঁহারা সে বই পড়িয়াছেন তাঁহারাই ইহা স্বীকার করিবেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দেন তাহা লেখকের প্রাপ্য সম্মান। কবি ভূমিকায় লেখেন, "ডাক্তারি বইয়ের ভূমিকা কবির চেয়ে কবিরাজকে মানায় ভালো। এ কাজে আমার যদি সত্যকার কোনো তাগিদ থাকে তবে সে রোগীর তরফ থেকে। কিছু কাল থেকে গ্রামের কাজে নিযুক্ত আছি, দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের।.. বিবিধ উপায়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে এ দেশের লোককে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কী করে রোগ ঠেকানো যায়।.. রাশিয়াতে এই প্রচারকার্য কিরকম সম্যক ভাবে ব্যাপক ভাবে সমস্ত দেশ জুড়ে চলছে তা দেখে এসেছি। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন সেখানকার চেয়ে অনেক বেশি, অথচ আয়োজন নেই বললেই হয়।..

"রোগের পরিচয়ে শরীরের পরিচয় পাওয়া যায়। শরীরী মানুষ এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না।.. এ দেশে রোগ যত সুলভ ডাক্তার তত সুলভ নয়।

"গ্রামে যদি কোথাও এক-আধজন জনহিতৈষী শিক্ষিত লোক থাকেন তাঁরাও এইরকম বইয়ের সাহায্যে উপস্থিত অনেক উপকার করতে পারবেন, আর আমার মতো সাহিত্য-ডাক্তার যাকে দায়ে পড়ে হঠাৎ ভিষক্-ডাক্তার হতে হয় তার তো কথাই নেই।.. যাদের সাধ্যগোচরে কোথাও কোনো চিকিৎসার উপায় নেই তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধরে পড়ে, তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে পারি এত বড়ো নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই। এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারি নে যে পুরো-চিকিৎসক নই বলে কোনো চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা-চিকিৎসকদেরকেও যমের সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাটি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।.. ডাক্তার পশুপতিকে আশীর্বাদ করে আমি মাঝে মাঝে এই বইখানি পড়ব এবং সেই পড়া নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।"

পৃ ৩৮৯। 'ছবি' কবিতা। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 'কবিকথা'য় লিখিতেছেন, "১৩২১ সালে কার্তিক মাসে কবি কিছুদিন তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলির বাড়িতে (এলাহাবাদে) ছিলেন। কবির কাছে শুনেছি এই বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, কবির নতুন বৌঠানের একখানা পুরানো ফটো তাঁর চোখে পড়ে, আর এই ছবি দেখেই বলাকার 'ছবি' নামে কবিতাটি লেখেন।"—বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০। পৃ ১৪৭-৪৮

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিতেছেন, "প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে কোনো স্মৃতিচিহ্ন আঁকড়িয়ে ধরে থাকা কবি পছন্দ করতেন না।" মহর্ষিও এ বিষয়ে কঠিন মত পোষণ করিতেন। সদর স্ট্রীটের বাড়িতে মহর্ষির একবার অসুখ হয়; বাঁচিবেন বলিয়া ভরসা ছিল না। এই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠান ও বলেন, "আমি তোমাকে ডেকেছি, আমার একটা বিশেষ কথা তোমাকে বলবার আছে। শান্তিনিকেতনে আমার কোনো ছবি বা মূর্তি বা ঐরকম কিছু থাকে আমার তা ইচ্ছা নয়। তুমি নিজে রাখবে না। আর কাউকে রাখতেও দেবে না। আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি এর যেন অন্যথা না হয়।" এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া কবি প্রশান্তচন্দ্রকে বলেন, "বুঝলুম মৃত্যুর পরে তাঁর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে পাছে কোনো রকম বাড়াবাড়ি কাণ্ড ঘটে এই আশঙ্কায় তাঁর মন উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। বাবামশায় জানতেন এ বিষয়ে আমার উপরে তিনি নির্ভর করতে পারেন। তাই সেদিন আর কাউকে না ডেকে আমাকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

শান্তিনিকেতন আশ্রমে মহর্ষির কোনো ছবি বা মূর্তি কখনো রাখা হয় নাই এবং রাখা নিষিদ্ধ। জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনতলায় যে ঘরে মহর্ষি দেহত্যাগ করেন, অনেকের ইচ্ছা ছিল সেই ঘর তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন দিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ-সব প্রস্তাবে কখনো রাজি হন নাই; তিনি ঐ ঘর অন্য-সব ঘরের মতোই ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কবির নিজের কাছেও কখনো কাহারও ছবি বা ফোটো রাখিতে দেখা যায় নাই। ছবি সম্বন্ধে যে কবির কোনো আপত্তি ছিল তাহা নহে; তাঁহার অসংখ্য ছবি তোলা হইয়াছে, নিজ ছবিতে যে-কেহ সহি চাহিয়াছে—দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কোনো আসক্তিও ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে দেখা যায় কবি যে-ঘরে থাকিতেন, বিশেষভাবে উদীচীতে, যেখানে প্রথম দিকে তাঁহার খাট চৌকি প্রভৃতি ছিল সেখানে, বাহির হইতে লোকে আসিয়া প্রণামাদি করে; বৈতালিকদল সেখানে গান করিয়া যায়। এই-সব দেখিয়া রথীন্দ্রনাথ চিন্তিত হইয়া পড়েন ও আমাদের পুরাতন কয়েকজনকে ডাকাইয়া পরামর্শ করেন। স্থির হইল যে, এই-সব ভাঙিয়া দিতে হইবে। তাহার পর রবীন্দ্রনাথের এই-সব মর্ত-চিহ্নাদি স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সে-সব সযত্নে রক্ষার আয়োজন হইয়াছে।

পৃ ৪০৭। ছত্র ১৮। "আয়ত্তের বাইরে। উহা শেষ হয় ৪ মার্চ।" স্থলে হইবে "নূতন বসন্ত নাটিকা বা বসন্ত রচনা। শেষ হয় ৪ মার্চ ১৯১৫।"

ঐ পৃষ্ঠার উপরে বাঁ দিকে "খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৪" স্থলে "খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৫" হইবে।

পৃ ৪৩৯। জমিদারিতে গ্রামোন্নয়নের চেষ্টা। "অতুলচন্দ্র সেনকে এই পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে কবি যে পত্র দেন" তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা—

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি 'স্বদেশী-সমাজ'-এর পরিশিষ্ট রূপে গ্রামের কাজের যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কথা আলোচিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে কালীমোহন ঘোষ প্রমুখ যুবকের দল প্রথম গ্রামোন্নয়ন-কর্মে ব্রতী হন। পুলিসের উপদ্রবে সে কাজ বন্ধ হয়। তার পর রথীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে কৃষিবিৎ হইয়া আসিলেন; শিলাইদহে তাঁহাদের কাজের সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সেখানে সে কাজ ব্যর্থ হয়। তার পর সুরুল কুঠি ক্রয় করিয়া বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে সেখানে লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, বিজলি বাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া রথীন্দ্রনাথকে গ্রাম-সংস্কারে ব্রতী করেন; কিন্তু সে ব্যবস্থাও বেশি দিন চলে নাই। অথচ কবির প্রাণ গ্রামের কাজের জন্য উৎসুক। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র 'হিতসাধন মণ্ডলী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িলেন— রবীন্দ্রনাথই তাঁহার প্রেরণা দান করেন। 'কর্মযজ্ঞ' ও 'পল্লীর উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে স্বদেশী সমাজের কথা পুনরায় আরও ব্যাপকভাবে বলিলেন। মণ্ডলীর কর্মপদ্ধতি কবি এইরূপ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন—

১. নিরক্ষরদিগকে অন্তত যৎসামান্য লেখাপড়া অঙ্ক শেখানো।
২. ছোটো ছোটো 'ক্লাস' ও পুস্তিকা-প্রচার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাশুশ্রূষাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান।
৩. ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, নানাবিধ অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ প্রভৃতির প্রতিষেধের জন্য সমবেত চেষ্টা।
৪. শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বন।
৫. গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা।
৬. গ্রামে গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোকদিগকে ইহার উপকারিতা প্রদর্শন।
৭. দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক প্রভৃতির সময় দুঃস্থদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে নবযুবকদিগকে গ্রামের দিকে ফিরিতে বলিলেন। পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; দেশের স্বাধীনতা কিভাবে আনা যায় সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দল ও দলপতিরা নানাভাবে চিন্তা করিতেছেন। তবে সকলেরই অন্তরের ইচ্ছা গণসংযোগ— অর্থাৎ দেশের লোকের মনকে জাগাইবার জন্ত উপায় উদ্‌ভাবন। এ কথা অতি সত্য, গ্রামের লোক কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না, বাহিরের লোককেও তাহারা সন্দেহের চক্ষে দেখে। শহরের লোক হইতে গ্রামের লোক সরল-সোজা— এ কথা ভাবিবার কোনো কারণ নাই। গ্রামের মধ্যে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য অতুল সেন প্রমুখ কয়েকজন যুবক কবির কাছে আসেন; কবি সানন্দে তাহাদিগকে তাঁহার জমিদারিতে 'কাজ' করিবার সকল প্রকার সুযোগ দান করিলেন; অতুল সেনকে লিখিত পত্রগুলি পাঠ করিলে সেইটি স্পষ্ট হইবে। এ সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বর বসুকে লিখিত পত্র হয়তো তাঁহার পুত্রদের নিকট সাহেবগঞ্জে থাকিতে পারে। উপেন্দ্র ভদ্র, বিদ্যুৎলতা দত্তের নিকটও হয়তো পত্র পাওয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গের কালিগ্রাম পরগনার জমিদার। এইখানে অতুল সেন প্রধান কর্মীরূপে আসিলেন; তাঁর সহকারী উপেন্দ্র ভদ্র ও বিশ্বেশ্বর বসু। উপেন্দ্র ভদ্র যৌবনের আরম্ভে পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন বলিয়া আমরা জানিতাম; কবিকেও আধুনিক বই পড়িবার জন্য পাঠাইতেন। ইনি কুমিল্লার অখিলচন্দ্র দত্তের আত্মীয়। বিশ্বেশ্বর বসুরা তিন ভাই শান্তিনিকেতনের ছাত্র। বিশ্বেশ্বর মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাস করিয়া সাহেবগঞ্জে তাঁহাদের বাড়িতে বসিয়া প্র্যাকটিস করিতেন; তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কালিগ্রামের কর্মকেন্দ্রে অতুল সেন তাঁহার কর্মীসংঘ লইয়া উপস্থিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট কাজের পাঁচটি অঙ্গ ছিল: ১. চিকিৎসা-বিধান ২. প্রাথমিক শিক্ষা -বিধান ৩. পূর্তকার্য বা কূপ-খনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামতি, জঙ্গল-সাফ বা বনোচ্ছেদ ৪. ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষার ব্যবস্থা ৫. সালিশী-বিচারে বিবাদের নিষ্পত্তি।

চিকিৎসাদির কার্য আরম্ভ হয় তিনটি কেন্দ্রে— পতিসর, কামতা ও রাতোয়াল। তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া বিনা মূল্যে ঔষধ-বিতরণের ব্যবস্থা হয়; হাসপাতালে ডাক্তার নিযুক্ত হয় এবং দুই-একটি রোগীকে রাখিবার ব্যবস্থাও করা হয়। জমিদার হিসাবে খাজনার টাকা-পিছু এক আনা রবীন্দ্রনাথ দিতেন, প্রজারা দিত এক আনা। আর-এক উপায়ে অর্থ সংগৃহীত হইত; গ্রামে পঞ্চায়েতের সমাজ-শাসনে অনেক সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মোটা রকমের খেসারত দিতে হইত; সে টাকা 'জাতে'র লোকে পানাহারে শেষ করিত। কবি ব্যবস্থা দিলেন যে ভবিষ্যতে ঐ জরিমানার টাকা সাধারণ তহবিলে আসিবে। "দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ আরম্ভ হয়। রাত্রির [নাইট্ স্কুল] এবং দিনের উভয়বিধ বিদ্যালয়েরই বন্দোবস্ত হয়; শিশু এবং বয়োবৃদ্ধ সকলেরই জন্য ব্যবস্থা করা হয়। নিরক্ষরতা দূর করার কাজ শেষ হইলেই পড়া, লেখা ও পাটীগণিত [3-R] শিক্ষার কাজে হাত দেওয়া হইত। এই শিক্ষা কিছু অগ্রসর হইলেই বক্তৃতা দ্বারা ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির পাঠ দেওয়া চলিত। প্রধান লক্ষ্য থাকিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল, আনুষঙ্গিক ভাবে পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোলও তাহাদিগকে শেখানো হইত। ইহার সঙ্গে মুখে মুখে আকস্মিক বিপদে প্রাথমিক সাহায্য (First Aid), কৃষিকর্মের সুবন্দোবস্ত, অগ্নি-নির্বাপণ, বন্যার সময় কর্তব্য, ইত্যাদি সম্পর্কেও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। অবসর সময়ে পৃথিবীর খবরাখবর শোনানো ব্যবস্থা ছিল।"

তৃতীয় উদ্দেশ্য পূর্তকার্য। কিন্তু পুকুর খনন, রাস্তা তৈয়ারি বা মেরামত প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য কার্য। দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে চাঁদা পাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য অতুলবাবু অর্থের বিনিময়ে 'শ্রম' দান বা জন খাটার ব্যবস্থা

করেন। এইরূপে সাত আট মাসের মধ্যে কালিগ্রাম পরগনায় বহু সহস্র টাকার কাজ সম্ভব হইয়াছিল। প্রজাদের সমবেত চেষ্টায় কাজ ইতিপূর্বে বাংলাদেশে কোথাও হইয়াছিল বলিয়া জানা নাই।

"চতুর্থ উদ্দেশ্য— ঋণদায় হইতে বিপন্ন প্রজাদের রক্ষা; ইহাও কালিগ্রামে সম্ভব হইয়াছিল। ইহার স্কীমটি.. রবীন্দ্রনাথের। অথচ বাংলাদেশে একটা জনশ্রুতি আছে, রবীন্দ্রনাথ অতিশয় অত্যাচারী জবরদস্ত জমিদার ছিলেন, ঋণের দায়ে প্রজার ফসল পর্যন্ত গায়ের জোরে ঘরে তুলিতেন।.. এই মিথ্যা অপবাদ রটিবার একটা হেতু ছিল। তাহাই বলিতেছি। প্রজারা স্বভাবতই নিঃস্ব; এক বৎসরের ফসলে পর-বৎসর পর্যন্ত তাহাদের চলে না; কারণ মাঝখানে কাবুলী অথবা কাবুলী-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন মহাজন বসিয়া থাকে। শুধু সুদের দায়ে ফসল যায়, ঋণ যেমনকার তেমনিই রহিয়া যায়। চাষী প্রজা বৎসরের কয়েক মাসই প্রায় অনশনে কাটায়। ইহার প্রতিকারার্থে রবীন্দ্রনাথ এক উপায় উদ্‌ভাবন করেন। এস্টেট হইতে প্রজাদিগকে ি f প্রয়োজন মাফিক শতকরা নয় টাকা হারে ঋণ দেওয়া হইতে লাগিল। প্রয়োজন মাফিক এইজন্য যে, অনেক সময় তাহারা বুঝিতে না পারিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ লইয়া বিলাসে তাহা ব্যয় করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়ে।.. অতুল সেনের কর্মীসংঘ হিসাব করিয়া এই প্রয়োজন নির্ধারণ করিতে লাগিলেন।.. ঋণ লইয়া চাষী চাষ করিল। ফসল কিন্তু তাহার ঘরে উঠিল না, ঋণ শোধ বাবদ এস্টেট্ তাহা গ্রহণ করিল; এই সময়ে শতকরা তিন টাকা সুদ সর্বক্ষেত্রেই মাফ করা হইত, অর্থাৎ প্রজাকে শতকরা ছয় টাকা সুদ দিতে হইত। ফসলের দাম হিসাব করিয়া ঋণ শোধ করিয়া যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকিত, প্রজা তাহা ঘরে লইয়া যাইতে পারিত। যদি টান পড়িত, তাহা হইলে তাহা প্রায়ই মাফ করা হইত। ইহার পর ঋণমুক্ত প্রজা পুনরায় প্রয়োজনমত ঋণ লইবার অধিকারী থাকিত।.. এই ব্যবস্থার ফলে কালিগ্রাম পরগনার প্রজারা বহুদিনের দুঃসহ ঋণের বোঝা হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি পাইতেছিল। রবীন্দ্রনাথের যে অপবাদ রটিয়াছিল তাহা জমিদারের বাড়িতে ওই ফসল উঠানো লইয়া।

"পঞ্চম উদ্দেশ্য— সালিশী দ্বারা কলহের নিষ্পত্তি। এইরূপ সালিশীর ব্যবস্থা ঠাকুর এস্টেটে অল্পবিস্তর পূর্ব হইতেই ছিল। এবারে এই কার্যের ভার অতুলবাবু গ্রহণ করিলেন। প্রজাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্যাপারটা তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করা হইত। তিনি বিচারবুদ্ধিমত সুরাহা করিয়া দিতেন।. এই স্কীম যতদিন চলিয়াছিল, ততদিন এবং তাহার পরেও অনেক বৎসর এই পরগনা হইতে একটি মামলাও শহরে যাইতে পারে নাই। ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী কাগজপত্র হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে।

"রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বপ্নই দেখেন নাই, সুবৃহৎ পরিসরে তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন— এই সংবাদ নানা কারণে তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।.. অজ্ঞাত থাকার.. কারণ, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বৎসরাধিক কালের মধ্যে নেতা অতুল সেন সহ তাঁহারা সকলেই রাজরোষে পতিত হইয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য.. অন্তরায়িত ও নজরবন্দী হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই কর্মযোগের দিকটা দেশের লোকের কাছে প্রচারের সুযোগ পান নাই।" —"রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ", শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮। পুনশ্চ দ্র, রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: "পল্লীর উন্নতি, পিতৃস্মৃতি"।

পৃ ৪৫৩। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি যখন জাপান যান তখন সেখানে একটি ছবির প্রদর্শনী হয়। ভারত হইতে অনেক শিল্পীর ছবি কবি লইয়া যান। ইহার Catalogue ছাপা হইয়াছিল; কলাভবনে সেইটি আছে। [সংবাদ সরবরাহ করেন বিশ্বরূপ বসু (২৪-৫-১৯৫১)]

পৃ ৪৭১। তারক পালিতের ঋণশোধ।

দ্র Second Trust Deed executed by Sir Taraknath Palit. Schedule C. Mortgages. Securities: All that piece or parcel of rent-free land together with the two several messuage tenements or dwelling house known as the premises No. 6-3 Dwarkanath Tagore's Lane in Calcutta and more particularly described in the schedule to the said indenture and delineated in the plan annexed thereto.

VI. Bengali mortgage deed between T. Palit of the one part and .. on the other part dated 10th day of May 1910 (27 Baisak, 1817 BE) registered etc.

Principal sum now due under the above deeds, Rs. 40,000. Interest due up to end of September, 1912—nil. দ্র Calcutta University Calendar, 1934, p. 169.

পৃ ৪৬৯। আমেরিকার 'গদর' মামলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে জড়িত করার কথা কবি জানতে পারেন শান্তিনিকেতনে ফিরে। তখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সন্‌কে একটি কেবল্ ও পরে পত্র লিখে প্রতিবাদ জানান।

উইল্‌সনের প্রতি কবির খুব একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল; তাই তাঁর 'ন্যাশন্যালিজ্‌ম্' বইটি তাঁকে উৎসর্গ করবেন, এমন কথা ভেবেছিলেন। মার্কিনী ম্যাকমিলান্ কোম্পানির অধ্যক্ষ এ বিষয়ে উৎসাহিত হন; কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আপিসের জনৈক বড়ো কর্মচারী এ বিষয়ে আপত্তি তোলেন এবং বলেন, সরকার থেকে অনুমতি পাওয়া যায় নি। এই-সব তথ্য অধ্যাপক স্টীফেন হে (Hay) তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা' প্রবন্ধে দিয়েছেন। দ্র দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৩৬৯। এই প্রবন্ধে আমেরিকা সফর সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে। আরও দ্রষ্টব্য—J. L. Dees, *Tagore and America*, U.S.I.S., 1961।

পৃ ৪৭৫। "Three weeks later, on December 12, on the occasion of Tagore's farewell recital in New York before his swing back to the West, there was a complete sell-out of all seats and standing-room, and '*The Newyork Times*' reported that a person had to be turned away although "many people stood in the lobby in the futile hope of eventually getting in."—J. L. Dees, *Tagore and America*, p. 15।

পৃ ৪৮৮। Stürm und drang হবে।

পৃ ৪৯২। 'ভাষার কথা'। কথিত ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত, ১৯০৮ [৬ ডিসেম্বর], ২১ অগ্রহায়ণ [১৩১৫]। কলিকাতা হইতে গিরিডিনিবাসী হিমাংশুপ্রকাশ রায়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "নিতান্ত কথিত ভাষায় লিখিবেন না—তাহার আর কোনো কারণ নাই, কেবল কথিত ভাষা বাংলাদেশের সকল জেলার ভাষা হইতেই পারে না ইহাই ইহার কারণ। তাই বলিয়া উগ্র বইয়ের ভাষা হইলেও চলিবে না, যাহাতে কথিত ভাষার রসটুকু থাকে অথচ পুঁথির ভাষার সম্ভ্রমটুকু রক্ষা হয় এমন হওয়া চাই।"—রবীন্দ্রসদন, পাণ্ডুলিপির কপি হইতে গৃহীত।

'পয়লা নম্বর' গল্পের পূর্বে 'স্ত্রীর পত্র' কথ্য ভাষায় লেখা; যদিও 'স্ত্রীর পত্র' লিখিবার পর কয়েকটিই সাধু ক্রিয়াপদী ভাষায় লিখিয়াছিলেন। 'স্ত্রীর পত্র' চিঠি বলিয়াই বোধ হয় কথ্য-ক্রিয়াপদী করিয়া লিখিয়াছিলেন, যেমন কবির অধিকাংশ চিঠিপত্রর ভাষা।

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

পৃ ১১। ৫৯তম জন্মোৎসব স্থলে ৫৮তম হইবে।

পৃ ৩৫। ফেব্রুয়ারি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কবি কিছুদিন সুরুলকুঠিতে বাস করেন। ১৪ ফাল্গুন ১৩২৬ তারিখের দুখানি পত্র পাই; একখানি চিঠিপত্র ৫ম (৮৫), প্রমথ চৌধুরীকে লেখা (পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন); অপর পত্রখানি কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিমন্ত্রণের জবাব, 'সুরুল/বোলপুর' ঠিকানা প্রদত্ত। পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে রবিতর্পণে (রানাঘাট রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসব, ১৩৬৮)।

পৃ ৩৬। উত্তরায়ণের পর্ণকুটীর। 'রথীন্দ্রনাথ এই অট্টালিকা বিশ্বভারতীকে দান করিয়া দিয়াছেন' বলিয়া যে সংবাদ এখানে লিখিত হইয়াছে তাহা যথার্থ নয়। বস্তুত, এই বাড়ি ও জমি বিশ্বভারতীর জন্য ক্রয় করা হইয়াছে। 'উত্তরায়ণ' রবীন্দ্র-মিউজিয়াম হইবে বলিয়া ঠিক হয়। বর্তমানে উহা কবির শেষ বাসগৃহ রূপে রক্ষিত হইতেছে। এই স্থানে নবনির্মিত বিচিত্রা-গৃহে মিউজিয়াম হইয়াছে ৭ মে ১৯৬১।

পৃ ৪০। গুজরাট-ভ্রমণ (মার্চ-এপ্রিল ১৯২০)। গুজরাটের সহিত ঠাকুর-পরিবারের সম্বন্ধ অনেকদিনকার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আহমদাবাদ প্রার্থনাসমাজে উপাসনা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আহমদাবাদে দীর্ঘকাল জজিয়তি করেন। সেই সময়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথ এখানে কয়েক মাস কাটান।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে বহু গুজরাটী ছাত্র কলিকাতা ও ঝরিয়া-ধানবাদ অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাদির অনুবাদ গুজরাটী ভাষায় হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব হইতে গুজরাটীরা বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়— নারায়ণ হেমচন্দ্র এ বিষয়ে ছিলেন অগ্রণী। তবে রবীন্দ্রনাথের জগৎ-খ্যাতি হইবার পর এই তাঁহার প্রথম গুজরাট সফর। রবীন্দ্রনাথ ও বোম্বাই-গুজরাট-কাথিবাড় সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠু আলোচনা হইবার বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে। বিশ্বভারতীর পূর্বযুগে এই অঞ্চলের গুজরাটী-ভাষীদের নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহা আর কোনো-একটি প্রদেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে কি না সন্দেহ। আহমদাবাদ, বরোদা, কাথিবাড় ও বোম্বাই মুক্তহস্তে কবিকে দান করিয়াছিল।

পৃ ৪১। গুজরাট ভ্রমণ করিয়া কবি বোম্বাই-এ ফেরেন ১৩ এপ্রিল ১৯২০। জালিনবালা দিবসের জন্য তাঁহার ভাষণ লিখিয়া দেন। ১৭ই বরোদা যান। এই আট-নয় দিন কবি বোমানজি প্রভৃতির সাহায্যে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "এখান থেকে টাকা বোধ হয় মন্দ পাওয়া যাবে না।.. টাকা ত হাতে আসবে। সে টাকা খরচ করবে কে? সর্বাধ্যক্ষদের হাতে দিলে কি রকম ব্যাপার হবে বলা শক্ত।" বোমানজি কবিকে বিলাত যাইবার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, এমন-কি ২৯ মে যে জাহাজ ছিল তাহাতে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু কবি লিখিতেছেন, "শান্তিনিকেতন আজ সমস্ত ভারতের সামনে এসে পড়ল— এর মধ্যে কিছুই এমন রাখা চলবে না, যা কুনো; যাতে সমস্ত ভারতের মন পাওয়া যায় এমন একটি জিনিস গড়ে তুলতেই হবে।" কিন্তু কবি এ যাত্রা বিলাতে যাবেন কি যাবেন না সে সম্বন্ধে একটু দ্বিধা আছে। লিখিতেছেন, "অনেক জিনিস আরম্ভ করা হয়েছে.. আমরা চলে গেলে পাছে সব পিছিয়ে যায় এবং কাজ নষ্ট হয় এই ভাবনা।" বোমানজির ইচ্ছা কবি স্বয়ং এবং রথীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী সকলেই তাঁহার সঙ্গে বিলাতে যান। তাই কবি লিখিতেছেন, "আমি আর তুই দুই জনেই যদি একসঙ্গে অনুপস্থিত থাকি তা হলে খুবই অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা আছে।" বোমানজি বলেন এন্‌ড্রুজের উপর ভার দিয়া আসিতে; কিন্তু এন্‌ড্রুজের উপর তো নির্ভর করা চলিবে না। —চিঠিপত্র ২ [এপ্রিল ১৯২০], পৃ ৭০-৭৩।

কিন্তু সেই এন্‌ড্রুজের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা সকলে বিলাত চলিয়া গেলেন— এন্‌ড্রুজ সমস্ত ঝুঁকি মাথায় তুলিয়া লন।

পৃ ৪৯। কেদারনাথ দাশগুপ্ত। জন্মস্থান— ভাটিখাইন, চট্টগ্রাম জিলা। ভাটিখাইন বা ভট্টখণ্ড শ্রীমতী-নদীতীরস্থ গ্রাম। শ্রীমতী-নদীতীরস্থ সাতটি গ্রামকে চক্রশালা বলিত, ভট্টখণ্ড এই চক্রশালার অন্যতম বিশিষ্ট হিন্দুপ্রধান গ্রাম। ১৯ অক্টোবর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কেদারনাথের জন্ম হয়; পিতা হরচন্দ্র দাশগুপ্ত মুন্সেফ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কেদারনাথ কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসেন ও স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিযোগ করেন। বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে কেদারনাথ তাঁহার ভ্রাতাকে চট্টগ্রাম হইতে আনাইয়া 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী সামগ্রীর দোকান খোলেন। দেশের লোককে স্বদেশীভাবাপন্ন করিবার জন্য তিনি 'ভাণ্ডার' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা লইয়া রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন; রবীন্দ্রনাথ তখন নব-পর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকত্ব করিতেছেন; তৎসত্ত্বেও এই নূতন পত্রিকার সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিলেন।

অল্পকালের মধ্যে পুলিসের দৃষ্টি কেদারনাথের উপর পড়িল; তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কেদারনাথ ব্যারিস্টারি পাস করিলেন বটে, কিন্তু দেশে ফিরিলেন না। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার-কল্পে মন দিলেন; তাঁহার মতে 'a nation is known by its stage; a country is known by its literature'। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় Union of East and West নামে সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতিতে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা হয়। এ ছাড়া League of Neighbours (১৯১৮) ও Fellowship of Faiths (১৯২৪) নামে সভার তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ইহার পর এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মিলিত করিয়া নাম দেন The World Fellowship of Faiths (The Threefold Movement)। "The purpose of the Threefold Movement is the realisation of peace and brotherhood through understanding and neighbourliness. Its method is to unite people of all religions, races, countries and classes, by building bridges of appreciation across the chasm of prejudice." কেদারনাথ নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক ডক্টর উপাধিতে ভূষিত হন। ৬ ডিসেম্বর ১৯৪২ নিউইয়র্কে তাঁহার মৃত্যু হয়। [এই তথ্যগুলি কেদারনাথের খুল্লপৌত্র অজিতেশ্বর দাশগুপ্ত ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ তারিখের পত্রযোগে জানান]।

পৃ ৫০। ভালো য়ুরোপীয় সংগীত শুনিবার সুযোগ পাইলে রবীন্দ্রনাথ তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেন; D' Aranyi নামে এক হাঙ্গেরিয়ান মহিলা বেহালাবাদকের বাজনা শুনিয়াছিলেন; এই সংগীত তাঁহাকে খুবই মুগ্ধ করে। এই সময়ে লণ্ডনে Beggar's Opera-য়[১] যাওয়াটা ফ্যাশান হইয়া উঠিয়াছিল। শচীন সেন কবিকে ও

[১] Early in the 18th century "Paris had cultivated a popular type of play with music called vaudeville, in which the serious operas were often parodied and other popular songs of all kinds were introduced. On this model John Gay [1685-1732] produced The Beggar's Opera in London in 1728, an amusing comedy of low life, to some extents parodying the Handelian Italian opera and introducing a number of songs, some of them old play-house songs, others tunes popular at the moment, and the majority folk-songs of English Scottish and Irish origin. The attractiveness of the tunes and still more that of the principal actress made The Beggar's Opera an unexpected success, and it maintained its popularity throughout the century beside

থীন্দ্রনাথকে সেখানে লইয়া যান। অভিনয়াদি কবির মোটেই ভালো লাগে নাই; পিয়ার্সনকে লইয়া কিছুক্ষণ রে চলিয়া আসেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়াছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে ইংরেজি সব কিছুকেই জোর করিয়া চলন করিবার একটা চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন, "We could not nderstand why this obsolete vulgar thing of the most decadent period of English iterature should be suddenly revived and people go crazy over it."—*Visva-Bharati News*, ugust 1934, p. 14. (Diary of 7th August 1920).

রথীন্দ্রনাথ এই উন্মাদনার অতি সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন: "Only one explanation offers itself. After the war (1) there has been a great eff·it at a strong nationalist revival. The English feel humiliated that they should always have to go to hear foreign operas, oreign theatres, foreign music, etc. So they have brought forth this purely indigenous opera and to hide its shame they applaud in their loudest voices its great merits."

পৃ ৪৯। সিবিল থর্নডাইক। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী থর্নডাইক ও তাঁহার স্বামী ভারত-ভ্রমণে আসেন; সে সময়ে ভারতীয় থিয়েটরের আদর্শ কী তৎসম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে কবির হোটেলে থর্নডাইক দেখা করিতে যান; সে সময়ে ধর্ম ও নাটক সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়। অভিনেত্রী লিখিযাছেন, "It was an hour I shall never forget as long as I live, for he gave me a glimpse of the very things I had been striving to find and understand as a Christian through the eyes of a great mind of another race."—*The Golden Book of Tagore*, p. 253.

পৃ ৫৫। প্যারিসে। কবি ও রথীন্দ্রনাথ ৬ অগস্ট ১৯২০ প্যারিসে পৌছন; পরদিন (৭ই) Y.M.C A.-এর চ্যাটার্জি ইঁহাদের Faust অভিনয় দেখাইবার জন্য Grand Opera-য় লইয়া যান। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার ইংরেজি ডায়েরিতে লিখিতেছেন, "Father greatly enjoyed it. It was better than any of the operas we had seen in America or London."—*Visva-Bharati News*, August, 1934, p. 14.

গার্ডনারের ফরাসী তর্জমা। J. D. Anderson ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২০ কেম্‌ব্রিজ হইতে রবীন্দ্রনাথকে যে দীর্ঘ পত্র দেন তাহাতে আছে: "The other day a friend of mine in Strasbourg sent me a copy of the *Journal d' Alsace et de Lorraine* in which was the review of Mme. Henriette Miraband Thoren's translation of your '*Gardener*'. It was rather a pleasant and cheerful review." আনডারসন এই সমালোচনার একটা বাংলা অনুবাদ রামানন্দবাবুকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। সমালোচকের

being revived in later times."—*Chamber's Encyclopaedia*, Vol. X, p 210.

"The astonishing career of 'The Beggar's Opera' eclipses everything in the history of the English stage. That this prose farce, written...as a burlesque of the Italian opera,...should not only have won instant success with the witty dialogue and dainty lyrics · but that after its revival on June 5, 1920, it should have drawn all London for three and a half years to a suburban theatre, suggests that it is informed with some rare and individual charm."—*Practical Knowledge*, Vol. I, p. 118.

নাম Georges Bergner। প্রবাসীর কার্তিক ১৩২৭ সংখ্যায় 'ফরাসী রবীন্দ্র-প্রশস্তি' নামে লেখাটি প্রকাশিত হয়।

পৃ ৬৩। হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিল (২৫ জানুয়ারি ১৯২১)। এখানে একদিন বক্তৃতার পর কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ T. W. Richards (1868-1928) -এর নিকট হইতে যে পত্র পান ও কবি যে উত্তর প্রদান করেন তাহা নিয়ে মুদ্রিত হইল। রিচার্ডস্ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নবিদ্যার জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন— রবীন্দ্রনাথ পান ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। কবি ২৫ জানুয়ারি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে The Poet's Religion নামে ভাষণ পাঠ করেন (*Letters from Abroad*, p. 59)। এই সভায় রিচার্ডস ও তাঁহার কন্যা উপস্থিত ছিলেন। পত্রখানি বোধ হয় ২৬ জানুয়ারি লিখিত। অধ্যাপক কবিকে লিখিতেছেন:

"Although quite unknown to you I am taking the liberty of writing to you for two reasons.

"In the first place I wish to thank you for your beautiful and inspiring address of yesterday [25 January, 1921] afternoon. It gave me (and my daughter who was with me)—very real pleasure and we feel that it could not but have been inspiration to many others also.

"In the next place I venture to call your attention to the fact, concerning which you doubtless agree with me, that in Science also great joy and a certain kind of imagination and poetry is to be found in the fundamental generalisations and basic truths underlying the structureness of the Universe. These in their way seem to me no less beautiful than highest images of poetry or art, even if they are more impersonal; moreover, they combine with beauty the quality of oneness of which you spoke.

"You are doubtless familiar with Bertrand Russell's new book *Mysticism and Logic* [1918]. In two of its chapters, 'Science and Culture' and 'Mathematics', he gives expression to a part of his feeling. Not being a scientific man himself he does not fully appreciate the scientific side of nature, but nevertheless his sympathy is remarkable under the circumstances As regards the pure joy of mathematics, no one could go further than he.

"With assurances of high esteem sincerely . ."

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক রিচার্ডস্‌কে নিম্নলিখিত পত্র দেন:

Thank you for your kind letter of appreciation. I fully agree with you in what you say about the fundamental generalisation and basic truths underlying the structure of the universe. In their aspect of perfect unity, they not only give information to our mind, but touch our imagination which is pure joy. In a mere reasoning analysis and gathering of facts we seem to wander in a kind of No Man's Lands; in reaching truth we find our home, for unity of truth has the same quality as our own being."—*Visva-Bharati News*, August 1951 (from notes of Suhrit K. Mukherjee).

পৃ ৬৮। প্যাট্রিক গেডিস। রবীন্দ্রনাথ The Indian College of the University of Montpellier (France) প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-পদ গ্রহণ করেন। গেডিস লিখিয়াছেন (১৯৩১): "I have indeed high hope of our Indian College here— which you have honoured at its outset by your acceptance of its presidency, and which I trust you may be able some day to visit and thus re-inspire . ."—*The Golden Book of Tagore*, p. 84।

পৃ ৭৬। কাইসারলিঙ্ রবীন্দ্রনাথকে কী চক্ষে দেখিতেন তাহা *The Golden Book of Tagore* -এর জন্য তিনি যে প্রশস্তি প্রেরণ করেন তাহাতে স্পষ্ট হইয়াছে: "Rabindranath Tagore is the greatest man I have had the privilege to know. He is very much greater than his world reputation and above all his position in India imply. There has been no one like him anywhere on our globe for many and many centuries. That is, Rabindranath is the creator of a nation . . He is the most Universal, the most encompassing, the most complete human being I have known." (p. 127)।

পৃ ৯৯। ভারত গবর্নমেণ্ট অক্টোবর ১৯২১ হইতে অসহযোগ আন্দোলন দমনের জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। ১০ মার্চ ১৯২২ Young India -র চারিটি প্রবন্ধের জন্য গান্ধীজি ও শঙ্করলাল ব্যাংকারকে পুলিস আহমদাবাদে গ্রেপ্তার করিল। দায়রার বিচারে ১৮ মার্চ গান্ধীজির ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইল। গান্ধীজি এজলাসে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "সব জানিয়া-শুনিয়াই আমি আমার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি। মাদ্রাজ-বোম্বাই-চৌরীচৌরার অপরাধের জন্য আমাকে দায়ী করা হইয়াছে, সে দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিতেছি না। আজ যদি আমাকে মুক্তি দেওয়া হয় আমি আবার সেই আগুন লইয়া খেলা করিব। জনসাধারণ সর্বত্র সংযত হইয়া চলে নাই। তথাপি অহিংসাই যে আমার মূলমন্ত্র তাহাতেও কিছুমাত্র ভুল নাই।"—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ ১২৯-৩০।

পৃ ১০০। দেশে প্রত্যাবর্তন, জুলাই, ১৯২১। কবি যখন বিদেশে নানা সম্মানে ভূষিত হইতেছেন সেই সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবকগণ সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত করিবার জন্য আন্দোলন করেন। প্রবীণ ও প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মগণ রবীন্দ্রনাথের এই নির্বাচনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই লইয়া উক্ত সমাজের মধ্যে খুবই অশান্তি হয়। অবশেষে তরুণ-দেরই জয় হয়। এই সময়ে প্রশান্তচন্দ্র যুব-সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন; তিনি 'রবীন্দ্রনাথকে কেন চাই' এই শীর্ষক একটি পুস্তিকা (For private circulation only) মুদ্রিত করেন (৫২ পৃ)। গ্রন্থের শেষ দিকে তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বমানবকে লইয়া একটি বিরাট সার্বভৌমিকতার আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছেন। রবীন্দ্র-নাথের সার্বভৌমিকতা স্বাতন্ত্র্যকে পরিহার করে নাই, জাতীয়ত্বকে বর্জন করে নাই, বৈচিত্র্যকে বিসর্জন দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতার মূল মন্ত্র— বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। এই একমেবাদ্বিতীয়মের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত তপস্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

". . ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও আমরা এই এক মূল আদর্শ দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্মসাধনার এই সার্বভৌমিক আদর্শটিকে বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাই ব্রাহ্মসমাজের চরম সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী ব্রাহ্মসমাজেরই বাণী।

"রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের সাধনা সত্য হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন্ত আদর্শের

প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রেরণা আসিয়াছে, এইজন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই।" (পৃ ৫১)।

পৃ ১০০। বিশ্বভারতীর জন্য গৃহনির্মাণ। বর্তমানে সে স্থানে পাঠভবনের ছাত্রদের জন্য নূতন ব্যারাকগুলি নির্মিত হইয়াছে।

পৃ ১১৩। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য। ৯ পৌষ ১৩৩৯ বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষদে কবির ভাষণ হইতে: "তখন [১৩২৮] এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না যেখানে সর্বদেশের বিদ্যাকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। সব য়ুনিভার্সিটিতে শুধু পরীক্ষাপাসের জন্যই পাঠ্যবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বার্থসাধনের দীনতায় পীড়িত, বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের কোনো চেষ্টা নাই। তাই মনে হল এখানে মুক্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব যেখানে সর্ববিদ্যার মিলন-ক্ষেত্র হবে।"—*Visva-Bharati News*, January 1933, p. 62।

পৃ ১১৪। বিশ্বভারতী, ১৯২১। দশ বৎসর পূর্বে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামে যে পুস্তক লেখেন তাহার উপসংহারে শান্তিনিকেতনের ভাবীকালের কল্পনা করিয়া লিখিয়াছিলেন:

"একদিন এমন হইবে যে, এখানে দেশ-বিদেশের সকল জ্ঞানের বিষয় এই যজ্ঞক্ষেত্রে আহৃত হইবে— যাহা বিরুদ্ধ তাহা মিলিবে, যাহা বিচিত্র তাহা ঐক্যলাভ করিবে। সাহিত্য চিত্র সংগীত শিল্প এইখানে বিকাশ পাইবে, এবং বিশ্বকলার নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানে ব্যাখ্যাত হইবে। তত্ত্ববিদ্যায় যে সমন্বয়দৃষ্টি লাভের জন্য সকল জ্ঞানী এদেশে এবং বিদেশে ব্যস্ত— এইখানে সেই সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে-- এইখানে ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ— সকল সংশয়ের ছেদন হইবে। এইখানে বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞানের সত্যসকল উদ্ধার করিবেন, উদ্‌ভাবনীশক্তি এইখানে নূতন নূতন জিনিস উদ্‌ভাবন করিবেন। সেই মানসলোকের পরিপূর্ণ জ্ঞানতপস্যার সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে আজ দেখো। . . সর্বভূতে আপনাকে দেখা আশ্রমের আদর্শ— এখানে এমন পরিবার সকল আসিবে যাহারা সহযোগী হইয়া একান্নবর্তী হইয়া কাজ করিবে – যাহাদের প্রীতি ও মঙ্গলভাব সকলের প্রতি, পশুর প্রতি, পক্ষীর প্রতি, কীটপতঙ্গের প্রতি প্রসারিত হইবে— যাহারা স্বাধীন হইবে, যাহারা কোনো মিথ্যার হাতে ধরা দিবে না, কোনো কদাচারকে প্রশ্রয় দিবে না, যাহা সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যাহা নিত্য ও শাশ্বত ধর্ম তাহাই জীবনের প্রত্যেক কর্মে আচরণ করিবে।"

অজিতকুমার আরো বলিয়াছেন, "হোক কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র, গোমহিষশালা, আধুনিক যন্ত্রতন্ত্রের বিপুল আয়োজন— কখনোই তাহারই মধ্যে তাহাকে [আশ্রমকে] শেষ করিয়া দেখিতেই পারিব না— তাহাকে ছাড়াইয়া বলিব, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।"

পৃ ১২২। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে (১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই সময়ে রাশিয়া জারের বিরুদ্ধে বিপ্লবান্তে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত; খাদ্যাভাবে রোগে আত্মকলহে উদ্‌বেজিত। বাহির হইতে নানা দেশ নানা ভাবে সাহায্য করিতেছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Copus Professor of Jurisprudence) আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক পল ভিনোগ্রাডফ (Vinogradoff) ১৯ মে রবীন্দ্রনাথের নিকট পত্র লিখিয়া জানান যে, রাশিয়ার শিক্ষিত সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সহায়তা প্রয়োজন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক রীডার রূপে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া আসেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত সেই সময়ে তাঁহার দেখা হয়। অধ্যাপক লিখিয়াছেন, "When I met you in Calcutta eight years ago, I little thought that I should have to appeal to you on behalf of my unfortunate countrymen in Russia.

"The impression I carried away after our interview was that I had met one who was fitted to represent the great Indian nation that has struggled for centuries with all kinds of hardships— physical and moral. It is to such humanitarians and idealists that I appeal in order to bring to their notice a particularly grievous and pressing need —the need of the intellectual leaders, the brain-workers of Russia who are threatened with destruction."

প্রবাসী (আষাঢ় ১৩২৯) লিখিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এই কার্যে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়া তাহা সত্ত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফের চিঠির সারাংশ সমেত নিজের আবেদন ছাপাইয়াছেন— তাঁহার নিকট শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় যিনি যত অর্থ পাঠাইবেন তিনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।" দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ ৪৫৫।

পৃ ১২৪। কলিকাতায় ইংরেজ কবি শেলির (Shelley) শতবার্ষিক স্মরণোৎসবে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি (৮ জুলাই ১৯২২ ॥ ২৪ আষাঢ় ১৩২৯)। কবি মৌখিক ভাষণ দান করেন। কবি বলেন, "যাঁরা পৃথিবীতে কোনো একটা বড়ো সৃষ্টির কাজ করেছেন— তাঁরা কোনো বিশেষ দেশের অধিবাসী নন..তাঁরা সকল কালের লোক। তা যদি স্বীকার না করি তা হলে সমস্ত মনুষ্যসমাজের মধ্যে আমাদের যে স্থান আছে সেই স্থানকেই অস্বীকার করা হবে। তা হলে এই কথা বলতে হয় যে পৃথিবীতে আমরা জন্ম গ্রহণ করি নি, আমরা কেবলমাত্র নিজেরই এই ক্ষুদ্র দেশের চতুঃসীমানার মধ্যে জন্মেছি— যা বেড়া দিয়ে আমাদের অন্তরায়ণের দণ্ডে দণ্ডিত করেছে।..

"পৃথিবীর অধিকাংশ মহাপুরুষই তো নির্বাসনের সিংহদ্বার দিয়ে পৃথিবীতে আপন অধিকার লাভ করেন।.. তাঁদের সাময়িক লোকে তাঁদের নির্বাসন দিয়েছে; তার কারণ, তাঁরা সংকীর্ণভাবে কোনো দেশের বা কোনো কালের মন জোগাতে পারেন নি।..জীবিতকালে যশের দিক থেকে সম্মানের দিক থেকে প্রবাসী হয়ে থাকেন, উপবাসী হয়ে জন্ম কাটান।..

"শেলি সর্বাংশে..কবি ছিলেন..তাঁর ব্যবহার, তাঁর যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা, তাঁর সমস্তই এক কবিত্বের ছাঁচে ঢেলে তৈরি করেছিলেন— এ কথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। অনেক কবিকে জানি, একটা বিশেষ সময়ে হয়তো কবিত্বের ভূত তাঁদের পেয়ে বসলে পর কাব্য রচনা করেন এবং বেশ ভালো কাব্যও রচনা করেন।.. কিন্তু শেলির জীবনের আশৈশব গতি এবং প্রকৃতি সমস্তই কবির। Imagination-এর আবহাওয়ায় তাঁর মন নিমগ্ন ছিল। কেবল তাঁর মগজের এক অংশ নয়, তাঁর সমস্ত জীবন নিমগ্ন ছিল। এইজন্য তাঁকে লোকে খেপা বলে মনে করেছে অনেক সময়।

"অন্যান্য সাধারণ বা অসাধারণ ব্যক্তির মতো শেলিরও কতকগুলি মতামত ছিল। এ কথা আমরা সকলেই জানি মতামত থাকাটা কবিত্বের পক্ষে একটা বালাই।.. সেটা আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থে বিশেষ করে দেখেছি। যেখানে তিনি রসেতে খুব পূর্ণ হয়েছেন সেখানে তিনি মতকে চাপা দিতে পেরেছেন। কিন্তু সেই পূর্ণতার একটু খর্ব হবামাত্র তাঁর মতগুলো খাড়া হয়ে উঠে রসপ্রবাহের প্রতিবাদ করতে থাকে। শেলিরও মতামত ছিল স্বাধীনতা সম্বন্ধে, মানবজাতির জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, রাজনীতি সম্বন্ধে। কিন্তু সেই মতগুলি পাগলামির দ্বারা বেশ মজে গিয়েছিল। সে ছিল এক পাগলা কবির মতামত। সুবুদ্ধি জিনিসটা মর্তের জিনিস, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের খাঁটি যে পাগলামি সে দৈবী। তাই বুঝি সুবুদ্ধির গড়া জিনিস ভেঙে ভেঙে পড়ে,

আর পাগলামির উড়িয়ে আনা জিনিস বীজের মতো অরণ্যের পর অরণ্য সৃষ্টি করে; তাই পাগলা শেলির বাণী আজও নবীন আছে।.. অত্যন্ত উদ্দাম হৃদয়ের imagination-এর বেগের দ্বারা উতলা হয়ে উঠে তিনি এত বড়ো মানবজাতির দূর ভবিষ্যৎকে মহিমা-খণ্ডিত করে দেখতে পেয়েছিলেন।.. তিনি বর্তমানকালের যা-কিছু দুর্গতি তাকে অত্যন্ত আঘাত দেবার চেষ্টা করেছিলেন।.. দুই সংঘবদ্ধ শক্তিকে তিনি আঘাত করেছেন তাঁর কাব্যের ভেতর দিয়ে। রাজতন্ত্র এবং পুরোহিততন্ত্র। তিনি বলেছেন মানুষ এই দুই তন্ত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে একেবারে জর্জর হয়ে গেল; এক দিক থেকে বাইরে তাকে দাসত্বে বদ্ধ করেছে রাজশক্তি, আর-এক দিকে ধর্মতন্ত্র তার আত্মাকে সংকীর্ণ করেছে, মুগ্ধ করে রেখে দিয়েছে। এই দাসত্বের বন্ধন আর মোহের বন্ধন তিনি সইতে পারেন নি।..

"বিচিত্র সুখদুঃখময় মানুষের এই জীবনটাকেও শেলি যেন একটা পর্দার মতো করে দেখেছিলেন। এর খণ্ডতা এর স্থূলতা যেন সত্যকে আবৃত করে রয়েছে। এই কুহেলিকার পর্দাখানা ছিঁড়ে ফেলে সত্যের নির্মল মূর্তি দেখবার জন্যে কবির ভারি একটা ব্যাকুলতা ছিল। কতবার সেইজন্য তিনি মৃত্যুর মধ্যে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এই মুক্তি-পিপাসু কবি যেমন রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের বাধা সইতে পারেন নি, তেমনি মানুষের জীবনের খণ্ড-চেতনা বিরাট সত্যের উপলব্ধি থেকে আমাদের চিত্তকে যে গণ্ডিবদ্ধ করে রেখেছে এও তিনি সহ্য করতে পারেন নি। এইখানে যেন শেলির মনের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় মনের একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও এই ব্যবহারিক জগৎকে, এই স্থূল জগৎকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে না এবং এর ভিতরে অন্তরতম অন্তর্যামী যে সত্য আছে তাকেই সন্ধান করে বেড়ায়।..

"শেলিকে তাঁর জীবনকালে ও পরবর্তীকালে তাঁর দেশের লোকে নাস্তিক বলে অপবাদ দিয়েছে। তার কারণ এই যে প্রচলিত ধর্মতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রকে তিনি আঘাত করেছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে গভীর একটা ধর্মের তৃষ্ণা ছিল, একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করা যেতে পারে না। তিনি তাঁর Alastor কাব্যের মধ্যে যে সন্ধানের বেদনা প্রকাশ করেছেন সে কিসের সন্ধান।.. তার যে বেদনা, সেই যে সন্ধান, তারই দ্বারা প্রমাণ হয় যে পরম সৌন্দর্যময় একটি আত্মিক সত্তা বিশ্বের মধ্যে আছে, সে সম্বন্ধে শেলির চিত্তে গভীর বেদনাপূর্ণ একটি আকৃতি ছিল।" —ভারতী, আশ্বিন ১৩২৯; প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৯।

এই প্রসঙ্গে আমরা পাঠককে কবির 'ছিন্নপত্র'-মধ্যে শেলি সম্বন্ধে মন্তব্যগুলির কথা স্মরণ করাইতে চাই। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত কয়েকখানি পত্রেই তিনি শেলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দ্র 'ছিন্নপত্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫২, পৃ ৭৫-৭৭; এবং ছিন্নপত্রাবলী।

কবি ও লেডি-দম্পতি ১১ অগস্ট ১৯২২ (২৪ শ্রাবণ ১৩২৯) কলিকাতায় আসেন। পরদিন বিশ্বভারতীর সদস্য ও বন্ধুদের জন্য রামমোহন লাইব্রেরি হলে বর্ষামঙ্গল বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এইটি হয় বোধ হয় ২৭ শ্রাবণ শনিবারে (১২ অগস্ট)। ইহার পরদিন সেই হলে লেভি সাহেবের বিদায়-সংবর্ধনা ও তৎপরে 'বিশ্ব-ভারতী সম্মিলনী'র অধিবেশন হয়। বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার-কল্পে কলিকাতায় এই সম্মিলনী স্থাপিত হয়। লেভি-সংবর্ধনার পর কবি যে ভাষণ দান করেন তাহা শান্তিনিকেতন পত্রিকার পৌষ ১৩২৯ সংখ্যায় বাহির হয়। আমাদের মতে এই ভাষণ প্রদত্ত হয় ১৩ অগস্ট (২৮ শ্রাবণ)। 'বিশ্বভারতী' নামে যে গ্রন্থ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হয় (৭ পৌষ ১৩৫৮), তাহার ৫-সংখ্যক রচনাটি এই ভাষণ। উহার তারিখ ১ ভাদ্র ১৩২৯ দেওয়া হইয়াছে। সম্পাদক ১ ভাদ্রর পর প্রশ্নচিহ্ন দিয়া ভালোই করিয়াছেন। অতঃপর বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান হইল ম্যাডান থিয়েটার প্যালেস অফ ভ্যারাইটিস (৩১ শ্রাবণ॥ ১৬ অগস্ট) ও আলফ্রেড

থিয়েটরে (২ ভাদ্র ॥ ১৯ অগস্ট)। এইবার সর্বপ্রথম পাবলিক রঙ্গমঞ্চে জলসা হইল।

কবি ৪ ভাদ্র (২১ অগস্ট) প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রসভায় বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইহার পর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া 'শারদোৎসব' অভিনয়ের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে ১ ভাদ্র (১৮ অগস্ট) লেভিরা বোম্বাই যাত্রা করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন পত্রিকার ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যায় (পৃ ১১১) আছে: "কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী রামমোহন লাইব্রেরিতে অধ্যাপক মহাশয়ের বিদায় সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। ১লা ভাদ্র অধ্যাপক সপত্নীক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বোম্বে অভিমুখে যাত্রা করেন।"

এইখানে গ্রন্থমধ্যে তারিখের যে গরমিল হইয়াছে তাহা বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, বালুচর, পালং, ফরিদপুর হইতে আমাকে পত্রযোগে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫) জানাইয়াছেন।

পৃ ১৪২। এসিয়াটিক সোসাইটির স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্‌ রিসার্চ ফেলো মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থের পুত্র ভবতোষ ভট্টাচার্য ৮ মাঘ ১৩৫৭ পত্রযোগে জানান যে রবীন্দ্রনাথ ৮ আষাঢ় ১৩৩০ (২৩ জুন ১৯২৩) শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে নৈহাটি যান ও বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

পৃ ১৫০। পিয়ার্সনের মৃত্যু। ইতালির Pistsia (Pistola) শহর হইতে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সি. এফ. এনড্রুজকে লিখিত এক পত্রে ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই শহরটি ফ্লোরেন্স হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে আপেনাইন পর্বতের একটি শাখার উপর অবস্থিত।

পৃ ১৬০। জুন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে একবার চীনদেশে যাইবার কথাবার্তা ও পত্রাদি-বিনিময় হয়। বক্তৃতার জন্য এক হাজার ডলার দিবার প্রস্তাব আসে। ৬ জুন ১৯২৩ পেকিঙ হইতে (F. C. Tsiang, Secretary, Lecture Association. C/o Sungpo Library, Peking) পত্র আসে। শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত এক পত্রে এই প্রস্তাবিত যাত্রার কথা আছে। তবে নানা কারণে সেবার যাওয়া হয় নাই। মার্চ ১৯২৪ যাত্রা করেন।

পৃ ১৬৯। পাদটীকা ৪। মিঃ কাদুরি (Mr. Kadoorie)। ইনি শান্তিনিকেতনে জলের কল করিবার জন্য অর্থ দান করেন। বোম্বাইয়ে Kadoorie Israel School আছে।

পৃ ১৭৪। পাদটীকা ৩। Son of Liang Chi-chao।

পৃ ১৭৯। মাইলন ফাঙ। "Recollections of Rabindranath Tagore", by Mei Lan Fang: (Trs. Narayan Sen), *Lifeline* (Tagore Centenary Number), Eastern Railway, 1961.

২০ মে ১৯২৪, পেকিঙ ত্যাগের দিন, Mei Lan Fang -এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে এক মহিলার পাখায় কবি ৪ পংক্তির একটি কবিতা লিখিয়া দেন।

কবিতাটি—

অজানা ভাষা দিয়ে
পড়েছ ঢাকা তুমি, চিনিতে নারি প্রিয়ে!
কুহেলী আছে ঘিরি,
মেঘের মতো তাই দেখিতে হয় গিরি। —দ্র স্ফুলিঙ্গ, ১-সংখ্যক কবিতা

কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদও সেই পাখায় ছিল—

You are veiled, my beloved,
In a language I do not know.

As a hill that appears like a cloud
Behind the mast of mist.

দ্র *Lifeline*, Tagore Centenary Number, 1961, p. 28।

পৃ ১৮১। জাপানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মে Immigration Bill পাস হয়। "It limited the annual immigration from a given country to 2% of the nationals of the country in the U. S. in 1890 . . "।

রবীন্দ্রনাথের জাপান পৌঁছিবার কয়েকদিন পূর্বে জাপানে সাধারণ নির্বাচনের ফলে নূতন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়; তাহাতে Keto প্রধানমন্ত্রী ও ব্যারণ শিদেহরা (Shidehara) বৈদেশিক মন্ত্রী হন। শিদেহরার কার্যকালে (জুন ১৯২৪ - এপ্রিল ১৯২৭) চীনের প্রতি জাপানের ব্যবহার শান্তিপূর্ণ (conciliatory) ছিল।

পৃ ২২৯। প্রবাসী, মাঘ ১৩৩২, পৃ ৫৪৪।

ভারতীয় দার্শনিক সঙ্ঘের অভিভাষণের কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল :

"আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আমাদের মহাকাব্য মহাভারত তাহার সাক্ষী। . . একজন বিশেষ কবির খামখেয়ালী এখানে নাই, সমগ্র জাতির সাধারণ মনোভাব এখানে দেখিতে পাই। . .

"মুসলমান যুগেও এই ভারতে যেসব সাধুসন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই গীত-রসিক।

"শৈশবে মনে পড়ে, একজন ভক্ত হিন্দু-গায়কের মুখে কবীরের এই গানটি শুনি—

পানীমে মীন পিয়াসী রে
মুকো শুনত শুনত লাগে হাঁসিরে।
পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট বরতে,
ক্যা মথুরা ক্যা কাশীরে।

"কবীরের এই উচ্চহাস্য সেই হিন্দুগায়কের ধর্মনিষ্ঠায় এতটুকুও আঘাত করে নাই। বরং কবীরের সঙ্গে তিনি একাত্ম . . তিনি বুঝিয়াছেন তীর্থ হিসাবে মথুরা বা কাশীর প্রতীক-গত তাৎপর্য থাকিলেও চিরন্তন সত্য হিসাবে তাহাদের স্থান নাই। . .

"পূর্ববঙ্গে একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই— সেটি এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ -সূত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন—

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান-জমীন;
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম,
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয়, বদবয়।

—এই সাধককবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত-পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে, যে পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।

"এই-সব তত্ত্ব-সংগীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহা গ্রাম্যসাধারণের ভাষায় লিখিত এবং নিতান্ত অমার্জিত বলিয়া

উচ্চ সাহিত্য কর্তৃক অবজ্ঞাত। এই-সব গ্রাম্য গায়কেরা তত্ত্ববিদ্যার কোনো ধার ধারেন না, সেটা তাঁহারা বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন।..

ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরি
নিকষে খসয়ে কমল আ মরি-মরি।

"ইহারা পথে-বিপথে তাহাদের গান গাহিয়া ফেরে। একটি গান বহুকাল পূর্বে শুনি, কিন্তু এখনও মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া আছে—

খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম তারি পায়।

"এই গ্রাম্য কবি দেখি উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে একমত।.. শেলির সেই কবিতাটির কথা স্মরণ করায় যাহাতে তিনি সুন্দরের অতীন্দ্রিয় আবেশের বন্দনা গাহিয়াছেন।

"সেই অজানা দুরধিগম্য হইলেও যে সকল সত্যের মূল সত্য, তাহা এই বিখ্যাত ইংরেজ কবি এবং সেই অজ্ঞাতনামা বাঙালি বাউল উভয়েই বুঝিয়াছেন। সেইজন্য তাহার গ্রাম্যসংগীত সেই অজানা পাখির ডানার ছন্দে মুখরিত।"

এখানে কবির ভাষণটি উদ্‌ধৃত করিয়া দিলে পাঠক দেখিতেন, কবি কী গভীরভাবে এই ব্রাত্য, অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত সমাজের অন্তরের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে তিনি একদিন লোকসাহিত্যের প্রতি বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আজও লোকধর্মের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। কবির পূর্বে অজ্ঞাতদের এমনভাবে সম্মান কেহ দেন নাই— তথ্য অনেকে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের তত্ত্বের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা লইয়া কেহ প্রবেশ করেন নাই।

পৃ ২৩৮। ১৯২৫ সালের শেষ দিকে অথবা ১৯২৬ সালের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ শ্রীদিলীপকুমার রায়ের নিকট হইতে একখানি পত্র পান। তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর লিখিত একখানি পত্র ছিল। সুভাষচন্দ্র তখন বর্মার মান্দালয় জেলে আবদ্ধ। পত্রখানি তিনি দিলীপকে লেখেন ৯ অক্টোবর ১৯২৫; কবি লিখিতেছেন, "তোমার চিঠিখানি কাল পেয়ে বড়ো খুশি হলুম। সুভাষের চিঠি বড়ো সুন্দর— এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না— সেইখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে— সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলেই হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদি হাটের ফরমাশ চালানো যায়, তা হলেই সর্বনাশ ঘটে। ফরমাশ তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফরমাশ অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরি করতে পারে, তা হলেই আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে.. কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি, তোমার যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্বিচারে রচনা করতে পারো; কবি যদি সফল হয় তবে সাধারণকে বলব, যে জিনিস শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো। যারা রূপকার, যারা রসস্রষ্টা, তারা আর্টের সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন্দ এই দুটি মাত্র শ্রেণীভেদই জানে— বিশিষ্ট কতিপয়ের পথ্য ও ইতর-সাধারণের পথ্য বলে কোনো ভেদ তাদের সামনে নেই।.. সর্বসাধারণকে আমরা শ্রদ্ধা করি বলেই রসের নিমন্ত্রণ সভায় আমরা বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে চিঁড়ে-দইএর ব্যবস্থা করি— সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি

যাদের বড়ো লোক বলি তাদের জন্যেই।"— অনামী, পৃ ৫৫৪-৫৫।

পৃ ২৩৮। সিউড়িতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন, ২০-২১ চৈত্র ১৩৩২ (৪-৫ এপ্রিল ১৯২৬)। মূল সভাপতি অমৃতলাল বসু। শাখা সভাপতি : সাহিত্য— সরলা দেবী ; দর্শন— ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ; ইতিহাস— কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ; বিজ্ঞান— হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। কবি 'সাহিত্যসম্মেলন' নামে ভাষণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

পৃ ২৪২। নটীর পূজা ভারতীর জন্য চাহিয়া সরলা দেবী একশত টাকার চেক পাঠান। কবি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। উহা 'মাসিক বসুমতী' বৈশাখ ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কারণটি প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্রে ব্যক্ত। ১৩৪৭ সালের নববর্ষের ভাষণে নটীর পূজার ব্যাখ্যা আছে। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭, পৃ ১৪৭।

পৃ ২৪৩। 'ভীমরাও হস্যুরকার' হইবে।

পৃ ২৪৪। পাদটীকা ২। নটীর পূজার ৬টি গান ছাড়া অন্য গানগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে আছে, পৌষ ১৩৩৮। রবীন্দ্রজয়ন্তীকালে (নটীর পূজার অভিনয়-কালের পূর্বে) রচিত বলিয়া মনে হয়।

পৃ ২৫৪। রবীন্দ্রনাথ-মুসোলিনী সংবাদ। ঠিক দশ বৎসর পরে ১৯৩৬-এর মার্চ মাসের গোড়ায় জবহরলাল নেহরুকে মুসোলিনী নিমন্ত্রণ করেন। জবহরলাল প্রত্যাখ্যান করেন— "The Abyssinian campaign was being carried on then and my meeting him (Mussolini) would inevitably lead to all manner of inferences, and was bound to be used for fascist propaganda. No denial from me would go far . I sent a letter to Signor Mussolini expressing my regret . ."— *The Discovery of India*, p. 28।

রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা হইতে জবহরলাল বোধ হয় এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পৃ ২৫৯। রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন সংবাদ। রণজিৎকুমার সেন, যুগান্তর, ৪ আষাঢ় ১৩৬২ (১৯ জুন ১৯৫৫)। *Asia* পত্রে উভয়ের কথোপকথনটি Rabindranath-Einstein News নামে প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৩৮, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত) ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পুনরায় ইহার নূতন তর্জমা যুগান্তরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১-১৫ সেপ্টেম্বর বার্লিনে ছিলেন ; সেই সময়ে অধ্যাপক আইনস্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পাদটীকায় 'বিচিত্রা'র যে নির্দেশ আছে তাহার সহিত এবারকার সাক্ষাৎকারের সম্বন্ধ নাই। এবারের মোলাকাতের কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই; তবে কবির *The Religion of Man* গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টের ভূমিকায় তিনি আইনস্টাইনের সহিত মোলাকাতের একটা চুম্বক দিয়াছেন। কবি লিখিতেছেন, "প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা।" এই দেখা ১৯২১ কি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে হয় তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় না ; আমাদের মতে ১৯২৬-এ ।

কবির সহিত বিজ্ঞানীর দ্বিতীয় মোলাকাত হয় ১৪ জুলাই ১৯৩০ ; তারই প্রতিবেদন *The Religion of Man* -এ আছে।

১৯৩০ সেপ্টেম্বরে কবির সহিত আইনস্টাইনের আর একবার সাক্ষাৎ হয়, সোভিয়েত রাশিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে কবি যখন মেন্‌ডেলদের[১] (Mendel) বাড়িতে আছেন সেই সময়ে। রবীন্দ্রনাথ

১ মেন্‌ডেল (Mendelsohn)—জারমেনির বিখ্যাত ব্যাংকার পরিবার। ইহারা ইহুদী। Franz von Mendelsohn (1865-1935), জারমান শিল্প ও বাণিজ্য সংঘের সভাপতি (১৯২১-৩১) এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘের সভাপতি (১৯৩১)। রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত রাশিয়া হইতে ফিরিয়া কয়েকদিন ইঁহাদের অতিথি ছিলেন।

আমেরিকায় গিয়া যে পত্র লেখেন (১৪ অক্টোবর ১৯৩০। চিঠিপত্র ৩, পৃ ৯৭) তাহাতে আছে, "সেখান [রাশিয়া] থেকে ফিরে এসে মেণ্ডেলদের ঐশ্বর্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম একটুও ভালো লাগল না . ." ইত্যাদি। আইনস্টাইনের সঙ্গে মোলাকাতের প্রথম কথা হইতেছে—"আজ ডাক্তার মেণ্ডেলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল"— ইত্যাদি। এই মোলাকাতের বিবরণী *Asia* নামে মার্কিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। তার থেকে তর্জমা প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'র আশ্বিন ১৩৩৮ সংখ্যায়— মোলাকাতের এক বৎসর পরে।

ইহার পর কবির সঙ্গে আইনস্টাইনের আর-একবার দেখা হয় আমেরিকার নিউইয়র্ক মহানগরীতে ১৯৩০-এর শেষ দিকে— ডিসেম্বরে। এই সময়ে আইনস্টাইন California-র Institute of Technology -তে ভিজিটিং প্রোফেসর রূপে আমন্ত্রিত হইয়া যাইতেছেন। নিউইয়র্কে কবি তাঁহার এক পরিচিত মহিলা-ভাস্করের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন ; সেই সময়ে আইনস্টাইন কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শ্রীমতী Gertrude Emerson (পরে ডাঃ বশী সেনের স্ত্রী) *The Golden Book of Tagore* -এ যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে কবির সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আইনস্টাইনের আগমনের কথা আছে। (পৃ ৮০)।

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মধ্যে জুলাই ১৯৩০ তারিখে যে কথোপকথন হয় তৎসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লিখিত মন্তব্য-সহ বাংলা অনুবাদ বিশ্বভারতী পত্রিকায় শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদক শ্রীকানাই সামন্ত। আমরা নিম্নে সেইটি উদ্‌ধৃত করিতেছি :

"প্রথম মহাযুদ্ধের পর জর্মানিতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তখন [১৯২৬] আমি বলেছিলাম, আর আজও আমি বিশ্বাস করি, যন্ত্রবিদ্যার এই উন্নতি আসলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ-বিধানের অনুকূল— বিশেষতঃ, এই উন্নতির প্রতিরোধ যখন অসম্ভব তখন প্রয়োজনের তাগাদায় মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি জীবনে যে সুবিধার সৃষ্টি করেছে তার সুচিন্তিত সদ্‌ব্যবহার করাই তো আমাদের কর্তব্য। সভ্যতার যে স্তরে মানুষ আজ উন্নীত, তাতে যেমন আঙুলে জমি আঁচড়ে চাষ করার কথা ভাবা যায় না, তেমনি হস্তপদ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় যেখানে পরাজিত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যন্ত্র সৃজন ক'রে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে চলেছে। আইনস্টাইন আর আমার মধ্যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল হল যে, নূতন নূতন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।

"গত বৎসরের [১৯৩০] গ্রীষ্মে আবার যখন জর্মানিতে যাই, বর্লিনের অদূরে Kaputh-এ আইনস্টাইনের নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম। 'দুদিন' আগে 'হিবার্ট' বক্তৃতামালায় যা বলেছিলাম, *The Religion of Man* নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন ব্যস্ত ছিলাম, সেই ভাবনায় আমার মন তখন ভরপুর। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাতেই বুঝলাম যে তিনি ধরে নিয়েছেন, 'আমার বিশ্ব' মানবিক্ ধ্যান ধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এ দিকে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি এই যে মানুষের মনবুদ্ধির নাগালের বাইরেও আছে এক সত্য। আমার বিশ্বাস, ব্যষ্টিমানব ঐক্যসূত্রে বাঁধা সেই দিব্যমানবের সঙ্গে যিনি আমাদের অন্তরে, আবার বাইরেও। অনন্তের ভূমিকায় বিরাজিত মানুষ, সেই অনন্ত মূলতঃই মানবিক। আমাদের ধর্মসাধনা নয় বিশ্বভৌমিক, আমাদের যে সজীব ব্যষ্টিসত্তা নিয়ে তার করণ-কারণ তার আছে শুভাশুভের আদর্শভাবনা। স্বভাবের মধ্যে ঐ প্রকার শুভাশুভের নীতি বা নন্দনীয়তা বিজ্ঞানের স্বীকার্য নয় ; নিরাবরণ নিরাভরণ 'অস্তি' নিয়েই তার কারবার। বিজ্ঞানে ব্যক্তিসত্তার কোনো উপযোগিতা নেই। অথচ, অধ্যাত্মপথে বা ধর্মসাধনায় নিছক বাস্তব তথ্য বা তৎসম্পর্কিত তত্ত্ব কোনো কাজে লাগে না।

"একক নিঃসঙ্গ মানুষ ব'লে আইনস্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বৈকি। তাঁর জড়বাদকে তুরীয়ই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যানধারণার সীমান্তচুম্বী, সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে— জগৎ থেকে— নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে বিজ্ঞান এবং আর্ট দুটিই মানুষের স্বরূপ প্রকৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে।"

পৃ ২৬২। বালাতন। Balaton, a lake in Hungary, 47 miles long and 7-10 miles broad, 266 Square miles. Many streams fall into the lake and the beauty of the place makes it a popular bathing and fishing resort. The lake has been thoroughly studied by the Hungarian Geographical Society।

বালাতন হ্রদের তীরে কবি ৮ নভেম্বর একটি Linden tree-র চারা রোপণ করেন। এই বৃক্ষরোপণ-উৎসবে কবি বলেন, "I am planting this tree in remembrance of my stay here, for nowhere else was I given what I received here. It was more than hospitality, it was awakening of feelings of kinship. . I sense and I know that I have come to the land of a nation which is emotionally akin to India. . ।"

হোটেলে প্রত্যাবর্তন করিয়া কবি তথাকার অতিথি-তালিকা বহিতে লিখিয়া দিলেন :

হে তরু, এ ধরাতলে রহিব না যবে
সেদিন বসন্তে নব পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি পথিকেরে কবে
'ভালো বেসেছিল কবি বেঁচেছিল যবে'।

When I am no longer on the earth, my tree, let the ever-renewed leaves of thy spring murmur to the wayfarers : "The poet did love while he lived."— Rabindranath Tagore. 8th November 1926.

"Tagore in Hungary", by Kshitis Roy, *Indian Literature*, vol. 3, October 1959-March 1960, pp. 28-34।

এই বালাতনে থাকিবার সময় কবি রোমাঁ রোলাঁর নিকট হইতে এক পত্র পান। এই পত্রে তিনি কেন কবিকে ইতালিতে মুসোলিনীর স্বৈরাচার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিয়াছিলেন, তাহার কৈফিয়ত দেন। রোলাঁ কবিকে লিখিয়াছিলেন (১১ নভেম্বর ১৯২৬): "Often I have accused myself for having disturbed your rest when I took away from you the confidence you had in your Italian hosts. However, I had no other interest in my mind but your glory, which I value more than your rest. I did not want devils misusing your sacred name in the annals of history. Forgive me if my intervention has caused you some restless hours. The future (the present already) will show you that I have acted as your faithful and vigilant guide"—দ্র *Rolland and Tagore*, Edited by Alex Aronson and Krishna Kripalini, Visva-Bharati, 1945, p. 67.

১৯৬২ সেপ্টেম্বর মাসে মস্‌কোতে যে হোটেলে ছিলাম (উক্‌রাইন) সেখানে দুইজন হান্‌গেরিয়ান সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। বলিলেন, বালাতন-তীরের গাছটি জীবিত আছে।

পৃ ২৬৭। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ইউরোপ-সফর সম্বন্ধে— "আমার পাশ্চাত্য মহাদেশে ভ্রমণকালে যাঁরা আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনী ছিলেন তাঁদের অনবধান বা ঔদাসীন্য -বশত সাধারণের অবগতির জন্য আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংগ্রহ ও রক্ষা করেন নি।"

এ অভিযোগ কবির নিকট আমাদেরও শোনা। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমরাও অনুরূপ অভিযোগ করি। তাহার কারণ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের কবির সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের সম্বন্ধে এই প্রকারের ধারণা প্রচার করা হইয়াছিল এবং আমিও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে জানা যায় সঙ্গীদের কোনো দোষ ছিল না। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ১৯২৬ হইতে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই ঘটনার সত্যটি কেহ বিবৃত করেন নাই এবং কবি অকারণ ক্ষোভ ও অভিমান মনের মধ্যে পোষণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন।

পৃ ২৮৪। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ে কবি ফরাসী-লেখক ও ভাবুক আঁরি বাবুস (Barbusse)-এর নিকট হইতে এক পত্র পান। য়ুরোপে ফ্যাসিজ্‌ম্‌ তখন প্রবল; তাহার বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহের জন্য বার্বুস চেষ্টান্বিত হন (a protest of enlightened and respected persons is the only thing likely, if it is organised and continuous, to put a stop to an abominable state of things)। রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে লেখেন—

"It is needless to say that your appeal has my sympathy, and I feel certain that it represents the voices of numerous others who are dismayed at the sudden outbursts of violence from the depth of civilization.. I rejoice at the fact that there are individuals who still believe in a higher destiny of man, proving in their suffering the deathless life of the human soul ever ready to fight its own aberrations."

—*Visva-Bharati Quarterly*, July 1927, pp. 194-95.

পৃ ২৯০। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের কয়েকদিন পূর্বে (২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭) কবি আমেরিকার য়ুনিটেরিয়ান অধ্যাপক জে. টি. সান্‌ডারল্যান্‌ড্‌কে এক পত্র লেখেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে একখানি বই সান্‌ডারল্যান্‌ড্‌ লিখিতেছেন [*India in Bondage*]; সে বিষয়ে সহায়তা চাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কবি ভারতের অধীনতার জন্য বিদেশী ইংরেজকেই একমাত্র দায়ী করিলেন না। তিনি লিখিলেন, দায়ী আমরা—"Where the mind itself is smothered under a load of dead things, under the pressure of automatic habits inherited from a primitive past, all our powers must be directed towards rescuing it from the debris of a ruined antiquity. That means widespread education."

—*Visva-Bharati Quarterly*, July 1927, pp. 191-92.

পৃ ২৯৫। ১৩৩৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশের সময় শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের উপর-তলার বারান্দায় প্রাচীর-চিত্র বা ফ্রেস্‌কো অঙ্কিত হয় (এপ্রিল ১৯২৭)। জয়পুর হইতে নরসিংলাল নামে এক কারুশিল্পীকে আনা হয়; ইনি জয়পুর রীতিতে প্রাচীর-চিত্র অঙ্কন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কয়েকটি (৪) কবিতা লিখিয়া দেন, সেগুলি দ্বিতলে চিত্রিত আছে। দ্র পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ ১৮৫-৮৬: 'হে দুয়ার' ইত্যাদি। নীচের

তলার ছবিগুলি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে দ্বিতীয় দফায় তৈরি হয়। দোতলার ছবিগুলি মিশরীয়, চৈনিক, ইসলামীয়, ভারতীয়, পারসিক চিত্র হইতে গৃহীত। প্রান্তের দুইটি আশ্রমের চিত্র, শ্রীনন্দলাল বসু ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর -কর্তৃক অঙ্কিত।

নীচের তলার ছবির মূল আঁকিয়াছেন শ্রীনন্দলাল বসু; সেগুলি আশ্রমের বাহিরের ও ভিতরের ছবি (Jayantlal Parekh, "Fresco-Painting and Santiniketan", *Visva-Bharati News*, July 1933. Also, Annual Report, Visvabharati, 1933, p 19)।

পৃ ২৮৫। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-দ্বীপালি ও বৃহত্তর ভারত ভ্রমণে যাইবার পূর্বে একদিন কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে বৃহত্তর ভারত পরিষদের উদ্যোগে কবিসংবর্ধনা হয় (আষাঢ় ১৩৩৪)। পরিষদের ও ইনস্টিটিউটের সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বলেন যে, দশ বৎসর পূর্বে [১৯১৭] রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এমন একজন শিক্ষিত যুবক জুটাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন যিনি যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপের ভাষা শিখিয়া তথায় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ ও তাহার ইতিহাস রচনায় সাহায্য করিতে পারিবেন।

সভারম্ভে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবির কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া আশীর্বাদ করেন।.. সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কবির উদ্দেশে সংস্কৃত প্রশস্তি পাঠ করেন। গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ীও স্বরচিত সংস্কৃত কবিতা পাঠ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী কুমারজীবের রচিত একটি চীনা কবিতা চীনা-অক্ষরে লিখিয়া ইংরেজি অনুবাদসহ কবিকে উপহার দেন।[১] যদুনাথ ইংরেজিতে তাঁহার ভাষণ পাঠ করেন; তাহাতে তিনি কবিকে পূর্বতন ঋষিদের স্থানাভিষিক্ত অধুনা-জীবিত একমাত্র ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও পরিশেষে বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করেন।

পৃ ২৯৭। ভবতোষ ভট্টাচার্য জানাইতেছেন, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি বলীদ্বীপ-ভ্রমণ-কালে Miss Mayo-র *Mother India* পুস্তকের *New Statesman* -এর সমালোচকই কবিগুরু সম্বন্ধে অসত্য উক্তির আরোপ করেন। Miss Mayo নিজে কিছু করেন নাই। কবিগুরুর লিখিত প্রতিবাদ সমগ্রভাবে *Manchester Guardian* ও পরে Sunderland-এর *India in Bondage*-এর ভূমিকা-রূপে, এবং আংশিকভাবে *Statesman* দৈনিকে (৫-৬ অক্টোবর ১৯২৭) প্রকাশিত হয়।

পৃ ৩০১। শ্যামের (সিয়াম) পথে "সিঙ্গাপুর হইতে 'কিস্তা' জাহাজে করিয়া ইঁহারা পিনাঙ আসিলেন" ৫ অক্টোবর ১৯২৭। স্টিমারে বসিয়া ৪ অক্টোবর তারিখে 'বিচিত্রা'র সম্পাদককে লিখিলেন, 'তিন পুরুষ' উপন্যাসের নাম বদলাইয়া যেন 'যোগাযোগ' রাখা হয়। "তিন পুরুষ নাম ধরে আমার যে গল্পটা 'বিচিত্রায়' বের হচ্ছে তার নাম রক্ষা করতেই হবে এমন কোনো দায় নেই। কাঁচা থাকতে থাকতেই ও-নামটা বদল করব স্থির করেছি।..

"সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্যরচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হল গোড়াকার তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বেসর্বা; সেখানে গুণধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয় মনস্তত্ত্বঘটিত বই-এর শিরোনামায় যখনি দেখব 'স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর ঈর্ষা,' বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা দ্বারাই

১ বন্ধুবর প্রবোধচন্দ্র এই অনুবাদটি আমাকে স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। তিনি এখন বিদেহী।

Bright virtue nourished in the heart	**As the lone Sphinx on the Tung tree**
Spreads its fragrance to thousands of Yojanas;	**(Sends forth) clear crisp sound up to the Nine Heavens.**

নামটি সার্থক হবে। কিন্তু 'ওথেলো' নাটকের যদি ঐ নাম হত, পছন্দ করতুম না। . . 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামে দোষ নেই— কেননা ও-নামে গল্পের কোনো ব্যাখ্যাই করা হয় নি।"

—বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ ৭৮৯-৯০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, পৃ ৫৪৪-৪৬।

পৃ ৩১১। ১৩৩৪-এর পৌষ উৎসবের-পর কবি শান্তিনিকেতনে। এই সময়ে শ্রীসুধীরচন্দ্র কর শান্তিনিকতনে নূতন আসিয়া গ্রন্থাগারে নিযুক্ত হন। সাহস করিয়া সুধীরচন্দ্র তাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা কবিকে দেখিতে দেন। কবি "পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া পড়িয়া, তাতে একটি মনোজ্ঞ অভিমত লিখিয়া দিলেন।" (১৭ পৌষ ১৩৩৪) দ্র. সুরধুনী, ফাল্গুন ১৩৩৪।

"বঙ্গের স্বরাজদলের যে পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে লেখা চাহিয়া তাহার পর তাহা ছাপেন নাই, তিনিই তৎপূর্বে সাতিশয় আগ্রহ সহকারে মালয় উপদ্বীপের ইংরেজদের কাগজ হইতে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ নিন্দা উদ্ধৃত করিযাছিলেন।" রবীন্দ্রনাথের অমনোনীত রচনাটি প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে (মাঘ ১৩৩৪, পৃ ৫৭৭) মুদ্রিত হয়।

কলিকাতায় ঋতুরঙ্গ অভিনয়ের পর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন, কয়েকদিন পরেই পৌষ-উৎসব। কবি ৩ পৌষ (১৩৩৪) নিম্নলিখিত পত্রখানি স্বরাজদলের পত্রিকা-সম্পাদককে পাঠাইয়াছিলেন।

"আপনাদের পত্রিকার জন্য আমার কাছ হইতে কিছু লেখা চাহিয়াছেন। আমার সময় অত্যন্ত অল্প, আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

"শাসনকর্তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে-কিছু বিকৃতি স্বদেশকে উপলব্ধি করিবার পক্ষে বাধা, তাহাই দূর করিবার চেষ্টা বর্তমান ভারতবর্ষের পলিটিক্‌স্‌। এই উপলক্ষে আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী কখনো-বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাধন কখনো-বা বিচ্ছেদ ঘোষণার ব্যাপারে নিরতিশয় প্রবৃত্ত। এই চেষ্টার প্রয়োজন যতই থাক্‌ ইহারই উত্তেজনা একান্ত হইযা গুরুতর প্রযোজন হইতে আমাদের কর্মোদ্যমকে দীর্ঘকাল বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

"আমাদের নিজেদের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে যে-সকল গভীর বাধা বর্তমান, যাহার জটিল মূল আমাদের সমাজে, আমাদের সংস্কারে, আমাদের বুদ্ধির বিকারে, শক্তির জড়তায়, চিত্তের ঔদাসীন্যে, পরনির্ভরশীল মনোবৃত্তিতে, বিচারহীন গতানুগতিকতার দীর্ঘকালীন অভ্যাসে, তাহাই স্বদেশকে অন্তরে বাহিরে সত্যভাবে লাভ করিবার সর্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায়। নিজেদের অন্তর্নিহিত এই অপূর্ণতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই বলিয়াই চোরাবালিতে পলিটিক্‌সের ভিত্তি স্থাপন চেষ্টায় আমাদিগকে নানাপ্রকার অত্যুক্তি ও আত্মবঞ্চনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে। মেকি টাকায় বিধাতার সঙ্গে কারবার চলে না; সিদ্ধির পথকে অবাস্তবের সাহায্যে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিবার কৌশল অবলম্বন করিলে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। দেশের প্রজাসাধারণ দেশকে আপন করিবে এই ইচ্ছাটি সাধারণের মধ্যে যখন সত্য হইবে, গভীর হইবে, ব্যাপক হইবে, এই ইচ্ছার বিচিত্র দুঃখসাধ্য ত্যাগপরায়ণ দায়িত্ববোধ যখন অগভীর আবেগস্রোতে আন্দোলনের বিষয় না হইয়া সুসংযত বিচার-বুদ্ধি ও সুশিক্ষিত সাধনার উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন বাহিরের প্রতিকূলতা আমরা উপেক্ষা করিতে পারিব। স্বদেশ সম্বন্ধে কল্যাণফল লাভের কথা যখন ওঠে তখন সাধনক্ষেত্রের মাটিতে নামিয়া ঢেলা-ভাঙার কথাই ভাবি, এ কথা মনেও করি না, মুখে বলিতে লজ্জা হয় যে, ফসল ফলিয়াই আছে, কেবল তাহা গোলাজাত করিবার বাহ্য বাধা সরিযা গেলেই সন্তই আমাদের পোলিটিক্যাল ভোজের আয়োজন পূরা হইবে।"

পৃ ৩১৮। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ৫ বৈশাখ ১৩৩৮ দিলীপকুমার রায়কে কবি লিখিতেছেন, "শ্রীঅরবিন্দ আত্মসৃষ্টিতে নিবিষ্ট আছেন। তাঁর সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ নিয়ম খাটবে না। তাঁকে সসম্ভ্রমে দূরেই স্থান দিতে হবে— সব

সৃষ্টিকর্তাই একলা, তিনিও তাই। আমাদের অভিজ্ঞতা সেইখানেই যেখানে জমেছে সকলের সঙ্গ— তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্র সকল জনতাকে উত্তীর্ণ হয়ে। কিন্তু আমরা সেটা সহ্য করি কেন ?— যে জন্যে মেঘকে সহ্য করি দূর আকাশে জমতে— শেষকালে বৃষ্টি পাওয়া যাবে চাষের জন্যে তৃষার জন্যে।"— অনামী, পৃ ৩৪৯।

পৃ ৩২২। বৃক্ষরোপণ। রবীন্দ্রনাথ কেবল ব্যবহারিক দিক হইতে বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রবর্তন করিয়া নিবৃত্ত হন নাই; শান্তিনিকেতনকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করেন। তাঁহার সাহিত্যে বহুপ্রকার ফুলের নাম আছে; তাহার তালিকা কেহ প্রস্তুত করিতে পারেন। জীবনের সন্ধ্যায় মংপু হইতে লিখিত একখানি পত্র সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পত্রখানি জগদানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ধীরানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কবির সেবক সচ্চিদানন্দ বা 'আলু রায়' কে লিখিত: "বাগানে বিশেষ করে মন দিস। কাছাকাছি গোটা দুই তিন চামেলির ঝোপ লাগিয়ে চামেলিয়া নাম সার্থক করতে হবে। আমি বড়ো গাছ ভালোবাসি, কিন্তু বাড়ির খুব কাছে নয়। সজনে গাছের কথা মনে রাখিস, শীতের সময় ফুল ঝরায়, অথচ বাড়তে সময় নেয় না। মহানিম, শিমুল, ওখানকার মাটিতে ধরে সহজে। পালতে মাদারের বেড়ায় কাঁটা এবং ফুল দুইই পাওয়া যায়, বনজুঁইএর বেড়াও উত্তম। রক্তকরবী গোরুতে খায় না, তার ফুলের গৌরবও আছে, সাদা করবী লাল করবী দুই পাশাপাশি চলবে। নেবু ফুলের গন্ধ আমার প্রিয়, তার ব্যবস্থা রাখিস। ফুলের ঐশ্বর্য আছে চালতা গাছে— শিরীষ, জামরুল, গোলাপজামকে আমি ফুলের জন্য পছন্দ করি। সারা জষ্টি মাস জল লাগবে। কোনো একটা লাইন কেটে পর্যায়ক্রমে কুরচি ও কাঞ্চন লাগানো যেতে পারে: দুচারটে গন্ধরাজ লাগালে দোষ নেই। যে গাছ ভালোবাসি নে সে হচ্ছে ছাতিম কদম। আমার ও জায়গাটাতে শিরীষ কেন জোর পায় না খবর নিস।" পত্রখানির তারিখ ২৭ এপ্রিল ১৯৪০। দ্র ঋতুপত্র, হেমন্ত সংখ্যা, ১৩৬২।

পৃ ৩২৫। প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত লইয়া বিজ্ঞানীরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ডাঃ সরসীলাল সরকার, রঙিন্ হালদার, অনিলকুমার বসু ও গিরীন্দ্রশেখর বসু এই সময়ে এতদ্‌সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৪ আশ্বিন ১৩৩৮ সালে ডাঃ সরসীলাল সরকারকে 'সাইকো-এনালিসিস' সম্বন্ধে পত্র দেন।— দ্র বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৮, পৃ ৩৪০-৪৩। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য:

ডাঃ সরসীলাল সরকার, "রবীন্দ্রকাব্যে পরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব", মানসী ও মর্মবাণী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

অনিলকুমার বসু, "রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ" [রবীন্দ্রনাথ ও সরসীবাবুর কথাবার্তা], প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ ৩৪০-৪৩।

গিরীন্দ্রশেখর বসু, "'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ' আলোচনা", প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৫, পৃ ৫৮৩-৮৪ [ইঁহার মতে সরসীবাবুর ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা psychological]।

অনিলকুমার বসু, "'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ' আলোচনা", প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৫, পৃ ৮৬৩-৬৪ [গিরীন্দ্রশেখরের মন্তব্যের সমালোচনা]।

পৃ ৩২৯। Message to the World League for Peace (*Modern Review*, October 1928). Ligne Mondiale pour la Paix-এর ডিরেক্টর Georges Dejean নিম্নলিখিত পত্রখানি কবিকে পাঠান (ফরাসী থেকে অনুবাদ দেওয়া গেল):

"Be pleased to permit us to approach you through the esteemed personality of Monsieur Romain Rolland, to pray that you be gracious enough to grant us an autograph for The Golden Book of Peace.

The work will consist of reproductions of the thoughts on peace from the most illustrious personages and the most eminent writers of each country. We have received up to this day, for this book, over 270 documents, among which are the autographs of Messrs. Heriot, Briand, Paul-Boncour, Poincare Brienx, Marcel Prevost, Chamberlin, Stressemann, Ador Henri Barbusse, Maurice Donnay, Vandervelde, Charles Richet, Quidde and others.

We pray that you believe, honoured Sir, that we shall consider it a very great disappointment if you do not consent to honour the Golden Book of Peace with some reflexion emanating from your great heart.

We feel sure that you will undoubtedly approve of our effort and that you will contribute to its moral success by letting us have a few lines that we solicit from your generosity.

Be kind enough, honoured Monsieur, to accept the expression of our great admiration and the assurance of our profound gratitude."

পৃ ৩৩৩। ২য় অনুচ্ছেদ। "মাঘোৎসবের পর কবি" ইত্যাদি ৩৩৪-এর ৩য় পংক্তিতে যাইবে।

১ম অনুচ্ছেদ: "রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর ভাষণ লিখিয়া দিলেন।".. ইহার পর ৩য় অনুচ্ছেদ পঠনীয়—"তিনি কলিকাতায় আসিলেন না।"

পৃ ৩৩৪। ৩য় অনুচ্ছেদ। "রবীন্দ্রনাথ ২৭ জানুয়ারি শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আসিলেন" পড়িতে হইবে।

ভারতবর্ষের নানা ধর্মাবলম্বী বিদ্বান ও চিন্তাশীল লোক এবং অন্যান্য দেশ হইতে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অনুরূপ লোক যোগদান করেন। বঙ্গের প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মৌলবী আবদুল করিম, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করেন।— প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৫, পৃ ৭৫৬।

পৃ ৩৩৯। কুমু বা কুমুদিনী বা 'যোগাযোগ' সম্বন্ধে শ্রীমতী রাধারানী দেবী রবীন্দ্র-পরিষদে আলোচনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে কুমুর বিস্তারিত পরিচয় জানিতে চান। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন: সেকালে বনেদীঘরের মধ্যে কুমুর জন্ম। বনেদীঘর সাধারণত আপন পাকা দেওয়ালের মধ্যে আপন সাবেক কালকে বেষ্টন করে রাখে। সেই সাবেক কালের অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু সে আপন আভিজাত্যরীতির দায়িত্ব প্রাণপণে স্বীকার করে, যে-কোনো ব্যবহার তার কাছে ইতর বলে ঠেকে বা কুল-গৌরবের অযোগ্য বলে সে মনে করে সর্বনাশ হলেও সেটাকে সে বর্জন করে। কিন্তু এই বেষ্টনের বাইরে যে-সব পরিবর্তন দ্রুতবেগে ঘটছে তার মধ্যে আভিজাত্যের দায়িত্বগৌরব নেই— তাই তার ভাষায় ভাবে কামনায় কর্মে ভ্রষ্টতার ইতরতার বাধা থাকে না। এই কারণেই এইরকম বংশের সঙ্গে বাইরের সমাজের একটা প্রভেদ অনেকদিন স্থায়ী থাকে। কুমু যে সময়ে জন্মেছে সেই সময়ে একাকার হবার পালা আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তবু ওদের ঘরে আত্মসম্ভ্রমের একটা বাঁধা রীতি ছিল। কুমুর জন্ম তারই মধ্যে। বাইরের সমাজ যে কত পৃথক তা ও কল্পনাও করতে পারত না। ছেলেবেলা থেকে ভাই-এর স্নেহে পালিত কুমু নিঃসঙ্গিনী। এই নিঃসঙ্গ নির্জনতায় তার স্বাভাবিক ধ্যানপ্রবণতা কোনো বাধা না পেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। যে-যৌবনের

মুখে পুরুষের পূর্ণ আদর্শ তার মনকে অন্তরে, অন্তরে নিজের অগোচরেও আকর্ষণ করেছে সেই বয়সে তার ঠাকুরের মধ্যে সেই আদর্শের যে প্রতিষ্ঠা করেছে, বস্তুত আপনার নারীর প্রেম পূজার ছলে সেই ঠাকুরকেই দিয়েছিল। সেই ঠাকুরকে সে আপন ধ্যানের সমস্ত সম্পদ দিয়ে রচনা করেছে। এমন কুমু আপন সংস্কারের মোহে কল্পনা করলে যে বিবাহের প্রস্তাবে তার ঠাকুরই তাকে ডেকেছেন— স্বামীর মধ্যে এই ঠাকুরের আহ্বান সার্থক হবে, এই ঠাকুরের পূজাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। হয়তো ভক্তির জোরে তাই হতে পারত— হয়ত স্বামীকেও আপন ধ্যানের পরশপাথরে সে সোনা করে তুলত, কিন্তু মধুসূদনের স্থূল প্রকৃতি তাকে একান্তই বাধা দিলে— এইখানেই ট্রাজেডি। মধুসূদন অত্যন্ত হাল আমলের কৃতী পুরুষ— ধন ও বাহ্য মান উপার্জনে সিদ্ধিলাভেই তাঁর একান্ত লক্ষ্য। তাদের বংশও একদিন সম্মানী ছিল কিন্তু দারিদ্র্যের তলার পাঁকে লিপ্ত হয়ে তাদের আত্মসম্ভ্রমের দায়িত্ববোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। হাল আমলের প্রচলিত রীতি অনুসারে ধনের গৌরবকেই সে সব চেয়ে বড়ো বলে দাম্ভিকতায় স্ফীত হয়েছিল— এমন অবস্থায় কুমু তাকে আত্মসমর্পণ করতে পারলে না— তাতে তার আত্মসম্মানে নিরতিশয় ঘা দিলে— এতবড়ো অপমানকর সম্বন্ধ তার পক্ষে ব্যভিচারের সমতুল্য— এ যেন দেবতার অবমাননা— নিজের যা শ্রেষ্ঠ তাকে পঙ্কে বিলুণ্ঠিত করা। কুমুর এই পরিচয়ের মধ্যেই গল্পের সমাধা হল। ওর পরিচয়ের পক্ষে আর বেশি কোনো ঘটনার প্রয়োজন নেই।" ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬২, পৃ ৭৯-৮০।

পৃ ৩৪৯। কবির পাসপোর্ট লইয়া গণ্ডগোল হয় ভ্যান্‌কুভার মার্কিন কাস্টম্‌স্ আপিসে। ভুলক্রমে লস্‌এঞ্জেলিস্ -এর ঘটনা বলিয়া লেখা হইয়াছে।

পৃ ৩৬০। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তপতীর অভিনয়। এই বৎসর মধু বসু কবির 'মানভঞ্জন' গল্পটির আখ্যান লইয়া 'গিরিবালা' নামে নির্বাক্ চিত্র প্রস্তুত করেন। মাদান কোম্পানির নির্দেশে এইটি করা হয়। মধু বসু লিখিতেছেন, "চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণ হবার পর গুরুদেবের . . শরণাপন্ন হই। তিনি পরম যত্নে ও পরম স্নেহে গিরিবালার সিনারিওটি আদ্যোপান্ত সংশোধন কোরে দেন।. . পাতায় পাতায় কবির হস্তাক্ষর বিভূষিত সেই সংশোধিত সিনারিওটি আজও পরম যত্নে ও গৌরবে রক্ষা কোরচি। ক্রাউন সিনেমায় 'গিরিবালা' চিত্রের উদ্বোধন দিবসে গুরুদেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং ছবি দেখে খুশী হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেন।"— দীপালি, ১৩৪৮, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সংখ্যা।

পরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'দালিয়া' গল্পটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাটকাকার দান করেন। ১৯৩৩ মার্চ মাসে দালিয়ার পুনরভিনয় হয়। তৎপূর্বে 'দালিয়া'র কপি কবির কাছে পেশ করা হয়। "সেবার কবিগুরু মূল কাহিনীটাকে সম্পূর্ণ নূতন করে নাটকাকারে লিখে দেন। তৎকালীন এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে নাটকটি অভিনীত হয়। গুরুদেব অভিনয়রাত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয় দর্শনে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।" অথচ প্রতিমা দেবীকে লিখিয়াছিলেন, "দালিয়াটা ভালো লাগল না।" (চিঠিপত্র ৩, পত্র ৪৮)

মধু বসু লিখিতেছেন, "Harmony এবং melody-র সংমিশ্রণে প্রথম Harmonised Indian music -এর যখন প্রবর্তন হয় তখন এই নব পরিকল্পনার প্রেরণা পাই আমি রবীন্দ্রনাথের সুর ও ভাব থেকে। 'আলিবাবা' গীতিনাট্যের প্রথম Harmonised music -এর স্বরলিপি পুস্তকখানি আমি গুরুদেবের নামে উৎসর্গ করি। তিনি আমার একখানি music-এর উৎসর্গ পত্রের নিম্নভাগে এই কথাকয়টি লিখে দিয়ে নাম স্বাক্ষর করেন: "I hope this small beginning will grow into a great musical development."

মধু বসুর প্রতি কবির বিশেষ স্নেহ ছিল; ইঁহার পিতা প্রমথনাথ বসু ও জননী কমলা দেবী; কমলা দেবী

রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা। ইঁহাদের বিবাহসভায় বঙ্কিমচন্দ্র যুবক রবীন্দ্রনাথকে একদিন অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। মধু বসু শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন (১৯০৭-০৯)। আমাদের মনে হয় মধু বসু প্রভৃতির তাগিদেই কবি 'দালিয়া' গল্পটি লইয়া নিজেই একটা খসড়া করিয়া দেন। সেই 'অরচিত নাটকের পরিকল্পনা'র খসড়া বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ ১৩৫০ সংখ্যায় প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশ করেন। তাঁহারই এক খাতায় কবি এই খসড়াটি লিখিয়া রাখেন বলিয়া প্রকাশ। মধু বসু, "রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ", গীতবিতান পত্রিকা, রবীন্দ্রশতবার্ষিক জয়ন্তী সংখ্যা।

পৃ ৩৬২। সহজ পাঠ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৩৬ সালে। কবির পুরাতন খাতায় ১৩০২-০৩ সালের একটা খসড়া পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য, শ্রীকানাই সামন্ত, রবীন্দ্র-প্রতিভা (১৯৬১), পৃ ২৬৬-৬৭।

পৃ ৩৬৬। ১৯৩০ জানুয়ারি মাসের গোড়ায় কবি উত্তর-ভারতে যান; কানপুর, আগ্রা, লখনৌ প্রভৃতি স্থানে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হয়। কবি লখনৌতে অসিত হালদারের বাসায় ছিলেন; অসিতকুমার তখন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁহার 'রবিতীর্থে' গ্রন্থে এই অঞ্চলে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টার আভাস পাওয়া যায়।

পৃ ৩৭০। "The poet . . shared in the common life of our colleges at Selly Oak (for Woodbrooke is one of a family of eight colleges) . . He was present on several occasions at the devotional meetings . . At three of these he spoke briefly, and the words which he said and even more the spirit in which he said them made a very deep impression upon all his hearers."

—John S. Hoyland, "The Poet at Woodbrooke", *The Golden Book of Tagore*, p 113।

পৃ ৩৮০। কলিন্স (Dr. M. Collins)। আদৈয়ারে (মাদ্রাজ) মৃত্যু হয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি ১৯২৫-৩১ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন।—*Visva-Bharati News*, March 1933, p 76।

পৃ ৩৮৯-৯০। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, "হেলেন কেলার প্রসঙ্গ", আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ চৈত্র ১৩৬১। ১৩৬১ সালে হেলেন কেলার ভারত-ভ্রমণে আসেন। কতকটা বিবরণ দেওয়া গেল :

"ভারতবর্ষে পদার্পণ করে হেলেন কেলার 'গীতাঞ্জলি'র কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সকলের কাছে এ কথা সুবিদিত নয় যে, রবীন্দ্রনাথের মার্কিন-প্রবাস-কালে একদা তাঁর সঙ্গে হেলেন কেলারের সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, কবি তাঁকে নিজের কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মার্কিন-প্রবাস-কালে New History Society রবীন্দ্রনাথকে যে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন (৭ ডিসেম্বর ১৯৩০) তাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হেলেন কেলারও সম্মানিত অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন; সমসাময়িক পত্রিকা থেকে এই সভার বিবরণ মুদ্রিত করা গেল; এই প্রসঙ্গে আমেরিকায় রবীন্দ্র-সংবর্ধনার আংশিক বিবরণও পাঠকের গোচর হবে। সভার বিজ্ঞপ্তি—

Rabindranath Tagore, Indian poet and teacher, and Helen Keller, blind and deaf writer, will be guests of honour at a meeting of the New History Society at the Ritz-Carlton Hotel tonight during the course of which Rabindranath will deliver what is described as his farewell message to America. A short address written by Miss Keller also will be delivered. Rabindranath will speak on 'The First and Last Prophets

of Persia' while Miss Keller also will refer to the hope of a new idealism emerging out of competition and nationalism.—*New York Times*, 7 December 1930.

সভার বিবরণ—

American admirers of Rabindranath Tagore, Hindu poet and Nobel Prize-winner, feted him last night at a reception in the grand ball room of the Ritz-Carlton Hotel.

More than 3,000 persons gathered to pay homage to the great Indian philosopher, who sails for India on December 16. The reception was held under the auspices of the New History Society. Event of the evening was the receipt of a radiogram from Dr. Albert Einstein who is en route to New York on the Bengenland. The message said :

'May Tagore work further with success in the service of our ideals for the union of all nations. Greetings to Tagore.'

Tagore in a brief talk recalled the two great Persian prophets, Zoroaster and Abdulbaha, who, he said, were the first teachers to preach the unity of God with all mankind.

When he had finished, Helen Keller, famous blind woman, embraced him. She told the gathering that Tagore was the supreme prophet in a movement that would result in a world-wide awakening of the brotherhood of all nations.—*New York American*, 8 December 1930.

The World I Live in গ্রন্থে[১] হেলেন কেলার তাঁর অনেক বেদনা-ভাবনা অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থ তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন কবিকে উপহার দেন তখন তাঁর জীবনের মর্মবাণীর দ্যোতকরূপে রবীন্দ্রনাথের "আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী" কবিতার শেষ দুই ছত্রের অনুবাদ উপহারপত্রে উদ্‌ধৃত করে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—

To Rabindranath Tagore.

Yes, Master.

I forget, I ever forget, that the gates are shut everywhere in the house where I dwell alone ![২] Jan 4, 1921.

Hellen Keller

ভাবতে ভালো লাগে, সম্ভবত এই কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথ হেলেন কেলারকে পড়ে শুনিয়েছিলেন, এ কবিতাটির বিভিন্ন ব্যঞ্জনাসূত্রে উভয়ের মধ্যে ভাবৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

হেলেন কেলার *The Golden Book of Tagore* -এর জন্যে একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়া পাঠান।

১ হেলেন কেলারের অন্য কয়েকখানি গ্রন্থ— ***Optimism*** ; ***Out of the Dark*** ; ***My Religion*** ; ***The Song of the Stone Wall*** ; ***The Story of My Life.***

২ "কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাসরি।" অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের *The Gardener* গ্রন্থে আছে,—"**I am restless I am athirst for far-away things.**"

Will Durant -এর বই *The Case for India* : রবীন্দ্রনাথের সহিত উইল ডুরাণ্টের আমেরিকাতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে দেখা হয়। সেই সময় তিনি এক কবিপ্রশস্তি লেখেন, তাহা *The Golden Book of Tagore* -এ মুদ্রিত হয় (পৃ. ৭৫)। বোধ হয় তখনই তিনি কবিকে তাঁহার রচিত *The Case for India* গ্রন্থখানি উপহার দেন ও তাহাতে লিখিয়া দেন, "You alone are sufficient reason why India should be free."[১] কবি দেশে ফেরেন ৩১ জানুয়ারি ১৯৩১ এবং ডুরাণ্টের বইয়ের সমালোচনা লেখেন ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১। (*Modern Review*, March 1931)। এই বইখানি বাংলাদেশের বাজারে আসিতে পারে নাই— যদিও সেখানি সরকারিভাবে 'নিষিদ্ধ' বলিয়া ঘোষিত হয় নাই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ডুরাণ্ট তাঁহাকে এই বইখানি পাঠান, কিন্তু তিনি পান নাই। কলিকাতার বিশিষ্ট এক 'পুস্তকবিক্রেতা পঞ্চাশখানি বই-এর অর্ডার দিয়া একখানি বই' পান নাই।—"বঙ্গের পুস্তকালয় ও বঙ্গভাষা", প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃ ৫০৯।

দেশে ফিরিবার এগারো দিন পরে তিনি যেদিন 'আমি' কবিতা (পরিশেষ) লেখেন, সেইদিনই ডুরাণ্টের বইয়ের সমালোচনা লেখেন (১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১)।

পৃ ৩৯২। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা সম্বন্ধে : তিনি 'আলেখ্য' কবিতায় (২৪ জুলাই ১৯৩২। পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ ২৬৮-৬৯) লিখিতেছেন :

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটনলেখায়।
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি,
যে সংসারে হতেছে বিচার
নিন্দাপ্রশংসার।
এই আস্পর্ধার তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।. .
অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি'
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।. .
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে
আনিয়াছি তোকে।. .
সুষমার অন্যথায়
ছন্দ কি লজ্জিত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়।

১ কবিপ্রশস্তিতেও Durant একস্থলে লেখেন ; "It is inconceivable to us that a nation capable of producing, even in the bitterest poverty and destitution, poets like yourself, scientists like Bose and Raman, and saints like Mahatma Gandhi, should not soon be welcomed into the fellowship of self-governing peoples."

যদিও তাই-বা হয়
নাই ভয়,
প্রকাশের ভ্রম কোনো
চিরদিন রবে না কখনো।
রূপের মরণত্রুটি
আপনিই যাবে টুটি
আপনারি ভারে,
আরবার মুক্ত ছবি দেহহীন অব্যক্তের পারে।

এইদিন লেখেন 'জলপাত্র' কবিতা (পরিশেষ)। এই কবিতাটির মধ্যে চণ্ডালিকার আখ্যানের প্রথমাংশ পাওয়া যায়। এক বৎসর পরে নাটিকাটি লেখেন।

পৃ ৪০৯। শিশুতীর্থ। সমসাময়িক অনেকগুলি ঘটনা বিচার্য: কানপুরের হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা, কলিকাতায় পুস্তক-প্রকাশক ভোলানাথ সেন ও দোকানের একজন কর্মচারীর হত্যা, চট্টগ্রামে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের ধনসম্পত্তি-লুণ্ঠন (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৮)। হজরত মহম্মদের এক দুষ্প্রাপ্য ছবি প্রকাশক বহু অনুসন্ধান ও ব্যয় করিয়া বিলাত হইতে সংগ্রহ করেন; উহা কোনো পারসিক পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত। সেই ছবি পাঠ্য-পুস্তকে দেওয়ার জন্য প্রকাশক ভোলানাথ সেন ও তাঁহার এক কর্মচারী সীমান্ত-প্রদেশ হইতে আনীত মুসলমান যুবকদের দ্বারা নিহত হন।

এই-সকল ঘটনার মধ্যে, শান্তি-স্থাপনের জন্য মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা, ও অবশেষে পরাভব নিশ্চিত জানিয়াও বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ভাদ্র মাসে ইংলণ্ড-যাত্রা, প্রভৃতি ঘটনা স্মরণীয়। বিদেশে জাপান চীনের নিকট হইতে মানচুরিয়া ছিনাইয়া লইয়া চীন আক্রমণের জন্য অস্ত্রে শান দিতেছে। নানা হিংসামূলক ঘটনা এবং তাহার বিরুদ্ধে গান্ধীজির অভিযান, এই ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষণীতে 'শিশুতীর্থ' ও 'নরদেবতা' ভাষণ পরিলক্ষণীয়। 'নরদেবতা' শান্তিনিকেতনের মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ মনে হইতেছে— ভাদ্র মাসে— প্রবাসীর আশ্বিন ১৩৩৮ (পৃ ৭৪৯-৫৪) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই বিশ্বব্যাপী ঘনায়মান হিংসাত্মক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিনে কবির স্মরণ হইতেছে খ্রীষ্টকে— যিনি শিশুরূপে, মানবপুত্ররূপে, নরদেবতারূপে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজিকার ভারতে মহাত্মাজি তাহারই প্রতীক। এই আলোকে 'নরদেবতা' ভাষণটি পাঠ করা যাইতে পারে। এই ভাষণের একস্থলে কবি পরমপুরুষকে 'মানবিক' বলিয়াছেন কেন, তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন (পৃ ৭৫৩)। ১৯৬২ অব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে শিশুতীর্থ ও *The Child* একত্র মুদ্রণ করিয়া প্রকাশিত হয়।

মানবপুত্র। ২ অগস্ট ১৯৩২ এনড্রুজ-লিখিত *What I Owe to Christ* গ্রন্থখানি কবি পড়েন; উহা তাঁহাকে উৎসর্গিত হয়। আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থ পাঠের পর (ঐ তারিখের পর) কোনো সময়ে কবিতাটি লিখিত। 'মানবপুত্র'র তারিখ নাই, সন আছে ১৩৩৯।

পৃ ৪১৫। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মোৎসব। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গ্যেটের (Goethe) দ্বিশতবার্ষিকী জন্মোৎসব। Welt-Goethe Ehrung (World-Goethe-Honouring) -এর উদ্যোক্তা অধ্যাপক Ch. H. Klenkens -এর নিকট হইতে গ্যেটে-স্মরণ-উৎসবের আয়োজন-সভায় যোগ দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ হয়। কবি ১১ অক্টোবর ১৯৩১ (২৪ আশ্বিন ১৩৩৮) এই পত্রখানি দেন: "Dear Sir, I gladly consent

to become a patron of the World-Goethe-Honouring which you are organising in Germany. I feel proud to associate myself with your project and thus render my homage to the undying memory of Goethe." অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "গয়টে ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দ্র "গ্যেটে দ্বিশতবার্ষিকী", বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭, পৃ ২৩৯-৫৪।

গ্যেটের সহিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে, কয়েকটি উদাহরণ উদ্‌ধৃত হইতেছে :

"He (Goethe) regarded his poems as something secret, almost sacred, or, to use favourite word of his, 'daemonic'; something produced unconsciously by that inner self, the true but unknown self." —Nevinson, p. 73.

"When I was eighteen, all my country was eighteen too."— Goethe told Eckermann in 1824. —Nevinson, p. 5.

"Goethe, whose own experience coloured all his works was always afterwards desirous to obliterate any trace of this, and suffer no one to detect the links between his life and his publications. When to that was added the further necessity of concealing any incoherence caused by frequent re-writing he took great pride in accomplishing the best." —Ludwig, p. 86.

পৃ ৪১৬। সোভিয়েট সম্বন্ধে : "এ কথা মানি, যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্রমন্থনের মতো সে বিষও উদ্‌গার করে। পশ্চিম-মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আস্‌চে।.. কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তি-সম্পদকে দোষ দেব না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে। খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে শুদ্ধ টান মারে নি; উল্টে, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুরিয়ে দিতে চায়।"— "বাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত", প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৮, পৃ ১১০।

পৃ ৪৩৬। পাদটীকা। পারস্য ও ইরাকে, ১৯৩২; 'বুশেয়ারের সর্বসাধারণ ও বুশেয়ারের গবর্ণর কর্তৃক অভিনন্দন' প্রভৃতি কয়েকটি বক্তৃতার রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুমোদিত অনুবাদ ১৩৩৯ ভাদ্র ও চৈত্র সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৫২০-২২; কবির উত্তর— ঐ, পৃ ৫২২-২৩; কবির সংবর্ধনা-ভোজের অন্তে বুশেয়ারের গবর্নরের বক্তৃতা ও কবির উত্তর— ঐ, পৃ ৫২৩-২৪। কবি-কর্তৃক পারস্য-সম্রাট রেজা শাহ পহ্লবীর নিকট প্রেরিত টেলিগ্রামের অনুবাদ— ঐ, পৃ ৫২৪-২৫। পারস্য-সম্রাটের উত্তর— ঐ, পৃ ৫২৫।

বোগদাদ ম্যুনিসিপ্যালিটি কর্তৃক ম্যুনিসিপ্যাল উদ্যানে কবি-সংবর্ধনা উপলক্ষে কবির বক্তৃতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৫২৫-২৭।

পৃ ৪৫২। বিচিত্র কাজ। কবি পুনা হইতে ফিরিয়া খড়দহে আসেন। ৮ কার্তিক ১৩৩৯ (২৬ অক্টোবর ১৯৩৩) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ২৮১।

পৃ ৪৫৮। মানুষের ধর্ম। *The Religion of Man* প্রকাশিত হইলে J. C. Smuts গ্রন্থখানি পাঠ করেন। স্মাটসের নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ আছে; তাহাকে বলা হয় Holism (*Holism and Evolution*, 1926)।

স্মাট্‌স্ *The Religion of Man* সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "It is in every way a fine achievement—perhaps the best work Tagore has yet written."

পৃ ৪৬৮। কলিকাতায় কবি ছিলেন বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্রের বাসায়। এই সময়ে মধু বসুর তত্ত্বাবধানে 'দালিয়া'র অভিনয়, 'মায়ার খেলা'র অভিনয় দুইদিন দেখিতে গিয়াছিলেন। এ অভিনয় শান্তিনিকেতনের ব্যবস্থায় হয় নাই। প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশের বিবাহের প্রথম সাম্বৎসরিক তিথিতে (রবিবার। ২১ ফাল্গুন ১৩৩৯। ৫ মার্চ ১৯৩৩) কবিকে উপস্থিত থাকিতে হয় (দ্র চিঠিপত্র ৩, পত্র ৪৮)। বোধ হয় ৭ মার্চ কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। এম্পায়ার থিয়েটরে 'শাপমোচন' অভিনয়ের সময় পুনরায় কলিকাতায় গিয়া বরাহনগরে উঠেন।

পৃ ৪৮৫। ১২ অগস্ট ১৯৩৩ কলিকাতাস্থ অস্থায়ী জারমান কন্সাল-জেনারেল ডক্টর হার্বার্ট রিখটার (Richtor) শান্তিনিকেতনে আসেন ও কবির সহিত দেখা করেন। সন্ধ্যায় কন্সাল-জেনারেল ছাত্রদের নিকট যে বক্তৃতা দেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। বক্তা যুদ্ধোত্তর জারমেনির দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে জারমেনিতে গণতন্ত্রমূলক পার্টিপ্রথার গবর্নমেণ্ট কার্যকরী হয় নাই। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারের নেতৃত্ব গ্রহণের পর হইতে দেশের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি হিটলারের প্রশস্তি করেন। লোকে হিটলারের শাসনে জারমেনির পুনরভ্যুত্থানের আশা তখন করিত। জানি না, এই বক্তৃতা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে কী প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। দ্র *Visva-Bharati News*, September 1933, pp. 19-20.

পৃ ৪৮৬। 'তাসের দেশ' লিখিত হয় আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৪০ সালে। তুলনীয় 'বিচিত্রিতা'র একাকিনী (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, পৃ ১১) ও 'পরিশেষে'র রাজপুত্র (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ ২১৩)। উভয়ই ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮ (১২ মার্চ ১৯৩২) বঙ্গাব্দে লিখিত। কবিতা দুটি পরস্পরের পরিপূরক। এখানে অজানা দেশ হইতে রাজপুত্র আসিয়া নূতন প্রাণ সঞ্চার করিল।

'চণ্ডালিকা' প্রায় এই সময়েই লিখিত। এক বৎসর পূর্বে (২৩ জুলাই ১৯৩২) রচিত 'জলপাত্র' শীর্ষক কবিতার (পরিশেষ) মধ্যে নাটিকার প্রথমাংশের কাহিনীটুকু আছে। সেখানে নারীর উক্তি :

চাহিলে তৃষ্ণার বারি— আমি হীন নারী
তোমারে করিব হেয়, সে কি মোর শ্রেয়।

প্রভুর উক্তি :

সুন্দরের কোনো জাত নাই, মুক্ত সে সদাই। . .
মোর কথা শোনো, শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।

এই কবিতাটি পাঠের পর 'চণ্ডালিকা' পড়িলেই ভাবসাম্য স্পষ্ট হইবে।

পৃ ৪৮৭। অভিনয়ের তারিখ : ১২, ১৩, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩। ২৭, ২৮, ৩০ ভাদ্র ১৩৪০।

পৃ ৪৯১। জবহরলাল নেহরু ও কমলা নেহরু ১৯ জানুয়ারি ১৯৩৪ আসেন। '১০ জানুয়ারি' ছাপার ভুল। দ্র *Visva-Bharati News*, January 1934, p. 51.

পাদটীকা ৪ ভুল। এইটি পরপৃষ্ঠায় পাদটীকা ১ হইবে। এবং ৪৯২ পৃষ্ঠার পাদটীকা ১ পূর্বপৃষ্ঠার পাদটীকা ৪ হইবে।

বিহারে ভূমিকম্প— ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৪। 'ভূমিকম্প' কবিতাটি লিখিত হয় ৬ চৈত্র (১৩৪০) [১৮ মার্চ ১৯৩৪]। দ্র নবজাতক।

পৃ ৫০০। শ্রীপল্লী। দ্র "Sripalli", *Visva-Bharati News*, October 1936, pp. 28-31. Quoted from *Ceylon Observer*।

পৃ ৫০২। শ্রাবণগাথা-অভিনয়ের তিনদিন পরে ১৫ অগস্ট ১৯৩৫ "A Letter to an English Friend" লিখিত।—*Visva-Bharati News*, December 1935, pp. 43-44। কোনো ইংরেজ মহিলা শান্তিনিকেতনে আসেন; তিনি অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ও তাহাদের মধ্যে intellectual pessimism, political bitterness প্রভৃতি লক্ষ্য করেন। সেই সম্বন্ধে কবির মত এই পত্রমধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পৃ ৫০৫। মাদ্রাজ। দ্র *Visva-Bharati News*, October 1934, p. 34। Rabindranath's reply to the Madras Corporation Address, pp. 35-37.

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

পৃ ১। ২য় পংক্তি 'শান্তিনিকেতন ফিরিলেন।' ইহার কয়েকদিন পরে পৌষ-সংক্রান্তি ১৩৪১ (জানুয়ারি ১৯৩৫) শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ -সম্পাদিত 'মহাকোষ' সম্বন্ধে অভিমত দেন। দ্র বঙ্গীয় মহাকোষ, ১২শ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠা।

পৃ ১৪। পাদটীকা ৩। সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র। দ্র ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র সেন -সম্পাদিত, পৃ ২১২-১৩।

পৃ ২২। "আশ্রমের শিক্ষা", প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৩ (১৩৪২ নহে)। নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের (NEF) বঙ্গীয় শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্মিলনীতে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬) যে কয়টি প্রবন্ধ পঠিত হয়, সেগুলি 'শিক্ষার ধারা' নামে প্রকাশিত হয় (ভাদ্র ১৩৪৩)। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে আশ্রমের শিক্ষা প্রথম মুদ্রিত হয়। অতঃপর ১৩৫১ সালে 'শিক্ষা' গ্রন্থের যে নূতন সংস্করণ বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ হইতে প্রকাশিত হয় তাহাতে ইহা সন্নিবেশিত হয়। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' বিশ্বভারতী বুলেটিন আকারে প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৪৮ সালে।

পৃ ২১। পাদটীকা ১। 'শিক্ষা': পশ্চিমবঙ্গ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (১০শ খণ্ড, পৃ ৬৯৬-৯৯) প্রবন্ধটি আছে।

পৃ ৩৯। পাদটীকা ৫। কবিতাটি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ডের ৯১১

পৃ ৬৬। ছন্দ। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে (আষাঢ় ১৩৪৩) কবির 'ছন্দ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে (কার্তিক ১৩৬৯) প্রবোধচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'ছন্দে'র নূতন সংস্করণ বাহির হয়। ১ম সংস্করণে মূল পাঠ ১৯৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; পরিশিষ্ট ২০৩-৩৯। পরিবর্ধিত সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৭১।

পৃ ১৪৩। রাখালচন্দ্র সেনের 'সপ্তপর্ণ' নামে ছোটোগল্পের বই বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ হইতে প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ১৩৪৫)। 'সহযাত্রী' নামে গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এ ধারার গল্প আমাদের সাহিত্যে দেখি নি। কেবল যে বিষয়টি য়ুরোপীয় তা নয়, রসের তীব্রতা এবং আখ্যানের চমকলাগানো নাট্যবিকাশের মধ্যে য়ুরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়। আরো যেটি লক্ষ্য করেছিলুম সে হচ্চে ঘটনার যাথার্থ্য, অপরিচয়বশত বাঙালীর হাতে যে ত্রুটি ঘটতে পারত তা এতে কিছু ঘটে নি। পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম।" —প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃ ৪২৪।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মদিনে কবির আশীর্বাদ। ১৮ আশ্বিন, শুক্লপঞ্চমী, ১৩৩৯ [৪ অক্টোবর ১৯৩২]।

পরিশেষ, সংযোজন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ ৩০৮-০৯।

পৃ ১৮৫। পুরীতে কবির বাড়ি ছিল। তৎসম্বন্ধে দ্র চিঠিপত্র ৬, পত্র ৪ এবং পরিশিষ্ট, পৃ ১৭২-৭৩।

পৃ ২১২। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কোয়েকার (Society of Friends) খ্রীষ্টানরা মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদে এক কনফারেন্স হইতে যুদ্ধ সম্বন্ধে বিবৃতি প্রকাশ করেন; রবীন্দ্রনাথ সেইটি পাইয়া লিখিলেন (জানুয়ারি ১৯৪০): "When history suddenly goes wrong with an appalling immensity of human sacrifice we claim from all great religions to send abroad their warning and their call. Unfortunately in such a crisis of collective moral aberration the spiritual man in us is too often persuaded to form either passively or in active agreement an unholy co-operation with the power that blindly runs amuck spreading devastation.

"There are frenzied occasions when bombs are hurled from the air upon priceless heritages of man shattering them into dust, but the worst of all havocs done to humanity happens when sacred vehicles of life's noble ideals are injured and made inactive by the virulent passion that poisons the atmosphere. And therefore it gives us an assurance of hope as we meet with an uuwavering assertion of faith in humanity such as we find in this paper, the challenge of the Christian ideal so bravely and beautifully uttered urging for peace and justice and resistance to evil force. During a world-wide comtamination of violence and hatred we badly need some signs of the triumph of the Divine Spirit, dwelling in man, defying the congregated might of malignity."—*Visva-Bharati News*, March 1940, pp. 70-71.

পৃ ২২৭। মৃত্যুসংবাদ: সি. এফ. এনড্রুজ, ৫ এপ্রিল ১৯৪০; সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩ মে ১৯৪০; কালীমোহন ঘোষ, ১২ মে ১৯৪০; অমিতা সেন (খুকু), ২৪ মে ১৯৪০; কিশোরীমোহন সাঁতরা, ২০ অক্টোবর ১৯৪০; গৌর-গোপাল ঘোষ, ৯ নভেম্বর ১৯৪০।

পৃ ২৫০। চিত্রলিপি সম্বন্ধে মতের পর। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে যামিনী রায়ের মূল প্রবন্ধের চুম্বক: ১. রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন খাঁটি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে. সুতরাং তাঁর ছবি বোঝবার যাঁরা চেষ্টা করবেন, তাঁদের পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ জানতে হবে। ২. ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তাঁর সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, শিল্প-ইতিহাসের পর পর স্তরগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না অথচ ছবিগুলি দেখলে বোঝবার উপায় নেই যে, তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে তিনি রেখা ও রঙের ব্যবহার আশ্চর্য রকমে আয়ত্ত করেছিলেন। এই নিয়ম-মাফিক শিক্ষার অভাব হেতু কোনো কোনো ক্ষেত্রে পতন ঘটেছিল তাঁর। যাঁরা তাঁর চিত্রসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এই দিকে তাঁরা সজাগ থাকলে ভালো হত। আশ্চর্য সক্ষমতার সঙ্গে অক্ষমতার মিলন দৃষ্টিকটু। সম্পূর্ণ কল্পনা থেকে আঁকা অবাস্তব ছবির মধ্যে এখানে ওখানে রিয়ালিস্টিক ছোঁয়াচ লাগাতে রসাভাস হয়েছে। ৩. রবীন্দ্রনাথের ছবি বড় তাঁর সবলতার জন্যে, ছন্দোবোধের জন্যে, যে বস্তু দুটির অভাব বাংলাদেশের আজকালকার ছবিতে প্রত্যক্ষ করি। ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি সতেজ শক্ত শিরদাঁড়া নিয়ে কারবার করেছেন। ৪. রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সব চাইতে বিস্ময়কর তাঁর কল্পনার বিরাটত্ব। সর্বত্রই দেখি, তিনি বৃহৎকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

মূল প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে (২৫ মে ১৯৪১) শান্তিনিকেতন হইতে একখানি পত্র দেন :

"এখনো আমি শয্যাতলশায়ী। এই অবস্থায় আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে আমি বড়ো আনন্দ পেয়েছি। আমার আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে আমার ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই। আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কোনো দ্বিধা করি নে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কি না আমি নিজে তা জানি নে। সেইজন্যে তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়। যখন প্যারিসের আর্টিস্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন, তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোন্‌খানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি নি। বোধ করি শেষ পর্যন্তই তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার দ্বিধা দূর হবে না। আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাঁদের দোষ দেই নে। আমি জানি, চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয় নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই, বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম। এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না। এই জন্যে তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি এবং কামনা করি তোমার কীর্তির পথ জয়যুক্ত হোক।" —শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ৯৪৯-৫০।

যামিনী রায়কে উপরি-উক্ত পত্র লিখিবার বারো দিন পরে কবি পুনরায় তাঁহাকে 'ছবি' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :

"ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি। এই জন্য তার একটি অহৈতুক আনন্দ আছে। চোখে দেখি, সে যে কেবল সুন্দর দেখে বলি, খুশি হই— তা নয়। দৃষ্টির উপরে দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্রেক করে রাখে। ছেলেবেলায় নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতুম, কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নানা কিছু চোখে পড়ত, তার ঔৎসুক্য মনকে জাগিয়ে রাখত। এই হল ছবির জগৎ। যে দেখায় মনটাকে টানে না, যা একঘেয়ে, যার বিশেষ রূপের বৈচিত্র্য নেই তার মধ্যে যেন মন নির্বাসিত হয়ে থাকে। সে আপন পুরো খোরাক পায় না। ছবির তত্ত্ব এর থেকেই বুঝব। দেখবার জিনিসকে সে আমাদের দেয়, না দেখে থাকতে পারি নে, তাতে খুশি হই। মানুষ আদিকাল থেকে এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে, নানা রকম ছাপ পড়ছে মনে। যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মনকে অধিকার করে নেয়, কোনো একটা বিশেষত্ব-বশত— তা সুন্দর হোক বা না হোক, মানুষ তাকে আদর করে নেয়, তাতে তার চারি দিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে। আমরা দেখতে চাই, দেখতে ভালোবাসি। সেই উৎসাহে সৃষ্টিলোকে নানা দেখবার জিনিস জেগে উঠছে। সে কোনো তত্ত্বকথার বাহন নয়, তার মধ্যে জীবনযাত্রার প্রয়োজন বা ভালোমন্দ বিচারের কোনো উদ্যোগ নেই। আমি আছি, আমি নিশ্চিত আছি, এই কথাটা সে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তাতে আমি আছি এই অনুভূতিকেও কোনো একটা বিশেষ ভাবে চেতিয়ে তোলে। ছবি কী, এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, যতই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় ভালো। তার ভালো-মন্দের আর কোনো রকম যাচাই হতে পারে না। আর যা-কিছু সে অবান্তর অর্থাৎ যদি সে কোনো নৈতিক বাণী

আনে, তা উপরি দান। যখন ছবি আঁকতুম না তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেল। গাছপালা, জীবজন্তু, সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারি দিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্তদ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখাবার আনন্দ এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে।.. ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম; তুমি গুণী, তুমি এর মর্ম বুঝবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না, দেখতে পাবে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানা কাজে ঘোরা-ফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে, 'অয়ম্ অহম্ ভো'— এই যে আমি এই।"

কবি এই পত্রখানি যামিনী রায়কে লেখেন ৭ জুন ১৯৪১, মৃত্যুর ঠিক দুইমাস পূর্বে— কবির শেষ মন্তব্য। দ্র প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃ ৪০৬।

ইহার পর বিশু মুখোপাধ্যায়কে ২৩ জুন তারিখে যে পত্র দেন, তাহাই ছবি সম্বন্ধে কবির শেষ পত্র। 'পরিচয়' পত্রিকায় বিশু মুখোপাধ্যায়ের আর্টের উপর একটি প্রবন্ধ পড়িয়া এই পত্র লিখিত হয়। "ছবির স্বৈরাচার", প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৮, পৃ ২০।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা হইয়াছে ও হইবে। মনোরঞ্জন গুপ্ত -লিখিত 'রবীন্দ্রচিত্র-কলা' ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় -কৃত এই গ্রন্থের সমালোচনা পর পর পাঠ করিলে পাঠকদের কবির চিত্রকলা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হইবে। দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ ২৮১-৮৬।

কবির উক্তি:

"The world of sound is a tiny bubble in the silence of the infinite. The universe has its only language of gesture, it talks in the voice of picture and dance."

১৮৮৭

আগে চল্, আগে চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই।

১৯৩৭

চলো যাই চলো, যাই চলো, যাই—
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে,
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।
চলো মুক্তিপথে,
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে.

...

চলো দুর্গম দূরপথযাত্রী
চলো দিবারাত্রি,
করো জয়যাত্রা,
চলো বহি নির্ভয় বীর্যের বার্তা.

...

দূর করো সংশয়শঙ্কার ভার,
যাও চলি তিমির দিগন্তের পার।

...

চলো জ্যোতির্লোকে
জাগ্রত চোখে,

...

চলো অভয় অমৃতময় লোকে
অজর অশোকে,
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—
অমৃতের জয় বলো ভাই॥

১৯৩৫ হইতে অদ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের নব-প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ

শান্তিনিকেতন। ভাষণ। প্রথম খণ্ড। মাঘ ১৩৪১ [১৯৩৫]। দ্বিতীয় খণ্ড। বৈশাখ ১৩৪২ [১৯৩৫]। কবি-কর্তৃক মার্জিত বহুশঃবর্জিত ও নূতন সংযোজন -যুক্ত।

শেষ সপ্তক। গদ্যকাব্য। ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ [১৯৩৫]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি পরিবর্ধিত সংস্করণে [১৯৬১] দশটি নূতন কবিতা সংযোজিত।

সুর ও সঙ্গতি। [১ অগস্ট ১৯৩৫] 'অতুলপ্রসাদের স্মরণে'। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পত্রালাপ। ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় -লিখিত পত্রও ইহার অন্তর্গত।

বীথিকা। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪২ [১৯৩৫]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি পরিবর্ধিত সংস্করণে [১৯৬১] দশটি নূতন কবিতা সংযোজিত।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ফাল্গুন ১৩৪২ [১৯৩৬]। চিত্রাঙ্গদা [১৮৯২] নাট্যকাব্যের নৃত্যাভিনয়ের নূতন রূপ।

পত্রপুট। গদ্যকাব্য। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান কৃষ্ণ কৃপালানি ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দিতার শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে আশীর্বাদ'।

ছন্দ। প্রবন্ধ। আষাঢ় ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান দিলীপকুমার রায়কে'। পরিবর্ধিত সংস্করণ, কার্তিক ১৩৬৯ [১৯৬২]।

জাপানে-পারস্যে। ভ্রমণকথা। শ্রাবণ ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু'। পূর্বতন 'জাপান-যাত্রী' [১৯১৯] ও নূতন 'পারস্যভ্রমণ' একত্র গ্রথিত। স্বতন্ত্র আকারে পুনঃপ্রকাশ— পরিবর্ধিত তথ্যসমৃদ্ধ রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ : জাপান-যাত্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ [১৯৬২]; পারস্য-যাত্রী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭০ [১৯৬৩]

শ্যামলী। গদ্যকাব্য। ভাদ্র ১৩৪৩ [১৯৩৬]। উৎসর্গ : 'কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবীশ'।

সাহিত্যের পথে। প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৪৩ [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে'। পরিবর্ধিত সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৫। সংযোজন অংশে দশটি নূতন রচনা সংকলিত।

পাশ্চাত্য ভ্রমণ। পত্র ও ডায়ারি। আশ্বিন ১৩৪৩ [১৯৩৬]। পরিবর্তিত য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র [১৮৮১] ও দ্বিতীয়-খণ্ড য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি [১৮৯৩] একত্র সংকলিত।

প্রাক্তনী। অভিভাষণ-সংগ্রহ। পৌষ ১৩৪৩ [১৯৩৬]। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের বিভিন্ন সভায় কথিত। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, ৭ পৌষ ১৩৬৬ [১৯৫৯]।

খাপছাড়া। ছড়া। মাঘ ১৩৪৩ [১৯৩৭]। 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বন্ধুবরেষু'। কবি-কর্তৃক অঙ্কিত বহু চিত্র ও রেখাচিত্র -সহ।

কালান্তর। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩৪৪ [১৯৩৭]। সংস্করণ, পৌষ ১৩৫৫ [১৯৪৮]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণে [১৯৬১] সাতটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত।

সে। গল্প। বৈশাখ ১৩৪৪ [১৯৩৭]। 'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য করতলযুগলেষু'। কবি-কর্তৃক অঙ্কিত বহু চিত্র ও রেখাচিত্র -সহ।

ছড়ার ছবি। কাব্য। আশ্বিন ১৩৪৪ [১৯৩৭]। 'বৌমাকে' [শ্রীমতী প্রতিমা দেবী]। শ্রীনন্দলাল বসু -কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র-সহ।

বিশ্ব-পরিচয়। বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৪৪ [১৯৩৭]। 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রীতিভাজনেষু'।

প্রান্তিক। কাব্য। পৌষ ১৩৪৪ [১৯৩৮]।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য। ফাল্গুন ১৩৪৪ [১৯৩৮]। চণ্ডালিকা [১৯৩৩]। নাটকের নৃত্যোপযোগী রূপান্তর।

পথে ও পথের প্রান্তে। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ [১৯৩৮]। শ্রীমতী রানী মহলানবীশকে লিখিত পত্রাবলী।

পত্রধারা। ১-৩ খণ্ড। ১৩৪৫ [১৯৩৮]। 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'পথে ও পথের প্রান্তে' একত্র 'পত্রধারা' নামে প্রকাশিত হয়।

সেঁজুতি। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪৫ [১৯৩৮]। 'ডাক্তার স্যার্ নীলরতন সরকার বন্ধুবরেষু'।

বাংলাভাষা-পরিচয়। প্রবন্ধ। ১৯৩৮। 'ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করকমলে'।

প্রহাসিনী। কাব্য। পৌষ ১৩৪৫ [১৯৩৯]।

আকাশ-প্রদীপ। কাব্য। বৈশাখ ১৩৪৬ [১৯৩৯]। 'শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু'।

শ্যামা। নৃত্যনাট্য। স্বরলিপি-সহ। ভাদ্র ১৩৪৬ [১৯৩৯]। 'পরিশোধ' [১৮৯৯] কবিতা হইতে 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্য [১৯৩৬] হয়, তাহারই সুসমৃদ্ধ রূপান্তর।

পথের সঞ্চয়। লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা ১। ভাদ্র ১৩৪৬ [১৯৩৯]। ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে লিখিত পত্রাবলী। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, মাঘ ১৩৬৮ [১৯৬২]।

নবজাতক। কাব্য। বৈশাখ ১৩৪৭ [১৯৪০]।

সানাই। কাব্য। আষাঢ় [শ্রাবণ] ১৩৪৭ [১৯৪০]।

ছেলেবেলা। বাল্যস্মৃতি। ভাদ্র ১৩৪৭ [১৯৪০]।

চিত্রলিপি [১]। সেপ্টেম্বর ১৯৪০। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের সংগ্রহ। চিত্র-বিষয়ক কবিতা ও তাহার ইংরেজি অনুবাদ -সহ।

তিনসঙ্গী। গল্প। পৌষ ১৩৪৭ [১৯৪০]।

রোগশয্যায়। কাব্য। পৌষ ১৩৪৭ [১৯৪০]।

আরোগ্য। কাব্য। ফাল্গুন ১৩৪৭ [১৯৪১] উৎসর্গ 'কল্যাণীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর'।

জন্মদিনে। কাব্য। ১ বৈশাখ ১৩৪৮ [১৯৪১]।

সভ্যতার সংকট। অভিভাষণ। ১ বৈশাখ ১৩৪৮ [১৯৪১]। শান্তিনিকেতনে অশীতিবর্ষপূর্তি-উৎসবের ভাষণ।

গল্পসল্প। খোশ-গল্প ও কবিতা। বৈশাখ ১৩৪৮ [১৯৪১]। 'নন্দিতাকে'।

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। প্রবন্ধ। আষাঢ় ১৩৪৮ [১৯৪১]।

১৩৪৮, ২২ শ্রাবণের পরে প্রকাশিত

স্মৃতি। শ্রাবণ ১৩৪৮ [১৯৪১]। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র।

ছড়া। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪৮ [১৯৪১]।

শেষ লেখা। কাব্য। ভাদ্র ১৩৪৮ [১৯৪১]।

চিঠিপত্র ১। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯ [১৯৪২]। মৃণালিনী দেবীকে লিখিত পত্র।

চিঠিপত্র ২। আষাঢ় ১৩৪৯ [১৯৪২]। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র।

চিঠিপত্র ৩। অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ [১৯৪২]। শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্র।

[illegible] পরিচয়। প্রবন্ধ। ১ বৈশাখ ১৩৫০ [১৯৪৩]।

সাহিত্যের স্বরূপ। প্রবন্ধ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ, বৈশাখ ১৩৫০ [১৯৪৩]।

চিঠিপত্র ৪। পৌষ ১৩৫০ [১৯৪৩]। মাধুরীলতা, মীরা, নীতু, নন্দিতা ও নন্দিনীকে লিখিত পত্র।

স্ফুলিঙ্গ। কবিতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৫২ [১৯৪৫]। পূর্বপ্রকাশিত [১৯২৭] 'লেখন'এর সগোত্র, তবে ইংরেজি রচনা নাই। পরিবর্ধিত রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৭ [১৯৬১]। ইহাতে ৬২টি নূতন কবিতা সংযোজিত হইয়াছে।

চিঠিপত্র ৫। পৌষ ১৩৫২ [১৯৪৫]। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র।

সঞ্চয়ন। কবিতা-সংকলন। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৪ [১৯৪৭]।

মহাত্মা গান্ধী। প্রবন্ধ ও অভিভাষণ। ২৯ মাঘ ১৩৫৪ [১৯৪৮]।

মুক্তির উপায়। নাটক। শ্রাবণ ১৩৫৫ [১৯৪৮]। 'মুক্তির উপায়' [১৮৯২] গল্পের নাট্যরূপ।

গীতবিতান। তৃতীয় খণ্ড। গান। আশ্বিন ১৩৫৭ [১৯৫০]। এই খণ্ডে বহু অপ্রচলিত ও অপ্রকাশিত গান সংকলিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতী। প্রবন্ধ। ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫১]।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। প্রতিষ্ঠা-দিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যপ্রণালী। ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫১]।

বৈকালী। গান ও কবিতা। ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫১]। ১৩৩৩ সালে মুদ্রিত, কিন্তু তখন প্রচারিত হয় নাই। কবির হস্তাক্ষরের প্রতিচিত্ররূপে মুদ্রিত।

চিত্রলিপি ২। ৭ পৌষ ১৩৫৮ [১৯৫১]। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের সংগ্রহ।

সমবায়নীতি। প্রবন্ধ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালার শততম গ্রন্থ। ১৩৬০ [১৯৫৪]।

চিত্রবিচিত্র। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৬১ [১৯৫৪]। শিশুরঞ্জন বহু অপ্রকাশিত ও কয়েকটি পূর্বপ্রকাশিত কবিতার সংকলন।

ইতিহাস। প্রবন্ধ। ২২ শ্রাবণ ১৩৬২ [১৯৫৫]। ইহার কয়েকটি প্রবন্ধ পূর্বে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

বুদ্ধদেব। কবিতা ও প্রবন্ধ। বুদ্ধপূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ [১৯৫৬]। বুদ্ধদেব-সম্বন্ধীয় বিবিধ রচনার সংকলন। কতকগুলি রচনা পূর্বে কোনো গ্রন্থ-ভুক্ত হয় নাই।

চিঠিপত্র ৬। শক বৈশাখ ১৮৭৯ [১৯৫৭]। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত পত্র। প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রবীন্দ্ররচনা-সহ।

খৃষ্ট। পৌষ ১৩৬৬ [১৯৫৯]। খৃষ্ট-জন্মদিনে প্রদত্ত খৃষ্টের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে ভাষণ।

চিঠিপত্র ৭। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭ [১৯৬০]। কাদম্বিনী দেবী ও শ্রীমতী নির্ঝরিনী সরকারকে লিখিত পত্র।

ছিন্নপত্রাবলী। আশ্বিন ১৩৬৭ [১৯৬০]। ছিন্নপত্র [১৯১২] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে লিখিত 'ছিন্ন' পত্রগুলি পূর্ণতর আকারে সংকলিত এবং তাঁহাকে লিখিত আরও ১০৭ খানি 'নূতন' চিঠি সংকলন-পূর্বক রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত।

বিচিত্রা। বিবিধ রচনার সংগ্রহ। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ [১৯৬১]। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সুলভ মূল্যে